বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

কিশোরগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
প্রিন্স রফিক খান

সমন্বয়কারী
সুস্মিতা চক্রবর্তী

সংগ্রাহক
মুহাম্মদ আলী
মো. হারেছ-উজ-জামান
মোহাম্মদ ওমর ফারুক সাহরিয়ার
মোখলেছুর রহমান দিনাজ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
কিশোরগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বাএ ৫২৮৬

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA : KISHOREGONJ (Present state of Folklore in Kishoregonj District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain., Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 395.00 only. US$: 6.00

ISBN-984-07-5295-2

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ,

www.pathagar.com

সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈমনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায়

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যেসব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদনদী, পুকুরদিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষপার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাটবাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত
১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শকশ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন্ শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঘ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঙ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

চ. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally"; ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শকশ্রোতা (audiance) সক্রিয়, ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

www.pathagar.com

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খালবিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন : গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান

www.pathagar.com

(সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা); লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল); অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধারবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাটবাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহি), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহি), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক

www.pathagar.com

কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ, নড়াইল, বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকাবাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১লা বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধার্বাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহররমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যেসমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান।

www.pathagar.com

২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যেসব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদনদী ও খালবিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শির্‌নি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকাবাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/সুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/ঝাঁকা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা সরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, উৎপাদন কর্মকর্তা শাহ্ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে কিশোরগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (Introduction of the District) ২৩-১৭৫
ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক কাঠামো
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম প্রতিবাদ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (Folk Literature) ১৭৬-২৫০
ক. লোকগল্প /কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. পুথিপাঠ
ঙ. ভাট কবিতা
চ. লোকছড়া

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (Material Culture) ২৫১-২৭১
লোকশিল্প (Folk Art)
১. লক্ষ্মীর সরা
২. মৃৎ শিল্প
৩. তাঁত শিল্প
৪. দারুশিল্প
৫. ঘর-বাড়ি শিল্প
৬. নকশি কাঁথা
৭. বাঁশ-বেত শিল্প
৮. পটচিত্র
৯. নকশি পাখা
১০. নকশি পিঠা
১১. আলপনা চিত্র
১২. পাট শিল্প

www.pathagar.com

১৩. কাগজ শিল্প
১৪. পাটি শিল্প
১৫. শোলাশিল্প
১৬. কাঁসা শিল্প
১৭. লৌহ শিল্প
১৮. স্বর্ণ ও শঙ্খ শিল্প
১৯. অলংকার শিল্প
২০. কুষ্ঠী চিত্র
২১. পিঁড়ি শিল্প
২২. কুলা চিত্র
২৩. পূজায় চিত্র
২৪. ট্রাঙ্ক শিল্প

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (Ware & Ornaments) ২৭২-২৭৩

লোকস্থাপত্য (Folk architecture) ২৭৪-২৭৬

লোকসংগীত (Folk Song) ২৭৭-৩৫৬

১. মাজারের গান, ২. উড়ি গান, ৩. ঘাটু গান, ৪. কর্মসংগীত, ৫. গাইনের গীত, ৬. মেয়েলি গীত, ৭. ভাটিয়ালি, ৮. পল্লিগীতি, ৯. গোরক্ষ নাথের গান, ১০. কাপালী সংগীত, ১১. ভাসান গান, ১২. রামায়ণ গান, ১৩. বাউল গান, ১৪. বিচার গান, ১৫. মুর্শিদি গান, ১৬. নৌকাবাইচের গান, ১৭. বারোবাসি গান, ১৮. বদর পিরের গান, ১৯. বৈষ্ণব গান, ২০. পালা গান, ২১. কবি গান, ২২. জারিগান, ২৩. বৃষ্টির গান, ২৪. ভিক্ষুক গান, ২৫. আঞ্চলিক গান, ২৬. ভাইব্রত ও সূর্যব্রতের গান, ২৭. ত্রিনাথের গান, ২৮. লক্ষ্মী পূজার গান, ২৯. গণসংগীত, ৩০. হিরালী গান, ৩১. বিয়ের গীত, ৩২. জুলার কিচ্ছা গান, ৩৩. গ্রাম-বাংলার আনন্দ সংগীত, ৩৪. নরসুন্দা নদীর গান, ৩৫. গিয়াসউদ্দিন ফকিরের গান, ৩৬. বাউল হাবিবুর রহমানের গান, ৩৭. অমরশীলের গান, ৩৮. মজনু বয়াতির গান, ৩৯. নবী হোসেন বয়াতির গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (Folk Instruments) ৩৫৭-৩৬৬

লোকউৎসব (Folk Festival) ৩৬৭-৩৭২

১. নববর্ষ
২. অষ্ট গ্রামের চৌদ্দমাদল উৎসব
৩. ঈদ উৎসব
৪. দুর্গা উৎসব
৫. গোপীনাথের রথযাত্রা
৬. বেড়া ভাসান উৎসব

www.pathagar.com

লোকমেলা (Folk Fair) ৩৭৩-৩৯২
১. চিল পূজা বনাম বৈশাখী মেলা
২. অষ্টমী স্নান ও মেলা
৩. হোসেনপুরের অষ্টমী মেলা
৪. রথযাত্রা ও রথমেলা
৫. নিকলীর রথমেলা
৬. মেলাবাজার
৭. কুড়িখাই মেলা
৮. ঝুলন মেলা
৯. পোড়া বাড়ীয়া মেলা
১০. চরপলাশ মেলা
১১. বারুণী মেলা
১২. অষ্ট গ্রামের মহররম মেলা
১৩. কাইমার বাউলী মেলা
১৪. গোসাই বাড়ি মেলা
১৫. ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইয়ের আখড়া ও চান্দখালি মেলা
১৬. প্রাচীন মেলাসমূহের বিবরণ

লোকাচার (Ritual) ৩৯৩-৪০০
১. খৎনা বা মুসলমানি
২. আকিকা
৩. অন্নপ্রাশন
৪. সিমন্তন্য
৫. সাধভক্ষণ
৬. ষষ্ঠি
৭. মানত
৮. গরুন্নাতের সিরনি
৯. চড়ি
১০. গায়ে হলুদ
১১. সদরভাতা
১২. মঙ্গলাচরণ
১৩. বউবরণ
১৪. বৌভাত

লোকখাদ্য (Folk Food) ৪০১-৪০৪

লোকনাট্য (Folk Theatre) ৪০৫-৪৬০
১. চন্দ্রাবতী
২. বীরাঙ্গনা সখিনা'র পালা
৩. মহুয়া পালা

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া (Folk Sport) ৪৬১-৪৬৬

১. হাডুডু খেলা
২. বউছি খেলা
৩. নৌকা বাইচ
৪. লাঠিখেলা
৫. ষাঁড়ের লড়াই
৬. দাড়িয়াবান্দা খেলা
৭. গোল্লাছুট খেলা
৮. বলাই
৯. তইতই
১০. রসকস খেলা
১১. হুমগুটি/গুটি খেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (Folk Groups) ৪৬৭-৪৭১

১. মিস্ত্রি/ছুতার
২. কুলু বা তেলি
৩. তাঁতি
৪. জেলে
৫. কামার
৬. গাছি
৭. গাইন ও বৈদ
৮. হাউইকর শিল্পী
৯. লিপিকর শিল্পী
১০. শিলপাটা ধার
১১. ঝালাইকর
১২. মালাকার
১৩. শালকর
১৪. কারিগর
১৫. আড়াইবাড়িয়ার কাঁচি ও কামার পাড়া

লোকচিকিৎসা (Folk Medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (Chant) ৪৭২-৪৭৮

ক. লোকচিকিৎসা
খ. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (Riddle) ৪৭৯-৪৯১

প্রবাদ-প্রবচন (Proverb) ৪৯২-৫০৬

লোকবিশ্বাস (Folk Belief) ও লোকসংস্কার (Folk Superstition) ৫০৭-৫১৫

লোকপ্রযুক্তি (Folk Technology) ৫১৬-৫২০

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

কিশোরগঞ্জ-বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এককালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে খ্যাত এবং পরে 'মহকুমা' নামে পরিচিত ছিল। তারও পূর্বে এ অঞ্চল প্রাচীন আমলে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কিশোরগঞ্জের নামকরণের উৎস নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। তবে এ বিষয়ে আজও কোনোরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়নি। সেই দিক থেকে এর নামকরণ নিয়ে এই দুটি মত তুলে ধরাই সবচাইতে যুক্তিযুক্ত। নিচে কিশোরগঞ্জের নামকরণ নিয়ে বিজ্ঞজনের দুটি ধারণা ও মতামত তুলে ধরা হলো :

ক. রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮১) বা ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠাকালে (১৭৮৭) কালেক্টরের রিপোর্টে কিশোরগঞ্জ নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এমনকি, ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন বৃহত্তর ময়মনসিংহে জামালপুর মহকুমার সৃষ্টি হয় তখনো কিশোরগঞ্জ সম্পর্কে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে, এই এলাকায় ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজকিশোর প্রামাণিক কর্তৃক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা পরবর্তী গেজেটিয়ারে লক্ষ করা যায় এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে ঝুলন মেলার জমজমাট সমাবেশের কথা জানা যায়। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। সময়ের আবর্তে এই পরগনা নাটোরের মহারাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয় বলে ধারণা করা হয়। বিখ্যাত প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের সাথে ব্যবসার সূত্র ধরে নাটোরের মহারাজার যোগাযোগ হয়। নাটোরের মহারাজা এই এলাকার কয়েকটি তালুক দেব-সেবার জন্য কৃষ্ণদাস প্রামাণিককে 'লাখেরাজ' দেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নাটোর মহারাজার জমিদারি নিলাম হয়ে গেলে খাঁজে কাফরে আরাতুন নামে এক আর্মেনীয় বণিক তা ক্রয় করেন। এতে আরাতুনের সাথে প্রামাণিকদের দীর্ঘকাল মোকদ্দমা চলে। তখনো পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ এলাকাটি 'কাটাখালি' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। আবার, জেমস্ টেলরের বর্ণনায় এলাকাটি 'জঙ্গলবাড়ি' হিসেবেই উল্লিখিত রয়েছে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই কিশোরগঞ্জের নামকরণটি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনের ধারণা আর জনশ্রুতি থেকে অনুমান করা হয় যে, বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত বত্রিশ প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের ষষ্ঠ ছেলে এবং প্রামাণিকদের কীর্তি একুশ রত্নের স্রষ্টা নন্দকিশোরের 'কিশোর' ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় হাট বা গঞ্জের 'গঞ্জ' যোগ হয়ে কিশোরগঞ্জ নামকরণ হয়েছে। প্রামাণিক পরিবারের বংশলতিকা অনুযায়ী নন্দকিশোর প্রামাণিকের সময় ছিল আনুমানিক

www.pathagar.com

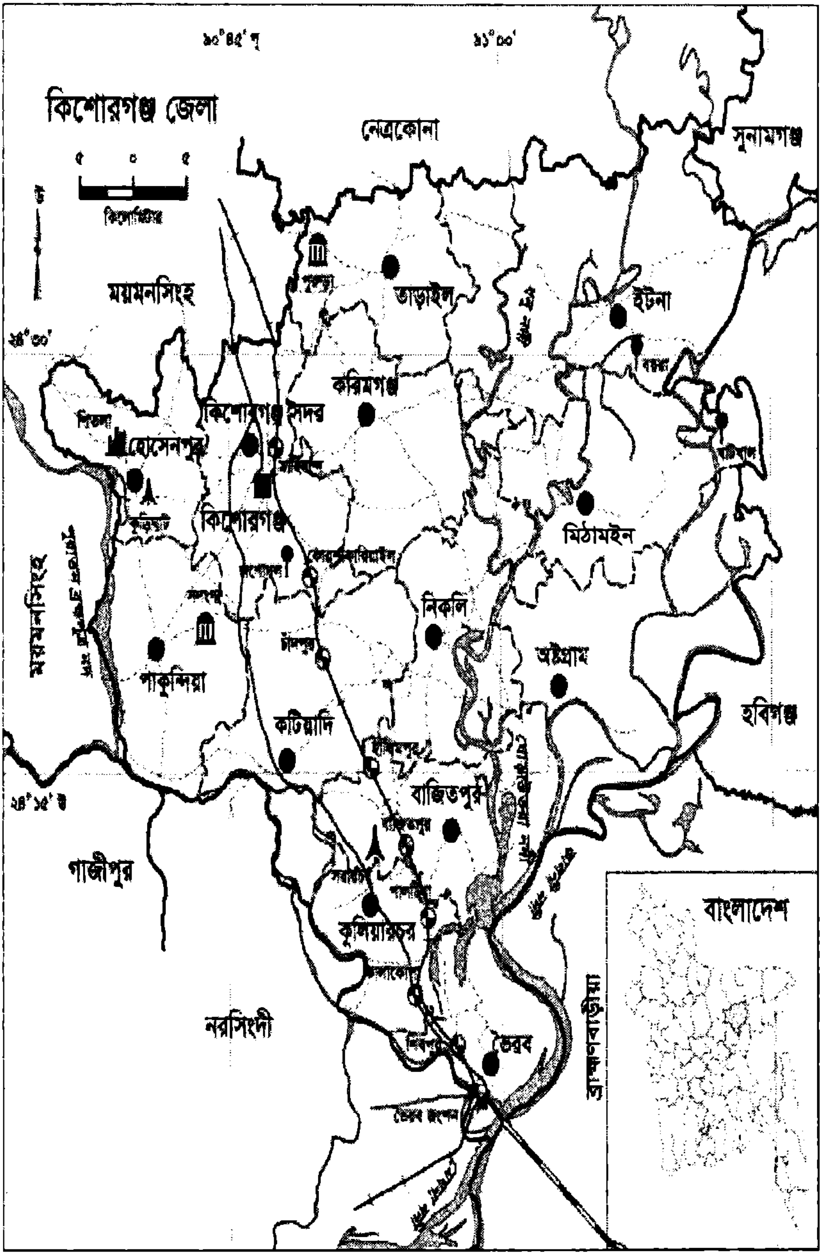

কিশোরগঞ্জ জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

১৭৫০ থেকে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ। এই হিসেবে তাঁর জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে এলাকাটির নামকরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ দেশের বহু এলাকার নামকরণ কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে 'গঞ্জ' যোগ করে করা হয়েছে। আর এই অঞ্চলে প্রামাণিকদের যে বিরাট প্রতিপত্তি ছিল তা জানা যায়। সে দিক থেকে 'কাটাখালির' নাম পরিবর্তন করে 'কিশোরগঞ্জ' নামকরণ করা বিচিত্র নয়। কিশোরগঞ্জের লোকঐতিহ্য সংগ্রাহক ও বিশিষ্ট গবেষক মোহাম্মদ সাইদুর সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এর নামকরণ নিয়ে উপরোক্ত ধারণাটি উল্লেখ করা হয়েছে যেটি এখানকার জনমনে বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়ে আছে।

খ. কিশোরগঞ্জের নামকরণ নিয়ে পাকুন্দিয়ার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব রসরাজ সাহা চৌধুরী দাবি করেছেন যে, কিশোরগঞ্জ মহকুমা (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠাকালে কিশোরীমোহন নাথ নামে একজন সমাজদরদী সাবরেজিস্ট্রার মহকুমাটি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে শ্রম, সময় এবং মেধা দিয়ে মহকুমা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত ইংরেজি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ইংরেজ কর্মচারীগণ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিশোরীমোহন নামের কিশোরীর দীর্ঘ-ইকার বাদ দিয়ে 'গঞ্জ' যুক্ত করে কিশোরগঞ্জ নামকরণ করেন। কিশোরগঞ্জ নামকরণ বিষয়ে এই মতটি ঢাকা সমিতির ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের নামকরণ বিষয়ে উপরোক্ত দুটি মতই প্রচলিত। তবে, প্রথম আলোচিত মতটি এর নামকরণের সাথে সর্বাধিক প্রচলিত আর জনপ্রিয়।

১৭৮৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা তখনকার ময়মনসিংহের অন্তর্গত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করে যদিও দেখা যায় যে, বাজিতপুর, নিকলী, হোসেনপুর ও জঙ্গলবাড়ির প্রাচীন আমেজ অনেক বেশি থাকলেও ঐতিহ্যবাহী জেলা হিসেবে কিশোরগঞ্জ আজ সর্বমহলে স্বীকৃত। কেননা প্রাচীন ইতিহাস আর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো বর্তমান জেলার অন্তর্গত।

বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তারপরে, গুপ্ত, বর্মণ, পাল ও সেন বংশ রাজত্ব করে এ অঞ্চলে। তবে, কোনো বংশই এ অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তৎকালে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উপস্থিতির কথা জানা যায়। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ছিল স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের পীঠস্থান। মধ্যযুগে, আলাউদ্দিন হোসেন শাহীর আমলে (১৮৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রি.) বৃহত্তর ময়মনসিংহে মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। কোচ অধ্যুষিত সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে সম্রাট আকবরের সময়।

অনুমান করা হয়, ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ও ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কিশোরগঞ্জ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কারণ হিসেবে বিখ্যাত প্রামাণিকদের কথা বলা হয়ে থাকে। ব্রজকিশোর প্রামাণিক ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন। প্রামাণিক পরিবারের একুশ রত্ন মন্দির নির্মাণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এক সময়ে যেমন বিপুল ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল

www.pathagar.com

অন্যদিকে ব্রজকিশোর প্রামাণিক মসলিন ব্যবসায় বিপুল উন্নতি করায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। তবে, ব্রজকিশোর প্রামাণিকের কথা গেজেটিয়ারসমূহে উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীকালে যে সকল দলিলপত্র পাওয়া যায় এবং জনশ্রুতি যা রয়েছে সেখানে ব্রজকিশোর নয় নন্দকিশোরের কথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিবেচনা করা যায় ঝুলন মেলা। উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতি বছর ঝুলন মেলা অনুষ্ঠিত হতো এখনও হয়। মূল ধর্মীয় উৎসবকে ছাড়িয়ে এই মেলা এতটাই বিস্তৃত লাভ করেছিল যে, শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমা থেকে কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। মেলাটি ছিল এই অঞ্চলের লোকশিল্পের ও কারুপণ্যের প্রধান বিপণন কেন্দ্র। এই মেলায় বিপুল জনসমাগম হতো। নরসুন্দা নদীর তীরে শত সহস্র নৌকা সারিবদ্ধ থাকত। মেলা উপলক্ষে ঢাকা, ত্রিপুরা, সিলেট কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই থেকে ব্যবসায়ীরা আসতেন কেনাবেচার জন্য। তৃতীয় কারণ হিসেবে বলা যায় এর যোগাযোগব্যবস্থা। তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলে নদী পথে যোগাযোগব্যবস্থা ও পরবর্তীকালে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে রেলযোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হলে এই অঞ্চলের সাথে বহির্দেশের যাতায়াত অনেক সমৃদ্ধ হয়। ফলে, এই অঞ্চলটির মহকুমার পর্যবসিত হওয়ার ক্ষেত্রে জমিদারদেরও অবদান রয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমা হওয়ার সময় থানা ছিল তিনটি। যথা : নিকলী, বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ। পরবর্তীতে, ১৯৮৪ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি তেরোটি থানা নিয়ে জেলা ঘোষণা করা হয়। বর্তমান সময়ে এই জেলাটি দেশের অন্যতম বৃহত্তম জেলা হিসেবে পরিচিত ও সর্বজনস্বীকৃত।

জঙ্গলবাড়ির কোচ রাজা লক্ষ্মণ হাজরা, সুশংরাজ রঘুপতি আর এগারসিন্দুর বেবোধরাজার কাহিনি এই অঞ্চলে আজ কিংবদন্তি। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের প্রথম রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের পুণ্যভূমি এই কিশোরগঞ্জ। তাঁরই কন্যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি নারী কবি চন্দ্রাবতী। তিনি এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় একটি রামায়ণ রচনা করেছেন। এছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার বেশ ক'টি উল্লেখযোগ্য গীতিকাসহ বেশ কিছু লোকগানও তিনি রচনা করেছেন। সখিনা, মলুয়া, মাধবীমালঞ্চি কইন্যার অঞ্চল কিশোরগঞ্জ। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন যে হারানো গীতিকাগুলো উদ্ধার করে ইংরেজিতে অনুবাদ করে আমাদেরকে বিশ্বের কাছে বরেণ্য করে তুলেছেন সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু গীতিকাই এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এই জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ হাওর অঞ্চলের রয়েছে স্বতন্ত্র জীবন, জীবিকা আর সংস্কৃতি।

বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার উপজেলা ১৩টি। যথা : কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, তাড়াইল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, নিকলী, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ইটনা ও মিঠামইন।

কিশোরগঞ্জ সর্ব প্রথম মহকুমা প্রশাসকের নাম ছিল মি. বকসেল। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ১৩টি থানাকে প্রথমে মান উন্নীত করে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয় এবং পরবর্তীকালে কিশোরগঞ্জ জেলা সরকারি গেজেট আকারে ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

খ. ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক কাঠামো

হাওর-বিল ও সমতলভূমির বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতির একটি বিস্তীর্ণ জনপদ হলো কিশোরগঞ্জ জেলা। ভৌগোলিকভাবে ২৪°০২ থেকে ২৪°৩৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৫ থেকে ৯১°১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা, দক্ষিণে নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এবং পশ্চিমে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা।

এ জেলার আয়তন ২৭৩১.২১ বর্গকিলোমিটার। কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলা, ১৪৪টি ইউনিয়ন আর ১৭৯৪টি গ্রাম রয়েছে। ১৩টি উপজেলার মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ হাওর এলাকা। এগুলো হলো ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম। এখানকার উপজেলাগুলো হলো কিশোরগঞ্জ সদর, অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিঠামইন, করিমগঞ্জ, কটিয়াদি, কুলিয়ারচর, তাড়াইল, নিকলী, পাকুন্দিয়া, বাজিতপুর, হোসেনপুর ও ভৈরব।

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেও কিশোরগঞ্জ এলাকাটি 'কাটাখালী' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। তার পূর্বে এ এলাকাটির নামকরণ ছিল 'হয়বতনগর'। এ থেকে ধারণা করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'কিশোরগঞ্জ' নামকরণ হয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে, স্থানীয় বত্রিশ এলাকার বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রামাণিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের ৬ষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর মতান্তরে নন্দকিশোর প্রামাণিকের 'কিশোর' এবং তার নামে প্রতিষ্ঠিত 'গঞ্জ' এ দুইয়ের সমন্বয়ে এ জনপদে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে একই সময়ে থানা ও মহকুমা প্রতিষ্ঠা হলে 'কিশোরগঞ্জ' নামটি সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘ ১২৫ বছর পর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অধীনে 'মহকুমা' হিসেবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি 'কিশোরগঞ্জ' একটি পৃথক এবং পূর্ণাঙ্গ 'জেলা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একই সময়ে কিশোরগঞ্জ সদর থানাটি প্রথমে 'মান উন্নীত' থানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি 'কিশোরগঞ্জ উপজেলা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°২১' থেকে ২৪°৩২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪২' থেকে ৯০°৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার অবস্থান। আয়তন ১৯৩.৭৩ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল, দক্ষিণে পাকুন্দিয়া উপজেলা ও কটিয়াদী উপজেলা, পূর্বে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে হোসেনপুর উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ৩,৪৮,৩৮২ জন। পুরুষ ১,৭৮,৪৬০ জন, মহিলা ১,৬৯,৯১৮ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৪৮.৪% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৫১.৪% শতাংশ। মহিলা শতকরা ৪৫.৪% শতাংশ।

করিমগঞ্জ উপজেলা

করিমগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি রয়েছে, বঙ্গবীর ঈশাখাঁর বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগল সেনাপতি মীরে বহর আল শায়খ আবদুল করিমকে এ অঞ্চলে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে আবদুল করিম এ অঞ্চলে

www.pathagar.com

থেকে যান। মীর আল শায়খ আবদুল করিম এখানে একটি 'গঞ্জ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'করিম এর গঞ্জ' এ দুইয়ের সমন্বয়ে এ জনপদের নামকরণ হয় 'করিমগঞ্জ'। করিমগঞ্জ থানা ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে সৃষ্টি হয় এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। ভৌগোলিকভাবে ২৪°২২ থেকে ২৪°৩২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৮ থেকে ৯১°০১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ২০০.৫২ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে তাড়াইল ও ইটনা উপজেলা, দক্ষিণে নিকলী, কাটিয়াদি ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে নিকলী ও মিঠামইন উপজেলা, পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ২,৫৮,২৬৬ জন। পুরুষ ১,২৯,১৩৪ জন, মহিলা ১,২৯,১৩২ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৩৫% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৩৯% শতাংশ। মহিলা শতকরা ৩২.৭% শতাংশ।

তাড়াইল উপজেলা

তাড়াইল কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি রয়েছে, এককালে এ অঞ্চলে ক্ষেতের আইল ছিল একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। অর্থাৎ বর্ষায় নাও আর হেমন্তে ছিল পাও একমাত্র ভরসা। সে অঞ্চলের জমিদার ছিলেন তালজাঙ্গার রাজনারায়ণ চৌধুরী। তার স্ত্রী 'তারামন দেবীর' স্মৃতির উদ্দেশে অনেক জায়গাজমি জনগণের কল্যাণে হাট-বাজার তৈরি করার জন্য দান করে গেছেন। সেই 'আইল' যুক্ত স্থানটি 'তারাদেবী'র নামের সাথে যুক্ত হয়ে পরবর্তী কালে 'তাড়াইল বা তারাইল' নামে জনপদের সৃষ্টি হয়েছে বলে স্থানীয় ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাড়াইল ঐতিহাসিক নাসিরুজিয়াল পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইকলিম মোয়াজ্জামাবাদ নামে এখানকার একটি স্থানে প্রাচীন মুদ্রা তৈরির কারখানা অর্থাৎ টাকশাল ছিল। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাড়াইল থানা স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ যুগে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাড়াইল উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°৩০ থেকে ২৪°৩৭ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৯ ডিগ্রি থেকে ৯০°৫৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১৩৬.৮৮ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া ও মদন উপজেলা এবং পূর্বে ইটনা উপজেলা। দক্ষিণে করিমগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,৫৩,৬৬৫ জন। পুরুষ ৭৮,৫৬৫ জন, মহিলা ৭৫,১০০ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৩৩.৩%। পুরুষ শতকরা ৩৫.৩% এবং মহিলা শতকরা ৩১.২% শতাংশ।

হোসেনপুর উপজেলা

হোসেনপুর-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। এককালে কিশোরগঞ্জ-হোসেনপুর পরগনার অধীনে একটি জনপদ ছিল। জনশ্রুতি আছে, মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ এর আমলে বাংলার তদানীন্তন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ একদা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে অঞ্চলের প্রজাসাধারণের সুখ-দুঃখ স্বচক্ষে দেখার জন্য এখানে এসে আগমন করেন এবং স্থানীয় 'দুল বাজার' নামক স্থানের এক জায়গায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে এই দুল বাজার এলাকাই সুলতান আলাউদ্দিন

www.pathagar.com

হোসেন শাহ এর নামানুসারে তার স্মৃতি রক্ষার্থে 'হোসেনপুর' নামকরণ হয় বলে স্থানীয় ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। হোসেনপুর একটি প্রাচীন পরগনা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা অঞ্চল। হোসেনপুর থানা স্থাপিত হয়েছে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°২৩ থেকে ২৪°২৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৪ থেকে ৯০°৪৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১২১.২৯ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে নান্দাইল উপজেলা, দক্ষিণে পাকুন্দিয়া ও গফরগাঁও উপজেলা, পূর্বে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে গফরগাঁও উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,৬১,৯৭৯ জন। পুরুষ ৮২,২০১ জন, মহিলা ৭৯,৭৭৮ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৩৬.৬% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৩৮.৬% শতাংশ। মহিলা শতকরা ৩৪.৬% শতাংশ।

পাকুন্দিয়া উপজেলা

পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি আছে, মধ্যযুগীয় এক মলং শাহ এর পাকদেহ থেকে পাকওয়ান শব্দের উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে পাকুন্দিয়া নাম হয়েছে। অন্য মতে, ষোড়শ শতকে এক মোঘল-পাঠান যুদ্ধে এক পাঠান সৈন্য এ স্থান দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাড়িত মোগল সৈন্যদের পিছন থেকে উচ্চারিত শব্দ 'পাকড়াও' শব্দটি পরবর্তীকালে উচ্চারণ বিবর্তন বা বিকৃতিতে পাকুন্দিয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আরেকটি মতে, এখানে অসংখ্য 'পাকুর' গাছ ছিল এককালে। 'দিয়া' অর্থ দু'পাশে নদী বা খাল বেষ্টিত উঁচু টিলাযুক্ত স্থান। পাকুর শব্দটি উচ্চারণ বিবর্তন বা বিকৃতিতে হয়তোবা পাকুনদিয়া বানানটি পাকুন্দিয়া হয়েছে বলে এ মতটি অধিক বিজ্ঞজনোচিত ও গ্রহণযোগ্য। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে পাকুন্দিয়া থানা স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ যুগে ১৯৮৩ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর পাকুন্দিয়া উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ভূপর্যটক ইবনে বতুতা পাকুন্দিয়ার এগারসিন্ধুর এলাকা পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া ঐতিহাসিক লেখক মোহাম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যক্ষ খুরশিদ উদ্দিন আহমদ, ড. আলাউদ্দিন আহম্মদ, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক ও খান বাহাদুর ইসমাইল সাহেবের জন্মস্থান পাকুন্দিয়া।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°১৫ থেকে ২৪°২৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৭ থেকে ৯০°৪৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অবস্থান। আয়তন ১৮০.৫২ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা, পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলা, পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ২,৩৭,২১৮ জন। পুরুষ ১,২০,৩৮৬ জন। মহিলা ১,১৬,৮৩২ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৪৮% শতাংশ। পুরুষ ৪৯.২% শতাংশ, মহিলা ৪৭.২% শতাংশ।

www.pathagar.com

কটিয়াদী উপজেলা

কটিয়াদি কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি রয়েছে, এককালে এ অঞ্চলে আদিবাসী 'হদী' উপজেলার সদরে বসবাস ছিল এবং ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞজনের ধারণা হদী উপজাতিদের বসবাসরত স্থানে কুঠি স্থাপিত হওয়ার পরবর্তীকালে এ অঞ্চল কুঠি থেকে উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে 'কটিহদী' থেকে কটিয়াদি বা কটিহাদি ইত্যাদি হয়েছে। অন্য একটি মতে, এখানে কটিফকির নামে একজন আধ্যাত্মিক পিরে কামেল এর নামানুসারে পরবর্তীকালে কটিয়াদি হয়েছে। ইতিহাসবিদ কেদারনাথ মজুমদার রচিত 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'হদি বা হদী' উপজাতি একমাত্র বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাস করত। বাংলাদেশের অন্য কোনো জনপদে তাদের দেখা যায়নি।' সেই উল্লিখিত মন্তব্যটি নিয়ে গবেষণা করলে 'হদী বা হদি' কটিয়াদি জনপদের নামকরণ এর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ মে কটিয়াদি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ১১ এপ্রিল ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°১০' থেকে ২৪°২২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৩' থেকে ৯০°৫৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ২১৯.২২ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে কিশোরগঞ্জ সদর ও করিমগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বেলাবো ও মনোহরদী উপজেলা, পূর্বে নিকলী, বাজিতপুর ও কুলিয়ারচর উপজেলা, পশ্চিমে পাকুন্দিয়া উপজেলা।

লোকসংখ্যা মোট ২,৮২,২৯৭ জন। পুরুষ ১,৪১,৪৭৭ জন, মহিলা ১,৪০,৮২০ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৩৭.৯% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৩৯.৯% শতাংশ, মহিলা শতকরা ৩৫.৮% শতাংশ।

নিকলী উপজেলা

নিকলী কিশোরগঞ্জ জেলার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন থানা ঐতিহ্যবাহী জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি আছে, মোগল বাহিনী খাজা ওসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে এবং তাকে ধাবিত করতে এই এলাকায় এসে পৌছায় এবং সেখানে ছাউনি ফেলে। তাদের অস্থায়ী আবাসস্থলে স্থানীয় মানুষেরা জড়ো হলে দলের প্রধান সিপাহীদের বলেন 'উছলে নিকানো'। এই উছলে নিকালো শব্দধ্বনি উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে 'নিকালো' থেকে নিকলী হয়েছে বলে বিজ্ঞজনের ধারণা। নিকলী কিশোরগঞ্জের প্রাচীনতম থানা এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৫ আগস্ট ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ। কিশোরগঞ্জ থানা ও একসঙ্গে মহকুমা স্থাপিত হয় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে। অথচ ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকলীতে মহকুমা স্থাপনের একটি সরকারি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা না করে কেন কিশোরগঞ্জ মহকুমা স্থাপন করা হয়েছিল সে তথ্য জানা যায়নি। নিকলী থানা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে একটি দেওয়ানি আদালতও স্থাপন করা হয়েছিল। আদালত পরবর্তীকালে উঠে আসে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে নিকলী দামপাড়া নামক এলাকায় প্রাচীন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। পরবর্তী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ যুগে ২৪ মার্চ ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নিকলী একটি উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

www.pathagar.com

এ উপজেলার সীমানা হচ্ছে উত্তরে করিমগঞ্জ ও মিঠামইন উপজেলা, দক্ষিণে বাজিতপুর উপজেলা, পূর্বে মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা, পশ্চিমে কটিয়াদি ও করিমগঞ্জ উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,২০,১০৫ জন। পুরুষ ৬১,৪০৮ জন, মহিলা ৫৮,৬৯৭ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ২১.৯% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ২৮%, মহিলা শতকরা ১৯.৬% শতাংশ। ভৌগোলিকভাবে ২৪°১৫ থেকে ২৪°২৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫২ থেকে ৯১°০৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ২১৪.৪০ বর্গ কি.মি.।

বাজিতপুর উপজেলা

বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ জেলার প্রথম পর্যায়ের একটি প্রাচীন থানা ঐতিহ্যবাহী জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি আছে-- মোগল আমলে ঐতিহাসিক বায়েজিদ খাঁ নামক জনৈক এক রাজকর্মচারী তার অপর ভ্রাতা ভাগল খাঁ, দৌলত খাঁ ও দেলোয়ার খাঁ সহ দিল্লী থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই ভাইদের প্রত্যেকের নামে প্রতিটি জনপদ গড়ে উঠে। যেমন বায়েজিদ খার নামে বাজিতপুর, ভাগলখাঁর নামে ভাগলপুর, পৈলনখার নামে পৈলনপুর আর দেলোয়ার খাঁর নামে দিলালপুর জনপদ থেকে আজকের উপজেলা 'বাজিতপুরের' সৃষ্টি বলে জানা যায়।

বাজিতপুর থানা ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পরবর্তী প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়। অথচ ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বাজিতপুরকে মহকুমা করার একটি পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভৌগোলিকভাবে ২৪°০৯ থেকে ২৪°১৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫০ থেকে ৯১°০৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১৭২.১৮ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে কটিয়াদি উপজেলা, দক্ষিণে কুলিয়ারচর, ভৈরব ও সরাইল উপজেলা এবং পূর্বে অষ্টগ্রাম ও নাসির নগর উপজেলা। পশ্চিমে কটিয়াদি উপজেলা।

কুলিয়ারচর উপজেলা

কুলিয়ারচর-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি রয়েছে, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে এ এলাকা বাংলার বার ভূঁইয়া প্রধান বীর ঈশাখাঁর অধস্তন ভাগলপুরের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবারের জমিদারীর অংশ ছিল। কালক্রমে দেওয়ানদের অন্যতম দেওয়ান আহমদ রেজার নামে এ এলাকা এককালে 'দেওয়ানগঞ্জ' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী কালে এই স্থানে কুলিখাঁ, তাঁতার খাঁ, আদম খাঁ, লোকমান খাঁ নামে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এসে আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাদের নামানুসারেই কুলিখাঁ থেকে কুলিখাঁরচর থেকে উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে কুলিয়ারচর, তাঁতার খাঁর নামে তাঁতার কান্দি, আদম খাঁর নামে আদমখাঁরকান্দি, লোকমান খাঁর নামে লোকমান খাঁর কান্দি জনপদগুলো কুলিয়ারচর উপজেলায় চিহ্নিত রয়েছে। অন্য আরেকটি জনশ্রুতি হলো, কুলি খাঁ নামে এক বিখ্যাত সুবেদার এখানে এসে পার্শ্ববর্তী মেঘনা নদী ও কালী নদীতে তৎকালীন সময়ের জলদস্যুদের তিনি শায়েস্তা করে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে দমন করেছিলেন। কুলি খাঁ যে চরে বসবাস করতেন পরবর্তীকালে তার নামানুসারে এই স্থান কুলিখার চর থেকে

www.pathagar.com

কুলিয়ারচর নামে পরিচিতি লাভ করে। অন্য একটি মতে–কুকিল (কোকিল) পাখি। কালের বিবর্তনে কুলি পাখির চর থেকে কুলিয়ারচর নাম হয়েছে বলে সমর্থন করেন। কুলিয়ারচর থানার প্রতিষ্ঠাকাল পরবর্তীকালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ০২ মার্চ ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।

সীমানা : উত্তরে বাজিতপুর উপজেলা, দক্ষিণে ভৈরব উপজেলা ও নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলা, পূর্বে বাজিতপুর উপজেলা ও ভৈরব উপজেলা, পশ্চিমে কটিয়াদি উপজেলা ও নরসিংদি জেলার বেলাব উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,৫৬,৫৯২ জন। পুরুষ ৭৯,৪১২ জন, মহিলা ৭৭,১৮০ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৪১.০৩% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৪৫.১০% শতাংশ, মহিলা শতকরা ৩৭.৪% শতাংশ। ভৌগোলিকভাবে ২৪°০৬ থেকে ২৪°১৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৯ থেকে ৯০°৫৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১০৪.০১ বর্গ কি.মি.।

ভৈরব উপজেলা

ভৈরব-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি আছে, ভৈরব রায়নামক এক তালুকদার তৎকালীন মেঘনা নদী বক্ষ থেকে উত্থিত বিস্তৃত চরাঞ্চল উলুকান্দি দেখে তিনি এই চর দখল করার জন্য স্থির করেন। মেঘনা নদী তীরবর্তী এই উলুকান্দি নামক চরটি তখন বাজিতপুর নিবাসী জমিদার ভাগলপুরের কৃতি সন্তান দেওয়ান আহমদ রেজার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। পরবর্তীকালে কোনো দলিল পত্র ছাড়াই মুখে মুখে ভৈরব রায় জমিদার আহমদ রেজার কাছ থেকে নিয়ে নেন এবং সুযোগ বোঝে দখল করে আবাদ শুরু করেন। পরবর্তীকালে ভৈরব রায়– এর নামে ভৈরবপুর, তার মা কমলা দেবীর নামে কমলগঞ্জ, ভাইবোনদের নামে জগন্নাথপুর, কালীপুর, চণ্ডিবের, শম্ভুপুর ইত্যাদিতে জনপদ গড়ে ওঠে। এ নিয়ে পরবর্তীকালে মুক্তাগাছার জমিদার জগৎ কিশোর মহারাজার পিতা ভবানী কিশোর আচার্য ওরফে পাঁচুবাবু এক সংঘর্ষে জড়িয়ে গেলে মামলা-মোকদ্দমায় ভৈরব রায়ের পরাজয় ঘটে। কিন্তু ভৈরব রায়ের নামেই অদ্যাবধি এই জনপদ 'ভৈরব' নামে পরিচিতি লাভ করে। ভৈরব থানা ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ভৈরব উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°০২ থেকে ২৪°১১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৪ থেকে ৯১°০২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ১২১.৭৩ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে বাজিতপুর উপজেলা, দক্ষিণে রায়পুরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা, পূর্বে সরাইল উপজেলা, পশ্চিমে কুলিয়াচর ও বেলাবো উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ২,৪৭,১৬৬ জন। পুরুষ ১,২৫,৬২১ জন, মহিলা ১,২১,৫৪৫ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৪০.৭% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৪৪.৮% শতাংশ, মহিলা ৩৬.৬% শতাংশ।

অষ্টগ্রাম উপজেলা

অষ্টগ্রাম-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি রয়েছে যে, খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের অধিপতি বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারই অধিসামন্ত কবি অনন্ত দত্ত অষ্টগ্রামের কাস্তলে এসে বসতি স্থাপন করেন। তারই পদবি কায়স্থ কুলের লোক হিসেবে এই জনপদের নামকরণ হয় কায়স্থ থেকে উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে 'কাস্তল'। কাস্তলের আশেপাশে অনন্ত দত্তের সঙ্গে এসেছিলেন তারই গুরু দ্বিজকণ্ঠ মতান্তরে গুরু শ্রী কণ্ঠ দ্বিজ সহ ওরা আরও আট জন। এরা এখানকার আটটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলে পরবর্তীকালে একত্রে এই চিহ্নিত গ্রামগুলোকে 'আটগাঁও' বলা হতো। বৃহত্তর ময়মনসিংহের সর্বপ্রাচীন মানচিত্রে 'আটগাঁও' নামে এলাকাটির নাম উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে থানা প্রতিষ্ঠাকালে আটগাঁও এর নাম 'অষ্টগ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করে। কালের পরিবর্তনে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অষ্টগ্রাম উপজেলা নামে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°১৩ থেকে ২৪°২৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৯ থেকে ৯০°১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ৩০০.৪৪ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে মিঠামইন, দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই ও বানিয়াচং উপজেলা, পশ্চিমে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,৪৫,৫৫২ জন। পুরুষ ৭৪,৫৮০ জন, মহিলা ৭০,৯৭২ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ৩৭.৪% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ৪২.৫% শতাংশ, মহিলা শতকরা ৩২% শতাংশ।

ইটনা উপজেলা

ইটনা কিশোরগঞ্জ জেলার একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। জনশ্রুতি আছে সুলতানি আমলে জৈয়ন শাহ নামক একজন সার্ভেয়ার প্রথম এ অঞ্চল জরিপ কাজ পরিচালনা করায় পরবর্তীকালে তার নামানুষারে অঞ্চল জৈয়ন শাহ থেকে জৈয়নশাহী পরগনা নামে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কি করে কখন এই জৈয়নশাহী পরগনা জোয়ানশাহী উচ্চারণ বিবর্তনে পরবর্তীকালে এর একটি স্থল ভাগ 'ইটনা' নামে পরিচিতি লাভ করে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞজনের ধারণা থানা প্রতিষ্ঠাকালে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এ অঞ্চলটি 'ইটনা' নামে খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করে। ইটনা সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি যা প্রচলিত তা হলো 'এথনা' শব্দ থেকে 'ইতনা-ইটনা' হয়েছে বলে অনুমান করে থাকেন। ইটনা একটি হাওর উপজেলা ভাটিদেশ নামে পরিচিত। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°২৭ থেকে ২৪°৩৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৭ থেকে ৯১°৫৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ৫০৩.৪০ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে নেত্রকোণা জেলার মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলা, দক্ষিণে মিঠামইন ও করিমগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ উপজেলা ও সুনামগঞ্জ জেলার সাল্লা উপজেলা, পশ্চিমে কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,৫১,১৫৭ জন, পুরুষ ৭৯,৬৪৯ জন, মহিলা ৭১,৫০৮ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ২৪.৮% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ২৮.১% শতাংশ, মহিলা শতকরা ২১.২% শতাংশ।

www.pathagar.com

মিঠামইন উপজেলা

মিঠামইন-কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ ও উপজেলা। এটি কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের দ্বীপপতিম উপজেলা এবং নৌপথ ছাড়া এখানে পৌঁছানো দুরূহ। জনশ্রুতি রয়েছে, সে এলাকার পার্শ্ববর্তী হাওর একসময় প্রচুর খাগড়া বনের সমাবেশ ছিল। উক্ত খাগড়া ছিল মিষ্টি বা মিঠা রস। এই মিঠা খাগড়ার বন থেকে উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে মিঠাবন থেকে 'মিঠামন'। শব্দ উচ্চারণ বা ব্যবহার যে বিবর্তন আর বিকৃতি হয় এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই মিঠাবন থেকে মিঠামন নামের উৎপত্তি থেকে। মিঠাবন > মিঠামন থেকে বর্তমানে এর নাম কাগজপত্রে এবং মুখে মুখে 'মিঠামইন' হয়ে গেছে। আরও একটি জনশ্রুতি হলো, এককালে এই এলাকাটিতে প্রচুর মইন গাছ হতো। নদীর ধারে, পতিত জমিতে বা কান্দায় কান্দায় মইন গাছের সমারোহ ছিল। সে গাছটিও ভিতরে ইক্ষুর মত মিষ্টি রস ছিল। অনেকের ধারণা এই মইন গাছের মিঠা থেকেই পরবর্তীকালে এ জনপদের নামকরণ হয়েছে 'মিঠামইন'। স্থানীয়ভাবে 'ঠ' শব্দ উচ্চারণ 'ট' বলতে শোনা যায়। ফলে উচ্চারণ বিবর্তন বা বিকৃতিতে মিঠামইনকে মিঠামইন বলতে এবং লিখতে দেখা যায়। মিঠামইন পূর্বে ছিল নিকলী থানার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মিঠামইন একই সাথে থানা থেকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যুগে একটি উপজেলা হিসেবে উন্নীত হয়।

ভৌগোলিকভাবে ২৪°২২´ থেকে ২৪°৩০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°০০´ থেকে ৯১°১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আয়তন ২২২.৯২ বর্গ কি.মি.।

সীমানা : উত্তরে ইটনা ও আজমিরিগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে অষ্টগ্রাম উপজেলা, পূর্বে হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং ও অষ্টগ্রাম উপজেলা। লোকসংখ্যা মোট ১,২২,২০০ জন। পুরুষ ৬৩,২৩২ জন, মহিলা ৫৮,৯৬৮ জন। শিক্ষার হার গড় শতকরা ১৫.৬% শতাংশ। পুরুষ শতকরা ২০.৭% মহিলা ১০.২% শতাংশ।

তথ্যসূত্র : বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশ কাল ২০০৩, ঢাকা

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুদূর প্রাচীনকালে কিশোরগঞ্জের উজান-ভাটির বিশাল এই ভূ-ভাগটি কবে কখন কোথায় কিভাবে কী অবস্থায় ইতিহাসের সূচনা করেছিল তার সঠিক তারিখ জানা নেই। কোনো অঞ্চলের অতীত ইতিহাস রচনায় তার প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ হিসেবে প্রথমেই স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নয়-প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপি যেকোনো একটি অঞ্চলের অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে। কারণ মুদ্রা ও শিলালিপিতে সে সময়ের প্রতীক চিহ্ন ছাড়াও শাসকের নাম ও পরিচয় সন তারিখ উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ, পর্যটকদের বিবরণ, পুথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মহাভারত, রামায়ণ, ধর্মভিত্তিক সাহিত্যে, লোকসাহিত্যে, ধর্ম প্রচারক, সুফিসাধক, মরমিবাদ, পির-ফকির-দরবেশদের বিবরণ, শৈব, শাক্ত, তন্ত্র-মন্ত্র-নাথ, যোগসাধন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, মৌর্য, গুপ্ত, শশাঙ্ক, পাল, সেন, বর্মণ প্রভৃতি শাসনামল। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, আফগান, মোঘল, পাঠান পরবর্তী

www.pathagar.com

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল আমাদের এ অঞ্চলের আদি অতীত ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। একটি কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, কোনো দেশ বা অঞ্চলের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনীতি, জীবন, জীবিকা, জনপদ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে সেই দেশ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা জানা প্রয়োজন।

পাশাপাশি সে অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনধারা আঞ্চলিক ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। গোটা বাংলাদেশসহ সমগ্রভারত বর্ষের ইতিহাস যেমন একক কোনো জাতির ইতিহাস নয়। হাজারো ভাষা সংস্কৃতির হাজারো জাতি গোষ্ঠীর মিশ্র ইতিহাস। তেমনি একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাসও শুধু একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকলেও কেন্দ্র থেকে বেশ দূর-দূরান্তে দেখা যেত প্রায়ই আশেপাশের নানা অঞ্চল থেকে এসে বহিরাগতদের বিদ্রোহ দানা বাঁধত। সেই সব ঘটনার সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে করতেই শাসকদের পুরো সময় অতিবাহিত হতো। নিম্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষদের কাছে রাজা-বাদশার গল্প-গুজব-কথা-কাহিনির-কিস্‌সা ছাড়া তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা যেত না। তাদের কাছে 'রাজা আসে রাজা যায়' তাতে জনগণের কিবা আসে যায়। সমাজে এ চিত্রই পরিলক্ষিত হতো বেশি।

এ চিত্র বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজ সংস্কৃতির উপর শোষণ-শাসন ও নির্যাতনের ইতিহাস। আর রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল কেবল ক্ষমতার পালা-বদল, সম্রাট ও সাম্রাজ্যের পতন, জয়-পরাজয়ের পালা ছিল অনিয়ন্ত্রিত। সে দিক বিবেচনায় কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর, যশোদলপুর ও ভৈরবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মুদ্রা ও নিকলীর গুরুই মসজিদে স্থাপিত সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ এর নাম অংকিত প্রাচীন শিলালিপি রয়েছে। যা আবিষ্কৃত না হলে কিশোরগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাসের এমন অনেক কথা আজও আমাদের অজানা অপ্রকাশিত থেকে যেত। এতে প্রমাণ করে সুলতান বারবাক শাহ-এর শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল কিশোরগঞ্জের নিকলী গুরুই এলাকা। কারণ ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ'র আমলে তারই নামে সমগ্র ভারতসহ বাংলাদেশে সর্বমোট ১৬টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। যার ১টি শিলালিপি নিকলী উপজেলার গুরুই নামক গ্রামের 'গুরই মসজিদে' রয়েছে। শিলালিপির সময়কাল ৮৭১ হিজরি। অর্থাৎ নিকলীর গুরুই মসজিদটি ১৪৬৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত বলে জানা যায়। কিশোরগঞ্জের যশোদলপুর এলাকায় সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহের নাম অংকিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের তৈরি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর এলাকায়। এ মুদ্রায় এ অঞ্চলের মাটি ও মানুষের খাদ্যের প্রতীক যেমন মাছ ও নৌযানের চিত্রের উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যায়। কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান ঐতিহাসিক লেখক ড. নীহার রঞ্জন রায় তার অমর গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস' আদিপর্বে উল্লেখ আছে কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারে একটি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মৌর্যযুগের যেসব প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল এগারসিন্দুর নামক গ্রামে তার সাথে যোগসূত্র রয়েছে আমাদের ভৌগোলিক অঞ্চলের

www.pathagar.com

পাশেই প্রাচীন অঞ্চল উয়ারী-বটেশ্বর নামক নরসিংদী জেলার দুটি আদি গ্রামের চমকপ্রদ নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও মুদ্রাসহ বিভিন্ন উপকরণ প্রাপ্তির ইতিহাস। যা সমগ্র দেশবাসীকে অবাক করে দিয়েছে। অর্থাৎ এতে করে গবেষণায় আমাদের কিশোরগঞ্জ জেলার এগারসিন্দুর এলাকার গৈরিক উচ্চভূমির আদি ইতিহাসের জানালা খুলে দিয়েছে। এছাড়াও যে সব প্রাচীন মুদ্রা এ অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির বিশাল গ্রন্থাগারের ত্রিতল ভবনে তা আজও রক্ষিত আছে। যেমন– সম্রাট আকবরের সময়ের প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোর বৈশিষ্ট হলো এগুলো রৌপ্য নির্মিত এবং চার কোণ বিশিষ্ট। চার কোণায় খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফার নামসহ মাঝখানে প্রথম কলেমা লেখা রয়েছে। এই মুদ্রার অন্যপীঠে আরবি হরফে জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর বাদশা গাজী নাম উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও এ অঞ্চলে পাওয়া গেছে সম্রাট শাহ্ আলমের সময়ের কিছু রৌপ্য নির্মিত গোলাকৃতি ধরনের মুদ্রা। একটি মুদ্রার সময়কাল আরবিতে লেখা আছে ১১৯৫ হিজরি এবং অন্যটিতে লেখা আছে ১২০৪ হিজরি। আরও পাওয়া গেছে শাহ্ আলম বাদশা জুলুস ইয়ার ৩০৭ এর একপাই মূল্যের তাম্রমুদ্রা। ১৩১৫ হিজরির গোলাকৃতি ৪টি আসল তাম্রপাঞ্জাসহ পাওয়া গেছে আরও কিছু মুদ্রা। শ্রী মাধব রাও ভা-সিংহ আলীজা বাহাদুর গোয়ালিয়ার ১৯৫৩ বিক্রমী ১ পয়সা মুদ্রা। পাওয়া গেছে শ্রীমৎ মহারাজ শিবাজী রাও হোলকত ইন্দোর ১৯৪৬ বিক্রমী ১ পয়সা মুদ্রা। এছাড়াও রানি ভিক্টোরিয়ার আমলের ১ সেন্ট মুদ্রা। শ্রীরাম চন্দ্র অযোধ্যার তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি। কিশোরগঞ্জ জেলার এই গৈড়িক উচ্চ ভূমি এগারসিন্দুরে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বের আকরিক লোহার তৈরি অসংখ্য হাত কুঠার, ধুনকে ব্যবহৃত পাথরের গুটিকা এবং অসংখ্য বর্শার ফলক। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের দিকে নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরসহ মুদ্রা প্রাপ্তির স্থানসমূহ যে প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিশোরগঞ্জ জেলার এগারসিন্দুর ও বুরুদিয়া ঐ একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করে থাকেন।

এগারসিন্দুর থেকে প্রাচীন পরগনা কিশোরগঞ্জের হাজরাদী অঞ্চল যা এ জেলার একমাত্র গৈড়িক উচ্চ ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকাটি প্রাচীন বঙ্গ জনপদ থেকে এক সময় কামরূপ রজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাসের এই ভাঙাগড়ার বিবর্তন আর পরিবর্তনে পূর্ববঙ্গে 'ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজত্বের শেষের দিকে অথবা তার পুত্র সুলতান সেকান্দর শাহ'র রাজত্বের একেবারে প্রথম ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। কারণ মোয়াজ্জমাবাদ মিন্টাউন থেকে সর্ব প্রথম উৎকীর্ণ মুদ্রার তারিখ হচ্ছে ৭৬০ হিজরি অর্থাৎ ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দ। ১৩৬৮ বাংলা সনের ৮ম সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রাবন্ধিক মুহম্মদ সিরাজুল হক 'ইকলিম-ই-মোয়াজ্জমাবাদ' এর সদর দফতর কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলায় ছিল বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার নামক স্থানে 'ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ' নামে একটি প্রাচীন প্রদেশের অবস্থান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই স্থানটি একই এলাকার সেকান্দর নগরের সাথে ছিল অভিন্ন। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল জাওয়ার এলাকার 'মোয়াজ্জমাবাদে' একটি 'টাকশাল' ছিল এবং এই টাকশাল থেকে যে প্রাচীন মুদ্রা তৈরি হতো এটি শুধু কিশোরগঞ্জের ইতিহাস

www.pathagar.com

নয়, বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ এর সদর দফতর অথবা মিন্টাউনের অবস্থান ছিল কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার 'জাওয়ার-সেকান্দরনগর' প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ সুলতানি আমলে এ অঞ্চল পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করে ছিলেন এটি কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীর জন্য কম গৌরবের কথা নয়।

কিশোরগঞ্জ-বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উজান-ভাটির হাওর অধ্যুষিত একটি জেলা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক লোকজ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ জনপদ। প্রাচীন যুগে কিশোরগঞ্জ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বে কামরূপকে বলা হতো প্রাগজ্যোতিষপুর। সর্বপ্রথম আমরা এ অঞ্চলটির খবর পাই খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রাক্কালে রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বের সময়ে। সে সময়ে চীন দেশীয় পর্যটক হিউ-এন-সাঙ বাংলা দেশের এসব অঞ্চল তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। এ বিস্তৃত অঞ্চলটি ছিল তখন বিশাল হাওর ও জলজ জঙ্গলে পরিপূর্ণ দুর্গম অঞ্চল। এসব দুর্গম অঞ্চলে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পার্শ্ববর্তী আসাম, কুচবিহার, ত্রিপুরা, বিক্রমপুর, রাজশাহী, রাঢ় অঞ্চলসহ অন্যান্য উচ্চ ভূমি থেকে বেশ কিছু কৌম শ্রেণি গোষ্ঠীর উপজাতি বৃহত্তর কিশোরগঞ্জের সমগ্র অঞ্চলগুলোতে এসে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করে। ফলে তাদের লোকধর্মভিত্তিক সমাজের প্রধান উপজীবিকা ছিল শিকার, মৎস্য আহরণ ও কৃষিকাজ। এমনি ধারায় অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জনপদটি জনবসতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতেও দেখা যায় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এ অঞ্চলের আদিবাসী বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর উপজাতি সীমান্তবর্তী বিভিন্ন পর্বতময় অঞ্চলে ফিরে যায়। ফলে কিশোরগঞ্জ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছরের বহু পুরাতন তার জনবসতির ইতিহাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে স্যার চার্লস লায়েল তার 'প্রিন্সিপাল অব জিওলজি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, আদি বঙ্গের উৎপত্তি খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে হওয়াটাই স্বাভাবিক। শ্রী কেদারনাথ মজুমদার রচিত 'ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন সকল অঞ্চল মহাভারতের যুগে লৌহিত্য সাগরের স্ফীত বক্ষে লুকায়িত ছিল। পরে ধীরে ধীরে তা উত্থিত হয়। মহাভারতের যুগে ব্রহ্মপুত্র নদটি কামরূপের প্রাগজ্যোতিষ পূর্ব প্রান্ত অগ্রসর হয়ে সাগরের সাথে মিলিত হতো। ঐ ধারার সাগরটিকে ঐতিহাসিকরা ব্রহ্মপুত্র নদকে 'লৌহিত্য সাগর' বলে অভিহিত করেছেন। মহাকবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশ' নামক গ্রন্থের পূর্বভাগে যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, তাতে দেখা যায় ঐ সময়ে সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর পাকুন্দিয়া এলাকার এগারসিন্দুর অঞ্চলটি গৈড়িক উচ্চভূমি ছাড়া অন্যগুলো সমতল ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে এ অঞ্চলের অতীত আলোচনার ঈঙ্গিত পাওয়া যায় প্রাচীন ইতিহাসে। গুপ্ত যুগের পর মৌর্য যুগে মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ণ সীমানার শেষ প্রান্ত ছিল কিশোরগঞ্জ। কোথাও জল কোথাও স্থল নিয়ে গঠিত এই বিশাল ভূ-ভাগটি তখনও তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় গভীর জল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। হিংস্র জীবজন্তুর অবাধ বিচরণক্ষেত্র ছিল কিশোরগঞ্জ। প্রাচীন বা প্রাথমিক পর্যায়ে এ অঞ্চলের

www.pathagar.com

আদি আদিবাসী আবাদী, জেলে, জংলী, জিরেতী জনগোষ্ঠী মধ্যযুগীয় জীবন ব্যবস্থায় তারা দিনের বেলায় ডাঙ্গায় বিচরণ করলেও অনেকেই নৌকাতেই রাত্রিযাপন করত। নৌকায় থাকা খাওয়া এখনো ভাটি কিশোরগঞ্জের হাওর জনপদের জীবন চিত্রে মাঝি-মাল্লা নামে মানুষদের মধ্যে অভ্যাস দেখা যায়। আদি বাঙ্গাল থেকে বাঙ্গালী জাতি 'বৃহৎ বঙ্গের' যে সব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত তাদের মধ্যে এ কিশোরগঞ্জের বাঙ্গাল > আদি বাঙ্গালদের যে জনগোষ্ঠীটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে অঞ্চলের নাম অষ্টগ্রামের 'বাঙ্গালপাড়া'। মধ্যযুগীয় কবি চন্দ্রাবতীর পালাকাব্যে উল্লেখ আছে, 'উত্তরে গারো পাহাড় দক্ষিণে সাগর, বাড়িঘর নাহি কেবল নল-খাগড়ারগড়। একদা লৌহিত্য সাগর শুকিয়ে গিয়ে তারই বুকে জেগে উঠে উর্বরচর। এসব চরে গজিয়ে উঠে নল-খাগড়াগড় কালক্রমে হিজল-তমাল আর করচের ঘনবন। এই লৌহিত্য সাগরেরই বড় অংশ ব্রক্ষপুত্র নদ। যে নদ অতিক্রম করতে পারেনি মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব। ব্রক্ষপুত্র নদের পশ্চিম থেকে পাণ্ডবরা পূর্ব ময়মনসিংহের জেলা কিশোরগঞ্জে আসতে পারেনি বলে এ স্থানের নাম হয়েছে পাণ্ডববর্জিত অঞ্চল। বিশ্ব পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই জলধারা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির ঘোড়া বাহিনীকেও থামতে হয়েছিল ব্রক্ষপুত্র নদের পশ্চিম তীরে। এমনকি এককালে আরাকান রাজ্য থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আসা বহিরাগত পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা সেকালের বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রসিদ্ধ নদী বন্দর কিশোরগঞ্জের ব্রক্ষপুত্র নদ তীরবর্তী অঞ্চল মঠখোলা, মির্জাপুর, এগারসিন্দুর প্রভৃতি স্থানে বারবার হানা দিয়েও জনগণের প্রতিরোধের মুখে দস্যুরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তেমনি মারাঠা বর্গী দস্যুরা কখনও এ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। তারও পূর্বে এ অঞ্চল এক সময় ছিল শুধু জল আর জল। এরইমধ্যে একটু আবাস একটু স্থল। সেই আদ্যিকালের কথা।

ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ বিরান অঞ্চল সৃষ্টি হওয়ার পর পর্বতচারী অষ্ট্রোমঙ্গোলীয়ান জাতিগোষ্ঠীর লোকজন তাদের পর্বত নিবাস ত্যাগ করে সমগ্র কিশোরগঞ্জের সমতল নিম্নজলাভূমিতে নেমে আসে। তাদের মধ্যে কোচ-গারো-হাজং-সাঁওতাল, মনিপুরী-রাজবংশী-রাখাইন-কুকি-বনওয়ারী-মান্দার-খাসিয়া-নাগ প্রভৃতি উপজাতির নামের গ্রামের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা যেসব স্থানে বা জনপদে বসবাস শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে এ অঞ্চল বিভক্ত করেছিল সেগুলো হলো– জঙ্গলবাড়ি, এগারসিন্দুর, চৌগাংগা, চারিপাড়া, যশোদল, কালিকা মৌজা, ইটনা, নিকলী, চৌধার, সাঁচাইল, তালজাঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্প্রদায় বা গোত্র ভিত্তিক যেসব আদিবাসী এ অঞ্চলে এসে অবস্থানের ফলে সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণে তাদের নামে স্থান নামের নামকরণ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হলো– তাড়াইল বোরো জাতিকে কেন্দ্র করে তাদের বসতি থেকে এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে বোরগাঁও। করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি উপজাতি জোঙ্গাল উপজাতিদের বসতিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে জোঙ্গাল থেকে জঙ্গলবাড়ি। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সাঁওতালদের নামকরন থেকে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। তেমনি মণিপুরীদের নামকরণ থেকে মনিপুরঘাট। রাখাইনদের নামকরণ থেকে রাকুয়াইল। কটিয়াদী উপজেলার নাগ উপজাতিদের বসতি থেকে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে নাগের গাঁও, তেমনি বনওয়ারীদের বসতি থেকে নামকরণ হয়েছে বনগ্রাম, বুনা

www.pathagar.com

প্রভৃতি অঞ্চল। অষ্টগ্রাম উপজেলার খাসিয়াদের বসতি থেকে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে খাসাল। নিকলী উপজেলার মহরকোণা অঞ্চলের পাশে সাঁওতালদের বসতি থেকে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে সাঁওতালীভিটা। কুলিয়ারচর উপজেলার ডুমদের বসতি থেকে অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে ডুমরাকান্দা। যেসব আদিবাসী সামন্ত শাসক আলোচ্য এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের মধ্যে এগারসিন্দুর অঞ্চলের রাজা ছিলেন রাজা আজহাবা, বটং ও বেবুইদ। কটিয়াদী চারিপাড়া নামক এলাকার তান্ত্রিক রাজা ছিলেন নবরঙ্গ রায়। যশোদল কালিকা মৌজার তান্ত্রিক রাজা ছিলেন গোবর্ধন আইচ। জঙ্গলবাড়ির তান্ত্রিক রাজা ছিলেন জোঙ্গাল, লক্ষ্মণ হাজরা প্রভৃতি। নিকলী উপজেলার কারপাশা এলাকার তান্ত্রিক রাজা ছিলেন কুঞ্জ'শা।

তাদের মধ্যে প্রাচীন আমলে এ অঞ্চলে বাঘ বিচরণ করত কিনা তা জানা যায়নি। তবে এ জেলার বিভিন্ন স্থানে বাঘ মারার কথা ও কাহিনি প্রচলিত আছে। ফলে নিকলী উপজেলার একটি স্থানের নাম রয়েছে বাঘগাঁ। অষ্টগ্রাম উপজেলার একটি স্থানের নাম রয়েছে বাঘাইয়া। মিঠামইন উপজেলার একটি স্থানের নাম রয়েছে বাঘাইয়া রাজিবপুর। কটিয়াদী উপজেলার ধূলদিয়া ইউনিয়নে একটি গ্রামের নাম রয়েছে বাঘজোরকান্দি। হোসেনপুর উপজেলার সিদলা ইউনেয়নের একটি গ্রামের নাম রয়েছে বাঘমারা। বাঘের অন্যতম প্রজাতি টিক্কাপোড়া বাঘ, বাঘাইল্যা, বন বিড়াল জাতীয় প্রাণী উন্দা-ওয়াফ, বেজী, শিয়াল, সজারু, ভোদর বা উদবিড়াল, লেনজা প্রভৃতি এ জেলার উজান-ভাটির হাওর জনপদে একদা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখনো শহরে কিংবা গ্রামে প্রতিরাতে লেনজা, উন্দা-ওয়াফ, শিয়ালের ডাক উৎপাত ও তাদের দৌড়ানোর কথা শোনা যায়। এককালে কিশোরগঞ্জের বনজঙ্গলে ভল্লুক এবং খরগোশ দেখতে পাওয়া যেত। এ অঞ্চলের জনপদ করিমগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি, কিশোরগঞ্জের সুন্দিরবন, কুট্টাগড়, হোসেনপুরের গড়মাছুয়া, গড়বিশুদিয়া ইত্যাদি স্থানের নাম তাই প্রমাণ করে। একদা সাপে দংশন করত অসংখ্য মানুষ। নিকলী উপজেলায় একটি স্থানের নাম রয়েছে সাপমারি। অষ্টগ্রাম উপজেলার একটি স্থানের নাম রয়েছে সাপান্ত। একদা বন্য মহিষ দলে দলে ঘুরে বেড়াত। পরবর্তীকালে বাথান বাড়িতে গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ ও গরুর সংখ্যা ছিল বেশি। এটি ষোড়শ শতকের কবি কিশোরগঞ্জের কন্যা চন্দ্রাবতীর পালা কাব্যে উল্লেখ আছে। বাথানে মহিষ আর পালা যত গাই, কত যে চড়িত তার লেখাজোকা নাই। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার একটি গ্রামের নাম রয়েছে মহিষবেড়। মিঠামইন উপজেলার একটি গ্রামের নাম রয়েছে মহিষা কান্দি। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বন্য হাতীর কথা জানা না থাকলেও নিকলী উপজেলার একটি হাওরের নাম রয়েছে চলিহাতীর খাল। এককালে কিশোরগঞ্জের নদীসমূহে কুমীর, কচ্ছপ, শুশুক বা শিশু মাছ দেখা যেত। আজ অনেক কিছুই বিরল। তবে মেঘনা অববাহিকার নদীসমূহে যেমন : মেঘনা-ঘোড়াউত্রা-ধনু-ধলেশ্বরী-কালনী প্রভৃতি নদীতে আজও শিশু মাছ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৮ সালে ভৈরবের সন্নিকটে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে একটি বিরল প্রজাতির ঘড়িয়াল পাওয়া গিয়েছিল। এটি ভৈরবের ঐতিহ্যবাহী হাজী আসমত আলী কলেজের বিজ্ঞানাগারে রক্ষিত আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মরক্কোর বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর নদী বন্দর এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি এ অঞ্চলে বেশ কয়েকদিন অবস্থানের ফলে বিভিন্ন জিনিসের সাথে নীল গাইসহ অসংখ্য হিংস্র জীবজন্তু দেখেছিলেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে এসব তথ্যের বিবরণ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে হরিণ দেখতে পাওয়া যেত এ ধরনের কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে ইটনা উপজেলার একটি জনপদের নাম রয়েছে মৃগা। আমরা জানি মৃগয়ার অপর নাম হরিণ। একদা আদি শিকারি জীবনের মানুষ পেশা পরিবর্তে তারা প্রবেশ করে কৃষিভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায়। কেউ জলদাস, কেউ হালুয়াদাস কেউ জালো-মালো-মাইমল ইত্যাদি পদবি বা নাম ধারণ করে বহুকাল তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এই এলাকায় বসবাস করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বৃদ্ধি পেলে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম থেকে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী মানুষের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। স্থানীয় আদিবাসীর বিভিন্ন উপজাতি বা ট্রাইব জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের ফলে এ অঞ্চলের বিস্তর ভূ-সম্পদের মালিকানা এককালে নিয়ন্ত্রণ ছিল আদিবাসী উপজাতিদের হাতে। এ অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতিদের এই আধিপত্য পঞ্চম শতাব্দীর রাজা ভাস্কর বর্মার কাল থেকে শুরু করে মোগল যুগের মাঝামাঝি পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

অতীত জীবন ও জনপদের অবস্থা কি ছিল? তা যদি জানতে চাই তাহলে দেখব সেকালে এসব অঞ্চলে ভালো কোন রাস্তা-ঘাট ছিল না বললেই চলে। ক্ষেতের আইলই ছিল উজান বা ভাটির একমাত্র যাতায়াতের পথ। এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে– বর্ষায় নাও, হেমন্তে পাও চিরায়ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম। কত প্রজাতির পশু-পাখি যে দেখা যেত তার হিসাব নেই। বাড়ির আঙিনা, নদীর পাড়, পাখির কলরবে সর্বদা মুখরিত থাকত। বাড়ি-ঘরগুলোতে মল ত্যাগের জনস্বাস্থ্যসম্মত কোনো ভালো পায়খানার ব্যবস্থাপনা ছিল না। তাই মল ত্যাগে পর্দা প্রথার নিমিত্তে প্রায় বাড়ির পিছনে বড় বড় ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল থাকত। এসব ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে মানুষ এমনকি গরু-বাছুর লুকিয়ে থাকলেও দেখা যেত না। এমনকি ভয়ে কেউ এসব এলাকায় সহজে যেত না। প্রায় প্রতিটি জঙ্গলেই হিংস্র জীব জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। জঙ্গলের ভয়ে মানুষ ক্ষেতের আইলের পাশে উন্মুক্ত রাস্তার পাশে নদীর পাড়ে, নদীতে নৌকায় বসে, মাথা নিচের দিকে গুঁজে আড়ালে মল ত্যাগ করত। এসব আদিম অসভ্য পরিবেশ প্রকৃতি এখন তেমন আর একটা নেই। তবে উজান ভাটির-হাওর জনপদে আজও কিছু কিছু এসব আদিম প্রকৃতিক দৃশ্য লক্ষ করা যায়। আজ যা বর্তমান কালের বিবর্তনে তাই আগামী দিনে অতীত। আমাদের অতীত পূর্ব পুরুষদের জীবন ইতিহাসই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুসন্ধিৎসু। অতীতকে সামনে রাখলেই জীবন চলবে কন্টকাকীর্ণ পথ হয় সুগম ও প্রেরণার।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পশ্চিম দিকের শেষ সীমানা ছিল কিশোরগঞ্জ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২ অব্দে প্রখ্যাত ভূ-পর্যটক মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণের অনন্য দলিল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের মানচিত্র থেকে জানা যায়, সে সময়ে কিশোরগঞ্জ ছিল বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর আদিবাসী রাজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। আদিবাসী সামন্তরাজ কোচ, হাজং, গারো, সাঁওতাল, মনিপুরী, কুকি, হদি, খাসিয়া, রাখাইন, বনয়ারী, নাগ, বুনা, মান্দার, রাজবংশী প্রভৃতি উপজাতির দখলে ছিল এই অঞ্চল। ঐতিহাসিক 'যোগিনীতন্ত্র' নামক কাব্যগ্রন্থে এসব কথা উল্লেখ আছে। পরবর্তী ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাস্কর বর্মা নামে এক রাজা বৃহত্তর

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ অঞ্চল শাসন করেন। তাম্রলিপি থেকে জানা যায়– পরবর্তীকালে এ অঞ্চল চন্দ্রবংশের শাসনাধীন চলে আসে। এ বংশের রাজা ছিলেন শ্রীচন্দ্র। একাদশ শতাব্দীতে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলটি চলে যায় পাল রাজাদের শাসনাধীনে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বর্মণ বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস সেন রাজবংশের। সেন রাজবংশ কর্তৃক ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল তাদের শাসন কর্তৃত্ব হলেও পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল 'পূর্ব ময়মনসিংহ' নামে খ্যাত সমগ্র কিশোরগঞ্জ তাদের শাসনমুক্ত ছিল। মূলত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসন আমলে কিশোরগঞ্জের বৃহত্তর অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। তখনো কোচ রাজা লক্ষ্মণ হাজরার অধীনে ছিল কিশোরগঞ্জের বিশাল জঙ্গলবাড়ি অঞ্চল। বাংলা তখন সম্রাট আকবরের শাসনাধীন। এই শাসন বিস্তৃতির বিঘ্ন ঘটিয়ে কিশোরগঞ্জের জঙ্গল বাড়ি আক্রমণ করেন বীর ঈশা খাঁ ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। মোহাম্মদ সাইদুর ও মোহাম্মদ আলী খান সম্পাদিত কিশোরগঞ্জের ইতিহাস নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঈশা খাঁর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মোগল বাহিনীসহ স্থানীয় নৃগোষ্ঠীর আদিম বিভিন্ন উপজাতির সামন্ত রাজাদের পরাজিত করে এ অঞ্চল অধিকারে মুসলিম শাসনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সময় তখন ষোড়শ শতাব্দী। ষোড়শ শতাব্দীতে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ছিল বঙ্গবীর ঈশা খাঁর ভাটি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। জঙ্গলবাড়িতে তখন বিখ্যাত প্রাচীন মসলিন কাপড় তৈরি হতো। মসলিনসহ অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি ক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জের ঈশা খাঁর এগারসিন্দুর দুর্গ হয়ে ওঠে বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রসিদ্ধ নৌ বন্দর। অন্যদিকে, কিশোরগঞ্জকে বলা হয় ষোড়শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক রাজধানী। সে সময়ে বাংলা ভাষায় রামায়ণ কাব্য অনুবাদ আর অসংখ্য পালা কাব্য রচনা করে কিশোরগঞ্জের প্রাচীন পাতুয়াইর নামক গ্রামের কৃতী পুরুষ দ্বিজবংশী দাস ও তাঁর কন্যা চন্দ্রাবতী ছিলেন বিখ্যাত গায়ক কবি। কবি চন্দ্রাবতী এবং তার পালা কাব্যের 'ময়মনসিংহ গীতিকা' আজ বিশ্বের প্রায় ২১টি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে কিশোরগঞ্জকে করেছে আলোকিত এবং মহিমান্বিত। প্রাচীনকাল থেকে এই কিশোরগঞ্জে রয়েছে ঐতিহাসিক অনেক সভ্যতার নিদর্শন ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শৈল্পিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম স্থান হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে বিবেচিত হয়ে আসছে কিশোরগঞ্জ।

কিশোরগঞ্জের এগারসিন্দুর আক্রমণ করে ঈশা খাঁ তান্ত্রিক রাজা অহমরাজকে পরাজিত করে। এমনিভাবে কটিয়াদীর চারিপাড়া এলাকার রাজা নবরঙ্গ রায়, যশোদলের কালিকা মৌজার রাজা গোবর্ধন পরাজয়ের মাধ্যমে বিশাল মোগল বাহিনীর সঙ্গে ঈশা খাঁর দীর্ঘ সময়ের সশস্ত্র সংগ্রাম এ অঞ্চলে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাবলির যুদ্ধ জয়ের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। এভাবে কিশোরগঞ্জের কিংবদন্তির নায়ক হয়ে ওঠেন বীর ঈশা খাঁ। পরবর্তীকালে এগারসিন্দুর দুর্গের সন্নিকটে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে পরাজিত করে বীর ঈশা খাঁ এতদঞ্চলের 'বাইশ পরগনার' দেওয়ানি লাভ করেন। দেওয়ান মর্যাদা লাভের মাধ্যমেই ঈশা খাঁ কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ির ভাটি রাজ্যের রাজধানীর রাজা হয়ে ওঠেন। এগারসিন্দুর

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে তার বিখ্যাত সেনানিবাস বা দুর্গ। অষ্টগ্রামের কাস্তলে মোগল বাহিনীর সঙ্গে ঈশা খাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মোগল বাহিনী পরাজিত হয়। সে সময়ে বহু পির, ফকির, আউলিয়া, দরবেশ, বৈষ্ণব, সাধু, সন্নাসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিমসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পেশাজীবী মানুষ ধীরে ধীরে কিশোরগঞ্জের জনপদে আগমন করেন। পরবর্তীকালে কিশোরগঞ্জের উজান-ভাটির-হাওর অঞ্চল বিভিন্ন পদবির মানুষে এই বিরল বসতির জঙ্গলময় অরণ্য ভূমি লোকালয়ে পূর্ণ হয়ে উঠে। মোগল আমলে সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমল এ অঞ্চলের রাজস্ব সুব্যবস্থা করেন এবং পরবর্তী ইংরেজ আমলে সরকার বাজুহা'র শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসে।

মধ্যযুগে কিশোরগঞ্জের অবস্থা দেখা যায়–ইলিয়াস শাহী বংশ বৃহত্তর ময়মনসিংহে দীর্ঘকাল তাদের শাসন বজায় রাখে। সে সময়ে রাজা গণেশের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহে মুসলিম শাসন সুবিস্তৃত হয় (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মূলত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে। হোসেন শাহের নামানুসারে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর পরগনার নামকরণ হয় হোসেনশাহী পরগনা থেকে বর্তমানে হোসেনপুর উপজেলার ইতিহাস। পরবর্তী সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনতায় আসে মহামতি সম্রাট আকবরের সময়। মোগল শাসন বিস্তৃতির সূচনা পূর্বে এই কিশোরগঞ্জে যার নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত তিনি হলেন বাংলার স্বাধীনতার বীর পুরুষ বিখ্যাত বার ভূঞার অন্যতম নেতা ঈশা খাঁ। মোগল আমল তথা মুসলিম শাসনের সমাপ্তির সাথে সাথে অবসান ঘটেছে মধ্যযুগের ইতিহাসের গতিধারা। পরবর্তীকালে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে এ দেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজ আমল। শুরু হয় আধুনিক যুগের কিশোরগঞ্জের পথপরিক্রমণ।

১৭৬৪ থেকে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত এবং ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জেমস রেনেলের অবিভক্ত বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রে বৃহত্তর কিশোরগঞ্জের বেশ কিছু নদ-নদী ও প্রাচীন এলাকাসমূহের একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে থমাস পাকেনহাম এর আমলে সর্বপ্রথম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় থানাসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহে থানার সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১২টি তার মধ্যে ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থানে থানার সংখ্যা ছিল মাত্র ২টি। একটি নিকলী এবং অপরটি বাজিতপুর। অথচ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় থানার সংখ্যা ১৩টি। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে অংকিত জেমস রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে কিশোরগঞ্জ নামে কোন জনপদ-গঞ্জ-থানা বা মহকুমা সৃষ্টি হয়নি। এমনকি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাদেও কিশোরগঞ্জ নামে কোনো জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বরং কিশোরগঞ্জের তুলনায় নিকলী, বাজিতপুর, হোসেনপুর ও জঙ্গলবাড়ির নাম ও তাদের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জানা যায় জেমস রেনেল অংকিত মানচিত্রই বাংলার প্রাচীন মানচিত্র। রেনেলের মানচিত্রে তখন কিশোরগঞ্জ কেন যে বৃহত্তর জেলা নিয়ে এত গর্ব বা অহংকার সেই 'ময়মনসিংহ' নামে ও কোনো স্থানের অস্তিত্ব বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

বরং বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার যে সীমানা সেই সীমানার মধ্যে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসেবে মানচিত্রে উল্লেখ রয়েছে যে সব স্থানের নাম সেগুলো হলো :

www.pathagar.com

জঙ্গলবাড়ি, হোসেনপুর, বাজিতপুর, নিকলী, হয়বতনগর, দগদগা, এগারসিন্দুর, গুজাদিয়া, ধুলদিয়া, দামপাড়া, বনগাঁও, কটিয়াদী, গুড়ই, দিলালপুর ঘাট, ফরিদপুর, বরিবাড়ী, ডুবি, মিঠামইন, সিংপুর, অষ্টগ্রাম, কমলা, ঢাকী, চারিগ্রাম, পাচকাহনিয়া, জয়সিদ্দি, ইটনা, কুরশা, বাদলা, বর্ণি ও জাফরাবাদ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জের তখনো জন্ম হয়নি। হয়নি এ নামের কোনো পরিচিতি কিংবা বিখ্যাত স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ। অথচ তার অনেক পূর্বেই হোসেনপুরের দক্ষিণে কাওনা নদীর তীরে বর্তমান পাকুন্দিয়া থানা বা উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের 'দগদগা' নামক এলাকায় একটি 'জেলা' শহর স্থাপনের জন্য ১৭৯০-৯৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তৎকালীন কালেক্টর স্টিফেন বেয়ার্ড 'বোর্ড অব রেভিনিউ'র নিকট প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ের পরগনা ময়মনসিংহ ও আলাপসিংহের জমিদারগণের আপত্তির মুখে ময়মনসিংহের 'সেহরা' নামক স্থানে জেলা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে কিশোরগঞ্জের প্রাচীন জনপদ পাকুন্দিয়ার 'দগদগা' নামক এলাকা 'জেলা' স্থাপনের গুরুত্ব হারিয়ে ফেললেও এ জেলার দগদগা গ্রামের সাধারণ মানুষেরা আজও এলাকার নাম 'দগদগা জেলা' বলে মুখে মুখে উচ্চারণ করে থাকেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে শুধু কিশোরগঞ্জ নয় আজকের ভৈরব বাজারেরও তখন জন্ম হয়নি। রেনেলের মানচিত্রে ভৈরব বাজার তখন মেঘনা নদী গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। উক্ত মানচিত্রে শুধু কুলিয়ারচর উপজেলার ফরিদপুর নামক গ্রামের উপস্থিতি উল্লেখ পাওয়া যায়। তার সাথেই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবহমান স্রোতধারার দৃশ্য দেখা যায়। এ তথ্য প্রমাণ করে একদা এ জেলার সমগ্র অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ থেকে ধীরে ধীরে উত্থিত হয়েছে। ফলে এ জেলার ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন অসংখ্য জনপদের নাম রয়েছে চরযুক্ত স্থান। যেমন–চর শোলাকিয়া, সরারচর, কুলিয়ারচর, উজানচর, চরপুমদী, চরপলাশ ইত্যাদি। অন্যদিকে, ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Bengal District Administration Committee 1913/14 Report. উক্ত রিপোর্টে বৃহত্তর ময়মনসিংহকে ভাগ করে আরও তিনটি জেলা করার একটি সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত সুপারিশ মহকুমা কিশোরগঞ্জকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে জেলায় রূপান্তরিত করে কিশোরগঞ্জের 'ভৈরব থানাকে মহকুমা' করারও প্রস্তাব করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনের সভাপতি ছিলেন মি. ই.ভি. লেভিঞ্জ। কিন্তু অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উক্ত প্রস্তাব সে সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি। তেমনি বাস্তবায়িত হয়নি ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বাজিতপুর ও ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নিকলীতে মহকুমা করার সরকারি প্রস্তাব বা সুপারিশ।

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশকে ১৯টি সরকার এবং সরকারগুলোকে ৬৮২টি মহালে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে একটি সরকারের নাম ছিল 'সরকার বাজুহা'। সরকার বাজুহার মহালের সংখ্যা ছিল ৩২টি। প্রাচীন মধ্যযুগীয় এই সরকারের আয়তন নিয়ে ইংরেজ আমলে সরকার বাজুহা হলো বিশাল ময়মনসিংহ জেলা। স্বভাবতই আজকের কিশোরগঞ্জ তখনকার সরকার বাজুহার অন্তর্গত একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ ছিল। রামায়ণ-মহাভারত তথা মহাকাব্যের যুগে কিশোরগঞ্জের এই বিশাল জনপদে কামরূপ কামাক্ষ্যার অনুসারী কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজার কর্তৃত্ব করার ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাচীন 'কালিকাপুরাণ' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় কামরূপের রাজা ছিলেন

www.pathagar.com

নরক। নরকের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগদত্ত পরবর্তীকালে রাজা হন। একাদশ-দ্বাদশ শতকে এ অঞ্চলে তার অনেক কথা ও কাহিনি পাওয়া যায়। সম্ভবত ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাস্কর বর্মা নামক এক সামন্ত শাসক বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ বিশাল কিশোরগঞ্জ অঞ্চল শাসন করেন। তার মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরগণ দশম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলের শাসন কর্তা ছিলেন বলে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউএন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে এরূপ কথাই সাক্ষ্য দেয়।

কিশোরগঞ্জ, হোসেনপুর, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ ও নীলগঞ্জ নীল চাষ ও নীল কুঠি স্থাপন করে এ এলাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্রিটিশদের ব্যবসা বাণিজ্যসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে সে সময়ে ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজার পর্যন্ত প্রায় ২২টি নীল কুঠির স্থাপন করে এ অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পুরোদমে পরিচালনা করে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন মি. বকসেল। পূর্বে এটি বিভিন্ন পরগনা নামে পরিচিত ছিল। প্রায় ৩৯টি পরগনা নিয়ে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হোসেনপুর এলাকার পিতলগঞ্জের নীল কুঠিরের কুঠিয়াল ছিলেন মি. ওয়াইজ। কটিয়াদী বেতাল এলাকার নীল কুঠিরের কুঠিয়াল ছিলেন মি. গ্লাস সাহেব। কিশোরগঞ্জ সদর মহকুমার কুঠিগির্দীর নীল কুঠিরের কুঠিয়াল ছিলেন মি. গির্দী সাহেব। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যে ৩৯টি পরগনা নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা স্থাপিত হয়েছিল সেই পরগনাগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

নিকলী, হোসেনশাহী, জোয়ানশাহী, কুড়িখাই, আটগাঁও, বরদাখাত, লতিবপুর, হাজরাদী, নাসিরুজিয়াল, দরজীবাজু, বলরামপুর, ঈদগা, মকিমাবাদ (এগুলো বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত)। বাকীগুলো হলো বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, যথা: ময়মনসিংহ, আলাপসিংহ, জাফরশাহী, রনভাওয়াল, পুখুরিয়া, কাগমারি, আটিয়া, শেরপুর, দড়িবাজু, সুসঙ্গ, খালিয়াজুরী, নসরৎশাহী, বরিকান্দি, বাউখণ্ড, চন্দ্রপ্রতাপ, ইছফাবাদ, রায়দ্রোন, কাসেমপুর, সাগরদী, হাউলী, জফুজিয়াল, ইছাপুর, পাতিলাদহ, তলন্দর, ইছবশাহী ইত্যাদি। এই তালিকায় কিশোরগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের অন্য কোনো স্থানের নামে পরগনার কথা উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব নিকলী, হোসেনপুর, জোয়ানশাহী, আটগাঁও, কুড়িগাই, নাসিরুজিয়াল ও হাজরাদী নামক পরগনাগুলো কিশোরগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক এলাকা ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। সে সময়ে কটিয়াদীর জালালপুর নামক গ্রামে যে নীল কুঠি ও তার চুল্লী স্থাপন করেছিল তা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম বড় চুল্লী ও কুঠি হিসেবে পরিচিত ছিল। কটিয়াদীর জালালপুর ও হোসেনপুরের পিতলগঞ্জের নীল কুঠির দুটির স্মৃতি চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়াও পাকুন্দিয়ার এগারসিন্দুর, বাহাদিয়া, করিমগঞ্জের নোয়াবাদ কটিয়াদীর বেতাল হোসেনপুরের সাহেবের গাঁও প্রভৃতি অঞ্চলের নীল কুঠিরের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

ঘ. জনবসতির পরিচয়

হাওর জনপদে কিশোরগঞ্জ জেলার উজান-ভাটির মধ্যে প্রথম বহিরাগত সভ্য শরণার্থী মানুষদের আগমন ঘটে একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে। রাজা বল্লাল সেনের আমলে জাতি-ভেদ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ফলে সে সময়ের অন্যতম কবি অনন্ত দত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তার গুরু শ্রীকণ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে লৌহিত্য সাগরের সেই ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে বঙ্গদেশের রাজধানী বিক্রমপুর থেকে অষ্টগ্রামের কাস্তুল গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অষ্টগ্রামে কবি অনন্তরামের প্রাপ্ত প্রাচীন কুর্চি নামায় এ তথ্য উল্লেখ আছে এভাবে–চন্দ্রঃতু শূন্য বানিসাংখ্য সাখে বাল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজ, শ্রীকণ্ঠ নাম্নানা গুরুনাদ্বিজেন শ্রীমানন্তদেব হৌচঃ বঙ্গঁম। একাদশ শতক থেকে পরবর্তী ষোড়শ শতক পর্যন্ত এভাবে অনন্ত দত্ত, অনন্তরাম, নারায়ণদেব, দ্বিজবংশীদাস, মাধবাচার্য প্রমুখ প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যার পাশাপাশি বঙ্গবীর ঈশা খাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে নানান শ্রেণি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও অষ্টম, নবম, দশম শতাব্দীর দিকে পার্শ্ববর্তী আসাম, কুচবিহার, ত্রিপুরা, বিক্রমপুর, রাজশাহী ও রাঢ় অঞ্চলসহ অন্যান্য উচ্চ ভূমি থেকে বেশ কিছু কোম শ্রেণি গোষ্ঠীর লেখক এর আগেই এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তী একদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সময়ে এসে এ জনপদটি ঘনজনবসতি হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিয়ে এগিয়ে যায়। এ বিষয়ে ১৩৩৪ বাংলা সনে প্রকাশিত কিশোরগঞ্জের পূর্ণচন্দ্র রায় রচিত 'উচ্ছ্বাস' নামক কাব্য গ্রন্থের একটি কবিতায় উল্লেখ আছে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বঙ্গবীর ঈশা খাঁর নেতৃত্বে এ অঞ্চলের আদিবাসী বিভিন্ন উপজাতির রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে জঙ্গলবাড়ি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। উক্ত কাব্যগ্রন্থে এ অঞ্চলের অতীত সমাজ চিত্রে কিভাবে বহিরাগত বিভিন্ন বর্ণ গোত্রের সভ্য শরণার্থী শ্রেণি গোষ্ঠী মানুষের আগমন ঘটেছিল তার একটি স্পষ্ট সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এভাবে।

জঙ্গলময় ভূমি জঙ্গলবাড়ি নাম
রাখিয়া তথায় ঈশা খা স্থাপিলেন গ্রাম
বিজন প্রদেশে হলো জনপূর্ণ ধাম
আসিল অসংখ্য প্রজা লইতে বিশ্রাম।
চৌদিকে সুযশ তার প্রচার হইল
কতস্থানের কত লোক আসিতে লাগিল
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অসিজীবী মসীজীবী
ভিষক পাঠক জ্যোতির্বিদ কবি।
বণিক শিল্পী দ্বিজকর্মকার কাসারী
বারুজীবী মৎস্যজীবী রজক পসারী
মালাকার কুম্ভকার যাচক শাঁখারী
চিত্রকর সূত্রধর কাপালী শিকারী।
পাঠ্যকার বাদ্যকার কৃষিজীবী দাস
সাহা শুড়ী যোগী আর তরণী দাস
গোপ, বণিক্য, ঢোলী. তন্ত্র, মোদক নাই
আসিল যে কত জাতি লেখা তার নাই।

www.pathagar.com

অন্যদিকে তিনি কিভাবে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছেন-ষোড়শ শতকের প্রাচীন কবি নারায়ণদেব তার পদ্মপুরাণে লিখেছেন–

ছাড়িয়া কায়স্থ কুল লৌহিত্য নদের কুলে
রাঢ় ছাড়ি কৈনু আগমন
বোরগাঁও পুণ্যভূমি বসতি করিনু আমি
দশদিক শোভা অতুলন।

অনুরূপ একই ভাষায় কবি দ্বিজবংশী দাস তার আত্মপরিচয় বর্ণনা করেছেন এভাবে–

যাদবানন্দের সুত দ্বিজবংশী দাস
পাঁচালী প্রবন্ধে কথা করিলা প্রকাশ
পরগনা দরজী বাজু পাতুয়াইর গ্রাম
ফুলেশ্বরী নদীতটে বিরছিল ধাম।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার ষোড়শ শতকের প্রাচীন কবি নিত্যানন্দদাস তার রচিত 'প্রেম বিলাস' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এ অঞ্চলের অতীত ইতিহাস কতটুক গুরুত্বহন করত অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসে আমাদের এ অঞ্চলসমূহ কতটুকুই বিখ্যাত ছিল তার প্রমাণ মিলে 'প্রেম বিলাস' কাব্যগ্রন্থে এভাবে–

বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ অতি শুদ্ধ
পাঠান লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ।
সে দেশের রাজধানী এগারসিন্দুর
ব্রহ্মপুত্র পাড়ে স্থিত অতি মনোহর।
এগারসিন্দুর আর মির্জাপুর
দগদগা কুঠিশ্বর আর হোসেনপুর।
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এসব স্থান হয়
নানা দেশী লোক তাতে বাণিজ্য করয়।
এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে
বাণিজ্য বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে।
নানা দেশী বণিক আসয়ে হেথায়
বেচা কেনা করে সবায় আনন্দ হিয়ায়।

এ অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-গতিধারায় কতটুকু গুরুত্ব ছিল কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান তার নজির পাওয়া যায় মোগল আমলের ইতিহাসে। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে তার রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমল সমগ্র বাংলাকে কয়েকটি সরকারে ভাগ করেন। এর মধ্যে 'সায়রজলকর মহল' ছিল উল্লেখযোগ্য। এই 'সায়র' শব্দটি সাগর এর অপভ্রংশ। পরবর্তী সময়ে সাগর>সায়র>'হায়র' থেকে উচ্চারণ বিবর্তন বা বিকৃতিতে 'হাওর' হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। এ ধারণায় এ অঞ্চলের মানুষ আজও স,শ,ষ–এর উচ্চারণ করে থাকে কখনো 'হ'। যেমন এ অঞ্চলে সাপকে-হাপ, শশাকে-হশা, ষাঁড়কে-হাড় বলার রীতি প্রচলিত আছে। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ভাটিরাজ্যের অধিপতি বার ভূঁঞা প্রধান বীর ঈশা খাঁ মোগল সম্রাট আকবরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে এ অঞ্চলের ২২টি পরগনার মালিকানা লাভ করেন। সে

www.pathagar.com

সময়ে এই 'সায়রজলকর' মহলটি পরগনা 'জয়নশাহী' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বীর ঈশা খাঁর শাসন ব্যবস্থার দেওয়ানীর মাধ্যমে এ অঞ্চলের আদিবাসী বিভিন্ন উপজাতিদের সামন্ত শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ ঈশা খাঁ যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলের আদিবাসী বিভিন্ন উপজাতিদের বিতাড়িত করেন। এ এলাকা দখল করে শাসন করেন কিশোরগঞ্জ জেলার উজান-ভাটির বিশাল অঞ্চলসহ বাইশটি পরগনা। ফলে পর্বত থেকে নেমে আসা আদিবাসী বিভিন্ন উপজাতি জনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে যায় সীমান্তের দিকে, গারো পাহাড় আর খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে আসা যাওয়া বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর নানান সম্প্রদায় ও শ্রেণি পেশার মানুষ মিলে মিশে গড়ে তুলেছে এখানে একটি মিশ্র সমাজ ব্যবস্থা। এই মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকার 'রূপবতী' নামক পালাকাব্যে উল্লেখ আছে–

মালী ডোম হাজং না করিব বিচার
কইন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার।

এককালে কামরূপ কামাক্ষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল এ অঞ্চল। ফলে অনার্য শ্রেণি গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোকদের বসতি ছিল বেশি। প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃত শক্তিকে নিয়ে আরাধনা সাধনা ও সংগীত চর্চায় তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব প্রচলিত ছিল বেশি। সেই থেকে এ অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে-শহরে যাদুবিদ্যা, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, পানিপড়া, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি অলৌকিক বা অতি লৌকিক শক্তির প্রতি এখনও বিশ্বাস মানুষের আদিম। পাশাপাশি শিবপূজা, কালীপূজা, চণ্ডীপূজা, সিতলাপূজা, মনসাপূজা, কার্তিকপূজা, কুমারীপূজা, লিঙ্গপূজা ইত্যাদি পুরাতনী নাচ গানের দৃশ্যাবলি অনার্য সভ্যতারই সংস্কৃতির নিদর্শন। দ্বিজবংশী দাসের মনসার ভাসানে উল্লেখ আছে–বেহুলা তার স্বামীর মৃতদেহকে ভেলায় তুলে ভেসে যাচ্ছিল, তখন অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বেহুলা একটি রাংগা অর্থাৎ লাল রঙ্গের মোরগও সাথে তুলে নিয়েছিল। মোরগ তা নিশ্চয় আর্য সভ্যতার চিহ্ন নয়, অনার্যদেরই খাদ্য ছিল। এতে প্রমাণ করে এ অঞ্চলে আর্যদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার আরও একটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার প্রসার পতনকালে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ কিশোরগঞ্জের অভ্যন্তরে এসে কটিয়াদীর সন্নিকটে 'আড়িয়াল খাঁ' নাম ধারণ করে পরবর্তী অংশ শীতলক্ষ্যা নাম ধারণ করেছে উপগত হয়েছে। এই 'আড়িয়াল খাঁ' নাম মিশ্র সমাজেরই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এ যে সে সময়ের মুসলিম ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির বহিঃপ্রকাশ তা সহজেই বুঝা যায়। কারণ সে সময়ের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ শুধু এ অঞ্চল নয়, তিনি কামরূপ পর্যন্ত বিজয় করেছিলেন। সুলতান আলালউদ্দিন হোসেন শাহ'র নামানুসারে কিশোরগঞ্জের 'হোসেনপুর' অঞ্চলের নামকরণের ইতিহাস পাওয়া যায়। তার পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ'র নামানুসারে নাসিরাবাদের নামকরণ হয়েছে। নাসিরাবাদ শহরটি আজকের জেলা ময়মনসিংহ শহর। নসরৎ শাহী অঞ্চলের সাতটি টাকশালের একটি স্থাপন করা হয়েছিল কিশোরগঞ্জের তাড়াইল অঞ্চলের মুয়াজ্জমাবাদে। ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ অঞ্চলটি যে কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ কামরূপের

www.pathagar.com

শাসনকর্তা ছিলেন। তারই ভাই জয়নশাহ এর নামানুসারে আমাদের এ অঞ্চলের 'জয়নশাহী' পরগনার স্মৃতি বহন করে। নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ'র নামানুসারেই তাড়াইল অঞ্চলটি 'নাসিরুজিয়াল' পরগনার অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক পরবর্তী সময়ে আর্য ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, নাথ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম ইত্যাদি এসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল। বস্তুত ভাগ্যান্বেষীরাই বহন করে এনেছিল এসব ধর্মমত। তারাই সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণে মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল। মুসলিম বীরবঙ্গ ঈশা খাঁ সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী 'স্বর্ণময়ীর' পানি প্রণয় গ্রহণ করে সে সময়ের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হলেও সমাজে এর প্রভাব প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সময়ের বিখ্যাত মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর প্রেমিক পুরুষ 'জয়ানন্দ' প্রেমিকা 'চন্দ্রাবতীকে' বিয়ে না করে ধর্মান্তরিত হয়ে জনৈক এক মুসলিম নারীকে বিবাহ করেছিল। এভাবে তৎকালের সামগ্রিক সমাজচিত্রে মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার নজির লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত ক্ষমতালোভী সামন্ত শ্রেণি গোষ্ঠীর লোকদের অত্যাচারে মুসলিম জনসংখ্যার অধিকাংশই ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ। তার পূর্বে অধিকাংশ আগত পির-ফকির-আধ্যাত্মিকদের উপস্থিতি ছিল বহিরাগত শরণার্থী। এ অঞ্চলে ভূমি সংস্থাপনের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় 'বাইদ' একটি উল্লেখযোগ্য ভূমি শ্রেণি। যার অর্থ দাঁড়ায় 'বাহু' প্রান্ত বা নিম্নাঞ্চল। এই নিম্নাঞ্চলে যারা বসবাস করত তাদের মধ্যে বেদে-বাদিয়া-বেদ-বৈদ্য ও বইদ শব্দের উৎপত্তি। তাই এ অঞ্চলে সাপুরে, মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী শ্রেণি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল বেশি। নিকলী উপজেলা অঞ্চলে একটি স্থানের নামকরণ রয়েছে বৈদ্যের কান্দা- তেমনি পাকুন্দিয়া উপজেলায় রয়েছে বাইদ্যা মির্জাপুর। ফলে এদেরই আদি পেশা তুকতাক মন্ত্র-তন্ত্র, জড়ি, বটির চিকিৎসা এখনো এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

মৈমনসিংহ গীতিকার সমাজচিন্তায় 'মহুয়া' নামক পালা কাব্যটি তো কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলেরই কাহিনি। অন্যদিকে জঙ্গলবাড়ি কিশোরগঞ্জের দেওয়ান ফিরুজ খাঁর স্ত্রী বীরাঙ্গনা সখিনার আত্মত্যাগ সে তো কিশোরগঞ্জের নারী সমাজেরই বীরত্বের ইতিহাস। জঙ্গলবাড়ির ইতিহাস-ঐতিহ্য মসনদ-ই-আলা ঈশা খাঁই এর সূচনা করেছিলেন। পূর্ব ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের ঈশা খাঁ যেমন কোচ-গারো-হাজং সহ বিভিন্ন উপজাতির প্রতিপত্তি বিনষ্ট করেছেন, তেমনি পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এ অঞ্চলকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। ঈশা খাঁকে দমন করার জন্যই রাজা টোডর মল্ল, সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ এবং অবশেষে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বীর ঈশা খাঁর যুদ্ধের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে যেমন শ্রেষ্ঠ ঘটনা। তেমনি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের বীর পুরুষ সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে ৯৩ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পণে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। এ গর্ব শুধু কিশোরগঞ্জ যশোদলপুর বাসীর নয়, সমগ্র বাংলার, সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরব। নারী সমাজেও বীরাঙ্গনা সখিনার উত্তরসূরী ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে প্রথম 'বীর প্রতীক' খেতাব লাভ করেন। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের মৃৎশিল্প কতটুকু প্রাচীনত্ব রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীহাররঞ্জন রায় রচিত বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থে। প্রাচীন সমাজের হাঁড়ি, পাতিল, কলস, থালা, বাটি, ঘটি, হুঁকো, লোটা, প্রভৃতি পোড়ামাটির তৈরি মৃৎপাত্র

www.pathagar.com

নিকলী উপজেলার সদর কুমারছড়া নামক গ্রাম সংলগ্ন একটি খাল খননে এগুলো ১৯৮০ সনে পাওয়া গিয়েছিল। অনুরূপ এগারসিন্দুর এলাকার মাটি খননে যে সব মাটির তৈরি তৈজসপত্র পাওয়া গিয়েছিল তা কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির তৃতীয় তলার একটি কক্ষে সংরক্ষিত আছে। কিশোরগঞ্জ জেলার সর্বত্র এসব পোড়ামাটির প্রাচীন তৈজসপত্রের বহুল প্রচলন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মোগল আমল পরবর্তী ইংরেজ আমলেও রাজপুরুষগণ নৌবিহারে পশু পাখি শিকারের জন্য বজরা ও পানসি সহযোগে ভাটি কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলের প্রাকৃতিক অভয়ারণ্যে ছুটে আসতেন। একদা নিকলী উপজেলার জোয়ানশাহী হাওরের বনজঙ্গলে পশু পাখি শিকারে এসে ইংরেজ রাজপরিবারের এক সদস্য অসুস্থ হয়ে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তার দেহ বাক্সবন্দি করে বিশেষ উড়োজাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইংরেজ লর্ড কারমাইকেল নিকলী, মিঠামইন, ইটনা ও অষ্টগ্রাম এলাকা জুড়ে যে বড় হাওরের পরিধি সেখানে তিনি পাখি শিকার করতে এসেছিলেন। বর্তমানে কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলই গোটা বাংলাদেশের একমাত্র 'বড় হাওর' বলে বিখ্যাত। বর্ষায় হাওর এর রূপ সেই আদ্যিকালের লৌহিত্য সাগরেরই প্রতিকৃতি। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলো দেখলে সাগরের বুকে কোন অজানা দ্বীপের মতই মনে হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা এ অঞ্চলের বিবরণ লিখতে গিয়ে বলেছেন "দি ভিলেজেস লাইক এ স্মল আইল্যান্ড ফ্লটিং অন এ বেস্ট ওসাইন অফ দি ওয়াটার।" প্রাচীন ইতিহাসে এ জনপদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পরিবেশ-প্রতিবেশের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

কিশোরগঞ্জ জেলার সমগ্র অধিবাসীর সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্ন-ভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়। তেমনি উজান-ভাটির-হাওর জনপদে ব্যতিক্রমধর্মী ভাষা শব্দ উচ্চারণের পার্থক্যও লক্ষ করা যায়। এ জেলার অধিবাসীদের বেশির ভাগই বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ হানাফি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত সুন্নি মুসলমান। মুসলমানদের আরেকটি অংশ শিয়া এবং কাদিয়ানি তারাও বসবাস করে। হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বহুধা বিভক্ত সংখ্যাই বেশি। এ সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলিম অল্প সংখ্যক দেশীয় ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এককালে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পৃথক 'ব্রাহ্ম' সমাজভুক্ত হলেও বর্তমানে তাদের সংখ্যা তেমন চোখে পড়ে না। তবে হিন্দু সমাজেরই একটি অংশ 'বৈষ্ণব' ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাস সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এককালে 'নাথ' যোগ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের বসতি ছিল সর্বত্র। এ অঞ্চলে উভয় শ্রেণির মানুষ সকলেই ধর্মপ্রাণ কিন্তু ধর্মান্ধ নন। তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী, সহনশীল ও উদার। কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই, সকলেই প্রতিবেশি মিলেমিশে থাকতেই পছন্দ করেন। গ্রামের মানুষ সৎ, অতিথি বৎসল, সরল ও সহিষ্ণু। বৈবাহিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অধিকাংশই অভিভাবক কর্তৃক পছন্দকৃত ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে পণ ও যৌতুক প্রথা নেই। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর পক্ষকে দেওয়া যৌতুক প্রথা চালু রয়েছে। পূর্বে নাথ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের লোক স্থায়িভাবে বসবাস করত।

www.pathagar.com

সাধারণ পূজা, পার্বণ, হোম, যাগযজ্ঞ ও বলিদানে ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল বেশি। ব্রাহ্মণরাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিভাজন করে সম্প্রদায় বিভক্ত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে বর্ণ বৈষম্য। কিশোরগঞ্জ জেলার জনসাধারণ পূর্ব থেকেই অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত। পান, তামাক, চিড়া, মুড়ি, গুড়, নাড়ু, পিঠা, দুধ, কলা, ডাবের পানি, শরবত, চা প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করে। যুগের পরিবর্তনে অবশ্য এর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

পূর্বে হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ ধুতি জাতীয় পোশাক পায়জামা-পাঞ্জাবি ও শাড়ি পড়তেন। উভয় সম্প্রদায় নামের পূর্বে পুরুষ শ্রী/ শ্রীশ্রী/ শ্রীযুক্ত প্রভৃতি শব্দ বা বাক্য ব্যবহারের প্রচলন ছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পূর্বে 'মুন্সী' শব্দ ব্যবহার করতেন। হিন্দু নারী সমাজে পূর্বে থেকে বর্তমানেও নামের সাথে 'শ্রীমতি' লেখার প্রচলন দেখা যায়। আর পুরুষদের নামের পূর্বে শ্রী/ শ্রীশ্রী/ শ্রীযুক্ত কিংবা বাবু লেখার প্রচলন রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে মুন্সি, মোহাম্মদ, মহাম্মদ, মোঃ, মু, আহাম্মদ, আহমদ, আহমেদ ইত্যাদি লেখার প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জের মধ্য যুগীয় কবি দ্বিজবংশীদাসের কাব্যে উল্লেখ রয়েছে–একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে/ যার তার কর্ম করে, সেই ধর্মজ্ঞানে। কিশোরগঞ্জের মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় স্থানীয় বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে। মৈমনসিংহ গীতিকায় 'রূপবতী' পালা কাব্যে উল্লেখ আছে, মালী ডোম হাজং না করব বিচার/ কইন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার।

কিশোরগঞ্জ জেলায় এক সময় মুসলিম ধর্মীয় পির-ফকির-সুফি-সাধকদের চিশতি, কাদিরী, কলন্দরী, মাদারী ও নকশবন্দী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করত। বর্তমানেও অষ্টগ্রাম উপজেলার কবির খান্দান, খাসাল, বর্ধমান, হায়দরাবাদ এবং কটিয়াদী উপজেলার কুড়িখাই অঞ্চলে হযরত শাহ্ শামছুদ্দীন আউলিয়ার মাজারকে কেন্দ্র করে তার শিষ্যগণ ছিলেন–শাহ্ কবীর, শাহ্ নসীর, শাহ্ কলন্দর। বর্তমানেও তাদের বংশজাত অনুসারী লোকদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় গ্রোত্র গোষ্ঠীর ভিন্নতা রয়েছে। অষ্টগ্রামে আজও প্রাচীনকাল থেকে 'গাভী' দিয়ে হালচাষ করা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, পাজামা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ প্রভৃতি পরিধান করে। সকলে জুতা-সেন্ডেল পায়ে দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে কিশোরগঞ্জ শহরটি ছিল হিন্দু জমিদার তালুকদার ও ব্যবসায়ী প্রধান এলাকা। শিক্ষা দীক্ষায় তারাই ছিল অগ্রণী ভূমিকায়। সম্ভবত শিক্ষিত ভদ্র সমাজ সে সময়ে অনেকই কাঠের তৈরি 'খড়ম' ব্যবহার করতেন। কাঠের তৈরি 'বৌলা ওয়ালা খড়ম' এর খুব কদর ছিল। যা বর্তমানে আর কোথাও দেখা যায় না। শহরের একটি মহল্লার সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোকেরা প্রাত কিংবা সন্ধ্যাকালীন বৈকালিক ভ্রমণের সময় পায়ে 'বৌলাখড়ম' পড়তেন বলে পরবর্তী কালে এই মহল্লার নামকরণ হয় 'খড়মপট্টি'। সে সময়ে খড়ম ছাড়াও কাঠের তৈরি এক ধরনের স্যান্ডেল পড়তেন। মুসলমানেরা কেউ কেউ মাথায় টুপি, পাগড়ি ব্যবহার করতেন। হিন্দুরা কেউ কেউ কপালে চন্দন তিলক এবং গলায় মালা ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে উভয় সম্প্রদায় গামছা, তোয়ালে, লুঙ্গি, রুমাল ব্যবহার করে। গ্রামের লোকেরা এককালে জামা কিংবা পাঞ্জাবি, গেঞ্জি গায়ে অর্থাৎ

www.pathagar.com

শরীরে পরিধান না করে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল বেশি। বগলে ছাতা কারও হাতে দীর্ঘ সুন্দর লাঠি থাকত। জুতা জোড়া অনেকে হাতে করে দীর্ঘপথ বহন করার দৃশ্যও দেখা যেত। তারা মনে করতেন 'পা' জলে ভিজিলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু জুতা জোড়াটি ভিজিলে উহা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এগুলোকে যত্ন করে রাখার অভ্যাস ছিল বেশি। সে যুগে ইস্ত্রি করে কাপড় পড়ার তেমন প্রচলন ছিল না। অনেক লোক একটি জামা দিয়েই কয়েক বছর কাটাইয়া দিতেন। জামাটি ময়লা হলে অনেকে গামছা কিংবা চাঁদর গায় দিয়া থাকত। ভাটি কিশোরগঞ্জে সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে বলা হতো–"বর্ষার নাও আর হেমন্তে পাও" হলো ভরসা। এসব কথা প্রবাদ বাক্যের মত আজও এ জেলায় প্রচলিত। কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার কৃতী সন্তান ড. নীহার রঞ্জন রায় তার "বাঙ্গালীর ইতিহাস" আদিপর্ব গ্রন্থে লিখেছেন– এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে আদি অস্ট্রেলিয়দের শোণিত ধারার সর্বাধিক সঞ্চালিত বলে তিনি মনে করেন। তার মতে মাঝারি মুণ্ড, প্রশস্ত নাসা, কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায়, ঢেউ খেলানো কালোচুল, ঘোলা চক্ষু এবং চেপ্টা নাক-মুখ বিশিষ্ট এই আদি অস্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব উঁচু-নীচু, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এখানকার বাঙ্গালি জনধারায় এ ধারা সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ করা যায়। তাই তিনি এই নরগোষ্ঠীকে আমাদের সমাজের জনধারার মূল স্তবক বলে অভিহিত করেছেন। ধান, পাট, পান, কলা, তুলা, আখ, ইক্ষু, সুপারি, হলুদ প্রভৃতি চাষাবাদ তাদেরই অবদান।

গৌতম বৌদ্ধের সময়ে ভারত উপমহাদেশে আদিম 'আবাদী' আর্যরা আসাম বাংলার সীমান্তবর্তী দেশ মগধ অবধি তাদের নিজেদের শক্তি অধিকার সম্প্রসারিত করেছিল। এ তথ্য গৌতম বৌদ্ধের সমকালীন প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, 'আবাদী' শ্রেণি গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম। সেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর কোনো ধারা কিশোরগঞ্জের কোনো অঞ্চলে আছে কিনা তা ব্যাপক গবেষণার ব্যাপার। তবে ভাটি কিশোরগঞ্জের হাওর জনপদের ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার এক শ্রেণির লোকদের অন্য শ্রেণির লোকেরা 'আবাদী' বলে। আবাদীরা তাদের বলে 'জংলী'। তেমনি উজান এলাকার লোকেরা ভাটি এলাকার লোকদের 'ভাইট্ট্যা' বলে। আবার ভাটি এলাকার লোকেরা কিশোরগঞ্জের উজান এলাকার লোকদের বলে 'উজান্যা'। তেমনি এক শ্রেণির মানুষকে কেউ কেউ উপহাস করে বলে থাকে 'গাবর'। এককালে মুসলিম তাঁতিদের বলা হতো জোলা। প্রাচীন জনসমাজের সুস্পষ্ট কোনো ইতিহাস ভিত্তিক তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রাচীন কিশোরগঞ্জের যে সকল আলোচনা বিভিন্ন গাঁথা, কাব্য, পুথি, পালা রয়েছে তাতে দেখা যায় যে, উজান-ভাটির জলময় হাওর অরণ্যবহুল কিশোরগঞ্জ অঞ্চল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ছিল হিন্দু ও ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রভাব ও শাসনমুক্ত বিভিন্ন উপজাতি-কোচ-হাজং-গারো-সাঁওতাল-রাজবংশী-কুকি-খাসিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত কিছু উচ্চ বর্ণ ও বাকী সব নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

এসব ধর্ম বর্ণের সাথে তান্ত্রিক ও হীন যাত্রী বৌদ্ধ নাথযোগী এবং পেশাজীবী কামার-কুমার-জেলে সম্প্রদায় ভুক্তরাই ছিল অধিক। কিশোরগঞ্জ জেলার যে সব স্থানে তান্ত্রিক রাজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে জঙ্গলবাড়ি,

www.pathagar.com

এগারসিন্দুর, চৌগাংগা, চারিপাড়া, কালিকামৌজা, যশোদল, ইটনা, নিকলী, চৌধার, সাঁচাইল ও তালজাংগার নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জে খ্রিস্টান মিশন নিয়ে আমেরিকা থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এসেছিলেন পাদ্রী মি. ব্ল্যাকম্যান। তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বিদের জন্য কিশোরগঞ্জে যে কুঠি নির্মাণ করেছিলেন সেই কুঠিতেই পরবর্তীকালে মহকুমা প্রশাসকের কালেকটরেট ভবন ছিল। বর্তমানে সেটি পুরাতন কোর্ট নামে পরিচিত। কিশোরগঞ্জ শহরে খৃষ্টধর্মের প্রসার তেমন একটি ঘটেনি। তবে শহর ছাড়া কটিয়াদীর বনগ্রাম, ইটনা, চৌদ্দশত ও হোসেনপুরে কিছুটা প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়। বাজিতপুরের হিলচিয়া নামক স্থানে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক উপজাতি সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। নানা কারণে সামন্তরাজ এ স্থানটি ছেড়ে চলে গেলে 'সহযানী যৌদ্ধ' সম্প্রদায়ীরা এ স্থানে অট্টালিকা তৈরি করে তাদের সাধন কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষুদ্র বৌদ্ধ বিহার।

কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে স্থায়িভাবে বিভিন্ন জনপদে বসবাস করছে এবং তাদের মধ্যে বিচিত্র এবং ব্যতিক্রমধর্মী ধর্মভিত্তিক বা বর্ণ গোত্র বিভক্তি জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের একটি তথ্য বিবরণী এখানে উপস্থাপন করা হলো।

কারার, কাহার, কসবি, কররানী, কোরাইশী, কুলু, কসাই–এসব পদবি হলো মুসলিম। কারকুন, কালোয়ার, কাপালী, কুরমী, কুরি, করনী, কুণ্ডু, কৈরী, কাঁসারী, কামার, কুমার, কায়স্থ, কৈবর্ত্য, কলু–এসব পদবি হলো হিন্দু। মলং, মাইমল, মাইকরস, মাটিয়াল, মল্লিক, মিল্‌কী, মীর, মির্যা, মৃধা, মোড়ল, মালাকার, মিঞা, মোঘল, মোল্লা, মুন্সী–এসব পদবি হলো মুসলিম। মহাপাত্র, মোদক, মাহিষ্য, ময়রা, মুচি, মোহান্ত, মালো, মালাকার, মালী, মণ্ডল, মল্লিক–এসব পদবি হলো হিন্দু। বাজপেয়ী, বেহারা, বক্‌শি, বারুই, বসাক, বোস, বৈদ্য, বিশ্বাস, বৈরাগী, বণিক, বসু, বর্মন, ভৌমিক, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য–এসব পদবি হলো হিন্দু। ভূঁইমালী, ভড়, ভূঁইয়া, বৈদ, বেদে, বাইন, বেপারী, বিশ্বাস, বক্‌স–এসব পদবি হলো মুসলিম। তবে বৈদ, বিন্দ, বেদে এরা মূলত আদিবাসী উপজাতীয় শ্রেণি গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হলেও সেই আদিকাল থেকে অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক ওরা মুসলিম। অন্যদিকে বিন্দ, বৈদ, কোচ, রাজবংশীয় কিছু লোক হিন্দু। গন্ধি, গাইন, এরা মুসলমান। গন্ধ বনিক, গনবর, গোঁব, গোপ, গোয়াল, গোস্বামী, ঘোষ–এসব পদবি হিন্দু। তাঁতী, তেলী, যেমন মুসলিম। সেখ, শেখ, সৈয়দ, শাহ, সরকার, সিকদার, সওদাগর- এসব পদবি হলো মুসলিম। তবে সরকার, সিকদার পদবি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে। শুড়ী, শূদ্র, শেঠ, সিং, সিংহ, শাঁখারী, সদগোপ, শীল, সাহা, সুবর্ণ বণিক, সূত্রধর– এসব পদবি হলো হিন্দু। দর্জি, দাই, দেওয়ান, ধাত্রী–এসব পদবি মুসলিম। দে, দত্ত, দোসাদ, দাস, দেবশর্মা, এসব পদবি হলো হিন্দু। আকন্দ, খন্দকার–এসব পদবি হলো মুসলিম। নন্দী, নাহা রক্ষিত, লৌহ, ধোবী, ধুনী, চৌহান, আঁইচ, তরফদার, অধিকারী–এসব পদবি হলো হিন্দু। অন্যদিকে 'ঠাকুর' পদবি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে। তাছাড়া ধুনকর, মগা–এসব পদবি মুসলিম। চাঁড়াল, চণ্ডাল, চামার, ডোম, ঋষি, হরিজন–এসব পদবিযুক্ত লোকজন আদি থেকেই হিন্দু। কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে উড়িয়া বা উড়িষ্যার মারওয়ারীগণ

www.pathagar.com

স্থায়িভাবে এখনও বসবাস করেন। বাজিতপুর উপজেলার প্রাচীন কাগজপত্রে আজও 'আকুতরাম' সীতারাম, কুষাল, প্রভৃতি মারওয়ারীদের নামে তালুক রয়েছে। এসব তালুকদারদের তালিকাভুক্ত ভূ-সম্পত্তি বাজিতপুরে রয়েছে।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

কিশোরগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ। এ জনপদ উজান-ভাটির জেলা হিসেবে যথার্থ নদীমাতৃক এলাকা। এর ভূ-প্রাকৃতিক দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় মেঘনা নদী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে কংস, মগরা, ধনু, বাউলাইসহ অসংখ্য শাখা ও সংযুক্ত নদী খাল, বিল, বাওর, হাওরসহ সর্ব পূর্ব-দক্ষিণে অষ্টগ্রামের কাছে ধলেশ্বরী ও ভৈরবে মেঘনা প্রবাহিত হয়ে সাগরের সাথে গিয়ে মিশেছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য সত্য যে, কিশোরগঞ্জের মাটি ও মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় প্রভাব বিস্তার করে আছে যে দুটি নদী তা একটি হলো পশ্চিমে হোসেনপুর থেকে পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর প্রভৃতি উপজেলার সীমানার প্রান্ত ছুয়ে ভৈরব বাজারের পশ্চিম এলাকা পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পুরাতন ব্রহ্মপুত্র' নদ। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে অংকিত জেমস রেনেলের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র নদ কিশোরগঞ্জ জেলার এগারসিন্দুর এলাকার নিকট এর প্রশস্ততা ছিল প্রায় ১২ মাইল অর্থাৎ ১৯ কি.মি.। সেই ব্রহ্মপুত্র নদ এখন মৃতপ্রায়। হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, এগারসিন্দুর এলাকায় নদ-নদী বলতে একটি সরুরেখা মাত্র। অন্যদিকে, ভৈরব বাজার থেকে উত্তরে কুলিয়ারচর, বাজিতপুর হয়ে নিকলী উপজেলা পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে অষ্টগ্রাম হয়ে ইটনার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গোটা এলাকাটাই মেঘনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল হিসেবে খ্যাত এবং পরিচিত। ভৈরব বাজারের কাছে পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা মিলন ঘটেছে। রেনেলের মানচিত্রে মেঘনা নদীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জে নদ-নদী বলতে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ঘোড়াউত্রা, ধনু, বাউলাই, মগরা, বারুই, চিনাই, সিংগুয়া, সুতী, আড়িয়াল খাঁ, ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী, কাওনা, বানার, সোয়াইজনী, নরসুন্দা, কুলা নদী, কাদাঙ্গী, বুড়িগাঙ, মরাগাঙ, বেংলা নদী ও কালী নদী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব নদ-নদীর নামকরণের উৎস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ দেশের নদ-নদী আমাদের গৌরব। এই নদী আমাদের আবাস ভূমি গড়ে তুলেছে, জনপদ সৃষ্টি করেছে, শস্য শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মানুষকে খাদ্য জুগিয়ে স্বাস্থ্য সম্পদে জীবন জীবিকায় পূর্ণ করেছে। এসব নদ-নদী আবার ভাঙনের কারণে বহু জনপদ বিলীন হয়ে নদী গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবু উৎস আর উন্নয়নের সব কিছুরই ভিত্তি হলো এই নদী। এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের কৃষিভিত্তিক জীবন-জীবিকা-শিল্প-কারখানা, গ্রাম-শহর-বন্দর-নগর ও রাজধানী। সোনার বাংলা রূপে বাংলাদেশের প্রাচীন যে গৌরবোজ্জ্বল পরিচিতি, তা এ সবই বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বয়ে যাওয়া অজস্র নদ-নদীগুলোর অনন্ত জলধারার অকৃত্রিম অবদান।

কিশোরগঞ্জ নদীমাতৃক এলাকা। এর পূর্ব সীমানায় মেঘনা নদী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে নেত্রকোনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কংস, মগরা, বাউলাই, এবং এদের অসংখ্য শাখা ও সংযুক্ত নদী এবং খাল।

www.pathagar.com

এই নদীগুলি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মোটামুটি ভৈরবের সাথে মিলেছে। সৃষ্টি হয়েছে একটি তোড়া সদৃশ আকৃতি যার একদিকে মেঘনা ও অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র আর ডালপালা হিসেবে অসংখ্য ছোট ছোট নদী আর খালবিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নরসুন্দা, ধনু, বারুনী, চিনাই, সিংগুয়া, সুতি, আড়িয়াল খাঁ, ফুলেশ্বরী, ধলেশ্বরী, সোয়াইজানী, কালী ও কুলা নদী। তবে, এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানকার অনেক নদীও আজ নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তন আর দুষণে শীর্ণকায়; অনেকগুলো কালের গর্ভে বিলীন। কিশোরগঞ্জের ইতিহাসের একটি আকর্ষণীয় দিক হলো হাওর। এখানকার ১৩টি উপজেলার মধ্যে তিনটি সম্পূর্ণ হাওর এলাকা যথাক্রমে ইটনা, মিঠামইন অষ্টগ্রাম। কেবল ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে নয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাওর এখানে বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে। বর্ষাকালে এখানকার হাওর অঞ্চলের বিশাল জলরাশি সাগরের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সারা কিশোরগঞ্জ জুড়েই রয়েছে অসংখ্য খাল, দিঘি-পুকুর। কোনো কোনো দিঘি পুকুরের সাথে জড়িয়ে আছে অনেক কথা ও কাহিনি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এগারসিন্দুরের বেবুদ রাজার দিঘি, কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন প্রামাণিকের পুকুর, ভেলুয়ার দিঘি, বাজিতপুরের শস্যের দিঘি, কটিয়াদির কুটামন দিঘি প্রভৃতি।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ছয় বছর পর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার কালীনাথ ধর এবং টাঙ্গাইলের প্যারীমোহন বিশ্বাস বি,এ পাশ করেছিলেন। এরাই বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রথম বি,এ। তাঁদের দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য হতো। বিচ্ছিন্নভাবে এরূপ দু'একজন কৃতী সন্তানের উদাহরণ পাওয়া গেলেও প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি ছিল নিতান্তই অপরিকল্পিত। কোনো স্কুল কলেজ ছিল না। ভুর্জপত্রে কঞ্চির লেখনী দ্বারা সকলকে লিখতে হতো। কালি প্রস্তুত হতো চাল পুড়িয়ে হাঁড়ির কালি দ্বারা। বৃদ্ধরা তা ব্যবহার করতেন। বালকেরা নিজেরাই লাউ পাতার হাঁড়ির কালি মেখে পানি চিপিয়ে সহজ প্রণালীতে কালি প্রস্তুত করে নিত। ইংরেজ শাসনামালে পাঠশালা প্রথার প্রচলন ঘটে। গ্রামের কোনো এক ব্যক্তি গুরু মহাশয় বা এলেমের পদ গ্রহণ করে গ্রামের ধনী গৃহের চণ্ডিমণ্ডপে বা আটচালা ঘরে পাঠশালা বা মক্তব খুলতেন। গুরু কোনো ছাত্র-বেতন নিতেন না। নির্দিষ্ট হারে খানা পেতেন। ছাত্র পালন প্রথা অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিল। পাঠশালার পাঠ শেষ হলে টোলে ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হতো। এই সময়ে মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কাঠের অক্ষরে লন্ডনে বাংলা পুথি মুদ্রিত হয়ে এদেশে এসেছিল। কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান শ্রী কেদারনাথ মজুমদারের লেখা থেকে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার এমনি অস্পষ্ট চিত্রই কেবল পাওয়া যায়। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে অনেক পরে।

১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Principal Heads History and Statistics of the Dacca Division গ্রন্থে বলা হয়েছে–

www.pathagar.com

১৮৬৮ সালের পূর্বেই হয়বতনগরে একটি মাদ্রাসার অস্তিত্ব ছিল, যদিও ছাত্রসংখ্যা মাত্র ঊনচল্লিশ জন। একই গ্রন্থে প্রাক্তন উলুকান্দি, বর্তমান ভৈরববাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে ভৈরববাজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য এলাকা। এখানে একটি ভালো স্কুল রয়েছে, তখন ভৈরবের লোকসংখ্যা ছিল ১৫০০ জন। হান্টারের লেখায়ও এই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কয়েকটি স্কুলের উল্লেখ রয়েছে, যেমন– (১) বাজিতপুর এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল, প্রতিষ্ঠাকাল, ডিসেম্বর ১৮৬৪, ছাত্রসংখ্যা ৫৫ (২) হোসেনপুর এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল, প্রতিষ্ঠাকাল, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, ছাত্রসংখ্যা ৪৪ (৩) কিশোরগঞ্জ এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল, প্রতিষ্ঠাকাল, ডিসেম্বর ১৮৫৪, ছাত্রসংখ্যা ৪২ (৪) শোলাকিয়া গার্লস স্কুল, প্রতিষ্ঠাকাল, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, ছাত্রসংখ্যা ৯ জন। এগুলো সবই ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল। এই পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সীমিত আকারে হলেও কিশোরগঞ্জ জেলার সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় রয়েছে যা নিয়ে গৌরব করা যায়।

কিশোরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাকাল ১লা জুলাই ১৮৮১ থেকে ১৯৯১-এ দীর্ঘ এক শতাব্দীর স্বাক্ষর রেখে আজও আলোর শিখা জ্বালিয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করে চলেছে। শুরুতে নাম ছিল কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। কিশোরগঞ্জে যে বিদ্যালয়টি উচ্চ শিক্ষার মহান প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা হলো সর্বজন পরিচিত কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, বর্তমানে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

কিশোরগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠার দুই দশক পরে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে মহকুমার হিন্দু-মুসলিম, জমিদার, তালুকদার, সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, জঙ্গলবাড়ি ও হয়বতনগরের বিখ্যাত দেওয়ান পরিবার, গাঙ্গাটিয়া, মসূয়া, আঠারবাড়ি, গুজাদিয়ার জমিদার, বত্রিশ পৌনে চারি আনার জমিদার বাড়ি, জয়কার প্রসিদ্ধ জমিদার-তালুকদার এবং স্থানীয় আইনজীবী ও সুধীবৃন্দের উৎসাহ, উদ্দীপনা, সর্বোপরি তাদের এককালীন ও মাসিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল এ বিদ্যাপিঠটির শুভযাত্রা।

বাবু দীননাথ চৌধুরী, বি,এ, বি, এল, ছিলেন প্রথম প্রধান শিক্ষক। তিনি ১৮৮১-১৮৮৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

এ বিদ্যালয়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঘটে। তখন কিশোরগঞ্জ শহরে “রামানন্দ হাইস্কুল” নামে আর একটি স্কুল ছিল।

স্থানীয় রামানন্দ হাইস্কুল পরবর্তী সময়ে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের সাথে মিলিত হয়। রামানন্দ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গাংগাটিয়ার জমিদার তৎকালীন হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী। তিনি স্কুলটির সর্বপ্রকার পরিচালনার ভার তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরগঞ্জে উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে দিয়েছিলেন। গিরিশবাবু স্কুলটিকে ভালভাবে পরিচালনা করতে পারেনি। দশ বছর স্কুলটি টিকে ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হতো। স্কুলের প্রতি জনমত বিরূপ থাকায় শেষকালে স্কুলটিকে একত্রীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

www.pathagar.com

মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা, পাকুন্দিয়া

সত্যিকার অর্থে মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা কিশোরগঞ্জ সর্বপ্রাচীন মাদ্রাসাই শুধু নয়, সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ, এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ।

"বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারস ময়মনসিংহ" (১৯৭৮)-এ এই মাদ্রাসার উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চলে মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। সাধারণত মাদ্রাসা, মক্তব বা টোলে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করত এবং তা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহ বা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন তৈরি হতো। কিন্তু এই মাদ্রাসায় সুদূর সিলেট থেকেও শিক্ষার্থী আসত।

কথিত আছে, প্রায় দুইশত বছর পূর্বে মোঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ কামেল দরবেশ এ স্থানে আস্তানা করেছিলেন ও অজ্ঞ জনসাধারণের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করেন। তাঁর নামানুসারে এ গ্রামের নাম রাখা হয় মঙ্গলবাড়িয়া।

বাংলা স্কুল

বাজিতপুর থানার প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বললে প্রথমেই গোবিন্দ পালের বাংলা স্কুলের নাম করতে হয়। এটি একটি উচ্চ প্রাইমারি স্কুল ছিল। পাগলার চর গদাধর চৌধুরীর বাড়িতে এটি বসত, বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা, শ্রুতি অনুযায়ী সময়কাল ১৮৫৬/৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পাল পাড়ার বিহারীলাল পাল। তৎকালীন বিজ্ঞজনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছিল বিরাট। পরবর্তী জীবনে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে মোক্তার হয়েছিলেন।

গোবিন্দপালের মৃত্যুর পর এই বাংলা স্কুলটি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র মধ্য ইংরেজি স্কুলে উন্নীত হয়। বাজিতপুরের খ্যাতনামা শিক্ষক তারিনী মাস্টার তার প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্কুলটি পরে পাগলার চর থেকে বর্তমান টাউন হাইস্কুলে চলে আসে নতুন নামে। ১৯৫৮-এ এটি জুনিয়র হাইস্কুল-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৫ থেকে টাউন হাইস্কুল নামে সরকারি অনুদান পেয়ে আসছে। অধুনা এটি নাজিরুল ইসলাম কলজিয়েট হাইস্কুল।

জঙ্গলবাড়ী হাইস্কুল

করিমগঞ্জ থানার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ি স্কুল এদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। বর্তমানে স্কুলটি ঈশা খাঁ'র স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক 'আড়া' বা পরিখা'র মাঝখানে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এটি এম, ই, স্কুল (Middle English School) (৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে তার যাত্রা শুরু। তখন বিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল আড়া বা পরিখার বাইরের দক্ষিণ দিকে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৬৮-এ 'আড়া'র ভিতর ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে এবং 'মহল পুকুর' নামে পরিচিত একটি ঐতিহাসিক পুকুর ভরাট করে বর্তমান জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

শতাধিক বছরের প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কিশোরগঞ্জের একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকাল ১লা এপ্রিল ১৮৯০। শুরুতে নাম ছিল বাজিতপুর এম,এ, স্কুল।

www.pathagar.com

শতবর্ষ পূর্বে বাজিতপুরের বিদ্যুৎসাহী, বিদ্যানুরাগী ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের প্রচেষ্টায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয় বাজিতপুর বাজারের পশ্চিমদিকে এক শান্ত সুন্দর পরিবেশে। প্রায় দুই একর জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি সৃষ্টিলগ্ন থেকেই আজ অবধি চতুঃপার্শ্বের শত সহস্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে চলেছে।

১৯৯০-এর জুন মাসে বিদ্যালয়টি নতুন নামকরণ হয় হাফেজ আবদুর রাজ্জাক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।

পাকুন্দিয়া হাইস্কুল ও পাকুন্দিয়া মহাবিদ্যালয়

পাকুন্দিয়া লক্ষীয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আবদুর রহমান এর আলোচনা থেকে এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হলো :

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আবদুল গণি তাঁর বাসভবনে একটি ওল্ডস্কীম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মাওলানা গণি ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকুন্দিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আলিমউদ্দিন। আঃ গণি ঢাকা থেকে উলা পরীক্ষায় স্বর্ণপদকসহ প্রথম বিভাগে প্রথম হন। দেওবন্দ থেকেও তিনি শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন ও শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

হোসেন্দী প্রখ্যাত আইনজীবী ও ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান মরহুম ইসলাম হোসেন খান বাহাদুর ও মুন্সী নুরুন্নবী সাহেবের উপদেশ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে মাওলানা আঃ গণির ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাটি নিউস্কীম মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। এটা তাঁর বাসভবন হতে স্থানান্তরিত করে বর্তমান পাকুন্দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থানে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়। মাওলানা গণি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাদ্রাসার শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৬২ তে এই নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ স্বীয় বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পাকুন্দিয়া নিউস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসার জন্য এক গৌরবময় সময়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উক্ত সিনিয়র মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেদিন বিপুল সংবর্ধনা ও বিরাট জনসমাবেশে শেরে বাংলার বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল অভূতপূর্ব।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে নারান্দীর শিক্ষককুল শিরোমণি মৌলভী খুর্শিদ উদ্দিন আহমদ পাকুন্দিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি এই মাদ্রাসাকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করেন।

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরই প্রচেষ্টায় ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় নিউস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসাটিকে পাকুন্দিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়টি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে মৌঃ খুর্শিদ উদ্দিন শিক্ষার মশাল হাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল স্তরের লোক নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতেন। ১৯৬১-তে এসে তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়। প্রতিষ্ঠিত হলো পাকুন্দিয়া মহাবিদ্যালয়।

www.pathagar.com

হোসেনপুর হাইস্কুল

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণি হতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত হোসেনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় চালু হয়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটি হোসেনপুর এম,ই স্কুল নামে প্রথম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উন্নীত হয়। ১৯২০-এ শম্ভুচন্দ্র হাইস্কুল নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মঞ্জুরী পায়। জানা যায়, তৎকালীন আঠারবাড়ির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায়ের বদান্যতায় হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে বিদ্যালয়টি আগুন লেগে পুড়ে যায়। এরপর এটি পুনঃনির্মাণে হোসেনপুরবাসী স্থানীয় চাঁদার মাধ্যমে বিদ্যালয়টি নাম পরিবর্তন করে "হোসেনপুর হাইস্কুল" নামে পুনঃনির্মাণ করে।

কোদালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

কিশোরগঞ্জের অন্যতম প্রাচীন হাইস্কুল কোদালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। পাকুন্দিয়া থানাধীন এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ।

কোদালিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শহরউল্লা কোনদিন পুথিগত বিদ্যার ধার ধারতেন না, তাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট। বিবেক তাঁকে পথ দেখিয়েছিল অজ্ঞ মানুষের মুক্তির পথ শিক্ষার পানে ধাবিত হতে। কিভাবে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, কিভাবে দুস্থ মানবের দুর্দশা লাঘব করা যায়, এই চিন্তায় তিনি সর্বদা ব্যাকুল ছিলেন। তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

বিদ্যালয়টি হোসেনপুর-কটিয়াদী এবং কিশোরগঞ্জ-পাকুন্দিয়া ডি,বি রোডের সংযোগস্থলের কাছে তাঁর বাসভবনের পাশে প্রতিষ্ঠিত।

আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৬। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন জগৎ জীবন ম্রিয়মাণ তখন আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যাঁর নাম অমর অক্ষয় হয়ে রয়েছে তিনি হলেন মুন্সী আজিম উদ্দিন।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম করিমগঞ্জ থানার সাঁতারপুর গ্রামে। পরলোকগমন করেছেন ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এ। মুন্সী আজিমউদ্দিন-এর শৈশব, কৈশোর কেটেছে দারুণ অর্থাভাবে কিন্তু পরিবেশের প্রতিকূলতা তাঁকে থামিয়ে দেয়নি। আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবার কারণে তিনি আইনজীবী হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও সফল হয়েছিলেন। জানা যায়, প্রথম দিন কোর্টে গিয়ে তিনি পেয়েছিলেন ১৩ (তের) টাকা এবং তা খরচ করেছিলেন মা'র জন্য একখানা শাড়ি ও অন্যান্য তৈজসপত্র কিনে। যে দারিদ্র্য তাঁকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে তা তিনি কখনো ভোলেননি।

২৮শে জানুয়ারি ১৯১৩। কিশোরগঞ্জ শহরের স্টেশন রোডের নিজ বাড়ির চত্বরেই মুন্সী আজিমউদ্দিন তুলে দিলেন বিরাট দু'চালা ঘর। নব প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের নাম হলো আজিম উদ্দিন উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার বছরে ছাত্র ভর্তি হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে খোলা হলো নবম শ্রেণি এবং তার পরের বছর ১০ম শ্রেণি। কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়কে সরিয়ে বর্তমান স্থানে আনা হলো।

www.pathagar.com

বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে কটিয়াদী থানার বনগ্রাম আনন্দকিশোর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বনগ্রামের জমিদার বাবু আনন্দকিশোর রায়চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা। এই বিদ্যালয়টি যেমনি সুপ্রাচীন তেমনি ঐতিহ্যমণ্ডিত। এখানে অধ্যয়ন করে বহু জ্ঞানীগুণীজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেছেন।

আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন

আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন উচ্চ বিদ্যালয় ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কটিয়াদী থানার অন্তর্গত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিপুল ঐতিহ্য ও সুনামের অধিকারী। আচমিতার জমিদার ছিলেন রায় বাহাদুর কেদারনাথ রায়। তিনি ছিলেন দারুণ ইংরেজভক্ত। তাঁর আমন্ত্রণে তৎকালীন ইংরেজ বড়লাট ৫ম জর্জ আচমিতায় আগমন করেন। ইংরেজদের প্রীতিভাজন হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেন 'আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন উচ্চ বিদ্যালয়।

ভৈরব কে. বি. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাকাল ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত বিজেশ্বর গ্রামের মরহুম জনাব মুন্সী শরাফত উল্লাহ জ্ঞানের আলোক বর্তিকা হাতে ভৈরব আগমন করেন এবং ভৈরবপুর ফকির বাড়িতে একটি মক্তব স্থাপন করে সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলো বিতরণে ব্রতী হন। ভৈরব বাজারে শিক্ষা বিস্তারে তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। জ্ঞানতাপস মুন্সী শরাফতউল্লাহ মহারাজ জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর কাছ থেকে দানস্বরূপ কিছু ভূমি গ্রহণ করে ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে মক্তবটিকে বাজারে অর্থাৎ বর্তমান কে,বি, হাইস্কুলের স্থলে স্থানান্তর করেন এবং ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্তবটিকে মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। এ মাইনর স্কুল ১৯১৯-এ জ্ঞানতাপস শরাফতউল্লাহ্'র প্রচেষ্টায় 'ভৈরব হাইস্কুল'-এ পরিণত হয়। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় ভৈরব হাই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে বর্তমান কে.বি. হাইস্কুল করা হয়।

হয়বতনগর আনোয়ারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়বতনগর আনোয়ারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। আলিম হিসেবে মঞ্জুরী পায় ১৯৩৬-এ এবং ফাজিল ও কামিল হাদিস হিসেবে মঞ্জুরী পায় যথাক্রমে ১৯৩৮ ও ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। উপমহাদেশের খ্যাতনামা মুহাদ্দেস হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী (র.)-এর নামানুসারে মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় আনোয়ারুল উলুম। এই মাদ্রাসা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৃহত্তর ময়মনসিংহে এটাই কামিল হাদিসের প্রথম মাদ্রাসা।

নিকলী জি.সি. হাইস্কুল

নিকলী সোয়াইজনী নদীর তীরে অবস্থিত এবং ইংল্যান্ডের ডেভিড কোম্পানির মি. স্টিফেনসন-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত নিকলী জি.সি. হাইস্কুল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ডেভিড কোম্পানির স্থানীয় গুদামের মালিক এবং যৌথ পাট ব্যবসায়ী বাবু দয়াল সাহার স্বর্গীয় পিতার নামানুসারে ও আর্থিক সহায়তায় জি.সি. অর্থাৎ গোড়াচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু।

www.pathagar.com

গুরুদয়াল সরকারি কলেজ

শুরুতে নাম ছিল কিশোরগঞ্জ কলেজ। প্রতিষ্ঠাকাল ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। অর্ধশতাব্দী প্রায় অতিক্রান্ত। নরসুন্দার তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য আর উত্তরসূরীদের প্রেরণা হয়ে। কিন্তু যাত্রাপথে তার অবস্থান ছিল বর্তমান স্থানে নয়, আর একটু দূরে বর্তমান পাট গবেষণা কেন্দ্রের সন্নিকটে। ১৯৪৩ এর সময়টি ছিল দুর্ভিক্ষ ভারাক্রান্ত দেশ। বৃটিশ শাসন চলছে।

পাট গবেষণা কেন্দ্র সংলগ্ন রাখুয়াইলে একটি একতলা সরকারি ভবন ছিল যা স্থানীয় সি এন্ড বি ডাকবাংলা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই ভবনেই ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুল আকাঙ্ক্ষিত কিশোরগঞ্জ কলেজ। ঐ বছরই ২০শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন তৎকালীন ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই.জি. ক্রীক। 'কিশোরগঞ্জ কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব' শিরোনামে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত, "ময়মনসিংহ সমাচার" পত্রিকায় ১লা নভেম্বর ১৯৪৩/১৫ই কার্তিক ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫-এ কলেজটি বতর্মান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়। তখন পর্যন্ত কলেজে কেবল কলা বিভাগ ছিল। উক্ত সনে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু বাধ সাধল আর্থিক অস্বচ্ছলতা। বিজ্ঞানাগার (কলেজে বর্তমানে যে মূল ভবন রয়েছে) তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হলো প্রচুর অর্থের। এই দুঃসময়ে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে এগিয়ে এলেন ইটনা থানার কাঠের গ্রামের নিরক্ষর কৈবর্তরাজ গুরুদয়াল সরকার। কৈবর্তরাজের এ টাকাতেই গড়ে উঠল কিশোরগঞ্জের আলোকবার্তিকা স্বরূপ এ বিদ্যাপাঠ। তাঁর সে বদান্যতা কিশোরগঞ্জবাসী বিস্মৃত হয়নি, তাঁর নামানুসারেই মহাবিদ্যালয়টির নাম রাখা হলো 'গুরুদয়াল কলেজ'। এই টাকায় সে বছরই বি, এ, ক্লাশও খোলা হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত হয়।

এস.ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

এটি কিশোরগঞ্জ শহরের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৩। এই স্কুলটি কিশোরগঞ্জ এর মেয়েদের জন্য একটি আদর্শ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহু পূর্ব থেকেই সুনাম অর্জন করে এসেছে। পড়ালেখা ছাড়াও ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এস.ভি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক চেষ্টা করেও এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়টির ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা যায়নি। যাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এ কাজে, তাঁরা সফল হয়নি।

স্কুলটির প্রথমে নাম ছিল সরযূ বিদ্যানিকেতন। যাঁর সাহায্যে এটি স্থাপিত হয় তিনি হলেন অষ্টগ্রামের ইছাপুরের বাবু মহেন্দ্র দাস। তাঁর পরলোকগত স্ত্রী সরযূবালার নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ হয়। এস.ভি. উচ্চ বিদ্যালয়টির সরকারিকরণ হয় ১৯৬৮-তে।

www.pathagar.com

হাজী হাসমত কলেজ

ভৈরব তথা কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাজী আসমত কলেজ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। ভৈরবে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে চল্লিশের দশকে শিক্ষানুরাগীরা একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভৈরবে অনুষ্ঠিত জেলা মুসলিম লীগ কনফারেন্সে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ভৈরবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৬-এ ভৈরবের কিছু সংখ্যক সমাজহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগী কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। এ মহতী প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ভৈরবের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও দানবীর মরহুম হাজী আসমত আলী বেপারী কলেজ স্থাপনের জন্য এককালীন ৪০,০০০/- টাকা দান করেন। তাঁর মহানুভবতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁরই নামে কে.বি. উচ্চ বিদ্যালয়ের উপরিভাগ ও তৎসংলগ্ন ৯ বিঘা ভূমি জুড়ে বিস্তৃত হাজী আসমত কলেজ।

কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ

তদানীন্তন কিশোরগঞ্জ মহকুমার নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ না থাকায় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ নামে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুদয়াল কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বর্তমান আদর্শ শিশু বিদ্যালয়ে কলেজের প্রথম ক্লাস শুরু হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি খাস ৫ একর ভূমি কলেজ কর্তৃক ৯৯ বছরের জন্যে লীজ নিয়ে বর্তমান স্থানে কলেজটিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলাদেশের বিখ্যাত ও সর্বজন পরিচিত শিল্পপতি ও সমাজসেবী আলহাজ্ব জহুরুল ইসলাম স্বীয় জন্মস্থান বাজিতপুর থানার ভাগলপুরে তুলেছেন জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে একটি অত্যাধুনিক ও বহুশয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৯। একই সাথে নার্সিং ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। নির্মাণ কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে। নির্মাণ শেষে পূর্ণাঙ্গরূপ পেলে তা হবে ১২০০ শয্যা সম্বলিত একটি আধুনিক হাসপাতাল এবং ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সম্পূর্ণ আবাসিক মেডিকেল কলেজ। আগস্ট ১৯৯২ থেকে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে ৪০ জন ছাত্রকে নিয়ে। এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম-এর নামকরণে এই কলেজটি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাকাল ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। কলেজটি বর্তমানে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে এর কার্যক্রম পরিচালিত করছে। সৈয়দ নজরুল ইসলামের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী ও সাংসদ। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কলেজটি কিশোরগঞ্জে স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলায় আরও বেশ কিছু প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যা আজও তাদের মহিমা ও সুনাম নিয়ে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত করে চলেছে।

www.pathagar.com

এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ভৈরব পৌরসভাধীন জগন্নাথপুর (পুরাতন) সরকারি বিদ্যালয় (১৮৯৬), কমলপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১১), কালিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৯), হাজী হুসেন আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৪), কমলপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৮), হাজী আসমত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩০), রামশংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৬), সাদেকপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত সাদেকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০০), গজারিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত বাঁশগাড়ী (২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৮), মানিকদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১০), শিবপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত জামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯০৪) প্রভৃতি। কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে যে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাকুয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯২৮, রামচরণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২৯। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ভট্টাচার্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। কুমুদিনী (চরশোলাকিয়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সন ১৯৪৭। নিউটাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৮ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

কিশোরগঞ্জ প্রকৃত অর্থেই একটি ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ জনপদ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে ঐতিহাসিক নির্দশন ও পুরাকীর্তির যে গৌরবময় উদাহরণ রয়েছে, তার কেন্দ্রভূমি কিশোরগঞ্জ। কিছু কিছু নির্দশন রয়েছে যা সারা দেশের জন্য আকর্ষণীয়। যেমন: জঙ্গলবাড়ি দুর্গ (করিমগঞ্জ), এগারসিন্দুর দুর্গ (পাকুন্দিয়া), এগারসিন্দুরের সাদী মসজিদ (পাকুন্দিয়া), সালংকা জামে মসজিদ (পাকুন্দিয়া), গুড়ুই মসজিদ (নিকলী), কুতুব শাহ মসজিদ (অষ্টগ্রাম), জাওয়ার সাহেববাড়ি মসজিদ (তাড়াইল), বাদশাহী মসজিদ (ইটনা) ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ি মসজিদ (বাজিতপুর), পাগলা মসজিদ (কিশোরগঞ্জ সদর) সেকান্দার শাহ্‌র মাজার (তাড়াইল), শাহ্ গরীবুল্লার মাজার (পাকুন্দিয়া), হযরত শামছউদ্দীন বোখারির মাজার কুড়িগাই (কটিয়াদি), শোলাকিয়া ধড় শহীদের মাজার (কিশোরগঞ্জ সদর), কাইল্যা শাহ ও মাইট্যা শাহ মাজার (ইটনা), নিজাম শাহ্‌র মাজার ও মসজিদ (কাতিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ), কবি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির (কিশোরগঞ্জ সদর), গোপীনাথ জিওর মন্দির (কটিয়াদি), দিল্লীর আখড়া (মিঠামইন), শোলাকিয়া ঈদগাহ (কিশোরগঞ্জ সদর), অস্কার বিজয়ী সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি (কটিয়াদি), গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়ি (হোসেনপুর) ইত্যাদি। নিম্নে বিপুল সংখ্যক নিদর্শনের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থাপনার বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো :

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

কিশোরগঞ্জের চেয়ে যে নামটি অধিক প্রাচীন তা হলো জঙ্গলবাড়ি। বার ভূঞা ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা'র দ্বিতীয় রাজধানীরূপে জঙ্গলবাড়ির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। রেনেলের মানচিত্রে জঙ্গলবাড়ির উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র ও পুরাতন গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায় যে, এই এলাকাটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আরও জানা যায় যে, স্থানটি পঞ্চদশ শতকে কোচ বংশীয় সমান্তরাজ লক্ষ্মণ হাজো'র রাজধানী ছিল। জঙ্গলবাড়ি

বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের অন্তর্গত। জেলা শহর থেকে চার মাইল পূর্বে নরসুন্দা নদীর তীরে তার অবস্থান।

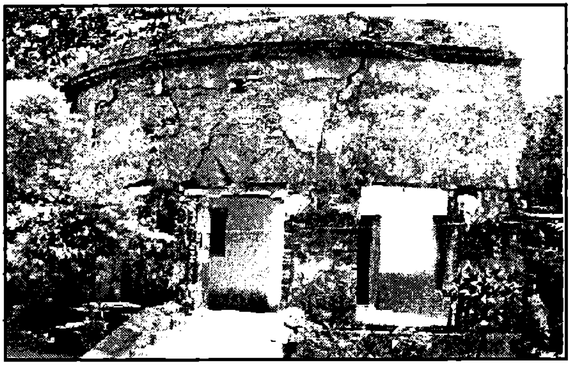

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ

জঙ্গলবাড়িতে বর্তমানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষই কেবল পাওয়া যায়। এলাকাটি যে একটি প্রাচীন জনপদ ও এখানে যে একটি দুর্গ ছিল তা নিয়ে গবেষক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। এলাকাটিতে প্রাচীন ইটের টুকরা ও মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর দিকে আছে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা। প্রায় সম্পূর্ণ ভগ্ন দুর্গ-প্রাচীর, ধ্বংসপ্রাপ্ত দরবার হল (মতান্তরে কাচারি), প্রাচীন মসজিদ, মসজিদের সামনে পুকুর, পুকুর পাড়ে বাঁধানো দেয়াল এবং একটি ভবনের ভিত্তিভূমি যা বর্তমানে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত ইত্যাদি পুরানো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে দুর্গ এলাকাটি খুব বড় ছিল বলে মনে হয় না। আয়তন ৩০ থেকে ৩৫ একরের বেশি হবে না। এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ থাকলেও এখন আর নেই। জঙ্গলপূর্ণ ছিল বলে এলাকাটির নাম জঙ্গলবাড়ি বলা হলেও নামকরণের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

জঙ্গলবাড়ি দুর্গের আদি ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থায়িভাবে না হলেও ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা এখানে বসবাস করতেন, এ তথ্য নিয়ে সংশয় নেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বংশধরদের একটি শাখা এখনও সেখানে বহুকাল ধরে বসবাসরত আছেন। কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন, হাজরাদী (তপ্পা) বাজুহার অন্তর্গত ছিল না। লক্ষ্মণ হাজো নামক এক কোচ রাজা বর্তমান জঙ্গলবাড়ি নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে হাজরাদী শাসন করছিলেন। ষোড়শ শতকের চতুর্থপাদে মোগলদের নিকট ঈশা খাঁ পরাজিত হয়ে জঙ্গলবাড়ি এলাকায় আগমন করেন এবং ঈশা খাঁ লক্ষ্মণ হাজোর রাজধানী জঙ্গলবাড়ি আক্রমণ করে দখল করেন। দুর্গটি দখলের পর তিনি এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ, দুর্গের সংস্কারসাধন এবং তিন দিকে পরিখা খনন করে ও নরসুন্দার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে দুর্গটিকে একটি গোলাকার দ্বীপের আকার দেন। এই জঙ্গলবাড়িতে অবস্থানকালেই ঈশা খাঁ সোনারগাঁও দখল করে সেখানে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করলে জঙ্গলবাড়ি হয়ে পড়ে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। জঙ্গলবাড়ির জৌলুসও তখন থেকে কমে যায়।

জঙ্গলবাড়ি দুর্গ এলাকায় ইট ও মৃৎপাত্রের যেসব ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে তা মুসলিম আমলের আগেকার বলে ধারণা করা হয়। তবে কালের বক্ষ বিদীর্ণ করে একটি মসজিদ

www.pathagar.com

এখনো দাঁড়িয়ে আছে যা সম্ভবত ঈশা খাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা নির্মিত। মসজিদটি বেশ বড় এবং তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদটির বহিরাঙ্গ ও ভিতরে প্লাস্টার করার ফলে তার প্রাচীনত্ব অনেকাংশে খর্ব হয়েছে, কেবল গম্বুজ তিনটি অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করছে। জঙ্গলবাড়ির নিকটেই বাইশ কাহনীয়া নামে একটি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি আছে যে, সেখানে কোচদের বাইশ কাহন সৈন্যের ছাউনি ছিল এবং কুশাখালে কোচদের বহর থাকত। উল্লেখ্য, ২০ জনে এক কাহন এবং কুশা বা কোশা এক গাছের নৌকা।

এগারসিন্দুর দুর্গ

এগারসিন্দুর, কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার একটি ইউনিয়ন। এগারসিন্দুর সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ষোড়শ শতকের কবি শ্রী নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখ করা হলো।

"এগারসিন্দুর আর মিরজাফরপুর।
দগদগা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর।।
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এসব স্থান হয়।
নানাদেশি লোক তাথে বাণিজ্য করয়।।
এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে।
বাণিজ্যে বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে।
নানাদেশি বণিক আসয়ে এথায়।
বেচাকেনা করে মনে আনন্দ হিয়ায়।।"

সে অতীত দিনের গৌরব বিলীন হয়ে গেছে। তবে এগারসিন্দুর যে প্রাচীন এলাকা তার চিহ্ন আজও পাওয়া যায়। এগারসিন্দুর দুর্গ ছিল বিশাল আকারের এবং দুর্গ। এলাকার প্রায় সর্বত্র এখনো খুঁজে পাওয়া যায় জাফরি ইট, অজানা সুরঙ্গ, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, দুই একটা পাথর খণ্ড। এগারসিন্দুর দুর্গ ঈশা খাঁর শক্ত ঘাঁটি ছিল, তবে এটি নির্মাণকাল প্রাচীন যুগে হয়েছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে দুর্গটির কোনো চিহ্নই নেই। দুর্গ এলাকা বলে চিহ্নিত স্থানটি দেখে ধারণা করা যায় যে, দুর্গের পশ্চিম দিকে ছিল প্রশস্ত পরিখা এবং উত্তর ও পূর্ব দিকে ছিল শঙ্খ নদীর বাঁক দ্বারা সৃষ্টি স্বাভাবিক পরিখা। দক্ষিণে ছিল বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ।

এগারসিন্দুর দুর্গ

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ-চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি এগারসিন্দুর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মো. হোসেনপুরী কর্তৃক অনূদিত এবং খানসাহেব এম, আবদুল্লাহ তাঁর "মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস" গ্রন্থে যে উদ্ধৃতি দিয়েছে, তার বাংলায় তরজমা দাঁড়ায় নিম্নরূপ : 'তৎসময়ে এগারসিন্দুর যেমন বন্য জন্তুতে পূর্ণ ছিল, তেমনি এখানে প্রচুর সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রও তৈরি হতো এবং এ মসলিন বস্ত্র তৈরির জন্যই তৎকালে এগারসিন্দুরে ইংরেজ ও পর্তুগীজরা কুঠি স্থাপন করেছিল। প্রচুর ফলমূলসহ পানেরও চাষ হতো। সে সময়ে সোনারগাঁও'র শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ।' এতে বুঝা যায় যে, চৌদ্দ শতকেও এগারসিন্দুর সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এগারসিন্দুর দুর্গ কে নির্মাণ করেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন অহমরাজ আজহাবা, কারও মতে কোচরাজ বেবুদ, আবার কেহ কেহ বলেন রাজা গৌরগোবিন্দ। প্রাচীন ইতিহাস থেকে যতদূর জানা যায়, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বেবুদ নামে এক কোচ সামন্তরাজ এলাকাটিতে স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করে বসবাস করেছিলেন। বার ভূঞা ঈশা খাঁ মোগল সুবেদার শাহবাজ খাঁকে রণচাতুরীতে পরাস্ত করে ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপনপূর্বক নবউদ্যমে চারপাশে তাঁর আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন এবং এ সময়েই ঈশা খাঁ এগারসিন্দুর উপস্থিত হলে বেবুদরাজ প্রাণ ভয়ে বিনাযুদ্ধে পালিয়ে যান। অপর মতে, ঈশা খাঁ সোনারগাঁও-এ মোঘলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাতের অন্ধকারে সৈন্যসামন্তসহ এগারসিন্দুর দুর্গ আক্রমণ করে কোচরাজকে পরাজিত করেন।

যা হোক, কোচদের দখল থেকে ঈশা খাঁ এগারসিন্দুর দখল করেন, এ নিয়ে দ্বিমত নেই। তিনি স্থানটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বেবুদ রাজের বাড়ি ও দুর্গটি সংস্কার করে দুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করান এবং সৈন্যসহ যুদ্ধাস্ত্র সংরক্ষণ করেন। পরবর্তীকালে এ দুর্গ থেকেই তিনি ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে টোকে অবস্থানরত মোগল সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, এগারসিন্দুর এলাকায় একটি সুন্দর দিঘি রয়েছে, যা বেবুদ রাজার দিঘি নামে আজও পরিচিত। রাজা বেবুদ প্রজাদের মঙ্গলার্থে এই দিঘিটি কাটিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। দিঘিটি প্রায় ৫০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। পানি বেশ স্বচ্ছ। এই দিঘি এবং তার পাশের আংটি চোরার বিল (বর্তমানে ভরাট) নিয়ে বেবুদ রাজার অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, যা বেবুদ রাজার অস্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও এগারসিন্দুরের গৌরবগাথা, জমজমাট নৌবন্দর, ব্যবসাকেন্দ্র, ধর্মপ্রচারক পির আওলিয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাসস্থান হিসেবে এর সুনাম অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের সময় ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে অহমরাজ প্রায় ৫০০ যুদ্ধযানসহ ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে এসে এগারসিন্দুর বন্দর আক্রমণ ও দুর্গ লুটতরাজ করে বন্দরটি ধ্বংস করে দেন। বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁ এ সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে দ্রুত অগ্রসর হন এবং এগারসিন্দুরে অহমরাজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। অহমরাজ পরাজিত হয়ে আসামের দিকে পালিয়ে যান। এ যুদ্ধে বন্দরটি আরও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে অহমরাজীর বাকি যা স্মৃতিচিহ্ন ছিল,

www.pathagar.com

সেগুলোও ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মাটির সাথে মিশে যায়। এমনি করেই একদিনের কোলাহল মুখর জনপদ ও সমৃদ্ধশালী বন্দর দুর্গের ঐতিহাসিক স্থাপনা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

সাদী মসজিদ

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে এগারসিন্দুরে ঐতিহাসিক এই অপূর্ব সুন্দর সাদী মসজিদটি নির্মিত হয়। পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ এই মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। এ ধরনের টেরাকোটা মসজিদ সত্যিই বিরল।

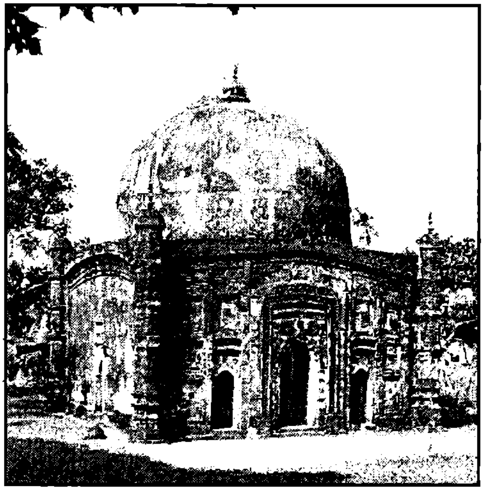

সাদী মসজিদ

কিশোরগঞ্জের পুরাকীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সাদী মসজিদ। বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহু ২৭ ফুট দীর্ঘ। মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। চারপাশে চারটি বুরুজ আছে এবং বুরুজগুলি ছোট গম্বুজ ও ফিনিয়েল দ্বারা আবৃত। বক্রাকারে কার্নিশ প্রাক্ মোগল যুগের ইমারতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ দ্বার রয়েছে। বহুপত্র বিশিষ্ট পূর্বদিকের প্রধান খিলান পথটি খুবই আকর্ষণীয়। এই কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইয়ের দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রবেশ পথগুলির চারদিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের কাজ রয়েছে এবং প্রধান দরজার দু'পাশ অপূর্ব সুন্দরভাবে পোড়ামাটির নকশাকৃত ফলকদ্বারা কারুকার্যমণ্ডিত।

ভিতরে মেহরাব ৩টি অনিন্দ্য সুন্দর। মূল মেহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে সুনিপুণভাবে অলঙ্কৃত। মোগল শাসনামলে সুবা বাংলায় শান্তি স্থাপনের পর পোড়ামাটির অলংকরণ আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, এর অলংকরণ তাই প্রমাণ করে।

মূল মেহরাবের আয়তাকার ফ্রেমটি উপরের দিকে কিছুটা বাঁকানো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র তিন দিকে পত্রাকারের খিলানটির বাইরের দিক সুন্দরভাবে খাঁজকাটা।

www.pathagar.com

উপরের দিকে রয়েছে ফুলের প্রতিকৃতি, খাঁজকাটা অংশে নিচের দিক সুন্দর প্যানেল দ্বারা সজ্জিত। অন্য দুটি মেহরাবও সুন্দরভাবে অলংকৃত। এগুলোর সুলতানি আমলের স্থাপত্য কৌশল লক্ষ করা যায়।

মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের মাথায় পলেস্তারের উপরে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ফুট ১০.২৫ ইঞ্চি লম্বা আরবি ও ফারসি ভাষায় একটি শিলালিপি রয়েছে।

শাহ্ মাহমুদের মসজিদ, ভিটা ও বালাখানা

কিশোরগঞ্জের অন্যতম সেরা আকর্ষণ এগারসিন্দুরে অবস্থিত শাহ মাহমুদের ঐতিহাসিক মসজিদ, ভিটা ও অপূর্ব সুন্দর বালাখানা। মসজিদের সামনে একটি পুকুর রয়েছে। একটি শিলালিপি ছিল মসজিদটির। মসজিদটি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। আরও জানা যায় যে, ১১৪৫ বঙ্গাব্দে ২৩শে মাঘ তারিখে মসজিদের ব্যয় নির্বাহে জঙ্গলবাড়ি হতে দেওয়া লাখে জমি ৭।।০ এককানি সাড়ে সাত গণ্ডা জমির দলিল আছে।

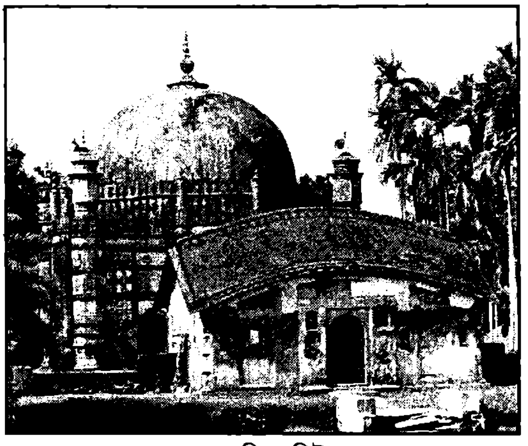

শাহ্ মাহমুদের মসজিদ, ভিটা ও বালাখানা

স্থানীয় জনশ্রুতি আছে, মসজিদের চারকোণে চারটি মূল্যবান প্রস্তর ফলক ছিল, কিন্তু তা অপহৃত হয়ে গিয়েছে। মসজিদ ও বালাখানার নির্মাতা শাহ্ মাহমুদ। তিনি প্রথম জীবনে খুবই দরিদ্র ছিলেন। ফকির নিরগিন শাহের অনুগ্রহে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন এবং প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হন।

বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহু ৩২ ফুট। চার কোণায় ৪টি আটকোণাকার বুরুজ দ্বারা মজবুত করা হয়েছে। বুরুজগুলি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত ও শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজযুক্ত। দেয়ালগুলো প্রশস্ত এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি খিলান পথ রয়েছে। মাঝখানের অপেক্ষাকৃত বড় খিলানের উপর এক সময় শিলালিপি প্রোথিত ছিল। ভিতর ও দক্ষিণ দিক থেকেও মসজিদে প্রবেশ করা যায়। দু'পাশে দুটি সরু মিনার রয়েছে। একটি মাত্র গম্বুজ আছে, তবে আকৃতি বিশাল। গম্বুজটি আটভুজা ও পদ্মের মটিফযুক্ত এবং শীর্ষদেশে কলসিকৃতির চূড়া রয়েছে। মসজিদটি ইটের তৈরি এবং সামনের চত্তরটি বাঁধানো। একদা

www.pathagar.com

পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। ভিতরে পশ্চিমের দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মেহরাবটি বড় ও অলংকৃত। সুলতানি আমলের মত চিত্রফলক দ্বারা মেহরাবগুলি অলংকৃত। কার্নিশ ও প্যারাপেট বাঁকান নয়, সোজা। প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাটলম্যান্ট দ্বারা সুশোভিত। মসজিদের চারদিকে আছে অনুচ্চ প্রাচীর।

বালাখানা

শাহ মাহমুদ মসজিদের প্রধান বিশেষত্ব হলো এর প্রবেশদ্বারটি ঠিক দোচালা ঘরের আকৃতি। এই ঘর বা বালাখানার জন্য মসজিদটির আকর্ষণ ও সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়েছে। আয়তন ২৫ × ১৩-৮"। এই বালাখানার মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করে মূল ইমারতে যেতে হয়। পূর্ব দেয়াল কুলুঙ্গী ও প্যানেল দ্বারা শোভিত। উপরের পাকা ছাদ ঠিক বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মতো। মসজিদের আঙিনায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন কবর রয়েছে।

সালংকা জামে মসজিদ

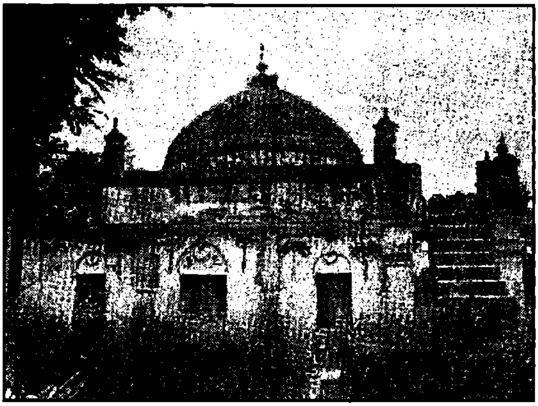

সালংকা জামে মসজিদ

পাকুন্দিয়া থানার নারান্দী ইউনিয়নের সালংকা গ্রামে সালংকা জামে মসজিদ নামে সপ্তদশ শতাব্দীর তৈরি একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। সুরকী জমানো ও বড় বড় পাথরে তৈরি ও মসজিদটি ইতিহাসের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশস্ত বারান্দা, দু'দরজা ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির চূড়ায় পিতলের ৪টি কলসি একটার উপর একটা, বড় থেকে ছোট এমনি করে রাখা। নিচের কলসিটি বড় এবং এর গায়ে চার পাশে প্রাচীন বাংলা লিখন পদ্ধতিতে 'হরে কৃষ্ণ' ও 'হরি' ইত্যাদি লেখা রয়েছে। (বর্তমানে উক্ত লিখনযুক্ত বড় কলসীটি যথাস্থানে নেই, স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, ঐ কলসিটি চুরি হয়ে গিয়েছে)। মসজিদটি বর্তমানে ঝোপ জঙ্গলে ঢেকে গেছে। এর সামনের প্রবেশদ্বারের উপরে ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ একটি সুন্দর শিলালিপি রয়েছে। কেউ বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় এটি হিন্দু দেবালয় ছিল। পরে ইসলাম বিজেতা কেউ এসে দেবালয়টিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন,

www.pathagar.com

চূড়ার কলসীটিই কোনো হিন্দু কারিগরের তৈরি। এ মসজিদটি ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় আজও কালের প্রহর গুনছে।

হর্ষি মসজিদ

পাকুন্দিয়া থানার সুখিয়া ইউনিয়নের হর্ষি গ্রামে এক গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন হর্ষি মসজিদের অবস্থান। প্রাচীন মসজিদের সম্প্রসারণ করায় মূল নির্মাণ শৈলীকে আড়াল করে ফেলেছে। মসজিদে একটি শিলালিপি রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১০৮০ হিজরি বা ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (১৯৭৮) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত মসজিদটিকে মসজিদ পাড়া গ্রামে অবস্থিত উল্লেখ করেছে। "মসজিদপাড়া মসজিদ" নামে পরিচিত করা হলেও আসলে তা হর্ষি মসজিদ, এগারসিন্দুর থেকে ৬.৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হর্ষি গ্রামে এর অবস্থান।

বর্গাকৃতির হর্ষি মসজিদের প্রত্যেক বাহু লম্বায় ২৯ ফুট। ৪ কোণায় অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। কেবলা প্রাচীরে আছে ৩টি মেহরাব। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় মেহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং চারদিকে লতাপাতার সুন্দর অলংকরণ রয়েছে। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আছে 'রজেট'-এর প্রতিকৃতি। কেন্দ্রীয় দরজার চতুর্দিকে লতাপাতা ও প্যানেলিং-এর কাজ এবং অন্য দরজার উপরিভাগ আয়তাকারের প্যানেলিং দ্বারা সুশোভিত। 'প্যারাপেট'-এর উপরিভাগে 'মারলন' দ্বারা অলংকৃত। মসজিদের কার্নিশগুলো আনুভূমিক।

মসজিদে একটি গম্বুজ রয়েছে এবং গম্বুজটি কিছুটা বাল্ব আকৃতির, উপরিভাগে চূড়া আছে এবং তা অলংকৃত, দেখতে অপূর্ব। মসজিদটিতে মোগল স্থাপত্যশৈলী সহজেই চোখে পড়ে।

গুড়ই মসজিদ

নিকলী থানার পশ্চিম সীমানায় গুড়ই গ্রামে এক গম্বুজ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রাচীন গুড়ই মসজিদের অবস্থান। "ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা" গ্রন্থে কটিয়াদী থানার গোরাই গ্রামে মসজিদটির অবস্থান বলা হয়েছে যা আদৌ ঠিক নয়। এই সুন্দর মসজিদটিতে মোগল আমলের স্থাপত্যরীতি ফুটে উঠেছে। গম্বুজের গোড়ায় একটি সুন্দর শিলালিপি আছে। এছাড়া নিচেও একটি সরু ও লম্বা শিলালিপি আছে। মসজিদটি ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শিলালিপিতে সুলতান বারবাক শাহ'র নাম উল্লেখ রয়েছে। গুড়ই মসজিদ বর্গাকারে নির্মিত। মূল দেয়ালের উচ্চতা ২২ ফুট এবং প্রত্যেক বাহু ভিতরের দিক থেকে ২৯-৭" এবং বাইরের দিক থেকে ৩৫ ফুট লম্বা। ৪ কোণে ৪টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট রয়েছে। যা উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে এবং তা রৌপ্য নির্মিত। মসজিদটির একটি বড় গম্বুজ রয়েছে যা বাল্ব আকৃতির। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে এবং পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। উক্ত ৩টি প্রবেশদ্বারের মধ্যে পূর্বের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারটি বড়। এই প্রবেশ পথটি ৭-৩" ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ও চওড়া ৪-৬" ইঞ্চি। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে একটি লম্বা ও সরু শিলালিপি আছে। আগে এটি মসজিদের ভিতরে ছিল জানা

www.pathagar.com

যায়। এছাড়া আরও একটি বিতর্কিত তথ্য স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায়, তা হলো এই শিলালিপির অপর পার্শ্বে কিছু খোদাই করা চিত্র ছিল যা মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। প্রবেশদ্বারগুলো খিলানের সাহায্যে পত্রাকারে নির্মিত ও উপরিভাগ খাঁজ কাটা। সামনের এবং উত্তর ও দক্ষিণের দেয়াল আয়তকার প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। দেয়াল ৫'-৫" করে প্রশস্ত।

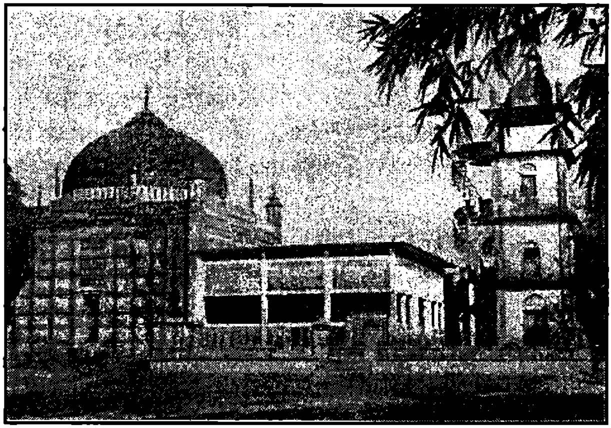

গুড়ই মসজিদ

পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। মাঝখানের মেহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মেহরাবে টেরাকোটার কাজ রয়েছে যা দৃষ্টিনন্দিত। এ কাজে সুলতানি আমলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মসজিদের জোড়া কার্নিশ ও প্যারাপেট সরল রেখায় নির্মিত। প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাটল্‌ম্যান্ট দ্বারা অলংকৃত। মসজিদটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে, পরিবর্ধিতও করা হয়েছে। মসজিদের ভিতরে সুন্দর কারুকাজ ছিল বলে জানা যায়, যা নতুন করে প্লাস্টার করার ফলে প্রাচীন নির্মাণ শৈলী এখন আর তেমন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও ভেতরে কিছু পদ্মফুলের নকশা করা কাজ রয়েছে যা প্রাচীন।

কুতুব শাহ্ মসজিদ

৫ গম্বুজ বিশিষ্ট কুতুব শাহ্ মসজিদটি অষ্টগ্রাম থানায় অবস্থিত। মসজিদটিতে এবং মসজিদের পাশে কুতুব শাহের মাজার ও আরও ৫টি মাজারে কোনো শিলালিপি বা তারিখ পাওয়া যায়নি। এর নির্মাণ শৈলী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এতে সুলতানি আমলের বৈশিষ্ট্য থাকলেও মোগল প্রভাবই বেশি। মসজিদটি ষোড়শ শতকের শেষার্ধে নির্মিত হয়েছিল। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ অঞ্চলে পাঠান সম্রাট শের শাহ্‌র রাজ্যভুক্ত হয়। পাঠান রাজত্বের শেষে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই অঞ্চলে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সুবেদার ইসলাম খানের আমলে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মোগল অধিকারের পরে যদি এ মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে তা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে হতে পারে না। আর ঈশা খাঁর আমলে যদি এ মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকে তবে তা

www.pathagar.com

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে হতে পারে। তবে ঈশা খাঁর আমলে নির্মিত হলে এতে মোগল প্রভাব থাকার কথা নয়। সঙ্গত কারণে ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত হয়েছিল।

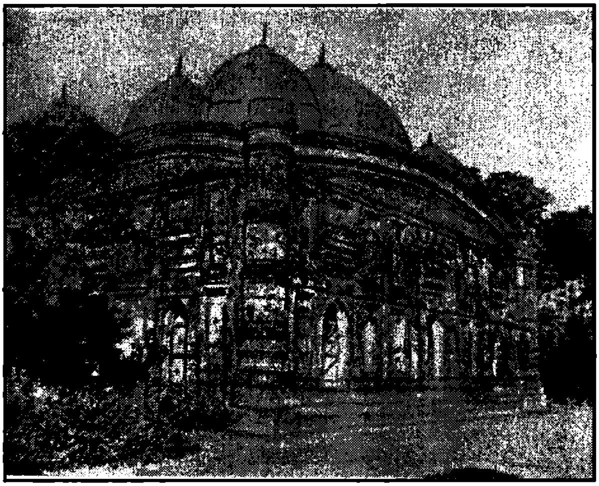

কুতুব শাহ্ মসজিদ

মসজিদে ৫টি গম্বুজ রয়েছে। এর ভিতর মাঝের গম্বুজটি বৃহৎ। মসজিদটি আয়তকার। বাইরের দিক থেকে দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট। চারকোণে ৪টি আট কোণাকার বুরুজ আছে। এগুলো মোল্ডিং দ্বারা শোভিত এবং চূড়া ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো মসজিদের কার্নিশগুলো বেশ বাঁকানো, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে প্রবেশদ্বার রয়েছে। পূর্বের ৩টি প্রবেশদ্বারের মধ্যে মাঝেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল প্রায় ৫ ফুট এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল প্রায় ৪.৫ ফুট প্রশস্ত। দেয়ালের বাইরের দিকে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলংকরণ ছিল, যার সামান্য নমুনা আজ অবশিষ্ট রয়েছে। পূর্বদিকের দেয়াল দু'সারি প্যানেল দ্বারা শোভিত। প্রবেশদ্বারগুলো অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ব্যতিক্রমধর্মী এই ৫ গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটি শীর্ণ অবস্থায় আজও টিকে আছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় ৫ গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ আর দ্বিতীয়টি নেই।

জাওয়ার সাহেব বাড়ি মসজিদ

তাড়াইল থানার জাওয়ার গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থান। কিশোরগঞ্জের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ। সুলতান হোসেন শাহ'র পুত্র গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ'র আমলে মসজিদটি নির্মিত। মূল শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ৯৪১ হিজরিতে (১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) রাহাতের পুত্র খান-ই-মোয়াজ্জম নূর খান মসজিদটি নির্মাণ করেন।

www.pathagar.com

জাওয়ার সাহেব বাড়ি মসজিদ

এই মসজিদ সম্পর্কে জনশ্রুতি হলো, দিল্লীর সম্রাট আকবর তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাহাত খানকে চিকিৎসায় কৃতিত্বের জন্য তাড়াইলের বর্তমান পরগনাটি দান করেছিলেন এবং রাহাত খান বর্তমান জাওয়ার গ্রামে পরগনার অধিপতিরূপে বসতি স্থাপন করেন। রাহাত খানের পুত্র, মতান্তরে পৌত্র নছরত খান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জাওয়ারের বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করেন। এছাড়া আরও একটি বিশ্লেষণ হলো, খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোচ বা হাজং বংশীয় কোনো উপজাতীয় সামন্ত রাজ পরিবার বর্তমান জাওয়ারে বসবাস করেছিলেন। পরে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে পূর্ব ময়মনসিংহে পাঠান ও মোঘলদের আধিপত্য বিস্তারের সময় রাহাত খান নামে জনৈক পাঠান সেনাপতি জাওয়ারের উক্ত উপজাতীয় সামন্ত নৃপতিকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে এখানে বসতি স্থাপন করেন।

মূল মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। "বরনী, সুতি, ফুলেশ্বরীর দেশ তাড়াইল" গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ আছে যে, চার শতাধিক বৎসর অতিক্রম হয়ে গেলেও আজও নূর খান ইবনে রাহাত খান মুয়াজ্জমের নির্মিত সুলতানি যুগের মসজিদের ভগ্নাবশেষ পূর্ব জাওয়ারে রয়েছে এবং এর পূর্ব দিকেই পুরনো যুগের বিরাট দিঘির স্মৃতি আজও দর্শক হৃদয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। মধ্য যুগের স্মৃতি বিজড়িত সে মসজিদ গাত্রে খোদিত দুটি কালো পাথরের খণ্ড ছিল। বর্তমানে এ দু'টি খণ্ড পশ্চিম জাওয়ারের জমিদার বাড়ি সংলগ্ন মসজিদের সম্মুখ প্রাচীরে সন্নিবেশিত আছে।

বাদশাহী মসজিদ

ইটনা থানা সদরের বড়হাটীতে ঐতিহাসিক বাদশাহী মসজিদের অবস্থান। স্থানীয়ভাবে "গায়েবি মসজিদ" নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন বড় মসজিদ। মসজিদটির শিলালিপি পাওয়া যায়নি। যতদূর জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেওয়ান পরিবারের মজলিশ দেলোয়ার খাঁ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত। মোগল শাসনামলে জয়নশাহী পরগনার সায়র জলকর মহালের প্রধান দেওয়ান মজলিশ দেলোয়ার খাঁ

www.pathagar.com

ইটনার দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঈশা খাঁর সমসাময়িক মজলিশ দেলোয়ারের পূর্ব পুরুষ পাঠান বংশীয় যোদ্ধা ছিলেন।

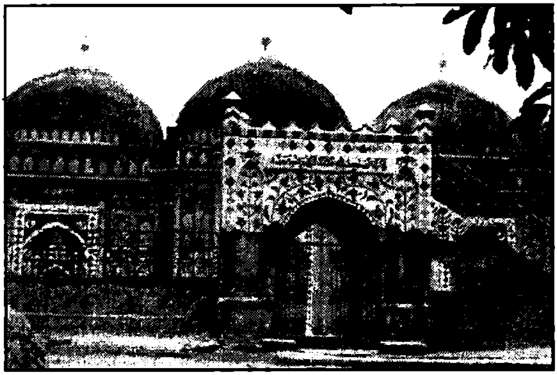

বাদশাহী মসজিদ

মসজিদটি বর্গাকৃতির এবং চারপাশ অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তিনটি বড় বড় গম্বুজ রয়েছে। এগুলো মোল্ডিং করানো। দেখতে অপূর্ব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। চার কোণের ৪টিসহ মোট ৮টি মিনার বা টারেট রয়েছে। এগুলো ছাদের উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে, তবে বড় গম্বুজের শীর্ষদেশের নিচে অবস্থান করছে।

মসজিদটির কার্নিশ ও প্যারাপেট সরলরেখায় নির্মিত। সুলতানি আমলের বৈশিষ্ট্যের মতো বাঁকানো নয়। মসজিদের সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। তিনটি সমান আকৃতির। দেয়ালগুলো প্রায় ৫ ফুটের মত প্রশস্ত এবং উচ্চতা প্রায় ৩২ ফুটের মতো। পশ্চিম দেয়ালে মেহরাব আছে যা সুন্দরভাবে অলংকৃত। বাইরের দেয়ালগুলো চমৎকারভাবে প্যানেলিং দ্বারা এবং প্যারাপেটের উপরিভাগ ব্যাটলমেন্ট দ্বারা শোভিত। মসজিদের সামনে ছোট মাঠ আছে, যা বাঁধানো এবং একটি কেন্দ্রীয় ফটক রয়েছে যা খিলানোর সাহায্যে নির্মিত।

এই বাদশাহী মসজিদ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি হলো, মসজিদটি নির্মাণের পর কোনো কারণে সেটি অনেক দিন পর্যন্ত অব্যবহৃত থাকে। ফলে ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ হয়ে মাটির নিচে তা চাপা পড়ে যায়। হঠাৎ কোনো একদিন গ্রামটির উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে যাবার ফলে জঙ্গলাবৃত মসজিদের গম্বুজের শীর্ষদেশ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর আশেপাশের লোকজন ঝোপঝাড় পরিষ্কার ও চারপাশের মাটি খুঁড়ে মসজিদটিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এ কারণে এটি 'গায়েবি মসজিদ' নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। আর একটি জনশ্রুতি হলো, মসজিদটি নির্মাণের পর জনৈক কোচ রাজার অত্যাচারে স্থানীয় মুসলমানেরা অন্যত্র সরে যায়। ফলে মসজিদটি অযত্ন অবহেলার মধ্যে পড়ে এবং এক সময় জঙ্গলে ঢেকে যায়। এই মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পাশে 'কোচরাজ হাটী' নামে একটি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এ অঞ্চল আবার মুসলমানদের অধিকারে আসে।

www.pathagar.com

জঙ্গলবাড়ি মসজিদ

ঈশা খাঁ'র স্মৃতিবিজড়িত জঙ্গলবাড়িতে, একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। শিলালিপি না থাকার কারণে নির্মাণ কাল জানা সম্ভব হয়নি। ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা'র বংশধরদের দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। মসজিদটি তিনটি বড় বড় গম্বুজ বিশিষ্ট। দেখতে অপূর্ব, দেয়াল অত্যন্ত প্রশস্ত, প্রায় ৪ ফুট। আয়তাকার এই মসজিদের ৪ কোণে ৪টি সুদৃশ্য মিনার বা টারেট আছে। টারেটগুলো দুইধাপে নির্মিত এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। এগুলোর উচ্চতা গম্বুজ তিনটির প্রায় সমান সমান। এছাড়া আরও ৪টি ছোট মিনার আছে। পশ্চিম দেয়ালে একটি মেহরাব আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা, পশ্চিম দেয়ালে ২টি জানালা এবং পূর্বের দেয়ালে ৩টি দরজা আছে। মূল প্রবেশদ্বার কিছুটা বড় ৭-৫" উচ্চতা ও ৪ ফুট চওড়া। ভিতরে ২টি বৃহৎ খিলান আছে যা পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালকে সংযুক্ত করেছে। বাইরের দিক থেকে মসজিদটি ১৮ ফুট প্রশস্ত ও ৪৪ ফুট দৈর্ঘ্য, মূল দেয়ালের উচ্চতা ১৫ ফুট। পূর্ব পাশে ১১-৩" প্রশস্ত খোলা বারান্দা রয়েছে।

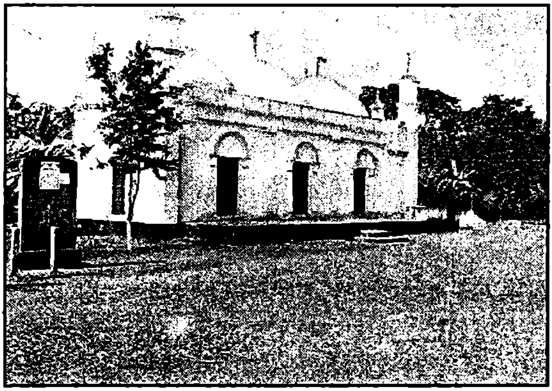

জঙ্গলবাড়ি মসজিদ

জঙ্গলবাড়িতে সত্যিকার অর্থে এই একটি কীর্তিই কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। তবে দেয়ালে নতুন করে প্লাস্টার করায় প্রাচীন আমেজ হারিয়ে গেছে, কেবল নয়নাভিরাম গম্বুজ তিনটি পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও রয়েছে প্রাচীন দরবার গৃহ ও ভগ্নপ্রায় দালানকোঠা বসতবাড়ি।

হয়বতনগর দেওয়ানবাড়ি মসজিদ

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন হয়বতনগরে একটি সুন্দর ঐতিহাসিক মসজিদ রয়েছে। জানা যায়, যে স্থানে বর্তমান মসজিদটি রয়েছে সেখানে পূর্বে একটি বৃহৎ তাজিয়া গৃহ ছিল। তাজিয়া গৃহটির নির্মাণকাল ছিল ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ। পরবর্তীকালে দেওয়ান শাহনেওয়াজ খাঁ এটি ভেঙে দেন এবং তাঁর পুত্র খোদা নেওয়াজ খাঁ ১২৬২ হিজরিতে (১৮৬৪ খ্রি.) সেখানে বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদে ২টি শিলালিপিও রয়েছে। মসজিদটিতে একটি গম্বুজ রয়েছে, তবে ৪ কোণায় ৪টিসহ ছোট বড় মোট ২২টি

www.pathagar.com

অষ্টকোণাকৃতির মিনার বা টারেট রয়েছে। এগুলো ছাদের উপরে উঠে গিয়ে ছোট গম্বুজবিশিষ্ট চূড়াতে শেষ হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। ২টি জানালাও আছে। বাইরের দেয়াল আয়তাকার প্যানেল দ্বারা শোভিত। পশ্চিম দেয়ালে একটি মেহরাব আছে, যা অলংকার দ্বারা শোভিত। মেহরাবটি দেয়াল ভেঙে পরে করা হয়েছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় পূর্ব পশ্চিমের দেয়াল দুটি সুদৃশ্য ও বৃহৎ আকারের খিলান দ্বারা সংযুক্ত। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৪৫-৮" ও প্রশস্তে ২৯-৯"। চারিপাশে ৪৫-৩" উত্তর-দক্ষিণমুখী এবং ৬৯-৫" পূর্ব-পশ্চিমমুখী অনুচ্চ প্রাচীর রয়েছে। এছাড়া ২২-৩" প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে, বারান্দার ছাদ পরে করা হয়েছে।

হয়বতনগর দেওয়ানবাড়ি মসজিদ

ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ি মসজিদ

বাজিতপুর থানার ভাগলপুরে ঈশা খাঁর উত্তরপুরুষদের দেওয়ানবাড়ি সংলগ্ন অষ্টাদশ শতকের নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। ঐ দেওয়ান পরিবারের দেওয়ান মোহাম্মদ গওছ খাঁ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত বলে জানা যায়। মসজিদটি আয়তাকার এবং চার কোণায় ৪টি মিনার বা টারেট রয়েছে। মিনারের শীর্ষদেশে রয়েছে ছোট্ট গম্বুজ। মসজিদটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।

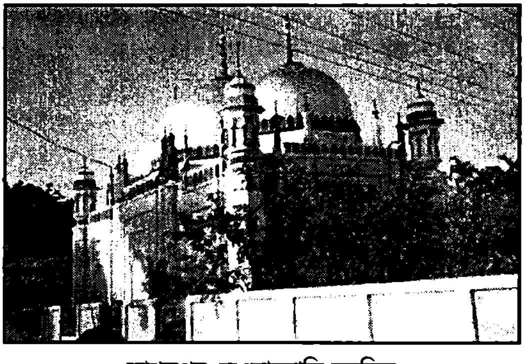

ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ি মসজিদ

www.pathagar.com

সেকান্দর নগর মসজিদ

তাড়াইল থানার ধলা ইউনিয়নের সেকান্দর নগর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে যা সেকান্দর নগর মসজিদ নামে সুপরিচিত। কোনো শিলালিপি নেই, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জান যায়। মসজিদটি দেখতে যেমন অপূর্ব সুন্দর তেমনি ঐতিহাসিক।

সেকান্দর নগর মসজিদ

পাগলা মসজিদ

কিশোরগঞ্জ শহরের পশ্চিমাংশে নরসুন্দা নদীর তীরে বিখ্যাত পাগলা নামে ঐতিহাসিক মসজিদটি অবস্থিত। তার সুউচ্চ মিনার বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। মূল মসজিদটি পূর্বের চেয়ে এখন অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। পাগলা মসজিদের নির্মাণকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। মসজিদটিকে নিয়ে অনেক জনশ্রুতি আছে। একটি জনশ্রুতি এরূপ : নরসুন্দা নদী একদা খুবই বেগবান ছিল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, নদীর প্রবল স্রোতধারার মধ্যেই মাদুরে আসন করে এক আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ ভেসে আসছেন। তাঁর আসন নদীর ঠিক মাঝখানে এসে স্থির হয়ে গেল। এভাবেই কেটে গেল ক'দিন। কিন্তু দেখা গেল ক'দিনেই স্থানটিতে ধীরে ধীরে একটি চড়া জেগে উঠেছে। সাধক ধ্যানেই মগ্ন। স্থানীয় জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে এসে এ অলৌকিক ব্যাপার দেখে বিস্মিত হয়। কিন্তু ভয়ে কেউ চড়ার পাশে যেতে সাহস পায় না। তার পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। নদীর পাশের রাখুয়াইল গ্রামের জনৈক গোয়ালার নতুন বিয়াতী গাভী দুধ দিচ্ছিল না। গোয়ালা শত চেষ্টা করেও গাভীটির বাঁট থেকে এক ফোঁটা দুধ বের করতে পারছে না। পরে একদিন গাভীর দিকে সারাক্ষণ নজর রেখে দেখা যায় যে, পাল থেকে হঠাৎ করে গাভীটি বিচ্ছিন্ন হয়ে নদী সাঁতরিয়ে সেই সাধকের চড়ায় উঠে এবং তাঁর পাশে রক্ষিত একটি পাত্রে বাঁটের সম্পূর্ণ দুধ ঢেলে দিয়ে পুনরায় নদী সাঁতরিয়ে পালে ফিরে আসে। একই ঘটনার কয়েকবার পুনরাবৃত্তি দেখে গোয়ালা নিশ্চিত যে, এ কামেল সাধক। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিনের মধ্যে গোয়ালার সংসারে অভাবনীয় উন্নতি হয়। গোয়ালার স্বচ্ছন্দের খবর জেনে

www.pathagar.com

রাখুয়াইলসহ আশেপাশে গোয়ালা, জেলে, তাঁতিরা এক এক করে এ সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাছাড়া অল্পদিনের মধ্যেই সাধকের গুণ-জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে উক্ত চড়ায় ভক্ত শিষ্যদের বদৌলতে সাধকের জন্য একটি হুজরাখানা তৈরি করা হয়। এ সাধকের প্রয়াণের পর তাঁর হুজরার পাশেই মরদেহ সমাহিত করা হয় এবং হুজরাখানার স্থানটিতেই পরবর্তী কালে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। উক্ত মসজিদই পরবর্তী কালে পাগলা সাধকের স্মৃতি হিসেবে "পাগলা মসজিদ" নামে খ্যাতি লাভ করে। উক্ত কাহিনি শুধুই জনশ্রুতি নির্ভর, ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

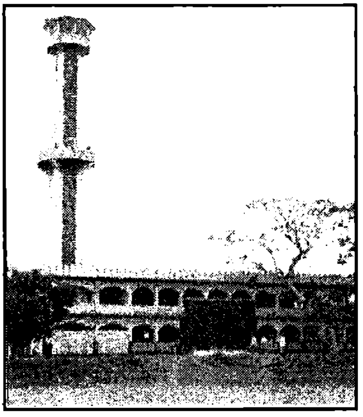

পাগলা মসজিদ

অন্যদিকে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট, স্থানীয় অধিবাসী ও সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা ও সূত্র থেকে যে তথ্য বা বিবরণ পাওয়া যায়, তা উল্লিখিত জনশ্রুতি ও নিবন্ধ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব ময়মনসিংহের বিস্তীর্ণ এলাকার মতো, পাগলা মসজিদটি যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকাও ছিল বৌদ্ধ, যোগী, নাথযোগী সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য বিশিষ্ট এলাকা। বিশেষ করে বর্তমান কাতিয়ারচর ও সগড়া জনপদগুলো ছিল নাথযোগী ও বিভিন্ন লোকধর্মের ধর্মীয় প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। বিগত শতকে উল্লিখিত জনপদগুলো থেকে 'হাড়মালা', 'মধ্যযুগ', 'যুগমালা' ও 'যুগধর্ম রহস্য' ইত্যাদি নামের হস্তলিখিত বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়েছিল। (পাণ্ডুলিপিগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়)।

পাগলা মসজিদে দুধ ও শিরনি দেওয়া বহুল প্রচলিত। বর্তমান সুরম্য ও সুশোভিত পাগলা মসজিদটি যে স্থানে অবস্থিত সেখানে মাত্র কয়েক যুগ আগেও ছিল একটি টিনের চৌচালা ঘর। তার পশ্চিম উত্তর পাশ কতটুকু জায়গার উপর ছিল পাথরের টুকরাকৃতি তিন চারটি ইট। আর ঘরটির সামনেই একটি উঁচু টিলার উপর ছিল একটি চার পাঁচ হাত দীর্ঘ পাথর। আনুমানিক চার হাত বেড়ে এ চৌকা পাথরটির মাঝ অংশ ছিল খাঁজকাটা। উল্লেখ্য, এরূপ একটি পাথর জঙ্গলবাড়ির পরিখার মধ্যেও পাওয়া গিয়েছিল। যা হোক উক্ত খাঁজকাটা পাথর ও ইটগুলিকে নিয়ে এক সময় নানা কিংবদন্তির প্রচলন ছিল এবং পাথর ও ইটকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হতো। কুমারীরা উপযুক্ত বর কামনায় ও নারীরা সন্তান কামনায় পাথরটির

www.pathagar.com

খাঁজে উপাচারসহ সিঁদুর রঞ্জিত করত। কখনো পাথরের গা থেকে কিছু সিঁদুর গ্রহণও করত। কেউ কেউ মামলা মোকদ্দমা বা কারও ক্ষতির কামনায় ইটগুলো উল্টে দিত। সিঁদুর রঞ্জিত সে খাঁজকাটা পাথর ও ইটগুলো কিশোরগঞ্জে আজ যাঁরা প্রবীণ তাঁরা অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন। এই খাঁজকাটা পাথরে দুধ ঢেলে মানত করাও বহুল প্রচলিত ছিল। অবশ্য সে পাথর ও ইটগুলো এখন আর নেই। এগুলো মসজিদ তথা মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। সে থেকে এমনটি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে যে, পাগলা মসজিদ স্থাপনের পূর্বে সেখানে নাথযোগীদের সাধন পাঠ থাকতে পারে। অন্যদিকে, পাগলা মসজিদের জায়গা জমি স্থানীয় হয়বতনগর জমিদার বাড়ির নিজস্ব ভূমি। যা থেকে নির্মিত জমিদারের পাগলা মসজিদ কিশোরগঞ্জের অত্যন্ত আকর্ষণীয় মসজিদ। বর্তমান ইমারতটি অপূর্ব, বিশেষ করে সুউচ্চ মিনার অনেক দূর থেকে দৃষ্টি নন্দন, তার নির্মাণশৈলী সুন্দর। বর্তমানে মসজিদটি বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। পাগলা মসজিদের প্রাচীন কাগজপত্রে এ জায়গাটি স্থানীয় জমিদার হয়বতনগর এর জিলকদর মতান্তরে জিলকরণ নামক এ পাগলা দেওয়ান সাহেবের দানকৃত ভূমি বলে জানা যায়। খুব সম্ভবত এই পাগলা দেওয়ান সাহেবের জায়গা জমিতে নির্মিত বলে মসজিদটি 'পাগলা মসজিদ' নামে পরিচিত।

কবি চন্দ্রাবতীর শিব মন্দির

কিশোরগঞ্জ সদর থানাধীন মাইজখাপন ইউনিয়নের কাচারীপাড়া গ্রামে কবি চন্দ্রাবতীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শিবমন্দিরটির অবস্থান। পুরাকীর্তির দিক থেকে তথা কিশোরগঞ্জের দর্শনীয় নিদর্শনের মধ্যে যে নামগুলো প্রথমেই আসে তার মধ্যে কবি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির অন্যতম সেরা আকর্ষণ। 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ', 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা' প্রভৃতি গ্রন্থেও গেজিটিয়ার সমূহে একে 'পাতোয়াইর মন্দির' নামে অবহিত করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে মন্দিরটি পাতোয়াইর গ্রামে অবস্থিত। তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ পাতুয়াইর/পাতোয়াইর গ্রামটি কিশোরগঞ্জ সদর থানায় নয়, পার্শ্ববর্তী করিমগঞ্জ থানার কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের অন্তর্গত। ঐ পাতোয়াইর গ্রামের পশ্চিমে আছে 'মজুমদার পাড়া' গ্রাম এবং তার পরে কাচারীপাড়া গ্রাম। এই কাচারীপাড়া গ্রামেই উক্ত মন্দিরের অবস্থান। এই কাচারীপাড়া গ্রামও নতুন নয়, অতি প্রাচীন, একদা ঢাকার নবাবদের কাচারি ছিল বা তৎপূর্বেকার জমিদারদেরও কাচারি এখানে ছিল বলে জানা যায়। এখনো ঐ গ্রামে তহশিল অফিস রয়েছে। অর্থাৎ তহশিল অফিসকে ও স্থানীয় ভাষায় কাচারি বলা হয়।

নীলগঞ্জ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী কাচারীপাড়া গ্রামের এ মন্দিরটি চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির হিসেবেই সুপরিচিত। ষোড়শ শতকের মনসা মঙ্গলের বিখ্যাত কবি দ্বিজ বংশীদাশের কন্যা ও বঙ্গের আদি মহিলা কবিরূপে খ্যাত চন্দ্রাবতী পূজিত ও বহু কাহিনি সম্পৃক্ত এ মন্দিরটি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। নয়ান ঘোষ প্রণীত পালাগান 'চন্দ্রাবতী' থেকে অনেক কথা জানা যায়। চন্দ্রাবতীর সাথে বিবাহের কথা ছিল ছোটবেলার সাথী ও প্রেমিক জয়ানন্দের। কিন্তু জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হন। চন্দ্রাবতীর হৃদয় ভেঙে যায়। পিতা দ্বিজ বংশীদাস (ভট্টাচার্য) এর কাছে চন্দ্রাবতী দুটি প্রার্থনা করেন। এক ফুলেশ্বরী নদীর তীরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যটি চিরকুমারী থাকার ইচ্ছা।

www.pathagar.com

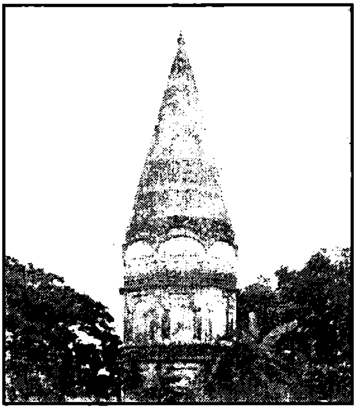

কবি চন্দ্রাবতীর শিব মন্দির

'চন্দ্রাবতী' পালায় তার বর্ণনা উল্লেখ আছে :

"অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।।"

মন্দিরটি অষ্টকোণাকৃতির। উচ্চতা ১১ মিটার (৩২)। আটটি কোণার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১.৭ মিটার (৫-২")। নীচের ধাপে একটি কক্ষ ও কক্ষে যাবার জন্য একটি দরজা রয়েছে। ভিতরে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিচের সরলরেখায় নির্মিত অংশটি ২টি ধাপে নির্মিত। নিচের ধাপের চারিদিকে প্রায় অর্ধ বৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রশস্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। নিচের ধাপে কার্নিশ পর্যন্ত উচ্চতা ২.৭০ মিটার। কক্ষের ভিতরে ৭টি জানালা সাদৃশ্য কুলুঙ্গি রয়েছে যার প্রস্থ ৫২ সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘ্য ৯৯ সে. মি.। কিছু কারুকাজ আছে। কক্ষের ব্যাস, ২.৩৫ মিটার বা ৭-৮" ইঞ্চি। কার্নিশ বরাবর অনুচ্চ ছাদ রয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপটিও সরলরেখায় নির্মিত। এই পর্যায়েও অর্ধবৃত্তাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রশস্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। কুলুঙ্গির ভিতরে একদা পোড়ামাটির অসংখ্য চিত্র ফলকের অলঙ্করণ ছিল যা আজ অবশিষ্ট নেই। দ্বিতীয় ধাপ থেকে এটি ক্রমশ সরু হয়ে সূক্ষ্মাগ্র চূড়ায় শেষ হয়েছে। চূড়ার শেষ প্রান্তদেশে খাঁজকাটা কারুকাজ আছে এবং কলসাকৃতি চূড়ার শীর্ষদেশে আছে সরু ডাঁটার আকারে নির্মিত 'ফাইনিয়েল'।

চন্দ্রাবতীর শিবমন্দিরের মাত্র কয়েকগজ পশ্চিমে আরও একটি শিব মন্দির রয়েছে। এটিও অষ্টকোণাকৃতির। কেউ কেউ এই দুটি মন্দির একসাথে আলোচনা করে বিভ্রান্তির অবতারণা করেছেন। এটি চন্দ্রাবতীর মন্দিরের চেয়ে আরও উঁচু। পার্থক্য হলো, এই মন্দিরের নিচের সরল রেখার নির্মিত অংশটি ৩ ধাপে নির্মিত এবং প্রত্যেক ধাপের শেষে বা কার্নিশে মনসার আকৃতি রয়েছে। নিচের ধাপে একটি কক্ষ আছে। প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে খাঁজ কাটা আছে। এরূপ খাঁজ অন্যান্য অংশের দ্বিতীয় ধাপেও দেখা যায়। মন্দিরের আটটি কোণার নিচের ধাপের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ১.৭৭ মিটার (৫-১০")। প্রত্যেক ধাপের চারদিকে প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রশস্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। শেষ ধাপটি প্রায় অর্ধবৃত্তকারে খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়ে

www.pathagar.com

ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে। শীর্ষপ্রান্তে খাঁজকাটা কারুকাজ রয়েছে এবং কলসিকৃতির চূড়ার উপরে আছে একটি ত্রিশূল। পূর্বে এটিও ভগ্ন অবস্থায় ছিল, বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সংস্কার করেছে। আর বিভিন্ন ধাপের কুলুঙ্গিগুলোতে যে অলংকরণের কাজ ছিল, তা আর এখন নেই।

মঠখলা কালীমন্দির

শাক্ত ধর্মে বিখ্যাত পীঠ হিসেবে এক সময় এগারসিন্দুর এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি কালীপীঠ তৈরি হয়েছিল এবং সে পীঠটিকে কেন্দ্র করে তৎকালে এতদঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শাক্ত ধর্মের বিশেষ প্রভাব সূচিত হয়েছিল। এই প্রভাব সূচিত হবার পেছনে ছিল পীঠে প্রতিষ্ঠিত জনশ্রুতিমূলক কালী বিগ্রহটি। বিগ্রহটির অলৌকিকত্ব সম্পর্কে অনেকগুলো জনশ্রুতি প্রচলিত। এর মধ্যে একটি হলো, স্থানীয় এলাকার জনৈক জেলে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মপুত্রের গভীর খাদ থেকে বিগ্রহটি উদ্ধার করেছিলেন।

মঠখলা কালীমন্দির

পীঠটি স্থাপনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে চারিপাড়ার রাজা নবরঙ্গ রায়ের অধস্তন ও শাক্তধর্মে দীক্ষিত জনৈক ভূস্বামী বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে বিগ্রহটি এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়েই মঠের খলা থেকে স্থানটি 'মঠখলা' নামে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মন্দিরটিতে ধর্মের বিভিন্ন আচার ছাড়াও প্রতি বছর জন্মাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান উপলক্ষে মেলা বসে। মেলাটি দু'দিন স্থায়ী হয়। পূর্বে স্থায়ী হতো পনের দিন।

মন্দিরের চূড়াটি বেশ দীর্ঘ। নির্মাণ শৈলী বেশ পুরনো। মন্দিরের এক অংশ গোড়ীয় রীতিতে দোচালা প্যাটার্নে তৈরি। প্রাচীন এ মন্দিরটি মিশ্র স্থাপত্য শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নির্দশন।

অধিকারীর মঠ

পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দুরে বিখ্যাত বেবুদ রাজার দিঘির সামান্য পশ্চিমেই 'অধিকারীর মঠ'। কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন দেব-দেউলের মধ্যে এ মঠ বা মন্দিরটি স্থাপত্যকলা ও প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উঁচু ভিটা ও দক্ষিণ দুয়ারী এ মন্দিরটির দুদিকে

www.pathagar.com

দু'টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। বটবৃক্ষে ঘেরা এ জীর্ণ মন্দিরটি বানিয়া গ্রামের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারের পূর্বপুরুষ জনৈক সাধক কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এক সময় সম্পূর্ণ মন্দিরটিই ছিল টেরাকোটায় সজ্জিত এবং এর ইটগুলোও ছিল খোদাই করা। ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠটি আজ শুধু তার পূর্বস্মৃতিই বহন করছে।

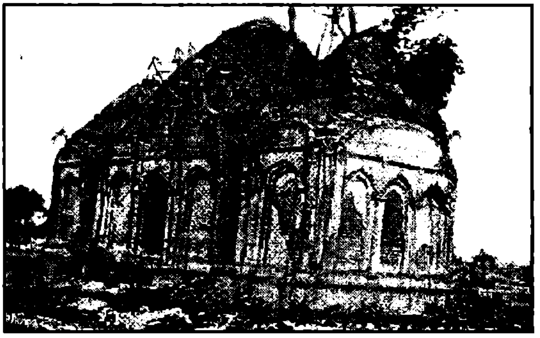

অধিকারীর মঠ

ভোগবেতাল গোপীনাথ জিওর মন্দির

কটিয়াদী থানার আচমিতা ইউনিয়নের ভোগবেতালে বিখ্যাত গোপীনাথ জিওর মন্দিরটি অবস্থিত। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত এটি একটি পুরনো দেবদেউল। প্রাচীন স্থাপত্যরীতি ধারায় দেশি ছনের চৌচালা ঘরের প্যাটার্নে তৈরি দেউলটির জীর্ণ প্রাচীরে একটি শিলালিপি রয়েছে। তবে এর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। অনেকেই বলেন, চারিপাড়ার সামন্তরাজ নবরঙ্গ রায় কর্তৃক মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় যে, নবরঙ্গ রায়ের আনুমানিক কাল ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে। সে সময়ে এ অঞ্চলে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হবারই কথা। অনুমিত হয়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নবরঙ্গ রায়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় অর্ধমাইল এলাকা ছিল এর চৌহদ্দি। এই চৌহদ্দির ভিতর মূল মন্দিরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল দোলমঞ্চ, অতিথিশালা, সেবালয়, নাট্যমন্দির, কৃত্রিম পাহাড় ও পুষ্পোদ্যান। আজ জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় মূল মন্দিরটি ছাড়া আর সবই কালের চক্রে ভগ্নদশায় শুধু স্মৃতি হয়ে আছে।

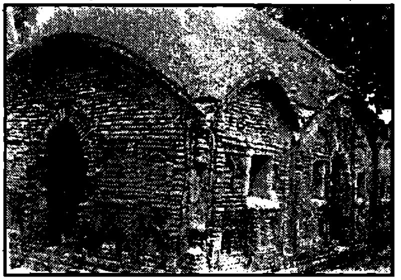

ভোগবেতাল গোপীনাথ জিওর মন্দির

www.pathagar.com

বিগত ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মূল মন্দিরটি বারান্দাসহ কয়েকটি স্থান ধ্বসে হয়ে গেলে পরবর্তী বছর নাটমন্দিরের পূর্বাংশে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করে মূল বিগ্রহ সেখানে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এ মন্দিরে কাঠের তৈরি তিনটি বিগ্রহসহ বেশ কিছু সংখ্যক পিতলের মূর্তি রয়েছে। শোনা যায়, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আদি কষ্টি পাথরের তৈরি বিরাট বিগ্রহটি দেশ বিভাগের পর এর উত্তরাধিকারীরা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। মন্দির এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে অনেক 'লাখেরাজ' জমি ছিল বলেও জানা যায়।

জ্ঞানদাসুন্দরী সতীদাহ মঠ

এক সময়ের ঘৃণিত সামাজিক প্রথার বলি ছিল সদ্য বিধবাগণ, যাদের মৃত স্বামীর সাথে একই চিতায় সহমরণে পুড়ে মরতে হতো। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় (১৮২৯) এ প্রথা আইনের চোখে নিষিদ্ধ হবার আগে এর প্রচলন বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক স্থানের মতো কিশোরগঞ্জেও ছিল। তার করুণ স্মৃতি আজ বর্তমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুলিয়ারচর-কালিকাপ্রসাদের মাঝামাঝি ছ'জন সহমৃতার স্মৃতি নিয়ে একটি গ্রাম 'ছয়সুতী', তাড়াইলের 'সতীরগাঁও', বাজিতপুরের হিলোচিয়ায় 'সতীর খাল', 'সতীর ভিটা', জঙ্গলবাড়ির পূর্বপার্শ্বে নরসুন্দার তীরের গোড়াঘাট ও করিমগঞ্জ থানার গুজাদিয়া ইউনিয়নের বিখ্যাত জ্ঞানদাসুন্দরী সতীদাহ মঠ নামে খ্যাত পরিচিত। বাংলা ১২৩৪ সনের ২৬শে বৈশাখ গুজাদিয়া বিখ্যাত তালুকদার বাড়ির একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী শ্রীমতি জ্ঞানদাসুন্দরীকে সাথে নিয়ে একই চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। সহমৃতা মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে পুত্র গয়ারাম চক্রবর্তী পরে চিতাস্থানে তৈরি করেছিলেন এই জ্ঞানদাসুন্দরী সহমরণ মঠ। মঠটি আজও কিশোরগঞ্জে 'সতীদাহ প্রথার' স্মৃতি বহন করে চলেছে এই ঐতিহাসিক স্থাপনার মাধ্যমে। তিনটি ধাপে নির্মিত মঠটির নিচের ধাপে একটি কক্ষ রয়েছে। প্রথম দুটি ধাপ সরলরেখায় নির্মিত এবং দ্বিতীয় শীর্ষদেশে পদ্ম ডাঁটার আকারে নির্মিত 'ফাইনিয়েল' রয়েছে। যে বাড়িতে জ্ঞানদাসুন্দরী থাকতেন সে বাড়িটি আজও ভগ্নদশায় একটি মন্দিরসহ কোনোরকমে টিকে আছে।

জ্ঞানদাসুন্দরী সতীদাহ মঠ

www.pathagar.com

পাগল শঙ্করের আখড়া

বাজিতপুর সদর থেকে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দিলালপুর বড় রাস্তার পার্শ্বে একটি পুরনো আখড়া ও আখড়ায় তিনটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। তাছাড়া মন্দিরের দক্ষিণাংশে একটি পুকুর, পুকুর সংলগ্ন মঠ ও বেদীর ভগ্নাবশেষও বিদ্যমান। আনুমানিক চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত মূল মন্দিরটি এক শিখরযুক্ত চৌচালা প্যাটার্নে তৈরি। জীর্ণ এ মন্দিরটিতে বর্তমান সমাধি আকারে এ আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা সাধক "পাগল শংকরের সমাধি"। এছাড়া তার পাশেই পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি দীর্ঘ শিখড়যুক্ত মন্দির বিদ্যমান। এ মন্দিরটিতে বর্তমানে কৃষ্ণবল রামের দু'টি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির পূর্বাংশে বৌদ্ধ সংঙ্ঘারামের অনুকরণে তৈরি অনেকগুলো প্রকোষ্ঠযুক্ত একটি ত্রিতল অট্টালিকা বর্তমান।

আখড়াটি খুব সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নিম্নবঙ্গে প্রচারিত বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় 'আগল শংকর' সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে 'পাগল শংকর' এই ব্যক্তি বিশেষের নামে পরিচিত হয়েছে।

দিল্লীর আখড়া

বিথঙ্গলের 'রামকৃষ্ণ গোসাই'র মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়ার মধ্যে মিটামইনের 'দিল্লীর আখড়া'টি বিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক। হাওর এলাকায় অন্যতম সেরা আকর্ষণ এই আখড়াটি। নদীতীরে হিজল গাছের সারি, প্রাচীন দেয়াল ও অট্টালিকা, ভিতরে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ যে কোনো পথিককে কাছে টানবে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্মিত উক্ত আখড়া ও আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা সাধক নারায়ণ গোস্বামীকে নিয়ে স্থানীয় এলাকায় প্রচুর জনশ্রুতি রয়েছে।

জনশ্রুতি রয়েছে যে, বর্তমান মন্দির এলাকাটির পাশেই একটি বৃক্ষের নিচে নারায়ণ গোস্বামীর আস্তানা ছিল। আস্তানার পাশ নিয়ে বহমান নদীতে একবার দিল্লীর সম্রাট প্রেরিত একটি কোষা মালামালসহ ডুবে যায়। আরোহীরা অনেক চেষ্টার পরও কোষাটি উঠাতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং একজন সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। আস্তানা থেকে গোস্বামী এ সংবাদ পেয়ে ঐশী ক্ষমতা বলে মালামালসহ কোষাটি উঠিয়ে দেন এবং সর্পাঘাতে নিহত ব্যক্তিকেও বাঁচিয়ে দেন। পরে দিল্লীর সম্রাটের কাছে সংবাদটি পৌঁছানোর পর সম্রাট বর্তমান কাটখালের বিরাট এলাকা সাধক নারায়ণ গোস্বামীর নামে লাখেরাজ দিয়ে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করে দেন। সে থেকে আখড়াটি 'দিল্লীর আখড়া' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। আখড়া প্রায় তিনশত একর ভূমি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

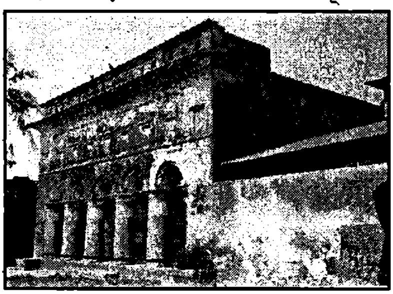

দিল্লীর আখড়া

www.pathagar.com

লাল গোসাইর আখড়া

নিকলী সদর থেকে সামান্য দূরে মহরকোণা গ্রামে লাল গোসাই'র আখড়া রয়েছে। আখড়াটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। লাল গোসাই'র স্মৃতিসৌধ রয়েছে। আখড়ায় এখনো প্রাচীন আমলের কাঠের ফ্রেমে তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি অযত্নে পড়ে আছে। একদা আখড়া ও মন্দিরটি খুব আকর্ষণীয় ছিল এবং দেয়ালগাত্রে অসংখ্য মিথুনের কারুকাজ ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় অনুসন্ধান, ভগ্নপ্রায় আখড়ার নির্মাণশৈলী ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয় (যেমন--সাইটধার আখড়া) ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে অনুমিত হয় যে, বিখ্যাত বিথঙ্গলের শিষ্য লাল গোসাই'র এই আখড়াটি প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন স্থাপনা।

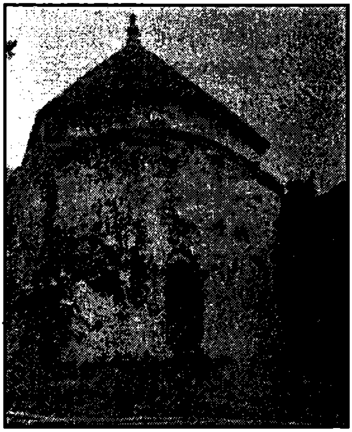

লাল গোসাই'র আখড়া

নারায়ণ গোসাই'র আখড়া

নিকলী থানার গুড়ই ইউনিয়নে বিখ্যাত নারায়ণ গোসাই'র আখড়াটি অবস্থিত, এটি ছেত্রার আখড়া নামে সুপরিচিত। এখানে আজও কালের সাক্ষী হয়ে বিরাট শিখড় চূড়া বিশিষ্ট ভোগমন্দির রয়েছে। মন্দিরটি অষ্টকোণাকৃতির। মোট ৩টি ধাপ রয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপ থেকে ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠেছে। নিচের ধাপের প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্য ৫-৮" ইঞ্চি। দুটো দরোজা রয়েছে। বিখ্যাত বিথঙ্গলের শিষ্য, নারায়ণ গোসাই, মতান্তরে নারায়ণ গোস্বামীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই আখড়ার সাথে, তাঁর সমাধি রয়েছে এখানে। তাঁর সমাধির পাশেই রয়েছে বিষ্ণুদাস গোসাই, মতান্তরে গোস্বামীর সমাধি। প্রায় ৩.৫ একরের মতো জমি নিয়ে বিস্তৃত এই আখড়ায় এখনো একটি পুরনো দেয়াল টিকে আছে। তাছাড়া ঘরের ভিত্তিভূমির অবশিষ্টাংশ এখনো বর্তমান। চারিদিকে দেয়াল, কোঠা প্রবেশ তোরণ ছিল, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে একদা যে এই আখড়া অত্যন্ত জমজমাট ছিল তা বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া পরিবেশ থেকে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানের মারফত জানা যায়। এককালে এই আখড়ায় ছিল বিরাট ইমারত দালানকোঠায় পরিপূর্ণ। আজ তার অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

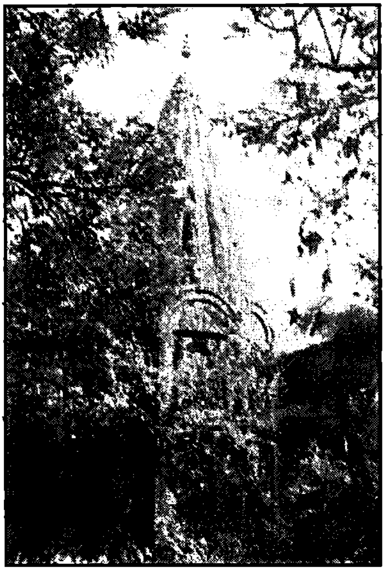

নারায়ণ গোসাই'র আখড়া

চন্দ্রনাথ গোসাই'র আখড়া

নিকলী থানা সদরে সাইটধার নামক এলাকায় কিশোরগঞ্জ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন এবং আয়তনে দীর্ঘ মঠের উচ্চতায় এ আখড়াটি বিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক স্থাপনা। এটি নাথ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় আখড়া। এ আখড়া থেকে নাথ ধর্মের বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ হাড়মালার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। যা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। এ আখড়াটি বিখ্যাত সাধক চন্দ্রনাথ গোসাই'র নামে খ্যাত এবং পরিচিত। এ আখড়ায় প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের বহু যুগল দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে।

চন্দ্রনাথ গোসাই'র আখড়া

www.pathagar.com

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

কিশোরগঞ্জের রয়েছে বিশাল রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস। বিশেষ করে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা বীর ঈশা খাঁর বিদ্রোহ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীর ভূমিকা এক গৌরবের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানি কারাগারে নীত হন। সেই সময়ে এই মহান নেতার অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জের কৃতীপুরুষ, প্রথম বাংলাদেশ সরকারের তখনকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের বিচক্ষণ ভূমিকা বিশ্ববাসীসহ এদেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার এ.টি.এম. হায়দারসহ অগণিত শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে কিশোরগঞ্জের অবদান অবশ্যই অগ্রগণ্য ও অনস্বীকার্য। স্বাধীন বাংলার প্রথম খেতাবপ্রাপ্ত বীর নারী মুক্তিযোদ্ধা কিশোরগঞ্জের কৃতী কন্যা ডা. সিতারা বেগমের অবদান কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীকে দান করেছে বীরত্বের গৌরব এবং অতিরিক্ত অহংকার। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের মানুষের অবদান অবিস্মরণীয়।

কিশোরগঞ্জ ছিল অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য অঞ্চল। এখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন সমুদ্রসম বিশালতায় ব্যাপৃত তেমনি রাজনীতির ইতিহাসও বিরাট বৈভব ও দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ। কিশোরগঞ্জের রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশাল ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করাও দুরূহ। নিম্নে স্বল্প পরিসরে রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি নাম পরিচয় তুলে ধরা হলো :

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়

শ্যামাচরণ রায় ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত মাসিক ১৪ টাকা বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় ইতিহাসে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তৎকালীন ভারত বর্ষের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ডোনেলী পদক' লাভ করেন। বি.এ. পাশ করে প্রথমে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী নামক ইংরেজি হাইস্কুলে এবং পরে পোগোজ নামক স্কুলে সহকারী শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে শিক্ষকতা কাজে ইস্তফা দিয়ে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওকালতি পাশ করে ময়মনসিংহ কোর্টে যোগ দেন।

তিনি সুদীর্ঘকাল ময়মনসিংহ বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও পরবর্তীকালে সভাপতি এবং পরে যোগ দেন যুগান্তর দলে। অল্প দিনেই হয়ে ওঠেন কর্মী থেকে একজন বড় মাপের নেতা। শ্যামাচরণ রায় রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী এবং 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। তিনি এক সময়ে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হিসেবে শহর পরিশোধিত পানীয় জলকল স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের সিটি কলেজিয়েট স্কুল, আনন্দমোহন কলেজ, বিদ্যাময়ী স্কুল, মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাকে "রায়বাহাদুর" উপাধী ও খেতাবে ভূষিত করেন। সেই থেকে রাজনীতির এই মহান পুরুষ "রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়" নামে পরিচিত। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই ময়মনসিংহ শহরে দেহত্যাগ করলেও কিশোরগঞ্জবাসী আজও তাকে স্মরণ করে।

আনন্দমোহন বসু

আনন্দমোহন বসু বাংলার প্রথম র‍্যাংলার ও একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি একজন ব্রিটিশ বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী নেতা হিসেবেও সকলের নিকট সমাদৃত। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

আনন্দমোহন বসু

অবিভক্ত ভারতে স্বদেশপ্রীতি জাগানোর উদ্দেশ্যে তিনিই প্রথম গঠন করেন 'স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গঠন করেন 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অবিভক্ত ভারতে শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, সিনেট সদস্য এবং শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। ভারতীয় নারী জাগরণের অগ্রদূত, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং উপমহাদেশের শিক্ষা প্রসারে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। ময়মনসিংহ শহরে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আনন্দমোহন কলেজ।

চন্দ্রমোহন বিশ্বাস

চন্দ্রমোহন বিশ্বাস কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে লেখাপড়ার পর ময়মনসিংহ জেলা শহরে চলে আসেন। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের স্বদেশী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। একজন আদর্শ নেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি জেলার সর্বত্র প্রায় কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের প্রখ্যাত

www.pathagar.com

নেতা কালীকিশোর বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা অন্নদা সুন্দরীর সাথে ব্রাহ্ম ধর্মমতে বিয়ে করেন। তিনি তাঁর পাঁচ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে সাম্যবাদী রাজনীতি ও ব্রাহ্ম ধর্মমতে সমাজসেবায় আদর্শ কর্মীরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

ময়মনসিংহ শহরে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিলে তৎকালীন মুক্তাগাছার জমিদার জগৎ কিশোর আচার্য চৌধুরীর বংশের কন্যা 'বিদ্যাময়ী দেবীর' নামকরণে এ স্কুলের নামকরণ হয় 'বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়'। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রমোহন বিশ্বাস ময়মনসিংহ শহরে প্রাণ ত্যাগ করেন। বিপ্লবী চন্দ্রমোহন বিশ্বাস রাজনীতির পাশাপাশি বৃহত্তর ময়মনসিংহে ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

চন্দ্রকিশোর কর রায়বাহাদুর

চন্দ্রকিশোর কর রায়বাহাদুর ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে কুলিয়ারচর উপজেলার রামদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামদি অঞ্চলের জমিদার। জমিদার হয়েও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর বাজিতপুর পৌরসভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বাজিতপুর দেওয়ানি আদালতে একজন তুখোড় আইনজীবী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব অবদানের জন্য ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

আনন্দকিশোর মজুমদার

আনন্দকিশোর মজুমদার ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হন। তিনি নিজে ময়মনসিংহ শহরে 'সাধনা সমাজ' নামে একটি দল গঠন করেন, যা ব্রিটিশ সরকার বেআইনি ঘোষণা করে। আনন্দকিশোর একজন সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ–নিকলী–বাজিতপুর–আঠারবাড়ি–ঈশ্বরগঞ্জ–সিলেট–কুমিল্লাসহ বিভিন্ন স্থানে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। ময়মনসিংহ ও কলকাতায় গুপ্তচরবৃত্তি এবং থানার দারোগাদের হত্যা ও নিধন করে ধনীদের সম্পদ লুণ্ঠন করে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের দায়ে তাকে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেফতার করে। পরে মুক্তিলাভের পর পুনরায় ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে ধরা পড়ে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বহরমপুর জেলে আটক থাকেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময় রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নরেশ চন্দ্র চৌধুরী

নরেশ চন্দ্র চৌধুরী ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাজিতপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাজিতপুর অঞ্চলে যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে যোগদান করেন। ময়মনসিংহ শহরে স্বরাজ দল গঠনের সময় তিনি গ্রেফতার হন। কারারুদ্ধ অবস্থায় রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। নরেশ বাহিনী নামে তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। এ দলের অনেক নেতা ও কর্মী বাজিতপুরে সক্রিয় ছিল।

www.pathagar.com

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। গ্রামের নাম কাপাসাটিয়া, থানা-কুলিয়ারচর। তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সে সময়ে সাধারণ চাষা-জেলে-কুমার-নিম্নবর্ণের মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের অন্ন-জল গ্রহণ করতেন। কোনো সামাজিক বন্ধন তাঁকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। সকল মানুষ সমান, সব মানুষের ন্যায় অধিকার পাওয়া কারও দয়ার বিষয় নয়। প্রয়োজনে লড়াই করে অধিকার আদায় করতে হবে, এই ব্রতকে সামনে নিয়ে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। ছাত্র জীবনেই ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী দল অনুশীলন পার্টিতে যোগ দেন এবং পরে পার্টির সম্পাদক পদে দায়িত্বপালন করেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তার হয়ে ওঠেনি। ১৯০৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হন। কুলিয়ারচর কাপাসাটিয়া গ্রামে যেখানে মহারাজের জন্ম হয় সেটি তার মাতুল বাড়ি। পৈতৃক পূর্ব পুরুষের নিবাস ছিল নরসিংদী জেলা সদরে। তিনি প্রথমে নরসিংদী সাইডের পাড়া প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করে কুলিয়ারচর চলে আসেন। ১৯১২ সালে, ১৯১৪ সালে এবং ১৯২৭ সালে রাজনৈতিক কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৯ সালে, ১৯৩০ সালে ও ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি বারবার গ্রেফতার হন। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে 'পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি' গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রগতিশীর দলের প্রার্থী হিসেবে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মহারাজের নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপরও ১৯৬২ সালের আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের আন্দোলনসহ সমকালীন প্রগতিশীল সব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আজীবন সংগ্রামী ও ত্যাগী এ নেতার জীবনে ভোগ বিলাস বলতে কিছুই ছিল না। মানুষকে ভালোবেসে জীবনে ঘর সংসার করা হয়নি জেলে বসে তিনি মানুষের মুক্তির জন্য যে সকল রণকৌশল বিষয়ক বই লিখেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম 'জেলে তিরিশ বছর'। বইটি পাকিস্তানি শাসক চক্র বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ ঠেকাও আন্দোলনে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান ছিল প্রথম সারিতে। মহারাজের দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় সংগ্রামী জীবনের ৩০টি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। জেল-জুলুম-অত্যাচার তার বিপ্লবী চেতনাকে থামিয়ে দিতে পারেনি সে সময়ের জুলুমবাজ সরকার।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কারণে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এ উপমহাদেশের মধ্যে অন্যতম বেশিদিন কারা ভোগকারী একজন ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী নেতা। ১৫ বছর তাকে দ্বীপান্তরে, বিভিন্ন জেলে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি ও গলায় বিশেষ শীল মোহরকৃত সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। এছাড়াও বহু বছর তাকে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। যৌবন শেষে বৃদ্ধ অবস্থায় কাটিয়েছেন জন্মভূমি কুলিয়ারচর কাপাসাটিয়া গ্রামের বাড়ি মাতুলালয়ে। যে দালানঘরটিতে মহারাজ শেষ জীবন কাটিয়েছেন, এ দালানটি তিনি ও তার সহোদররা পিতা ও মাতার নামে মেমোরি করে দিয়েছেন। দালানঘরটির বারান্দায় দেওয়ালের একটি শ্বেত পাথরে লেখা আছে–

In memory of late Durga Charan Chakraborty and Late Prasanna Moyee Devi by their sons–1939. ১৯৭০ সালের ২৪শে জুন মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়লে ভিসা নিয়ে বিমান যোগে ভারতে যেতে পারেননি, অতি প্রত্যুষে বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ১৯৭০ সালের ৯ই আগস্ট তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারত সরকার তাকে 'স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর' উপাধি ও সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি কখনও কোনো রাজা মহারাজা ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক তাকে রাজনীতির 'মহানায়ক' না বলে 'মহারাজ' খেতাব দিয়েছিলেন। তিনি সে খেতাব গ্রহণ করেননি। কিন্তু রাজনীতি তাকে এই খেতাবটি তার নামের পূর্বে যুক্ত করে দিয়েছে। রাজনীতিতে মহারাজের মতোই ছিল তার উন্নত জীবনাদর্শ, কঠোর ন্যায়নীতি, তপস্যা ও দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসার অঙ্গীকার। ভারতের বিখ্যাত নেতা বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ বসুর সঙ্গে তিনি জেল খেটেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় নিজ বাড়িতে বিলেতি কাপড় ও বিলেতি লবণের পরিবর্তে তিনি দেশি খদ্দর কাপড় ও দেশি লবণ ব্যবহার প্রচলন করে গ্রামের মেয়েদের সুতা কাঁটা শেখানোর জন্য একজন প্রশিক্ষকও নিয়োগ করেছিলেন। তার বাড়িতে সে সময়ে প্রায় এক'শ চরকায় নিয়মিত সুতা কাটা হতো। দিল্লীর ঐতিহাসিক রাজমাঠে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষ কৃত্যানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরুর চেয়েও অধিক লোক হয়েছিল এ কৃত্যানুষ্ঠানে। সবাই রাজনীতির এই 'মহারাজ'কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল।

রেবতীমোহন বর্মণ

রেবতীমোহন বর্মণ স্বনামধন্য লেখক, বিপ্লবী সংগঠক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। রেবতীমোহন বর্মণ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার শিমুলমান্দি গ্রামে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি লেখাপড়া ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের জোর কমে আসার পর তিনি পুনরায় আজিম উদ্দিন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মেধা তালিকায় রেবতীমোহন বর্মণ 'প্রথম স্থান' অধিকার করে তখন অবিভক্ত বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই সময়ে তিনি ঢাকায় শ্রীসংঘেও যোগদান করেন। শ্রী সংঘের সভ্য হিসেবে তাঁর কর্মস্থল ছিল কলকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা। নানা বৈপ্লবিক কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়েও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী রেবতীমোহন বর্মণ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম বই "তরুণ রুশ" প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুদিন "বেণু" নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। গত শতাব্দীর তিন দশকে বাংলার হাজার হাজার রাজনীতিক কর্মীদের মতো কমরেড রেবতীমোহন বর্মণও বিনা বিচারে বন্দি হন। এই অবস্থায়, তাঁকে বিভিন্ন শিবিরে বাস করতে হয়েছিল এবং তিনি শেষ কারাবাস করেছিলেন রাজপুতনার দেউলী বন্দী শিবিরে। ব্রিটিশের জেলখানায় তার শরীরে কুষ্ঠরোগের জীবাণু প্রবেশ করানো হয়েছিল। অসুস্থ অবস্থায় শিমুলকান্দিতেও কাটিয়েছেন কিছুদিন। "সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" রেবতীমোহন বর্মণের লেখা শেষ বই, যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি (১৯৩৯), মার্ক্স প্রবেশিকা (১৯৩৮), কৃষক ও জমিদার (১৯৩৮), সাম্রাজ্যবাদের সংকট (১৯৩৮), হেগেল ও মার্ক্স (১৯৩৮), ক্যাপিটাল (মার্ক্স-এর দাস ক্যাপিটালের বাংলায় লেখা সংক্ষিপ্ত সার) (১৯৩৮), ভারতে কৃষক সংগ্রাম ও আন্দোলন (১৯৩৮), লেনিন ও বলশেভিক পার্টি (১৯৩৯), Society and Its Development (১৯৩৯), Marksist View of Capital (১৯৩৯), সমাজের বিকাশ (১৯৩৯), সোভিয়েট ইউনিয়ন (১৯৪৪), শান্তিকামী সোভিয়েত (১৯৪৫), পরিবার বঞ্চিত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (বঙ্গানুবাদ), সমাজতন্ত্রবাদ-বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক (বঙ্গানুবাদ)। তার সর্বশেষ গ্রন্থ 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে। এ নিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। রেবতীমোহন বর্মণ শেষ জীবনে আগরতলায় কাটিয়েছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে এই খ্যাতিয়ান পুরুষ ৬ই মে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

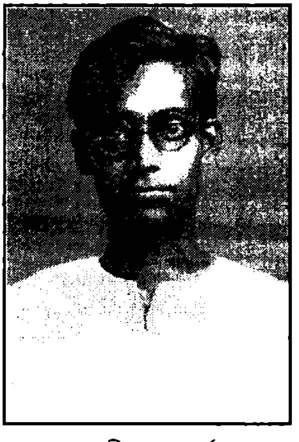

রেবতীমোহন বর্মণ

মনোরঞ্জন ধর

মনোরঞ্জন ধর কটিয়াদী উপজেলার কৃতী সন্তান। বৃটিশবিরোধী রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তাঁকে বহু বছর কারাভোগ করতে হয়েছিল। তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির পাশাপাশি আইন পেশায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৩০ সালের

www.pathagar.com

মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) হয় তিনি তার সঙ্গেও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ৪৭-এর দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৪৭-৫৬ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ও ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং কারাবরণ করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আওয়ামী রাজনীতিতে জড়িত হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুজিব নগরস্থ বাংলাদেশের প্রথম সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর তিনি বাংলাদেশের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিক হিসেবে গণঅভিযান নামে একটি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তিনি এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

অনাথ গোপাল সেন

অনাথ গোপাল সেন অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হরিশ চন্দ্র সেন। তিনি একজন সাবজজ ছিলেন। অনাথ গোপাল সেন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেসের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। মার্কসবাদী রাজনৈতিক ধারায় ভারতীয় অর্থনীতির উপর তিনি বাংলা ভাষায় 'টাকার কথা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ শহরে ওকালতি করার সময় মহাত্মা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এ জন্য তাঁকে সাড়ে ৩ বছর কারাভোগ করতে হয়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। তার রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'কর নীতি', 'যুদ্ধের দক্ষিণা', 'জাগতিক পরিবেশ' ও 'গান্ধীজীর অর্থনীতি' নামে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ১৩৫১ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নিবারণ চক্রবর্তী

নিবারণ চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাতুয়াইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সাথে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার তাকে এ কারণে গ্রেফতার করে দ্বীপান্তরে পাঠায়। আন্দামান জেলে তিনি দীর্ঘকাল বন্দি ছিলেন। মুক্তি পেয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-নীলগঞ্জ-তাড়াইলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন দলের নেতা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন।

পূর্ণ চন্দ্র গোস্বামী

পূর্ণ চন্দ্র গোস্বামী কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে আন্দামান জেলহাজতে বন্দি করে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে তিনি ভারতে চলে যান। পশ্চিম বাংলার চাকদহ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

সিতাংশু দত্ত রায়

খুসু দত্ত রায়ের প্রকৃত নাম সিতাংশু দত্ত রায়। তিনি ইটনা উপজেলার ঢাকী গ্রামে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন শুরু হয় নেত্রকোণায়। নেত্রকোনায়

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত সারা ভারতবর্ষের প্রথম কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। অতঃপর কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পরবর্তীকালে টঙ্ক, তেভাগা প্রভৃতি প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন বিপ্লবী রাজনৈতিক যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় ময়মনসিংহ শহরে অবস্থানরত ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্রাহাম আততায়ীর হাতে নিহত হন। ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাহামকে হত্যার দায়ে এক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করে তাঁকে ৫ বছর জেল দেওয়া হয়। সে সময়ে আন্দামান দীপপুঞ্জে দীপান্তরবাসী হয়ে সেখানে কারাবাস কাটান সুদীর্ঘকাল। পরবর্তী সময়ে তিনি সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি নেত্রকোণা মহকুমার কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। সিতাংশু দত্ত রায় 'খুসু' দত্ত রায় নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

সঞ্জীব চন্দ্র রায়

সঞ্জীব চন্দ্র রায় ১২৯৫ বঙ্গাব্দে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে তিনি 'গুপ্ত বিপ্লবী দলে' যোগ দেন। কালক্রমে একজন সক্রিয় কর্মী থেকে বিপ্লবী নেতা রূপে পরিচিত লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে তিনি পালিয়ে যান। পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে কিশোরগঞ্জ শহর থেকে একটি রিভালবার ও গুলিসহ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ২ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে কারাগারে প্রচণ্ড নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সঞ্জীব চন্দ্র রায় এর মৃত্যু সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে তৎকালীন কিশোরগঞ্জবাসী শোক দিবস পালন করে।

ধরণী গোস্বামী

ধরণী গোস্বামী কিশোরগঞ্জ উপজেলার যশোদল এলাকার বীর দামপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন দলের বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন ভারতের মিরাট অঞ্চলের ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ফলে দীর্ঘদিন বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়। অনুশীলন দলের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা কিশোরগঞ্জের ধরণী গোস্বামী ভারতে মৃত্যুবরণ করেন।

ধরণী গোস্বামী

www.pathagar.com

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী কটিয়াদী উপজেলার বেতাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে দীর্ঘকাল কারাবাস প্রদান করে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি প্রথম কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার বাজিতপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নীরোদ চন্দ্র দত্ত মজুমদার বাজিতপুরের বারের প্রথিতযশা উকিল ছিলেন। বাজিতপুরেই নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক জীবন শুরু। বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ ও ভারতের ব্যারাকপুর এলাকায় একজন রাজনৈতিক সুবক্তা হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সমাজসেবী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের ব্যারাকপুরে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেস সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মোহনকিশোর নমোদাস

মোহনকিশোর নমোদাস বাজিতপুর থানার সরারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই মোহনকিশোর নমোদাস দেশ সেবায় ব্রত নিয়ে অনুশীলন দলের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময়ে নেত্রকোনা মহকুমার সোয়ারীকান্দা গ্রামে এক অভিযোগে অন্যান্যদের সঙ্গে বিপ্লবী মোহনকিশোর নমোদাসকে ১৯৩২ সালে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারের পর তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে। ফলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কারাগারে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাকে আন্দামান সেলুলার জেল-হাজতে পাঠানো হয়। জেলে অবস্থানকালে দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট পালনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আন্দামান জেল কারাগারে বিদ্রোহী বন্দী যারা মৃত্যুবরণ করে শহিদ হয়েছেন তাদের স্মরণে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। শহিদ সাতজন বিদ্রোহীর মধ্যে মোহনকিশোর নমোদাসের নাম স্মৃতিস্তম্ভে অঙ্কিত আছে।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য পাকুন্দিয়া থানার নগর হাজরাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। দেশ মাতৃকার মুক্তি আন্দোলনে তিনি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রাবস্থায় তিনি কারাবরণ করেন। মুক্তি পেয়ে দেশ ভাগের পূর্ব পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ শহরে জীবন বীমা অফিসে কাজ করতেন। দেশ স্বাধীন হলে পরিবার পরিজন শহরস্থ শোলাকিয়ার নিজ বাসায় রেখে তিনি এক সময়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে বসবাস করেন। সে দেশেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

ডা. প্রফুল্লচন্দ্র বীর

ডা. প্রফুল্লচন্দ্র বীর কিশোরগঞ্জ পৌরসভার সদর রাকুয়াইল নামক এলাকার 'বীর' পদবিধারী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা শহর থেকে এম.বি পাশ করে কিশোরগঞ্জ শহরে চিকিৎসা পেশা আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুচিকিৎসক ও কংগ্রেস রাজনীতিক ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র বীরের গৌরাঙ্গবাজারের চেম্বারটি ছিল রাজনীতিকদের নিত্যদিনের আড্ডাখানা। তিনি দু'বার কিশোরগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তেজস্বী, সত্যপ্রিয়, স্পষ্টভাষী এই রাজনীতিক ডা. বীরকে আইয়ুব সরকার জেল হাজতে পাঠায়। একজন জনদরদী, আদর্শবান ও জনপ্রিয় চিকিৎসব হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ভূপেশ গুপ্ত

ভূপেশ গুপ্ত ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইটনায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহেশ চন্দ্র গুপ্ত। কলকাতার স্কটিস চার্ট কলেজে পড়ার সময়েই দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে তিনি মোট ৪ বার গ্রেফতার হন। ১৯৩৩ এর পর পুনরায় ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলখানায় তাঁকে কাটাতে হয়। বহরমপুর ভারতের বন্দী শিবিরে থাকাবস্থায় তিনি প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক উভয় পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন। মুক্তি লাভ করে ইংল্যান্ডে গিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও আইনে স্নাতক এবং পরে মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে কমিউনিটি রাজনীতি ও আন্দোলনে পরোপুরি নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৪৯-এ একবার এবং ১৯৪৮-এর আরও একবার আত্মগোপনে যান। ১৯৫১-এ গ্রেফতার হয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কারাগারে কাটান। এ বছরই তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই থেকে একটানা ঊনত্রিশ বছর তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে এবং সি.পি.আই ন্যাশনাল কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন আজীবন। ভূপেশ গুপ্ত শুধু রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী ছিলেন না, তিনি একজন সুলেখক ও কৃতী সাংবাদিক হিসেবে প্রচুর সুনাম এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মুখপাত্র 'দৈনিক স্বাধীনতা'র তিনি ছিলেন সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। বিশ বছরের অধিককাল তিনি সিপিআই এর মুখপাত্র 'The New Age'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজিতে ও বাংলায় তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফ্রিডম এন্ড দ্যা সেকেন্ড ফ্রন্ট', 'টেরার ওভার বেংগল', 'সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্লান এ ক্রিটিক', ও 'বিগ লুট' প্রভৃতি। ভূপেশ গুপ্তের বাবা মহেশ চন্দ্র ছিলেন জমিদার শ্রেণির লোক। মহেশ গুপ্ত ইটনার মহেশ চন্দ্র শিক্ষা নিকেতন নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিশোরগঞ্জ শহরস্থ খড়মপট্টি মুক্তিযোদ্ধা ভবনটি বিপ্লবী নেতা ভূপেশ গুপ্তের বসতবাড়ি ছিল।

কিশোরগঞ্জের এই স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। ইটনা ও কিশোরগঞ্জের দুটি পুরনো বাড়ি আজও এই বিপ্লবী নেতা ভূপেশ গুপ্তের স্মৃতিকথা কিশোরগঞ্জবাসীর মনে দাগ কাটে।

www.pathagar.com

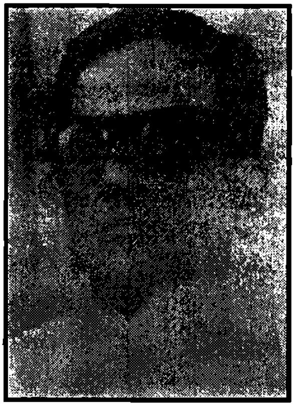

ভূপেশ গুপ্ত

যতীন দাস

কিশোরগঞ্জের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন যতীন দাস। তিনি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। ব্রিটিশের কারাগারে বন্দীদশায় ৫৬ দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে সারা ভারত কেঁপে ওঠে। কিশোরগঞ্জে তার এই মৃত্যুর প্রতিবাদে বিরাট মিছিল বের হয়। সর্বত্র কেবল লাল পতাকা। এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখনকার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা সুধাংশু কুমার অধিকারী। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। দেশের ডাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পড়া ছেড়ে কম্যুনিজম মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

নগেন সরকার

নগেন সরকার তাড়াইল থানার তালজাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। মানুষের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। বাংলার যুগান্তর দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভূপেন গুপ্ত, ওয়ালীনেওয়াজ খান আরও অনেকেই বৃটিশ বিরোধী রাজনীতির প্রথম পাঠ শিখেছেন নগেন সরকারের কাছে। বৃটিশ সরকার তাঁকে অধিকাংশ সময় জেলখানায় বন্দি করে রাখে। জীবনের শেষ ভাগে পৌঁছে বিপ্লবী নগেন সরকার সাম্যবাদী (নগেন) নাম দিয়ে পৃথক সংগঠন দাঁড় করান। পরবর্তী বয়োবৃদ্ধ এ নেতা কিশোরগঞ্জ শহরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে এই নিবেদিতপ্রাণ নিঃস্বার্থ বিপ্লবী রাজনীতিক নেতা নগেন সরকার ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। আজীবন অকৃতদার নগেন সরকারের প্রায় ৩০ বছর জেলখানায় কেটেছে।

গঙ্গেশ সরকার

গঙ্গেশ সরকার ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তাড়াইল থানার দামিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি জনদরদী ও সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্টের সাথে একাত্ম ছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের লড়াকু সংগঠক ও 'যুগান্তর' দলের স্থানীয়

www.pathagar.com

প্রভাবশালী নেতা নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে কিশোর বয়সেই গঙ্গেশ সরকার গোপন রাজনীতির সাথে বার্তাবাহক হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৪৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও ১৯৪৬ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পাকিস্তান বিরোধী 'আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়' আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনেও চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় তিনি আত্মগোপনে থেকেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পুনরায় কারাগারে যান। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) দল গঠিত হলে তিনি ন্যাপে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন ও কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আবার গ্রেফতার হয়ে ২ বছর কারাগারে ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ওয়ালী খান ও মোজাফফর আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত ন্যাপের সাথে একাত্ম হন। গঙ্গেশ সরকার ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালে নিজ এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে দামিহা ইউনিয়নে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সুদীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা ভাসানী, জ্যোতি বসু, মণি সিংহ প্রমুখ নেতার সাহচর্যে এসেছেন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র মোদক

সুরেন্দ্রচন্দ্র মোদক করিমগঞ্জ থানার জাফরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি একজন সন্ত্রাসীবাদী বিপ্লবী নেতা ছিলেন। রাজনীতির কারণে পুলিশ তার উপর হুলিয়া জারি করে। তিনি আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় যশোদল রেল স্টেশনে পুলিশের হাত ধরা পড়েন। পুলিশ অকথ্য নির্যাতন করে এ বিপ্লবী নেতার উপর। পিটুনীর চোটে তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে যান। পরদিন সকালে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন তিনি দেখতে পান যে তিনি থানা-হাজতের ভিতরে পড়ে আছেন। দীর্ঘকাল বিনা বিচারে জেলে রাজবন্দী করে রাখা হয়। জানা যায়, জেলেই তার মৃত্যু ঘটে। তারপর তার লাশের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

যশোদা নন্দন গোস্বামী

যশোদা নন্দন গোস্বামী। তিনি কটিয়াদী থানার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক যশোদা নন্দন গোস্বামী প্রায় একশত সত্যাগ্রহী নিয়ে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে কারাবরণ করেন। কিশোরগঞ্জ শহরস্থ শোলাকিয়া এলাকার একটি আখড়া এই বিপ্লবী নেতা যশোদা নন্দন গোস্বামীর হাতে গড়া ছিল। দেশ ভাগের পর তিনি চলে যান পশ্চিম বাংলার কৃষ্ণনগরে এবং সেখানেই তিন মৃত্যুবরণ করেন। বনগ্রামে এমন এক সময় তিনি রাজনীতি করতেন যে, সে সময়ে এ গ্রামের প্রায় পুরুষ-মহিলারাও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্রেহাম যখন এ গ্রামে আসেন তখন দেখা যায় এ গ্রামের প্রায় সকলেই কেউ কংগ্রেস কেউ সন্ত্রাসবাদী কেউ যুগান্তর

www.pathagar.com

অনুশীলন বা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী অথবা সমর্থক হিসেবে কাজ করেন। এ ধরনের বিচিত্র গ্রাম এ জেলায় তখন দ্বিতীয়টি আর ছিল না বলে জানা যায়।

মনীন্দ্রচন্দ্র রায়

মনীন্দ্রচন্দ্র রায় করিমগঞ্জ থানার কৃতী সন্তান ছিলেন। দেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তিনি বিপ্লববাদী দলে যোগ দেন। পুলিশ তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। তিনি আত্মগোপনে থেকে চলে যান গৌহাটি শহরে। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এক রাতে চলার পথে পুলিশ বেষ্টনীতে পড়ে যান তিনি। আত্মসমর্পণ বিপ্লববাদীর ধর্ম নয়। ফলে তিনি তার দেহে রাখা গোপন পিস্তল থেকে গুলী ছুড়ে পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চললেন। একটি মাত্র পিস্তলের লড়াই তাও আবার সীমিত রসদ তাই পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্রের সাথে কতক্ষণ আর চলতে পারে? অবশেষে তিনি ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। কিন্তু বিপ্লবী এই নেতা মনীন্দ্র চন্দ্র রায়ের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সন্দেহ করা হয় পুলিশ তাকে হত্যা করে লাশ গোপন করে ফেলেছিল।

প্রবীর গোস্বামী

প্রবীর গোস্বামী কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি যুগান্তর দলে একজন বিপ্লবী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। পিস্তল হাতে তিনি তৎকালীন মুমুরদিয়া মানিকখালি সরকারি পোস্ট অফিসে অর্থ লুট করে ব্রিটিশ সরকারের নজরে পড়েন। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। এভাবে তিনি চার বছর আত্মগোপনে থেকে কলকাতা শহরে গ্রেফতার হন। সরকার তাঁকে দ্বীপান্তরে পাঠায়। আন্দামান জেলে নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে তাকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হয়। জেলে বন্দি থাকাবস্থায় তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। সরকার তাকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তার শরীরের অবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি ভারতের শিলিগুড়িতে মৃত্যুবরণ করেন।

নিবারণ পণ্ডিত

নিবারণ পণ্ডিত ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সগরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকে তিনি ছড়া, কবিতা ও গান রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানের আক্রমণ শুরু হলে নিবারণ পণ্ডিতের রচিত ছড়া-কবিতা-গান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি টংক, হাজং ও তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কৃষক-শ্রমিকের শোষণমুক্তির লক্ষ্যে গণসংগীত ও গণকবিতা রচনা করেন। তাঁর টংক কথা, হাজং আন্দোলনের গান, জনযুদ্ধের ডাক, প্রভৃতি গণসংগীত ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৃষক সমাজে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

স্বরচিত গান পরিবেশনের জন্যে গানের স্কোয়াড গঠন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর মুসলিম সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গান রচনা করেন। লীগ সরকারের দমননীতির কবলে পড়ে আত্মগোপন। ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি গ্রেপ্তার। একই বছর ডিসেম্বর মাসে প্রথমার্ধে মুক্তিলাভ। লীগ সরকারের অত্যাচার উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৫০) সঙ্গোপনে সপরিবারে কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে ভারতে

www.pathagar.com

গমন। তাঁর লোকসংগীতের গানগুলো একদিকে যেমন শিল্পগুণে সমৃদ্ধ অন্যদিকে তেমনি সাম্যবাদী ধ্যানধারণা ও গণচেতনায় ঋদ্ধ। কঙ্কন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় তাঁর গানের সংকলন নিবারণ পণ্ডিতের গান (১৯৮৬) প্রকাশিত হয়েছে।

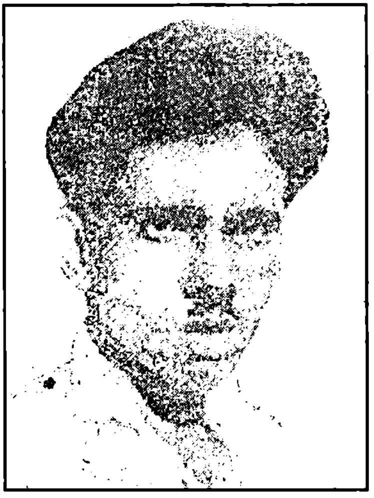

নিবারণ পণ্ডিত

পঞ্চাশের দশকে তিনি ভারতের কুচবিহারে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানে খাদ্যের দাবিতে মিছিলে গুলি হলে তাঁর রচিত গান ও কবিতা বিরোধী শিবিরে উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করত। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদ্বন্ধু রায়

জগদ্বন্ধু রায় ৫ই অক্টোবর ১৯১৩ সালে কিশোরগঞ্জ শহরের বিন্নগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অধর চন্দ্র রায় ও মাতার নাম কুঞ্জময়ী রায়। তিনি ১৯৩৭ সনে কিশোরগঞ্জ উচ্চ বালক বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। ৭ম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গুপ্ত সংগঠন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স পার্টি'তে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতির কারণে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ প্রেসিডেন্সি ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দি জীবন কাটান। রাজনীতির পাশাপাশি মানব সেবার লক্ষ্যে তিনি কলকাতা হোমিওপ্যাথিক ট্রেনিং কলেজ থেকে এইচএমবি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মাতৃভূমি কিশোরগঞ্জে ফিরে আসেন এবং স্থায়িভাবে হোমিও চিকিৎসা ও সংস্কৃতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ১২ বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হোমিও চিকিৎসক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কিশোরগঞ্জে সকলের নিকট পরিচিত।

www.pathagar.com

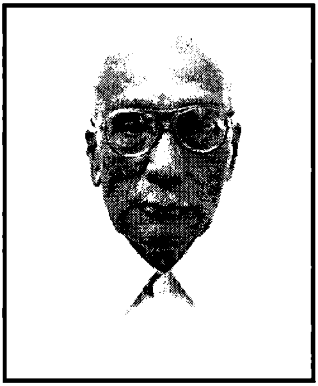

জগদ্বন্ধু রায়

মৌলভী আফতাব উদ্দিন আহমদ

আফতাব উদ্দিন আহমদ ১৮৯৯ সালে পাকুন্দিয়া উপজেলা কুমারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল করিম মাস্টার। প্রথম জীবনে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে বিশেষ করে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২০ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দেন এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন ঋণ সালিসী বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নেতা, বলিষ্ঠ সমাজকর্মী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

আফতাব উদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

ওয়ালী নেওয়াজ খান

ওয়ালী নেওয়াজ ১৯০৪ সালে জেলা সদরের তারাপাশায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার নামে প্রতিষ্ঠা করেন আরজত আতরজান হাইস্কুল। হিন্দু-মুসলিম সমাজের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ যখন ব্রিটিশের তোষামদীতে ব্যস্ত তখন ওয়ালী নেওয়াজ খান যোগ দেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অনুশীলন দলে। ওয়ালী নেওয়াজ খান তখন ময়মনসিংহ শহরের এক স্কুলের ছাত্র। ছাত্ররা হরতাল আহ্বান করেছিলেন। স্কুলের ফটকে শুয়ে রয়েছেন তারা। তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্রেহাম ছাত্রদের মাড়িয়ে স্কুলে ঢুকতে চান। সে সময়ে বিপ্লববাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছাত্রনেতা ওয়ালী নেওয়াজ খানের ধমনীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তার পকেটে রাখা সেদিনের একটি ছোট চাকু নিয়ে তড়িৎ উঠে গিয়ে তা মি. গ্রেহাম সাহেবের দেহে বসিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। তখন তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। ধরি ধরি করেও পুলিশ ওয়ালী নেওয়াজ খানকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না। তিনি চলে এলেন কিশোরগঞ্জ শহরে।

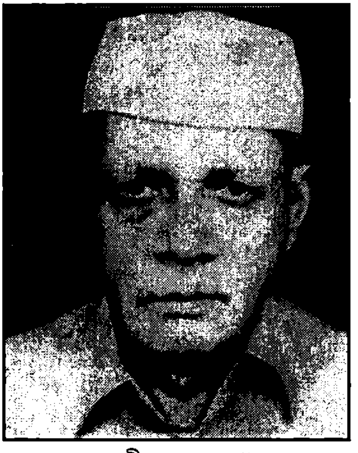

ওয়ালী নেওয়াজ খান

কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় তৎপরতার জন্য তিনি বিভিন্ন মেয়াদে বহু বছর কারাবাস করেছেন। তেভাগা, টংকসহ অন্যান্য আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে তার মত এত বড় বিপ্লবী নেতা আর কেউ হয়ে উঠেননি। শেষ জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হয়েছিলেন। কিশোরগঞ্জের ওয়ালী নেওয়াজ খান কলেজ এবং পিতামাতার নামে প্রতিষ্ঠিত আরজত আতরজান হাইস্কুল এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার স্মৃতি ও কীর্তি বহন করছে। এই মহান বিপ্লববাদী রাজনীতিবিদ ২৫শে নভেম্বর ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মাইনউদ্দিন

মাইনউদ্দিন কিশোরগঞ্জের নীলগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী অনুশীলন দলে যোগদান করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-নীলগঞ্জ ও তাড়াইলের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন দলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। ওই সময়

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ শহরে লালটুপি মাথায় দিয়ে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। নীলগঞ্জের কৃষকরা সেসব সভায় তার নেতৃত্বে যোগদান করতেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জেল হাজতে পাঠায়। শেষজীবনে তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক। মৃত্যু অবধি রাজনীতির পাশাপাশি চিকিৎসা সেবায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

জমিয়ত আলী

করিমগঞ্জের কৃতী সন্তান জমিয়ত আলীর জন্ম ১৯১৯ সালের ৮ই জানুয়ারি। জমিয়ত আলী একজন নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে চারবার তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। জীবনের প্রায় নয় বছর তাঁর কেটেছে জেলখানায়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে সকল রাজবন্দী অনশন শুরু করেছিলেন, যা ৪০ দিন স্থায়ী হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে জমিয়ত আলী ছিলেন অন্যতম। প্রায় দু'বছর পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে এলাকার জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। করিমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তিনি সফলকাম হন। করিমগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

জমিয়ত আলী

জমিয়ত আলী ১৯৫৪-এর নির্বাচন-এ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রাদেশিক পরিষদে করিমগঞ্জ-তাড়াইল নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি হলে জমিয়ত আলী গ্রেফতার হন। আবুল হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হলে অন্যান্য নিরাপত্তা বন্দীদের সাথে তিনিও মুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এ যোগদান করেন। ১৯৭০-৭৩ ও ১৯৭৯ এর নির্বাচনে করিমগঞ্জ-তাড়াইল নির্বাচনী এলাকায় তিনি ন্যাপের প্রার্থী ছিলেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জমিয়ত আলী ভারতের মেঘালয়ের মইশখলা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তিনি করিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখানেও জমিয়ত আলী বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিলেন। জমিয়ত আলী চিকিৎসার জন্য একবার রাশিয়া গিয়েছিলেন। ৭২ বছর বয়সে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ আগস্টে কিশোরগঞ্জ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

খানবাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল

পাকুন্দিয়ার হোসেন্দী গ্রামে ১১ই জুলাই ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়িতে ধর্মীয় শিক্ষা ও গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পাশ করেন।

আর্থিক অনটনের মধ্যে থেকেই তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ পাশ করার পর ঢাকা ইসলামিয়া হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকের চাকরি নেন। সে চাকরির টাকায় পড়াশুনা করে বি.এ. ডিগ্রি নেন এবং আইন পাশ করেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ বারে যোগ দেন এবং স্বল্প সময়ে খ্যাতিনামা আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আইন ব্যবসার পাশাপাশি তিনি রাজনীতির সাথেও যুক্ত হন। তেজস্বী বাগ্মী হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। পূর্ববঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করার আন্দোলনে নবাব সলিমুল্লাহর সহকর্মী ছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যে ৪ (চার) বার ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচনের মাধ্যমে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। খানবাহাদুর আবদুল মোমেন এর নেতৃত্বে গঠিত নিউস্কীম মাদ্রাসা সংস্কার কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই কমিটির উদ্যোগে দেশে নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তন হয়।

সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে তৎকালীন ইংরেজ সরকার খানবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। খানবাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ময়মনসিংহ প্রজা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের কৃষক-প্রজা সম্মিলনীর অন্যতম সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ময়মনসিংহ থেকে টোক পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কটি তাঁর নামানুসারে নামকরণ করা হয়। এই প্রখ্যাত আইনজীবী, সমাজ সেবক ও রাজনীতিবিদ ৪ঠা মাঘ ১৩৫১ বঙ্গাব্দে (১৯৫৪) মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল করিম খানবাহাদুর

আবদুল করিম খানবাহাদুর কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার বাহেরনগর গ্রামে ১৮৭৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আলী আহমেদের পুত্র। আবদুল করিম ১৮৯০ সালে ঢাকা মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অনার্সসহ বি.এ. (বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম) এবং ১৮৯৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ল' ডিগ্রি লাভ করেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি প্রথমে ১৮৯৯ সালে ঢাকা বার এবং পরে ১৯০৩ সালে কুমিল্লা বারে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ ৩৫ বৎসর সেখানে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করেন। ৩৫ বছরের মধ্যে ২০ বছর পাবলিক প্রসিকিউটরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সেই আমলে তাঁর সমকক্ষ আইনজীবী খুব কমই ছিল। মক্কেলদের কাছে তিনি 'বাঘা করিম' নামেও পরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯২৪ সালে খানবাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। খান বাহাদুর আবদুল করিম ১৯২২-২৬ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯০৫ থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয়ের কাউন্সিল অফ স্টেটের সদস্য এবং ১৯৩৭-৪০ সাল পর্যন্ত বাংলার ঊর্ধ্বতন আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪১ সালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভায় খানবাহাদুর আবদুল করিমকে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি ১৯৪৩ সাল

www.pathagar.com

পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। এই কৃতী পুরুষ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ৭২ বৎসর বয়সে নিজ গ্রামে বাহেরনগরে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহ্ আব্দুল হামিদ

শাহ আব্দুল হামিদ ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাড়াইল থানার বান্দুলিয়ায় সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শাহ্ শমসের আলী। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং কৃষক প্রজা সংগঠক ছিলেন।

তিনি পাতুয়াইর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে মাইনর পাশ করার পর কিশোরগঞ্জ শহরস্থ রামানন্দ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক অনটনে পড়ে তাঁকে তাড়াইল থানাধীন ধলা হাইস্কুলে চলে যেতে হয়। সেখানে তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। এ সময়ই তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

শাহ আব্দুল হামিদ

হোসেনপুর থানাধীন গাঙ্গাটিয়া জমিদারিতে কিছুকাল (১৩২১-২৫ বঙ্গাব্দ) নায়েবের চাকুরিও করেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্র ও চাকরির জন্য উপযোগী ছিল না। চাকরি ছেড়ে হেকিমি ঔষধের প্রস্তুত ও ব্যবসা করে অনেকাংশে স্বচ্ছলতা আনয়ন করেন। অন্যদিকে কৃষক প্রজা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং প্রজা সাধারণকে সংগঠিত করেন। শেরে বাংলা শাহ আবদুল হামিদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে কৃষক প্রজা সমিতির অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন।

এই সমিতির মনোনয়নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এম.এল.এ এবং পরে এম.এল.সি. নির্বাচিত হন। তিনি দলের চীফ হুইপ ছিলেন। শাহ আব্দুল হামিদ স্বীয় গ্রামে সমবায় ভিত্তিতে একটি উইভিং ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শেষ জীবনে অর্থ কষ্টের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তিনি ধীরে ধীরে রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়েন। এই নিঃস্বার্থ নেতা ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৯ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

হামিদ উদ্দিন আহমেদ

হামিদ উদ্দিন আহমেদ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কটিয়াদী উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। বাজিতপুরে

www.pathagar.com

স্থায়ী বসতি স্থাপন করে সেখানেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি একাধারে বাজিতপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ১২ বছর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রিটিশরা তাকে খানসাহেব উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলার পার্লামেন্টারি পদে নিয়োজিত হন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন সরকারের কৃষিমন্ত্রী হন। তিনিই প্রথম কৃষি মন্ত্রণালয়ে যান্ত্রিক বিভাগ চালু করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার হাওরে পাওয়ার পাম্পে সেচ কাজের গোড়াপত্তন করেন।

সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহ্

সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহ্ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে হয়বতনগর জমিদার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশা শুরু করেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিশোরগঞ্জে পাকুন্দিয়ার জাঙ্গালিয়ার খাতক বিদ্রোহ চলাকালীন ব্রিটিশ পুলিশ কৃষকদের উপর অত্যাচার-জুলুম শুরু করলে তিনি তাদের পক্ষ হয়ে আইনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

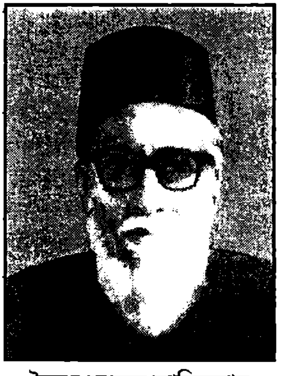

সৈয়দ মুহম্মদ আতিকুল্লাহ্

আবদুল মোনায়েম খান

আবদুল মোনায়েম খান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাজিতপুর উপজেলার হুমাইপুর গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন বাজিতপুরে। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এন্ট্রাস পাশ, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৮ তে আই.এ এবং ১৯২০-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন ডিগ্রি নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২৪-এ পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি লাভ করেন।

www.pathagar.com

আবদুল মোনায়েম খান

পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে সদস্য নির্বাচিত হন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। ১৯৬২-এর ২৮শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ১৯৬৯-এর ২৩শে মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গভর্নর থাকাকালে ৬ দফাসহ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। আজীবন তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি ১৯৭১-এ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ৭১-এর ১৩ই অক্টোবরে তাঁর বনানীস্থ বাসভবনে মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের গুলিতে তিনি মারাত্মক আহত হন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা আতাহার আলী

কিশোরগঞ্জের রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম মাওলানা আতাহার আলী। জন্মতারিখ ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ। পৈতৃক নিবাস হচ্ছে সিলেটের ঘোড়দিয়া গ্রামে।

মাওলানা আতাহার আলী রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং নেজামী ইসলামী পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মাওলানা আতাহার আলী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আজীবন দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করেছেন। ৬ই অক্টোবর ১৯৭৬-এ মাওলানা আতাহার আলী ময়মনসিংহে মৃত্যুবরণ করেন।

আশরাফ উদ্দিন আহমদ

আশরাফ উদ্দিন আহমদ ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ১লা জুন মাতুলালয় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলের বারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম মফিজ উদ্দিন। কিশোরগঞ্জ শহরের নগুয়ায় তিনি স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কিশোরগঞ্জ শাখার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

৫২'র ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ সরকার তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয় লাভের পর তিনি কারামুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি উক্ত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সংসদ সদস্যের শূন্য পদে উপ-নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ সদর থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। স্থানীয় আজিম উদ্দিন হাই স্কুলের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও পরবর্তীকালে হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একজন গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি সকলের নিকট সমাদৃত। তিনি ১৯৯৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন।

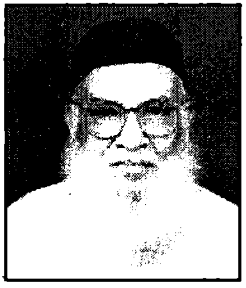

আশরাফ উদ্দিন আহমদ

এ.কে. শরফুদ্দীন আহমেদ

এ.কে শরফুদ্দীন আহমেদ, ডাক্তার বাদশা মিয়া হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে চারিয়াকোণা গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক বাড়ি পাকুন্দিয়ার মঙ্গলবাড়িয়া গ্রামে। তিনি ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করে ময়মনসিংহ শহরে মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। পরে ১৯৩১ সালে এল.এম.এফ. পাশ করেন। প্রথম জীবনে ম্যালেরিয়া বিভাগে কিছুদিন চাকরি করার পর কলকাতায় গিয়ে ক্রিসেন্ট ফার্মেসি খুলে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। সে সময় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। এর প্রভাব ডা. বাদশা মিয়ার উপর পড়েছিল।

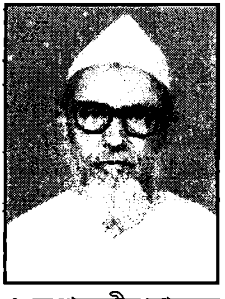

এ.কে শরফুদ্দীন আহমেদ

www.pathagar.com

কলকাতায় কিছুদিন ডাক্তারি করে তিনি কিশোরগঞ্জ শহরে চলে আসেন এবং পুনরায় ক্রিসেন্ট ফার্মেসি খুলে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি জনসেবা ও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই গুণী ব্যক্তি দেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ শোলাকিয়া মাঠের সম্পাদক হিসেবে চৌদ্দ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালের ১৬ই জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের অন্যতম স্থপতি। তিনি সদর উপজেলার যশোদলের বীরদামপাড়া গ্রামে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুর রইছ ও মাতা নুরন্নেসা খাতুন রূপা। তার ডাক নাম ছিল গোলাপ মিয়া। কিশোরগঞ্জে প্রাথমিক পড়ালেখার পাঠ শেষে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ১ম বিভাগে মেট্রিক, ১৯৪৩-এ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাশ করেন। বাংলাদেশের বিনির্মাণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরে যে জাতীয় চার নেতার নাম উচ্চারিত হয় তাদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অন্যতম। তাঁর কীর্তিময় ও গৌরবদীপ্ত ভূমিকার জন্য কিশোরগঞ্জবাসী গর্ব অনুভব করে। ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাৎ দান করেন। এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের তৎকালীন বাসভবনে। এই সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম ছাত্রাবাসের সহ-সভাপতি ও ছাত্রনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে ১৯৪৯-এ সি.এস.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আয়কর অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৫১-এ সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক

www.pathagar.com

হিসেবে যোগদান করেন। পরে অধ্যাপনা ছেড়ে ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহ জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান করেন এবং ঐ বছরই আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৫৭-এ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪'র ৮ই মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬'র ৮ই মে আওয়ামী লীগ দল পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে 'ডাক'-এর অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে তিনি ১৯৬৯-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৯-এর রাজনৈতিক সঙ্কট মীমাংসাকল্পে পশ্চিম পাকিস্তানের পিন্ডিতে বিরোধী দলগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত সরকারের এক গোল টেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৭০ সালে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল দেশ ত্যাগ করে সীমান্ত এলাকা মেহেরপুর এর বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির মহান দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি পালন করেন। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হওয়ার পরে ২২শে ডিসেম্বর প্রথম বাংলাদেশ সরকার মুজিব নগর থেকে ঢাকায় চলে আসে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে ১৯৭২-এর ১২ই জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিপরিষদের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময়ে নিজ এলাকা যশোদলস্থ কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলস প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭২-এর ৯ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭৩-এর ৬ই মার্চ পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭৩-এর ৭ই মার্চ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩-এর ১২ই মার্চ দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-এর ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ সংক্ষেপে 'বাকশাল' গঠিত হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির ২ নম্বর সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে ২৩শে আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ আরও তিনজন জাতীয় নেতা গ্রেফতার হন। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকাবস্থায় ১৯৭৫-এর ৩রা নভেম্বর অপর জাতীয় তিন নেতার সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলামকেও হত্যা করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আদর্শবান উদার প্রকৃতির মানুষ। চল্লিশের দশকে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে এবং ষাটের দশকে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের আন্দোলনে সর্বোপরি

www.pathagar.com

সত্তর-এর দশকে বাঙালির অধিকার আদায় থেকে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত কাছের মানুষ, বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসেবে তিনি আমৃত্যু সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি ও সংগ্রাম করে গেছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামই শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাংলাদেশের মিল কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বর্তমানে কিশোরগঞ্জ-হোসেনপুর হতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য এবং বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারের স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের কথা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ও সমগ্র কিশোরগঞ্জবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ষাটের দশকে ৬ দফার আন্দোলন চলা কালে বঙ্গবন্ধু যখন বারবার কারাগারে গেছেন তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। সত্তরের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের নেতা নির্বাচিত হলেন বঙ্গবন্ধু, উপনেতা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রথম বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, উপরাষ্ট্রপতি তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং একাত্তরে বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার কারণে সৈয়দ নজরুল ইসলামই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। ৭২-এর জানুয়ারি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠিত হলো। বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম হলেন সংসদ উপনেতা। আবার যখন রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তিত হলো বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। সৈয়দ নজরুলের রাজনৈতিক জীবনাদর্শ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সহিষ্ণু মনোভাব ও গণতান্ত্রিক চর্চা এদেশের মানুষের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

ঢাকায় ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে কিশোরগঞ্জের যে ক'জন কীর্তিমান ছাত্রনেতা সে সময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ছিলেন অন্যতম। ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মেহের আলী মিয়া। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের খ্যাতনামা আইনজীবী ও তৎকালীন লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জেলা বোর্ডের সদস্য। ভৈরবের হাজী বোলাকী মোল্লা-আমজাদ আলী সরকারের বাড়ির সন্তান হলেও জিল্লুর রহমানের শৈশব ও বাল্যকাল কাটে ভৈরবের বাইরে ময়মনসিংহ শহরে। পরে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ভৈরব কাদির বক্স সংক্ষেপে কে.বি. হাইস্কুলে এসে ভর্তি হন। কে.বি. হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্সসহ এম.এ. ও এলএল.বি. ডিগ্রি লাভ করেন। ভৈরব নদী বন্দর আর বাজারেতো ব্যবসা-বাণিজ্য করেই মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু জিল্লুর রহমানের দাদা মোজাফ্ফর বেপারী তার ছেলে মেহের আলীকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়ে তৎকালীন সময়ে ময়মনসিংহ শহরের উকিল বানিয়েছিলেন। মেহের আলী মিয়াও তাঁর ছেলে জিল্লুর রহমানকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করেছিলেন। জিল্লুর রহমানের পিতা মেহের আলী মিয়াই ভৈরবপুর গ্রামের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। জিল্লুর রহমান ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। পিতা এডভোকেট মেহের আলী মিয়া তখন ময়মনসিংহ

জজকোর্টের উকিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ভৈরবের 'মুকুল মেলা' নামক সাহিত্য সংগঠনে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। তিনিই প্রথম ঢাকা কলেজ মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি হন। ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে ভৈরবে 'টিপু সুলতান' নামে ঐতিহাসিক নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। এক কথায় তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন একজন আদর্শবান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে একজন তুখোড় ছাত্রনেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৫২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন ছাত্রনেতা জিল্লুর রহমান তাতে সভাপতিত্ব করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক হল এবং ঢাকা হল সংলগ্ন পুকুর পাড়ে যে সংগ্রামী ১১ জন ছাত্রনেতার নেতৃত্বে পরের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ছিলেন এই ১১ জনের মধ্যে অন্যতম।

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিল্লুর রহমানের এম.এ. ডিগ্রি কেড়ে নেয় এবং তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। পরে আন্দোলনের চাপে এম.এ. ডিগ্রি ফেরত দিতে বাধ্য হয়। জিল্লুর রহমান তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কলকাতা থেকে প্রকাশিত '২য় বাংলা' নামক পত্রিকাটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট প্রেরণার উৎস। এই পত্রিকাটির প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন জিল্লুর রহমান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আইভি রহমান উভয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে অবিচল মনোভাবের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর জিল্লুর রহমানকে তৎকালীন সামরিক বাহিনীর কুচক্রী মহল গ্রেফতার করে ঢাকাসহ কুমিল্লার বিভিন্ন কারাগারে চার বছরেরও অধিক সময় বন্দি করে রাখে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবারও দেশ ও জনগণের সেবায় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। পরবর্তীকালে এরশাদ সরকারের আমলে আবারও গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। ১৯৮৬ সালে নির্বাচনের ঘোষণা হলে তিনি কিশোরগঞ্জের ভৈরব-কুলিয়ারচর নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে পুনরায় তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০০ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। সে কাউন্সিলেও তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকে জাতীয় সংসদ-এর উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯-এর সংসদ নির্বাচনে ভৈরব-কুলিয়ারচর নির্বাচনী এলাকা থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় সরকার গঠন করে এবং তাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। জিল্লুর রহমান একজন আত্মত্যাগী, আদর্শবান রাজনীতিক। তিনি শুধু কিশোরগঞ্জের গর্ব নন, সারা বাংলাদেশের গর্ব। তাঁর স্ত্রী আইভি রহমানও একজন জাতীয় পর্যায়ের নেত্রী। তিনি বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ও বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং নারী পুনর্বাসন সংস্থার চেয়ারপার্সন ছিলেন। আইভি রহমান ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত হন। মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদসহ মোট ৬ বার সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়।

আসাদুজ্জামান খান

কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান আসাদুজ্জামান খান বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী, প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক মন্ত্রী, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও সংসদে বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। তিনি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হোসেনপুর থানাধীন হোগলাকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী আ. হেকিম খান। কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মেট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯৩৫-এ আই.এ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭-এ ডিগ্রি, ১৯৩৯-এ ইতিহাসে এম.এ এবং ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ১ম বিভাগে আইন ডিগ্রি নেন।

আসাদুজ্জামান খান সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন (১৯৩৮-৩৯)। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন ও ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে (জুডিশিয়াল) যোগ দেন এবং পুনরায় ১৯৫২-এ পদত্যাগ করে ঢাকা বারে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা হাইকোর্ট বারে এবং পরে তদানীন্তন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৫২-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক ছিলেন।

www.pathagar.com

আসাদুজ্জামান খান

তিনি বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তখন নির্বাচনী এলাকা ছিল পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর ও কটিয়াদী। পরিষদে প্রথমে স্বতন্ত্র গ্রুপে এবং পরে বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭-তে আওয়ামী লীগ-এ যোগদান করেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯-৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা হাইকোর্ট বার সমিতির সভাপতি ছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সদস্য এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে আসাদুজ্জামান খান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পাট মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯-এর পুনরায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পাকুন্দিয়া-হোসেনপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন।

আসাদুজ্জামান খান ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত মিষ্টভাষী। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি ভালো ফুটবল ও টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ২১শে জানুয়ারি ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এই জনপ্রিয় নেতা ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

কাজী আবদুল বারী

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাজী আবদুল বারী জন্মগ্রহণ করেন অষ্টগ্রামে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম কাজী আবদুল আউয়াল। কৈশোরেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালে ময়মনসিংহ শহরে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি ছয় মাস কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে পুনরায় গ্রেফতার হন। বারবার গ্রেফতারের ফলে কলেজের পড়াশোনা শেষ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের সাথে যুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান বেআইনিভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করার পর কাজী আবদুল বারী এর প্রতিবাদে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ ময়দানে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার ফলে তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৯ সালে আত্মগোপন অবস্থায় তিনি গ্রেফতার হন। সামরিক আদালতের বিচারে তাঁর শাস্তি হয়। দশটি বেত্রাঘাত এবং তিন বছরের জেল হয়। বেত্রাঘাতে এই নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদের কর্ণপট ফেটে যায় এবং তিনি এর পরিণতিতে বধির হয়ে যান। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

১৯৬৯-এ পুনরায় গ্রেফতার হয়ে গণআন্দোলনের সময় মুক্তি পান। কাজী আবদুল বারী ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা ন্যাপের সভাপতি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ন্যাপের সাথে যুক্ত ছিলেন। আদর্শবাদী, সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৩-এর ২১শে ডিসেম্বরে কাজী আবদুল বারী অষ্টগ্রামে পরলোকগমন করেন।

আইভি রহমান

আইভি রহমান ১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার ভৈরবপুর এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মো. জিল্লুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতার নাম প্রিন্সিপাল জালাল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন তখন ঢাকা কলেজে চাকরিরত। মাতার হাসিনা বেগম ছিলেন গৃহিণী। ৮ বোন ৪ ভাইয়ের মধ্যে আইভি রহমান ছিলেন ৫ম সন্তান। তাঁর একমাত্র পুত্র নাজমুল হাসান পাপন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি। তিনি ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে গিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কথিকা পাঠ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারপার্সন এবং জাতীয় মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। এক কথায় তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে এক জনসভায় ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হয়ে পরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ২৪শে আগস্ট ২০০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আইভি রহমান

www.pathagar.com

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তি (১৯৩৩)। এ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চম বর্ষে অধ্যয়নকালে কলকাতা জাদুঘরে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর ছয়টি জলরঙের চিত্র প্রদর্শিত। এ ছয়টি চিত্রই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গৃহীত এবং পুরস্কার হিসেবে 'গভর্নরস গোল্ড মেডেল' লাভ। ১৯২৮-এ ফাইন আর্টসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৩৫০ (১৯৪৩ খ্রি.) এর দুর্ভিক্ষের সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের স্কেচ অঙ্কন করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন। তিনি ঢাকা সরকারি আর্ট স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা অনুষদ) প্রতিষ্ঠায় অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫-এ তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭০-এর ১২ই নভেম্বর এক প্রলংকারী ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানলে যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয় তা দেখার জন্য মনপুরা সফর। তার ওপর ভিত্তি করে ৬ ফুট কাগজের স্ক্রল-এ অঙ্কন করেন আর এক অপূর্ব চিত্রকর্ম। চিত্রটির নামকরণ করেন 'মনপুরা-৭০'। ১৯৭১-এর মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সামরিক সরকারের নিপীড়নের প্রতিবাদে 'হেলালে ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন। ষাটের দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার রেডিও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। তাঁর অঙ্কিত ছবির মধ্যে ১১৫০টি ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

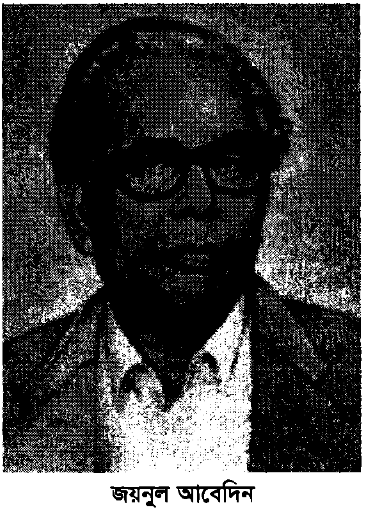

জয়নুল আবেদিন

www.pathagar.com

মোহাম্মদ সাইদুর

১৯৪০ সালের ২৮শে জানুয়ারি কিশোরগঞ্জের বিন্নগাঁও গ্রামে মোহাম্মদ সাইদুর জন্মগ্রহণ করেন। বিন্নগাঁও প্রাইমারি স্কুলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর তমালতলা প্রাইমারি বিদ্যাপীঠ, কিশোরগঞ্জ মাইনর স্কুল (বর্তমান পিটিআই) এবং আজিমউদ্দিন হাইস্কুলে অধ্যয়ন। স্কুলে পড়ার সময় বাড়ির পাশে কাইনজার বিলের অপর পাড়ে এক অন্ধ বৃদ্ধের মধুমালার গান শুনে মুগ্ধ হন। কোথাও গানের আসর হলেই, সেখানে ছুটে যেতেন। এসব আসরে পুথিপাঠ, জারি-সারি, পালাগান, কবিগান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। আবদুল গনি বয়াতি নামে এক গাড়োয়ান রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গল্প শোনাতেন। সাইদুরও মাঝে মধ্যে তার সঙ্গী হতেন। বাবার পুথিপত্র ঘেঁটে ময়মনসিংহ গীতিকায় চন্দ্রাবতীর কাহিনির ঐতিহাসিক সন্ধান পান। চন্দ্রাবতীর ভণিতায় কিছু গান লোকমুখ থেকে সংগ্রহ। এভাবেই সংগ্রাহক জীবনের সূত্রপাত।

১৪ বছর বয়সে ১৯৫৬-এ মওলানা ভাসানী আহূত ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে জারিগানের দল নিয়ে অংশগ্রহণ। বাংলা একাডেমির সংগ্রাহক হিসেবে ১৯৬২-এর জুলাই মাসে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। আগস্ট মাসে প্রথম লোকসাহিত্য সংগ্রহ একাডেমিতে জমাদান। চাকরিতে থেকেই ১৯৬৮-এ মেট্রিক পাস করেন। ১৯৭২-এ বাংলা একাডেমিতে স্থায়ী নিয়োগ লাভ। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' ও সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'র সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে 'কিশোরগঞ্জ বার্তা' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন।

মোহাম্মদ সাইদুর

তাঁর একক প্রচেষ্টায় বাংলা মাসভিত্তিক ১২৯৩টি মেলার তালিকা প্রণয়ন, যাতে মেলার নাম, স্থান ও ঠিকানা, উপলক্ষ, তারিখ, মেলার বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তথ্য, প্রধান প্রধান পণ্যসামগ্রীর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'জামদানি' (১৯৯৩) গ্রন্থটি তিনি মাঠ পর্যায়ের কাজের ওপরে রচনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমির 'লোকসাহিত্য সংকলন' ৩০তম খণ্ড (লোকনাট্য-১), ৪৫তম খণ্ড (আনুষ্ঠানিক গীত); 'বাংলা একাডেমি ফোকলোর সংকলন' ৪৯তম খণ্ড

www.pathagar.com

(মুহররম অনুষ্ঠান), ৫১তম খণ্ড (বেড়াভাসান উৎসব), ৬১তম খণ্ড (লোকনাট্য-২), ৬৩তম খণ্ড (লোকনাট্য-৩, যৌথভাবে সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়। এছাড়া মোহাম্মদ আলী খানের সঙ্গে যৌথভাবে 'কিশোরগঞ্জের ইতিহাস' রচনা ও সম্পাদনা। এটি আঞ্চলিক ইতিহাসের এক অনন্য দলিল। নিজ বাড়িতে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা।

মোহাম্মদ সাইদুর মহান মুক্তিযুদ্ধের নানান ধরনের স্মারক সংগ্রহ করেছেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে। এসব স্মারক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৭৪-এ বাংলা একাডেমিতে তাঁর একক লোকশিল্প সংগ্রহ প্রদর্শনী হয়। ১৯৮৮-এ লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেল আর্ট গ্যালারিতে ওপেন এয়ার প্রদর্শনীতে তাঁর নিজস্ব লোকশিল্প সংগ্রহের প্রদর্শনী এবং ১৯৮৯-এ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত যৌথভাবে 'নকশিকাঁথা প্রদর্শনী' হয়। এ প্রদর্শনী ছিল চমৎকার এবং এখানে মোহাম্মদ সাইদুরের বিপুল সংগ্রহ উপস্থাপন করা হয়। ২রা জানুয়ারি থেকে ২৭শে মার্চ ২০০১ সালে জাপানের ফুকুওয়াকা এশিয়ান আর্ট মিউজিয়াম-এর উদ্যোগে নকশিকাঁথার প্রদর্শনী করেছেন। ২০০২ সালে তিন দিনব্যাপী জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ কাঁথা ও পাখা প্রদর্শনী করেছে প্রবর্তনায়।

তাঁর অন্যতম একটি সংগ্রহ হচ্ছে 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' একটি পালা গান। এ পালা গানটি নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। শিকড় সন্ধানী মোহাম্মদ সাইদুর তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফলস্বরূপ দেশে ও বিদেশে সংবর্ধিত এবং পুরস্কৃত হয়েছেন, পেয়েছেন সম্মাননা।

এ প্রথিতযশা সংগ্রাহক সম্পর্কে দেশি-বিদেশি মনীষী প্রশস্তি গেয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরিস্ট হেনরী গ্লাসি 'ট্রাডিশনাল আর্ট অব ঢাকা' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'Mohammad Sayeedur Rahman from Kishoregonj, North of Dhaka, is the Bangla Academy's man is the field, its folklore collector. His close knowledge of the folklore of Bangladesh is unrivaled." তাঁর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন ২০০১-এ বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ, ১৯৮৮-এ লোকনাটক সংগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠী সম্মাননা, ২০০১-এ জাপানের ফুকুওয়াকা এশিয়ান আর্ট গ্যালারি সংবর্ধনা, ২০০২-এ বাংলাদেশ কারুশিল্পী পরিষদের সম্মাননা, 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' নাটক সঞ্চায়নের শতরজনী উপলক্ষে কলকাতায় এর সংগ্রাহক হিসেবে সংবর্ধনা। বাংলাদেশ ফোকলোর চর্চাকেন্দ্র থেকে ফোকলোর সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবে সংবর্ধনা (২০০৩)। তিনি ২০০৭ সালে ৪ঠা মার্চ কিশোরগঞ্জে মৃত্যুবরণ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাংলা শিশুসাহিত্য রচনার পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৮৬৩ সালের ১০ই মে কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পাস (১৮৮০)। স্কুল জীবনেই চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা অর্জন। কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট থেকে বি.এ. পাস (১৮৮৪)। তিনি গল্প, নাটক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কবিতা, গান, মনোরম ছবি সবই উপহার দিয়েছেন ছোটদের। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রকাশিত। স্বরচিত গ্রন্থের স্ব-অঙ্কিত চমকপ্রদ চিত্র

www.pathagar.com

সংযোজন। 'বলরামের দেহত্যাগ' তাঁর অঙ্কিত একটি বিখ্যাত চিত্র। নানা রঙের হাফটোন ছবি ছাপার ব্যাপারে বর্তমানকালে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তার পেছনে তাঁর অবদান অপরিসীম। গবেষণা করে নানারকম ডায়াফার্ম সৃষ্টি, রি-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র নির্মাণ। ডায়োটাইপ ও রে-প্রিন্ট পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি ছোটদের রামায়ণ (১৮৯৪-১৮৯৫), সেকালের কথা (১৯০৩), ছোটদের মহাভারত (১৯০৯), মহাভারতের গল্প (১৯০৯), বিবিধ প্রবন্ধ, গল্পমালা ও ছড়া-কবিতা-গান রচনা করেছেন। তিনি ১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

খ্যাতনামা বাঙালি মননশীল লেখক ও চিন্তাবিদ নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদীতে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ ও কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। নীরদ চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয় ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাবরক্ষণ অধিদপ্তরে একজন কেরানি হিসেবে। চাকরির পাশাপাশি একই সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন।

জনপ্রিয় সাময়িকীগুলোতে নিবন্ধ পাঠানোর মাধ্যমে লেখার জগতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম নিবন্ধটি ছিল অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত বাঙালি কবি ভারতচন্দ্রের উপর। এই নিবন্ধটি ঐ সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ইংরেজি ম্যাগাজিন "মডার্ন রিভিউ"-তে স্থান পায়।

নীরদ চৌধুরী হিসাবরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে খুব শীঘ্রই চাকরি ত্যাগ করেন এবং সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে নতুন কর্মজীবন শুরু করেন। ঐ সময়ে কলকাতা কলেজ স্কয়ারের কাছাকাছি মির্জাপুর স্ট্রিটে অন্যতম লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সাথে একত্রে বোর্ডার হিসেবে ছিলেন। তিনি তখনকার সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ইংরেজি ও বাংলা সাময়িকী হিসেবে মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী এবং শনিবারের চিঠিতে সম্পাদনা কর্মে সম্পৃক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি দুইটি ক্ষণস্থায়ী অথচ উচ্চস্তরের সাময়িকী-সমসাময়িকী এবং নতুন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্য মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় রমানন্দ চ্যাটার্জির অধীনে সহকারী সম্পাদকের চাকরি গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। ১৯২৭-এ বাংলা সাময়িকী শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বছরই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

'An Autobiography of an Unknown India' (১৯৫১) তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। নীরদ চৌধুরী ইন্ডিয়া ত্যাগ করে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে পাড়ি জমান ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে। এসময় Scholar Extraordinary বইটি লেখার কাজে হাত দেন। বইটি *Scholar Extraordinary*. The Life of Professor the Right Honourable Friedrich Max Muller, P. C. প্রচ্ছদনামে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রার এক অতি সুন্দর প্রতিচ্ছবি সম্বলিত গ্রন্থ To Live or Not to Live প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৭৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে প্রকাশ করেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বই : Clive of India, A Political and Psychological Essay, Culture in the Vanity Bag, Clothing and Adornment in Passing and Abiding India এবং Hinduism. A Religion to Live By.

নীরদ চৌধুরীর মহান কীর্তি The Hand! Great Anarch! India : 1921-1952 নামীয় গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি ১৯৮৭-তে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স নব্বই। এ বয়সে তাঁর দৈহিক এবং মানসিক কর্মদক্ষতা অটুট ছিল। পাণ্ডিত্য ও মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৯২-এ ইংল্যান্ডের রানি তাঁকে কমান্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়র (CBE) উপাধি দেন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০১ বৎসর বয়সে নীরদচন্দ্র চৌধুরী অক্সফোর্ডে নিজ বাসগৃহে মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল আলীম চৌধুরী

বিশিষ্ট চক্ষুবিশেষজ্ঞ, শহীদ আলীম চৌধুরী ১৯২৮ সালে কিশোরগঞ্জের খয়েরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৫-এ কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৪৮-এ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই.এসসি., ১৯৫৫-তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. এবং ১৯৬১-তে লন্ডন থেকে ডি.ও. ডিগ্রি লাভ। ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। তিনি ১৯৫২-র ভাষা

www.pathagar.com

আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এ-কারণে ১৯৫৩-তে কারা নির্যাতন ভোগ। ১৯৫৪-১৯৫৫ পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি।

কর্মজীবনে বিলাতের সেন্ট জেমস হাসপাতালের রেজিস্ট্রার (১৯৬১-১৯৬৩), মীর্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালের প্রধান চক্ষু চিকিৎসক (নভেম্বর ১৯৬৩-অক্টোবর ১৯৬৫), ঢাকায় পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জুন-ডিসেম্বর ১৯৬৭), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জানুয়ারি ১৯৬৮-সেপ্টেম্বর ১৯৭০), রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (জুন-অক্টোবর ১৯৭১) এবং ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭১)।

আবদুল আলীম চৌধুরী

এছাড়া ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার যুগ্ম-সম্পাদক, ১৯৬৭-১৯৬৮ পর্যন্ত উক্ত সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৯-এ ইস্ট পাকিস্তান অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪১-১৯৪২ পর্যন্ত 'খাপছাড়া' (মাসিক পত্রিকা), ১৯৫২-১৯৫৩ পর্যন্ত 'যাত্রিক' (মাসিক পত্রিকা) ও ১৯৫৭-১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক। আবদুল আলীম চৌধুরী শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন।

ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সহযোগী আল-বদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ঢাকার মিরপুরের বধ্যভূমিতে হত্যা করে।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯১৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার বৌলাই জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ মোগল শাসকদের বংশধর ছিলেন বলে কথিত হয়। তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৩৮) ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েড কলেজ থেকে আইএ (১৯৪০) পাস করেন। কিছুকাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্স অধ্যয়ন করেন।

www.pathagar.com

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

১৯৬২ সালে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের পাবলিক রিলেশন বিভাগে চাকরি লাভ। এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'কৃষি সমাচার' পত্রিকা সম্পাদক। ১৯৭৯ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। বাংলা সাহিত্যের পাশপাশি উর্দু ও ফারসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন। পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসীর কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ 'শাহনামা'র বঙ্গানুবাদ তাঁর বিশিষ্ট কীর্তি। ফেরদৌসীর শাহানামা (১৯৯১) নামে এটি ছয় খণ্ডে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন (১৯৬০), দীওয়ান-ই-গালিব (১৯৬৪), কালামে রাগিব (১৯৬৭), রুমীর মসনবী (১৯৬৭) উল্লেখযোগ্য।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৮), একুশে পদক (মরণোত্তর, ১৯৯৩)-সহ একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস ১৯১১ সালের ২০শে আগস্ট কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক (১৯২৭) ও কলকতা সিটি কলেজ থেকে আইএ (১৯২৯) এবং কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বিএ (১৯৩১) ও একই কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এমএ (১৯৩৩) ডিগ্রি লাভ করেন।

দেবব্রত বিশ্বাস গম্ভীর ও উদাত্ত কণ্ঠ এবং ব্যতিক্রমী নিজস্ব গায়কীর অধিকারী ছিলেন। প্রকাশভঙ্গি, সূক্ষ্ম নাটকীয়তা ও প্রাণবন্ত তালে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে তিনি গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বহু অপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত তাঁর কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি ১৯৭১ সালে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর গানের রয়্যাল্টির পুরো অর্থ তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দেন। ১৯৮০ সালের ১৮ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

লে. কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার

লে. কর্নেল এ.টি.এম. হায়দারের পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ হায়দার। তিনি ১৯৪২ সালের ১২ই জানুয়ারি কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ ইসরাইল ও মাতা হাকিমুন নেসা। তাঁর গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের কান্দাইল গ্রাম।

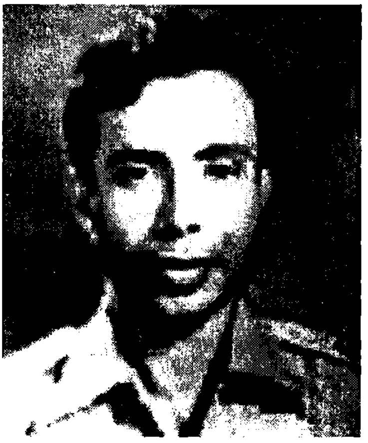

লে. কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার

এ.টি.এম. হায়দার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন পাবনা জেলার বীণাপানি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। ১৯৫৮ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের রামানন্দ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৬১ সালে কিশোরগঞ্জের সরকারি গুরুদয়াল কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করেন। ১৯৬৫ সালে লাহোর ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

এ.টি.এম. হায়দার ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে এমএসসি প্রথম পর্ব শেষ করার পর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন। তিনি কাকুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আর্টিলারি ফোর্সে অফিসার হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি পাকিস্তানের চেরাটে স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপ (এসএসজি) বিষয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরে তিনি সুলতান ক্যান্টনমেন্টে যোগ দেন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত থাকেন। ১৯৭০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এ.টি.এম. হায়দার ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন এবং কুমিল্লা সেনানিবাসে তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ঢাকায় বদলি হন এবং এর কিছুদিন পরই পুনরায় কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলি হন।

এ.টি.এম. হায়দার ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাস ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হন। সেখান থেকে তিনি তেলিয়াপাড়া যান এবং কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কসহ মুসল্লী রেলওয়ে

www.pathagar.com

সেতু বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেন। এরপর তিনি মেলাঘরে সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অধীনে সেকেন্ড কমান্ডার নিযুক্ত হন। ক্যাপ্টেন হায়দার মেলাঘরে একটি স্টুডেন্ট কোম্পানি গঠন করেন এবং গেরিলাদের কমান্ডো ও বিস্ফোরক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ৭ই অক্টোবর মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কে ফোর্স গঠিত হলে ক্যাপ্টেন হায়দার কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধের পর তিনি দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭২ সালে কুমিল্লা সেনানিবাসে ১৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হল এ.টি.এম হায়দার এর অধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং মেজর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি লে. কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি রুমা সেনানিবাসে বদলি হন।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে লে. কর্নেল এ.এটি.এম হায়দার নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ ১১ই নভেম্বর উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ.টি.এম. হায়দার বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন। উল্লেখ্য, তাঁর বোন ডা. সিতারা বেগমও মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মো. আবদুল হামিদ বর্তমানে বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি। তিনি নবম জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে ২৫শে জানুয়ারি ২০০৯ সাল থেকে ২৪শে এপ্রিল ২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যুর ৬ দিন পূর্বেই ১৪ই মার্চ ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আসীন ছিলেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি গণমানুষের নেতা। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সময় কালে ৭ বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। পাকিস্তান আমলে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রাজনীতির সূচনা। আদর্শে অটল থেকে তিনি ৪ দশকের বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয়। স্পষ্টভাষী, আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ আবদুল হামিদ তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছেও জনপ্রিয়। স্থানীয়ভাবে তিনি সকল দলের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। গণমানুষের নেতা আবদুল হামিদ-এর জন্ম ১লা জানুয়ারি ১৯৪৪। তাঁর পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন কামালপুর গ্রামে পিতা মরহুম হাজী মো. তায়েব উদ্দিন ও মাতা মিসেস তমিজা খাতুন। লেখাপড়া শুরু করেন কামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। নিকলী জি.সি. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে ১৯৬৯ সালে গুরুদয়াল কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএল.বি পাস করে কিশোরগঞ্জ বারে যোগ দেন।

www.pathagar.com

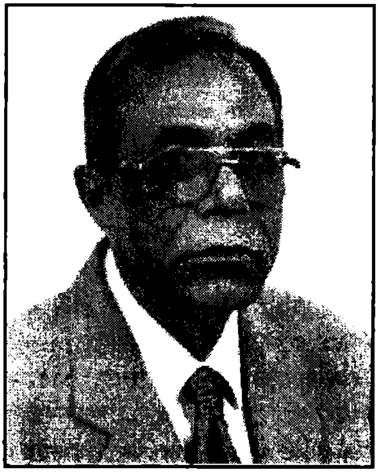

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

জনাব আবদুল হামিদ ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬১ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ১৯৬৩ সালে কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজে ছাত্র সংসদে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিশোরগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কারণে ১৯৬৮ সালে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৭০-এ ময়মনসিংহ-১৮ নির্বাচনী এলাকা থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (Member of National Assembly-MNA) নির্বাচিত হন। ২৩শে মার্চ ১৯৭১-এ তাঁর নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জের রথখলা মাঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের মেঘালয়ে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং ক্যাম্পের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি মুজিব বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭১ সালে নির্বাচিত এমএনএ হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৬-৭৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৮৬ সালে কিশোরগঞ্জ-৫ (ইটনা-অষ্টগ্রাম-মিঠামইন) নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি পুনরায় এম.পি. নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা ১৯৯৬ সালে ১৩ই জুলাই নির্বাচিত হলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার। স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১০ই জুলাই ২০০১ পর্যন্ত। আব্দুল হামিদ স্পিকার নির্বাচিত হন ১১ই জুলাই ২০০১। দায়িত্ব পালন করেন ২৮ অক্টোবর ২০০১। ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। নির্বাচিত

www.pathagar.com

হলেন সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা নভেম্বর ২০০১ সালে। তিনি নবম জাতীয় সংসদের সদস্য ও স্পিকার নির্বাচিত হন। জননেতা আবদুল হামিদ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সভাপতি, কিশোরগঞ্জ জেলা বার এসোসিয়েশন (১৯৯০-৯৬)। জীবন সদস্য ও নির্বাহী সদস্য কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরি, জীবন সদস্য, কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, কিশোরগঞ্জ ইউনিট। জীবন সদস্য, কিশোরগঞ্জ রাইফেলস ক্লাব, সম্মানসূচক সদস্য, কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

আবদুল হামিদ রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারে কাজ করেছেন। তিনি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। মিঠামইন কলেজ, ইটনা কলেজ, মিঠামইন হাইস্কুল, ইটনা গার্লস হাইস্কুল, তমিজা খাতুন গার্লস হাইস্কুল, এলংজুরি জুনিয়র হাই স্কুল, আব্দুল্লাহপুর জুনিয়র হাই স্কুল, অষ্টগ্রাম আব্দুল ওয়াহেদ জুনিয়র হাই স্কুল, কিশোরগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর স্ত্রী মোছাম্মৎ রাশেদা খানম কিশোরগঞ্জ জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী। তাঁদের তিন ছেলে এবং এক মেয়ে।

নন্দিত জননেতা আবদুল হামিদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিষ্ঠাবান, ভাটির শার্দুল হিসেবে মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম তাঁর পিতা শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের যোগ্য উত্তরসূরি। যিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে রয়েছেন। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম পিতার কর্মস্থল ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার যশোদলপুর বীরদামপাড়া গ্রামে। ১৯৬৮ সালে তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৭০ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি এক শিক্ষা সফরে লন্ডন গেলে সেখানে থেকে যান।

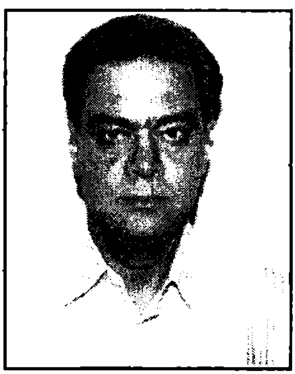

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম

www.pathagar.com

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ময়মনসিংহ শহরে স্কুল ও কলেজ জীবনে তিনি ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্ররাজনীতি শেষে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে কিশোরগঞ্জ সদর আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বিমান, পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও দলীয় মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সাধারণ নির্বাচনে বাধ্য করা, দেশে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০০৮ সালে সাধারণ নির্বাচনে তিনি পুনরায় কিশোরগঞ্জ সদর ও হোসেনপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের কিশোরগঞ্জ জেলাবাসীর গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ তখন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা ছিল। কিশোরগঞ্জ মহকুমা তথা বর্তমান জেলার রয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার টালবাহানার মাধ্যমে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় দেশের ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ। স্লোগান তোলে 'তুমি কে, আমি কে, বাঙালী বাঙালী।' 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।' 'তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব' 'জয় বঙ্গবন্ধু, জয় বাংলা।'

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জন সমুদ্রে পাকিস্তান সরকারের শাসন শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে বাঙালির রক্তে রঞ্জিত করে ঢাকার রাজপথ। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

২৬শে মার্চ রাতেই কিশোরগঞ্জ শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. এ. এ. মাজহারুল হক-এর টেলিফোনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র' রিসিভ করেন তৎকালীন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ ও কটিয়াদী থানা আসনের সে সময়ের নির্বাচিত এম.পি. এ. মোস্তাফিজুর রহমান খান ওরফে চুন্নু মিয়া।

আর ওই রাতেই ছাত্রনেতা লিয়াকত হোসাইন মানিক মিয়া ও ক্রিসেন্ট প্রেসের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী কাজী মো. মহসিনের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি মাইকিং করে কিশোরগঞ্জ শহরে প্রচার করে দেন।

শুরু হয় প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি। ২৩শে মার্চ ১৯৭১-এ কিশোরগঞ্জে তখন তরুণ এম.এন.এ. মো. আবদুল হামিদ স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা পতাকা উত্তোলন করেন প্রথম কিশোরগঞ্জ শহরস্থ রথখলা ময়দানের এক উত্তাল জন সভায়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকসহ সাধারণ জনতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই মানচিত্র আঁকা পতাকা এলাকার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

মানচিত্র আঁকা পতাকা কিশোরগঞ্জে তৈরি করেছিলেন স্থানীয় শহরস্থ রথখলা মডার্ন টেইলারি হাউস-এর মালিক ও কাটিং মাস্টার প্রয়াত আব্দুল মজিদ ওরফে ময়না মিয়া। পতাকার নমুনা স্বরূপ একটি হ্যান্ডবিল ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছিলেন তখনকার ছাত্রনেতা প্রয়াত আলমগীর হোসেন সাবেক এম.পি.। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে বাঙালি হত্যা অভিযান শুরু করেছিলেন তা সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, নারীপুরুষসহ বাঙালি সেনা সদস্য, ইপিআর, পুলিশ হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান হানাদার সেনাবাহিনী বিশ্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক গণহত্যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের এক নির্জন কারাগারে বন্দি করে রাখেন।

৩০শে মার্চ বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন সেনাদলসহ ২নং ইস্ট বেঙ্গলকে একীভূত করে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মেজর সফিউল্লাহ তখন জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। চলে আসেন ময়মনসিংহ শহরে।

মেজর কে. এম. সফিউল্লাহর নেতৃত্বাধীন বাঙালি সৈনিকেরা ময়মনসিংহ শহর থেকে তার হেডকোয়ার্টার কিশোরগঞ্জ শহরে স্থানান্তরিত করেন। কিশোরগঞ্জ শহরস্থ আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে একটি শক্ত সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। তিনি এখানে অবস্থান করে স্থানীয় ছাত্র-জনতাদের একত্র করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সাময়িক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করণের কাজ চালিয়ে যান। সিদ্ধান্ত নেন ঢাকা আক্রমণের। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেজর সফিউল্লার নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রে দীক্ষিত একটি প্রশিক্ষণরত দল গড়ে তুলতে সক্ষম হন। ওই দলটি পরবর্তীতে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুক্ত করেছেন। এ দলের অনেকেই

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে স্বাধীনতা উত্তর 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে শহীদ আতিক বীর প্রতীক, শহীদ খায়রুল বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম খান পাঠান বীর প্রতীক, বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল হক বীর প্রতীক এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এদিকে সে সময়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলেন কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান তৎকালীন বাঙালি সেনাকর্মকর্তা মেজর এ.টি.এম. হায়দার, তাড়াইলের মেজর জেনারেল মো. আবদুল মতিন ও কুলিয়ারচরের মেজর জেনারেল মো. আইন উদ্দিন। মেজর সফিউল্লাহ কিশোরগঞ্জ থেকে চলে যাওয়ার সময় মেজর মতিন ও মেজর আইন উদ্দিন তারা উভয়ে একসাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। চলে যান ৩ নম্বর সেক্টরে। ২ নং সেক্টরের মেজর হায়দার তখন ক্যাপ্টেন। ১৪ই এপ্রিল বিকাল ৩ ঘটিকায় একটি কয়লার ইঞ্জিন চালিত ২ টি বগি নিয়ে কুমিল্লা থেকে কিশোরগঞ্জ শহরে আসেন। সেদিন তার সঙ্গে ছিলেন ৬ জন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডারসহ বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য। তিনি কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ তারের ঘাট ব্রীজ একটি শক্তিশালী ডিনামাইট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। পাকিস্তানি বাহিনী যাতে এ সড়ক পথ দিয়ে কিশোরগঞ্জ আসতে না পারে। একই দিনে একইভাবে কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের মুসুল্লি এলাকার রোল ব্রীজটিও একটি ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

ওই দিন রাতেই তাদের বহনকারী সেই ট্রেন যোগে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। এর কিছুদিন পর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি করে তার অনুপস্থিতিতে কিশোরগঞ্জের কৃতীসন্তান সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিশোরগঞ্জবাসীর আরও গৌরবের বিষয় এই যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রবাসী সরকারের যে ৪ জন উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম এবং একজন ছিলেন কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদী থানার কৃতী সন্তান প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মনোরঞ্জন ধর। তিনি স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জ ৩ নম্বর ও ৫ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। ১৪ই এপ্রিল সর্ব প্রথম কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভৈরব থানা সদরের ভৈরব বাজারে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী হেলিকপ্টার যোগে আক্রমণ ও আগমন করে। হেলিকপ্টারে ছত্রীসেনা অবতরণ করে মাদিনী গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে এবং গজারিয়া ইউনিয়নের বাঁশগাড়ি গ্রামে অবসর প্রাপ্ত বাঙালি সেনাসদস্য মো. সাঈদ দর্জিকে সর্বপ্রথম গুলি করে হত্যা করে। একই দিনে ভৈরব পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী এলাকা পানাউল্লার চরে প্রায় ৫শত নিরীহ নিরস্ত্র নারীপুরুষ ও শিশুকে একত্রে পেয়ে গুলি করে হত্যা করে। ওই দিন ছিল ১৪ এপ্রিল বাংলা পহেলা বৈশাখ বাঙালির ঐতিহ্যবাহী লোকমেলাসহ বাজারে ব্যবসায়ীদের হালখাতা ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ উৎসব।

www.pathagar.com

১৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ভৈরব থেকে একটি বিশেষ ট্রেন যোগে সর্বপ্রথম কিশোরগঞ্জ মহকুমার সদর শহরে হানাদার পাকিস্তানিবাহিনী প্রবেশ করে। কিশোরগঞ্জ হয়ে ওঠে তখন অন্যতম যুদ্ধক্ষেত্র। বাঙালি নিধন লীলাক্ষেত্র। পাক বাহিনী ট্রেনটি প্রথমে যশোদল রেলস্টেশনে এসে থেমে যায়। সেখানে প্রবাসী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি বীর দামপাড়া নামক গ্রামের পাশে যশোদল রেল স্টেশন সংলগ্ন হিন্দু পাড়ার দীনেশ চন্দ্র ভৌমিকের বাড়িতে অগ্নি সংযোগের পর স্থানীয় সাবপোস্ট অফিস সংলগ্ন পাকা পুকুরঘাটে তরুণী গোস্বামীকে গুলি করে হত্যা করে। তরুণী গোস্বামী কিশোরগঞ্জ সদর মহকুমার সর্বপ্রথম শহীদ। আর মো. সাঈদ দর্জি কিশোরগঞ্জ মহকুমার প্রথম ভৈরব থানার শহীদ।

১৯ এপ্রিল পাক বাহিনী বহনকারী ট্রেনটি কিশোরগঞ্জ সদর রেল স্টেশনের পূর্ব-দক্ষিণ পাশের সিগন্যাল পয়েন্টের কাছে এসে আবার থেমে যায়। ট্রেনের বগি থেমে নেমে পড়ে সব পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী। সে সময়ে রিকশাচালক মো. জজ মিয়া নামের এক তরুণ কে লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করে। রেল লাইনের সমান্তরাল পথ ধরে ঠিক বরাবর উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে একরামপুর রেল ব্রীজের পাশে শামস উদ্দিন নামে এক পাগলা মামাকে গুলি করে হত্যা করে। কেউ কেউ পাগলা মামাকে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর নামেও ডাকত। মুসলিম সাধক হিন্দু সন্ন্যাসী বেশে চলাফেরা করত শামস উদ্দিন। গ্রামের বাড়ি ছিল করিমগঞ্জ। পাকিস্তানি বাহিনী দল বেঁধে মার্চ করতে করতে পুরান থানার পথ ধরে। শহরে প্রবেশ করেই পুরান থানার ক্ষুদ্র পান দোকানদার ধীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার খড়মপট্টি এলাকার যতীন্দ্র পাল, কালাচাঁদ সরকারের স্ত্রী জগনদা সুন্দরী সরকার, রমেশ চন্দ্র দে, রশিদাবাদ গ্রামের সোনাধর ভূঞার ছেলে গুরুদয়াল কলেজের পিয়ন আব্দুল খালেক ভূঞা, হারুয়া এলাকার আবদুর রাজ্জাকের ছেলে তরুণ রিকশাচালক আবদুল খালেক প্রমুখকে গুলি করে নরহত্যার এক ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করে। ১৯শে এপ্রিল থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২২৯ দিন অর্থাৎ ৭ মাস ১৪ দিন কিশোরগঞ্জ মহকুমা সদর শহরে পাক বাহিনীর মেজর কুখ্যাত ইফতেকার আহমেদ শতশত বাঙালিকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী কিশোরগঞ্জ ছেড়ে চলে যায়। গোটা কিশোরগঞ্জ শহর তখন রাজাকারের রাজ্য।

বিশেষ করে যশোদল এলাকার বড়ইতলা নামক স্থানে ১৯৭১ সালের ১৩ই অক্টোবর আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৪০০ শত নিরীহ বাঙালিকে ধরে এনে এক সাথে বসিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মিলিশিয়াও এ দেশীয় দোসর রাজাকার বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তাদেরকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছিল। উক্ত বড়ইতলা স্থানটি বর্তমানে এ জেলার সর্ববৃহৎ বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয়টি ভৈরব পানাউল্লার চর বধ্যভূমি। এবং তৃতীয়টি ইটনা উপজেলার বয়রা নামক বধ্যভূমি। ভৈরব থানার মানিকদী গ্রামের প্রায় ৫টি মসজিদের সকল মুসল্লি, নিকলী থানার দামপাড়া হিন্দু পাড়ার সকল হিন্দু পুরুষকে ধর্মান্তরিত করে গায়ে পাঞ্জাবী-পায়জামা এবং মাথায় টুপি পড়িয়ে নিকালী থানা সদর শ্মশানঘাটে একত্রে বাঁধা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। এবং ভৈরবের মানিকদীর মুসল্লিদের মসজিদের অভ্যন্তরেই গুলি করে হত্যা করেছিল।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ সদর শহর মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৫শে অক্টোবর ১৯৭১ সালে সচিহাটা রোল ব্রীজে। এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন পাক সৈন্য নিহত হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ২৬শে নভেম্বর কিশোরগঞ্জ শহরস্থ শহরতলির প্যারাভাঙ্গা নামক স্থানে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী দুই অকুতভয় যোদ্ধা ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। স্বাধীনতা উত্তর এ দুজন বীরমুক্তিযোদ্ধার একজন খায়রুল জাহান অন্যজন সেলিম মিয়া 'বীর প্রতীক' খেতাব লাভ করেন। তৃতীয় যুদ্ধটি সংঘটিত হয় মূল শহরে ১৬ই ডিসেম্বর। এ যুদ্ধে শহীদ হন বিন্নগাঁও বগাদিয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা গুরুদয়াল কলেজের তৎকালীন ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নিজাম উদ্দিন। এক পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে পা বিচ্ছিন্ন হয়ে আহত হন শিশু আনোয়ারা বেগম।

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের যুদ্ধে কিশোরগঞ্জ মহকুমার সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শত্রুমুক্ত থানার নাম নিকালী। ৫ নম্বর সেক্টরের বড় ছড়া সাব-সেক্টরের কোবরা কোম্পানীর দু-আই-সি অর্থাৎ সহ অধিনায়ক কমান্ডার রিয়াজুল ইসলাম খান বাচ্চু মিয়ার নেতৃত্বে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হওয়ার মাধ্যমে ১৯শে অক্টোবর ১৯৭১-এ নিকলী থানা শত্রুমুক্ত হয়।

এভাবে মহকুমার প্রতিটি রনাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণের বিনিময়ে এ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়। ২৩শে অক্টোবর কুলিয়ার চর থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ২৭শে অক্টোবর বাজিতপুর থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ২৮শে অক্টোবর কটিয়াদী থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ৮ই নভেম্বর অষ্টগ্রাম থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ১৪ই ডিসেম্বর করিমগঞ্জ থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ৩রা ডিসেম্বর পাকুন্দিয়া থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ১৪ই ডিসেম্বর তাড়াইল থানা শত্রুমুক্ত দিবস। ১৯শে ডিসেম্বর ভৈরব থানা শত্রুমুক্ত দিবস। আর ১৭ই ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ সদর মহকুমা শহর শত্রুমুক্ত দিবস।

১৬ই ডিসেম্বর সারাদেশসহ ঢাকা শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় দিবসের আনন্দ বিজয় উল্লাস পালিত হলেও কিশোরগঞ্জে সদর মহকুমা শহর শত্রুমুক্ত হয় ১৭ই ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার। এই একদিন শহরস্থ শহীদী মসজিদ কেন্দ্রিক পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর দালাল আতাহার আলীর নেতৃত্বে রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও আল মুজাহিদ বাহিনী সরাসরি যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ঝরেছে। মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জের মসজিদ মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের অবস্থান ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে। শহরের বিখ্যাত শহীদী মসজিদের তৎকালীন খতিব নেজামে ইসলামী পার্টির প্রধান মাওলানা আতাহার আলী, স্থানীয় আনোয়ার উলুম আলীয়া মাদ্রাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন এবং যশোদলের তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত মাওলানা লোকমান মৌলভী এই তিনজন মাওলানার নেতৃত্বে এ শহরে রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, আল মুজাহিদ ইত্যাদি বাহিনী গঠন করে 'শান্তি কমিটি' স্থানীয় মুসলিমলীগ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। কিশোরগঞ্জ সদর রেল স্টেশন সংলগ্ন ডাক বাংলোটি ছিল মেজর ইফতেকার আহমেদ

www.pathagar.com

এর বাঙালি হত্যা ও নারী নির্যাতনের প্রধান কেন্দ্র। হিন্দুদের দেয়া হতো বিশেষ পরিচয়পত্র।

মুক্তিযুদ্ধের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাক বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান এর জিওসি আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী এক অপারেশনে হেলিকপ্টার যোগে কিশোরগঞ্জের ইটনা থানা সদরে ইটনার তৎকালীন দেওয়ান আবদুল রহিম এর আমন্ত্রণে এসেছিলেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অন্যদিকে ১৭ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ শহর শত্রুমুক্ত করতে ভারতীয় সীমান্তের ১১ নম্বর সেক্টরের রংরা সাব-সেক্টরের অধিনায়ক মিত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন নিরঞ্জন সিং চৌহান, টু-আই-সি কমান্ডার মৌরারী ও সহকারী কমান্ডার ধরম পাল সিং অটোয়ালসহ এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিবাহিনীর বিজয় উল্লাসে কিশোরগঞ্জ শহর শত্রুমুক্ত হয়। কিশোরগঞ্জে নিরীহ বাঙালি নিধনের দায়িত্বে ছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর টু-আই-সি ক্যাপ্টেন বোখারী। পাকিস্তানি নায়েক সুবেধার ফজল হোসেন। ফায়ারিং স্পট বা বধ্যভূমিগুলো ছিল শহরস্থ শৌল মারাব্রীজ, একরামপুর রেল ব্রীজ, সিদ্বেশ্বরী নদী ঘাট, মনিপুর নদীঘাট, গচিহাটা রেলব্রীজ, নীলগঞ্জ রেলব্রীজ, মানিকখালী বগামারা রেল ব্রীজ ইত্যাদি।

ট্রেনে বহন করে হত্যা করতে ধরে নিয়ে যে সব নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালিকে গুলি করার দায়িত্বে ছিল তার নাম রাজাকার কমান্ডার আবদুল জব্বার। রিকশা চালক আবদুল জব্বার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর রাজাকার কমান্ডার ছিল। বাঙালি হত্যার বহনকারী ট্রেনেই ছিল রাজাকার আবদুল জব্বারের ডিউটি। বাড়ি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া।

মুক্তিযুদ্ধে যে সব লোক ভারতের সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীতে যোগ দিতে পারেননি। তাদেরই একটি দল কিশোরগঞ্জের নিকালী ও বাজিতপুর থানার সীমান্তবর্তী গুরুই ও হিলচিয়া নামক এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে গঠন করেছিল একটি মুক্তিবাহিনী দল। এ দলের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান ছিলেন মো. আবদুল মুত্তালিব ওরফে বসু। কিশোরগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনী 'বসু বাহিনী' নামে পরিচিত। কিশোরগঞ্জ সদরে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা সরাসরি যুদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে কিশোরগঞ্জের যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন উৎসর্গ করে বাংলাদেশ তথা নিজের মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে স্বাধীনতা উত্তর 'খেতাবপ্রাপ্ত' বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকায় তাদের নাম চির উজ্জ্বল চির ভাস্বর হয়ে আছে। তাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কিশোরগঞ্জ সদর থানার শহীদ লে. কর্নেল এ.টি.এম. হায়দার (বীর উত্তম)। করিমগঞ্জ থানার শহীদ আবু মঈন মো. আশফাকুস সামাদ (বীর উত্তম)। ইটনা থানার শহীদ সিরাজুল ইসলাম (বীর বিক্রম)। পাকুন্দিয়া থানার শহীদ মো. বদিউল আলম বদি (বীর বিক্রম)। নিকালী থানার মো. মতিয়র রহমান (বীর বিক্রম)। কটিয়াদী থানার

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন এ.ওয়াই. এম. মাহফুজুর রহমান (বীর বিক্রম)। কুলিয়ারচর থানার মেজর সাফায়াত জামিল (বীর বিক্রম)। কুলিয়ারচর থানার শহীদ সিপাহী মো. লিলু মিয়া (বীর বিক্রম)। কুলিয়ারচর থানার শহীদ সেলিম মিয়া (বীর প্রতীক)। কিশোরগঞ্জ সদর থানার ক্যাপ্টেন (অব.) ডা. সিতারা বেগম (বীর প্রতীক)। কিশোরগঞ্জ সদর থানার সুবেদার মেজর ইদ্রিছ মিয়া (বীর প্রতীক)। কিশোরগঞ্জ সদর থানার শহীদ খায়রুল জাহান (বীর প্রতীক)। কিশোরগঞ্জ সদর থানার এ. কে. এম. রফিকুল হক (বীর প্রতীক)। তাড়াইল থানার মেজর জেনারেল মো. আবদুল মতিন (বীর প্রতীক)। কুলিয়ার চর থানার মেজর জেনারেল মো. আইন উদ্দিন (বীর প্রতীক)। কুরিয়ারচর থানার নায়েক সুবেদার নাজিম উদ্দিন (বীর প্রতীক)। ভৈরব থানার শহীদ সিপাহী আমির হোসেন (বীর প্রতীক)। বাজিতপুর থানার সিপাহী হারুন-অর-রশীদ (বীর প্রতীক)। করিমগঞ্জ থানার অনারারি ক্যাপ্টেন এম.এ.জব্বার (বীর প্রতীক)। ও হোসেনপুর থানার মো. নূরুল ইসলাম খান পাঠান (বীর প্রতীক) প্রমুখ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জের বীর বা বীরাঙ্গনা নারীদের অবদান কম নয়। গোটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশে সর্ব প্রথম বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিতা নারী কিশোরগঞ্জের সন্তান ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম। অস্ত্র হাতে যারা পুরুষের পাশে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে ইটনা থানার পায়ের তালা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নারী মিরাসী বেগম। নিকলী থানার গুরুই গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নারী সখিনা বেগম। বাজিতপুর সদর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা নারী আনোয়ারা বেগমের নাম উল্লেখযোগ্য। দেহে মেশিনগানের গুলি বিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন মিঠামইনের দুই নারী আহেনা বেগম ও মাহেনা বেগম।

কিশোরগঞ্জে অনেক নারী পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের তিরিশ লক্ষ নর-নারী আত্মাহুতি দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী বীরাঙ্গনা লাঞ্ছিত হয়েছে। ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেতু, ব্রীজ, কালভার্ট ধ্বংস করেছে।

সর্বশেষ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। নজির পাওয়া যাবে না। স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে আজ আমরা গর্ববোধ করি। অথচ ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আজ ও মেলেনি। কিশোরগঞ্জ গোটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক গর্বিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের কৃতী পুরুষ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের প্রথম উপ রাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ভাষা সৈনিক ও রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান এবং রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ কিশোরগঞ্জেরই সন্তান। ২ নম্বর সেক্টর এর সহ অধিনায়ক মেজর এ.টি.এম হায়দার ও দেশের প্রথম খেতাব প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম এরা কিশোরগঞ্জের গৌরব, কিশোরগঞ্জের অহংকার।

www.pathagar.com

ঞ. বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম প্রতিবাদ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা ঘটনার প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন কিশোরগঞ্জের কয়েকজন প্রগতিশীল ছাত্র ও যুবনেতা। কিশোরগঞ্জে '৭৫-এর ১৫ আগস্টে প্রথম প্রতিবাদ মিছিলে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন, অ্যাডভোকেট অশোক সরকার, অধ্যক্ষ হালিম দাদ খান রেজোয়ান, হাবিবুর রহমান, ডা. এনামুল হক ইদ্রিস, প্রয়াত সেকান্দর আলী ভূঁইয়া, পীযুষ কান্তি সরকার, অলক ভৌমিক, আকবর হোসেন খান, স্বপন গোপাল দাস, আলী আজগর স্বপন, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান মানিক, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, মতিউর রহমান, আবদুল আহাদ, অরুণ কুমার রউত, সৈয়দ লিয়াকত আলী বুলবুল প্রমুখ।

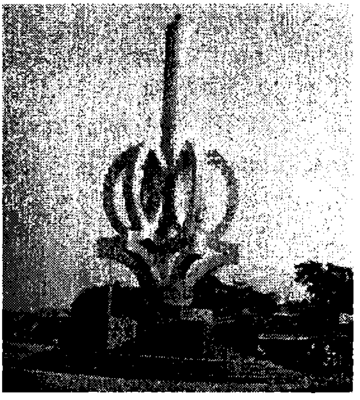

দুর্জয় স্মৃতিসৌধ, ভৈরব

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মধ্যযুগীয় কিশোরগঞ্জের মহিলা কবি চন্দ্রাবতী তার কাব্য সাহিত্যে বলেছেন– "গোলায় গোলায় ধান আর গলায় গলায় গান"- ছিল সেকালে কিশোরগঞ্জের লোকঐতিহ্য। আমাদের মাঝে অনেক সংগীত শিল্পী আজ আর বেঁচে নেই। তাদের অমর সংগীতগুলোই 'লোকসংগীত' নামে পরিচিত। এগুলো আধ্যাত্মিক ধরনের গান। যেমন– মামুদজান ফকিরের গান, ফকির চান্দের গান, আলাউদ্দিনের গান, মকবুলের গান, অখিল ঠাকুরের গান, অমর শীলের গান, যামিনী কুমার দেবনাথের গান, মোহাম্মদ মাতু মিয়ার গান, তাহের উদ্দিন খানের গান, আবদুল জলিলের গান, ইয়াকুব আলীর গান, আব্বাস উদ্দিনের গান, কানা বাছিরের গান, কানা স্বপনের গান, আ. রহিম ওরফে খেলু পাগলার গান, শারীরিক প্রতিবন্ধী মো. জামিরের গান, লাই বক্স এর গান, লাল চান্দের গান, পানু মাস্টারের গান, হারিছ মোহাম্মদের গান, সফর আলী ফকিরের গান, ইন্তাজ ফকিরের গান, খলিল ফকিরের গান, নূর হোসেনের গান, নূরে খান শাহ এর গান, ছাত্তার মিয়ার গান ও আনোল শাহ-এর গান উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

গ্রামীণ লোককবি, চারণ কবি আর চারণ বৈরাগীর লীলাক্ষেত্র কিশোরগঞ্জ। লোককবি, চারণ কবি ও চারণ বৈরাগীদের পাশাপাশি আর এক শ্রেণির বাউল সাধক সংগীত গায়ক কবি রয়েছেন যারা অঞ্চল থেকে অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে একতারা-দুতারা বাজিয়ে কথায় কথায় মুখে মুখে গান রচনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দিয়ে গীত পরিবেশন করে সাধারণ নর-নারীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সহজ সাধনায় পারলৌকিক মুক্তির সন্ধানে এবং এ জেলায় এমনি অনেক সাধক লোককবিদের সংখ্যাই বেশি। যুগে যুগে এসব বাউল সাধক কবিগণ আজীবন গুরু সাধনায়, সংগীত সাধনায় তাদের সাধন ভজন পদ্ধতি কথা ও গানে শিষ্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে একদিন তারা বিলীন হয়ে গেছেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দরা সেই সব সাধক কবির সাধন ভজনের নির্দিষ্ট স্থান বা নশ্বর দেহ রক্ষার স্থানকে চিহ্নিত করে তৈরি করেছে তাদের পবিত্র পীঠ। যার ফলে কিশোরগঞ্জ জেলার উজান-ভাটি-হাওর জনপদের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এমনি অসংখ্য মাজার-মন্দির-মঠ-আখড়া আস্থানা। এসব মাজার-মন্দির-আখড়া-খানকায় বংশ পরম্পরায় এ পথের অনুসারীরা গানে-গানে, কথায়-কথায়, শ্রদ্ধা ভক্তিতে পির ও গুরুর ভজন-কীর্তনের পাশাপাশি মুর্শিদী-মারফতি গান গেয়ে মুক্তির পথ খোঁজেন। যে পথ সাধন সংগীতের সুর লহরীতে ধ্বনিত হয়– 'হেল কুড়িগাই, বন্দি গা থেকে বাড়ি যাই'। নিম্নে ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জ জেলার বিখ্যাত, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো :

রামু সরকার

কিশোরগঞ্জের ঊনবিংশ শতকের কবিয়ালদের মধ্যে রামু সরকার ছিলেন সবচেয়ে প্রতিভাধর কবি। রামু সরকার জাতিতে ভূঁইমালী ছিলেন। তিনি ১২৭৪ সনের বাংলা চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল রামপ্রসাদ এবং মাতার নাম ছিল রায়মনি। কবিয়াল বিজয় আচার্য ১৩২১ সনের সৌরভ পত্রিকায় মাঘ মাসের সংখ্যায় রামু সরকারের উপর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন। কবিয়াল রামু সরকার বিখ্যাত হবার পিছনে রামুর জন্মস্থান আউট পাড়ার বহুদর্শী পণ্ডিত সাধু ব্যক্তি অমরচন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান ছিল ব্যাপক। অমর চন্দ্র ছিলেন রামু সরকারের শিক্ষাগুরু।

রামু ছিলেন স্বভাব কবি। তাই বাল্যকাল থেকে তার কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। রামুর কবি প্রতিভা লক্ষ করে অমরচন্দ্র সাথে সাথেই তাকে শিষ্য করে নিয়েছিলেন।

রামু ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু তার স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। বিজয় নারায়ণ আচার্য বলেছেন, রামুর স্মরণশক্তি ছিল সংসার ছাড়া। একবার যা শুনতেন আর ভুলতেন না।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভগবত, চণ্ডী, তন্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ মুখে মুখে শুনে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ১৪ বছর বয়সে রামু সরকার কবির দলে প্রবেশ করে ২০ বছর বয়সের মধ্যেই কবিয়াল হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

রামু সরকার চৌপদী ছড়া ছাড়াও পাঁচালীতে ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় তিনি পাঁচালী বলতে বলতে ভারাক্রান্ত হয়ে কেঁদে আকুল হয়ে পড়তেন বলে বিজয় আচার্য তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বিজয় আচার্য তিনিও একজন খ্যাতিমান কবিয়াল ছিলেন। অনেক সময় তার সাথেও কবিগানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হতেন রামু সরকার। একবার বিজয় আচার্য শাক্তের ভূমিকা নিয়ে রামু মালীকে বৈষ্ণব বানিয়ে ঠাট্টা করে আসরে বলেছিলেন–

জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী।
রামুমালী আসরে উঠে এর উত্তরে বলেন–
তুমি বল্লে– নাকি জাত মারা সব নেড়ে বৈরাগী
জাতি কুল, সেতো স্থূলের দেশের গোল
কুল কি মানে প্রেমানুরাগী?
(আমরা) রাধাকৃষ্ণ প্রেম সাগরে ডুবায়েছি জাতিকুল
পাণ্ডাঠাকুর, কুল থাকতে আর অকুলেতে কেউ পাবে না কুল।
শ্রীকৃষ্ণ জগত পতি, জীবমাত্র তাঁর সন্ততি,
সম্প্রতি বুঝ জাতির মূল,
তুমি দেখতে ভাল মাকালের ফল,
অথবা মান্দারের ফুল।।
জাতিকুল সেতো স্থূলের দেশের গোল কুল কি মানে প্রেমানুরাগী।

একবার বিক্রমপুরের এক কবিয়াল রামু মালীর সাথে কবিগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এক পর্যায়ে বিক্রমপুরের কবিয়াল পাণ্ডব বর্জিত স্থান পূর্ব ময়মনসিংহের অধিবাসীকে অসভ্য আখ্যায়িত করে বিদ্রুপ করলেন। রামু মালী উত্তরে বললেন–

"পূর্ব ময়মনসিংহ পাণ্ডব বর্জিত স্থান এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কারণ পাণ্ডবরা দ্রৌপদিকে নিয়ে পূর্ব ময়মনসিংহে আসতে চাইলে তখন শম্ভুগঞ্জে খেয়ানৌকার মাঝি জানতে চাইল, 'তোমরা দেখছি পাঁচজন পুরুষ, আর তোমাদের সাথে একজন স্ত্রীলোক, এই স্ত্রী লোকটি কে? পাণ্ডবরা উত্তর দিলেন তিনি আমাদের স্ত্রী। মাঝি বল্লেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো কোনদিন শুনিনি? কারণ আমরা একজন পুরুষ পাঁচটি স্ত্রী রাখতে পারি আর তোমরা পাঁচজন পুরুষ একজন স্ত্রী। না, তোমাদেরকে আমি কিছুতেই আমাদের পূর্ব ময়মনসিংহে যেতে দেবনা, তোমরা বরং বিক্রমপুরে চলে যাও সেখানে নারীর সতীত্বের কোন বিচার করা হয় না।" পূর্ব ময়মনসিংহ বলতে বুঝায় নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলা।

এই বলে রামুমালী গান ধরলেন– সেই সাথে দোয়ারীরাও ধরলেন–
"ভাওয়ালে ভদ্রতা নাস্তি জল নাস্তি টেঙ্গরে
বিক্রমপুরে সতিত্ব নাস্তি পোলা জন্মায় চাকরে।"

একবার রামুমালী সামান্য তালুক খরিদ করেছিলেন। কাইট্যাল গ্রামে রামুমালী কবিগানে অংশগ্রহণ করতে এলে ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূ-স্বামীরা রামুকে প্রশংসা করে বলেন রামু বড় ভাগ্যবান। প্রতিপক্ষ হয়ে আসরে গান গাইতে এসেছিলেন কিশোরগঞ্জেরই আরেক খ্যাতিমান কবিয়াল রামগতিশীল। রামুমালীর তালুকদার হয়ে জাতে উঠার চেষ্টার স্বরূপ উদঘাটন করে রামগতিশীল গাইলেন–

"রামু বড় ভাগ্যবান কর্তারা শুনছেন।
বল্লে আমি দোষী অই আসল কথা কই কৈ।
একশ টাকার তালুক কিন্না তিনশ টাকা দেন

www.pathagar.com

আওলাত কইরা কাওলা লয়
মাজনেরে দেয় রেন
দখল পায়না পচামালী
এমন তালুক কল্ল কেন?

রামগতি শীলের টপ্পার উপর রামু মালী তাৎক্ষণিক জবাব না দিতে পেরে, রামু মালী রামগতি শীলের মুখের বসন্তের দাগ নিয়েই বিদ্রুপ করে গাইলেন–

"তোমার মুখ খানা যে ডায়মন্ডকাটা"

রামগতি শীল এবার বল্লেন–

"আচ্ছা ঢকের পুরুষ
নাই কোন দোষ দেখতে চমৎকার
এমন ঢকের পুরুষ দেখি নাই কো আর–
ঘারটা মোটা চোখটি ছোট
মাথাটা বান্দরের ওল
রামুমালী কেওয়া বনে
ফুটছে গোলাপ ফুল।"

একবার রামু মালী নেত্রকোণার তালুকদার, দাগু বিশ্বাসের বাড়িতে কবিগানের আসরে আমন্ত্রিত হলেন। সেখানে অন্য কবিয়ালরাও গান গাইতে এসেছেন। আসর শুরু হবে কিন্তু রামু মালীর পাত্তা নেই। দাগু বিশ্বাস নির্দেশ দিলেন রামুকে খুঁজে বের করে আনতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রামু কে পাওয়া গেল দাগু বিশ্বাসের বাড়ির কাছেই এক বৈষ্ণবের আখড়ায় তন্ময় হয়ে বসে আছেন। লোকজন রামু মালীকে ঢোল করতাল বাজিয়ে একজন মহারাজার মতো আসরে নিয়ে এলো। আসরে এসে গাইলেন–

রাধার পূর্বরাগ বিষয়ে রামুমালীর একটি গানের অংশ নিম্নরূপ :

"সে রূপ দেখে চিত্রপটে
দাগ লাগিল চিত্ত পটে।
চাইলে দেখি আকাশ পটে
সে কপটের দাপট অতিশয়।।
ভুলতে গেলে যায় না ভুলা
তাইতে হলো পাগল ভোলা
আমার হইল সে বোল বলার ভয়
বুক জোড়া সেই শঠের রূপ মিষ্ট অতিশয়।।"

সাহিত্যিক বিচারে কবিয়াল রামুমালীর পূর্বরাগ বর্ণনার শব্দ বিন্যাস, শব্দ বিচার এবং বিষয় বর্ণনার ধারাটি চমৎকার। বিজয় আচার্য বলেছেন, রামু-রামগতি বসন্তের কোকিল ছিলেন। তাঁদের কুহু কুজনে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কাব্য কানন সর্বদাই আনন্দে মুখরিত থাকত।

www.pathagar.com

রামগতি শীল

কিশোরগঞ্জের ত্রিরাম কবিয়ালের মধ্যে রামগতি শীল ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন নাপিত সম্প্রদায়ভুক্ত। রামগতি শীল জন্মগ্রহণ করেছিলেন করিমগঞ্জ থানার গাংগাইল গ্রামে। ছোটকাল থেকেই তিনি কবিগানের দলে যোগদান করেন। তার বাকচাতুর্য এবং অসাধারণ কাব্য প্রতিভার দ্বারা এক সময় তার দলের কবিয়াল সরকার নিযুক্ত হন। রামগতিকে চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহের 'দাশু রায়' আখ্যা দিয়েছিলেন।

রামগতির আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অভাবের তাড়নায় তিনি এক সময় একই থানার সুকুন্দিন গ্রামে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। সেখানেও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি কৈলাটি ফতেপুর গ্রামের দাগু বিশ্বাসের স্মরণাপন্ন হন। দাগু বিশ্বাসের অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলেও এক সময় অভাবের তাড়নায় সেই স্থানটিও ত্যাগ করে আঠারবাড়ির রাজা মহিম চৌধুরীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে কিছু জমা-জমি লাভ করেন। এক কথায় বলা যায় কিশোরগঞ্জের গৌরব প্রতিভাধর এই কবির জীবনটা ছিল বড়ই বিড়ম্বিত।

রামগতি শীল ছিলেন স্বভাব কবি। আসরে তিনি কি গাইবেন তা আগে থেকে চিন্তা করতে হতো না। তাৎক্ষনিক টপ্পা রচনায় রামগতির প্রকাশ ভঙ্গি ছিল চমৎকার। একবার চন্দনকান্দির তালুকদার গিরীশ চন্দ্র চৌধুরীর শ্বশুর বাড়িতে কবিগানের আসর হয়। এই আসরে রামু রামগতি এবং বিজয় আচার্য এই তিন কবিয়াল আমন্ত্রিত হন। আসরে তিনজনেই অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যায়ে তিন কবিয়ালকেই গিরীশ বাবু আদেশ করলেন টপ্পা রচনা করতে। বিষয় হচ্ছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের যুবতী স্ত্রী শারদীয় দুর্গাপূজার আগে একটি নতুন শাড়ির জন্য স্বামীর সঙ্গে কোন্দল করছে। আদেশ হলো প্রথমে রচনা করে গাইবেন রামগতি। তারপর রামুমালী পরে বিজয় আচার্য।

রামগতি গাইলেন :

"আশ্বিন মাসে বঙ্গ দেশে
এসেছে আনন্দের জোয়ার
মরি হায়রে যতধনী লোক
কর্তেছে মনের সুখে সাজসজ্জা সম্ভার।
তাই দেখে এক নতুন বামনী
বামনের কাছে শাড়ী চায়।
কড়ার কাঙ্গাল বামন বাঙ্গাল
জঞ্জাল ঘটাল বিধাতায়।
দিন গেল কোন্দল করে
ব্রাহ্মণ তো ক্ষুধায় মরে
রানতে কেডা যায়?"

একবার কবিগান গাইতে রামগতি শীল রামেশ্বরপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তার এক টাকা চৌদ্দ আনা দামের জুতা জোড়া চোরে নিয়ে যায়। আসরের শেষ পর্যায়ে টপ্পায় রামগতি গাইলেন–

"কালে কালে কলির ধর্ম হতেছে প্রবল
রামু মালীর সঙ্গেতে কবি সংগীত গাইতে

www.pathagar.com

এথা এসে পেয়েছি তার ফল।
অকস্যাতে এরাজ্যের মঠের মাথায় পড়ল কুঁড়।
এখন আর সাবেক ধরান নাই সে রামেশ্বরপুর
ভদ্রলোক কয়েকজন বুদ্ধে সাধ্যে বিলক্ষণ
যাদের করি জোর
সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে কয়েক শালা জুতাচোর।
দলের অন্যরা গেয়ে উঠল–
"এখন মঠের মাথায় পড়ল কুঁড়
সেই ভদ্রদের জাত মেরেছে কয়েক শালা জুতাচোর।"

রামগতিশীল এভাবেই বাড়ির তালুকদারকে মঠের সাথে তুলনা করে বিদ্রুপটি টপ্পায় খুবই চমৎকারভাবে উপস্থাপন করলেন।

রাম কানাই

কিশোরগঞ্জের ত্রিরাম কবিয়ালের অন্যতম রাম কানাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহরের গাইটালে। বর্তমান গাইটাল শ্মশান খলার উত্তর দিকে যে যুগিপাড়া গ্রামটি ছিল সেই গ্রামেই রাম কানাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে ঐ যুগিদের কোন বাসস্থান ঐ স্থানটিতে আর নেই। বিগত শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত রাম কানাইয়ের পরিত্যক্ত ভিটাটি দেখা যেত।

রাম কানাইয়ের এক শিষ্য ছিল সদর থানার কাতিয়ার চর গ্রামের কাসুঠাকুর। কাসুঠাকুর রাম কানাই সম্পর্কে অনেক কথাই মুখে মুখে বলেছেন কিন্তু সেগুলো লিখিত হয়নি। তাই আজ এই প্রতিভাধর কবিয়াল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারিনি।

কবিয়াল বিজয় আচার্য রাম কানাই সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেছিলেন তার থেকে গবেষক যতীন সরকার তার প্রবন্ধে কিছু উপস্থাপন করেছেন। আমরা তা থেকেই কিছুটা আলোচনা উপস্থাপন করলাম।

রামকানাই ছিলেন যুগী সম্প্রদায়ের লোক। রামু মালী, রামগতি এবং রাম কানাই প্রায় সময় একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে কবি গানের আসরে অংশগ্রহণ করতেন।

একটি আসরে রাম গতিশীল-রামুকে যুগী বলে বিদ্রুপ করে গাইলেন–
যুগী কখনও হিন্দু নয় তার সন্দেহ কি আছে
মহারাণীর আমলে
মিলে সবে যুগীর দলে
দরখাস্ত লেখে কোম্পানির কাছে।
পাঁচশ টাকা নজর দেওয়া যুগীপোড়ার সনদ লয়।
অইল না যুগী পোড়া দেশ জুইড়া আছে পরিচয়।"
সুতার বাড়ীর রাম দল
কাইট্টা দিল চিতাশাল
আগুন দিতে কয়
গইর দিয়া শালা পইড়া গেল
আর কি যুগী পোড়া অয়

অইল না যুগী পোড়া দেশ জুইড়া আছে পরিচয়।

কবিয়াল ভগবান আচার্য্য আরও কিছুটা তীব্রভাবে বললেন–

যুগী জাতের মরণ বড় নটখটি
এই যুগী জাত মরলে পরে
তেছরা করে দেয় মাটি।

এবার রাম কানাই উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধভাবে সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে এরপর বললেন–

"আচ্ছা ঠাকুর এটাতো সত্য যে দু'বছরের কম বয়স্ক কোন ব্রাহ্মণ অথবা অন্যকোন সম্প্রদায় যেমন শীল, মালী, কর্মকার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়ে মারা গেলে তাকে দাহ না করে মাটিতে পুতে ফেলা হয়। তাহলে সেই ছেলে মেয়ের জন্ম দাতা কি আমাদের যুগী জাতের না তোমরা যারা চিতাশালে যুগীজাতকে দাহ করতে দেওনা তাদের?"

রামকানাইর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। তার বক্তব্যে আসরে শ্রোতামণ্ডলী ধন্য ধন্য রাম কানাই বলে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। এই ধরনের আরও অনেক তথ্য রামকানাই সম্পর্কে জানা যেত, যদি তার বিবরণ সংরক্ষণ করা হতো, গ্রন্থ আকারে ছাপা হতো।

ঈশান নাথ

কিশোরগঞ্জের কবিগানের ধারাবাহিকতায় বিগত শতাব্দীর কবিয়ালদের মধ্যে ঈশান নাথ উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার ভাটগাঁও ছিল কবিয়াল ঈশান নাথের জন্মস্থান।

সংরক্ষণের অভাবে প্রতিভাধর এই কবি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। যতদূর সম্ভব কিশোরগঞ্জের ত্রিরাম কবিয়ালদের মৃত্যুরপর ঈশান নাথ খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ঈশান নাথ সম্পর্কে তাড়াইল থানার বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করে প্রবন্ধকার যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে প্রমাণ মেলে তিনিও একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। কিশোরগঞ্জের কবিগানের ইতিহাসের যতটুকু উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে এই বিচিত্র মিশ্র সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়।

শুধু ভাষা ছন্দেই নয়–কবিয়ালরা তাদের তাৎক্ষণিক রচিত কবিতায় উপাদান হিসেবে শ্রোতাদের মানসিক প্রবণতার চাহিদা অনুভব করে ভাব আহরণের বিষয়টি ছিল খুবই চমৎকার। গানের কথা ছিল খুবই মূল্যবান লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশক এবং এর কিছু আগের কিশোরগঞ্জের কবিগানের নতুন কিছু তথ্য আমাদেরকে জানিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম খান।

তিনি বলেছেন আমাদের এই অঞ্চলে পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে মাঝে মাঝে কবির লড়াই অনুষ্ঠিত হতো। আমাদের কবিয়ালরা বেশ দক্ষতার সাথেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করে তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতেন।

এমনই একটি কবি গানের আসরের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন তিনি। হোসেনপুরের একটি কবিগানের আসরে দুই প্রতিদ্বন্দ্বি কবিয়াল একজন রাম অন্যতম রাবণ হয়ে আসরটি মাতিয়ে তুলেছিলেন। যিনি রাম গাইছেন হঠাৎ করেই ভুলে গেলেন 'লঙ্কা' কে পাড়ি দিয়েছিল এই বহুল আলোচিত বিষয়টি।

www.pathagar.com

কবিয়াল এই বিষয়টি ভুলে যাবার ফলে আসরে তার পরাজয় ঘটতে পারে বিবেচনা করে তার গানের মূল বিষয়বস্তু থেকেই সহকারীদের কাছে জানতে চেয়ে গাইতে লাগলেন–

"লঙ্কা যে পাড় হইল তোমরা জাননি? উত্তর দাও"

এই সুযোগে সহকারীরা বায়নার টাকার ভাগাভাগির বিষয় নতুন করে পাকাপোক্ত করার মওকা আবিষ্কার করল। কারণ প্রতিটি আসরে কবিয়াল বায়নার টাকার দশ আনা ভাগ গ্রহণ করতেন আর সহকারীরা পেতেন ছয় আনা ভাগ, তারা সমস্বরে গেয়ে উঠল–

"ছয় আনা দশআনা ভাগ আমরা জানি কি? আপনি বলুন"

কবিয়াল তখন পুরোপুরি অনুধাবন করছেন আসরে তার পরাজয় নিশ্চিত। কারণ প্রতিপক্ষ কবিয়াল তার এই ভুলে যাওয়া বিষয়টি শ্রোতাদেরকে তো বলবেই, এরপরে আরও বলবে, রামায়নের উপর তার কোনো জ্ঞান নেই। কবিয়াল তাৎক্ষণিকভাবে তার সহকারীদেরকে আশ্বস্ত করে গাইলেন–

"এখন হইতে ভাগ সমান-সমান"

সহকারীরা বুঝতে পারলেন তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েছে। সাথে সাথেই কবিয়ালকে রক্ষা করলেন বিপর্যয়ের হাত থেকে, তারা গেয়ে উঠলেন–

"লঙ্কা যে পাড় হইল বীর হনুমান"

বল বল কবিয়াল ঈশান নাথের সম্মান।

আসরের বোদ্ধা শ্রোতামণ্ডলী বাহবা দিয়ে উঠলেন কবিয়াল ও তার সহকারীদেরকে। এই তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে কবিয়াল ও তার সহকর্মীরা কী ধরনের উপস্থিত বুদ্ধি রাখতেন। আর দর্শক শ্রোতাদেরকে আমোদিত করার কী ধরনের কৌশল তারা অবলম্বন করতেন।

আমাদের কিশোরগঞ্জের কবিগানের উল্লিখিত বিষয়গুলো বেশ অম্ল মধুর রসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং তৎমুহূর্তে জবাব দেবার ক্ষমতা কবিয়ালদের বিশেষ কৃতিত্বই প্রমাণিত হয়। সেই সাথে উপভোগের বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি বড়ই চমৎকার ছিল। এ গান কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগে এ গানের আসর তেমন একটা দেখা যায় না। কিশোরগঞ্জের যশোদলপুর নিবাসী লোক কবি পল্লি গায়ক ও গীতিকার অমর চন্দ্র শীল ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিগান পরিবেশন করে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মামুদজান ফকির

মামুদজান ফকির একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। নিকলী উপজেলার গৌবিন্দুপর নামক গ্রামে অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মসাল জানা যায়নি। বাংলা ১২০৫ সালের পৌষ মাসের শেষ রবিবার দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন (১৭৯৮ খ্রি.)। কবর গাত্রে লেখা এ তথ্য নির্ভর করে প্রতি বছর ঐ দিন তার ওরস পালন করা হয়ে থাকে। এমন কি তার পিতা ও মাতার নামও জানা যায়নি। তারা ছিলেন দুই ভাই। একজন মামুদ জান অপরজন শমশের। শমশের ছিলেন বড় এবং সংসারী। তার

www.pathagar.com

উত্তরসূরি বংশধরগণ আজও ৬ষ্ঠ পুরুষ পরিচয়ে বেঁচে আছেন। পঞ্চম পুরুষ একজনের নাম মো. হানিফ মিয়া এ তথ্য প্রদান করেন।

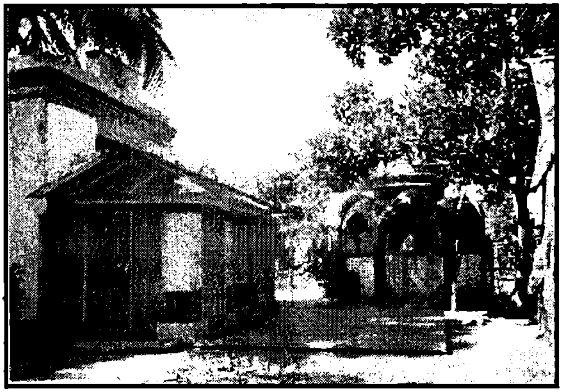

মামুদজান ফকিরের মাজার

মামুদজান ছিলেন সংসার ত্যাগী আধ্যাত্মিক সাধক ও সংগীত প্রিয় গায়ক, লোককবি। শিশু বয়সে তার পিতা-মাতার মৃত্যু ঘটে। বাড়ির পাশে ছিল বিখ্যাত চন্দ্রনাথ ও আদুরীনাথ গোসাইর দুটি আখড়া। শৈশবেই তার গানের প্রতি ঝোঁক ছিল। ফলে একটি তার গ্রামে গোবিন্দপুর অন্যটি পাশের গ্রামে সাইটধার এই দুটি আখড়ায় নাথ ধর্মীয় সংগীতের সুন্দর পরিমণ্ডল ছিল। গানের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ দেখে তৎকালীন নাথ ধর্মীয় অন্যতম সাধক পুরুষ আদুরীনাথ তাকে সংগীতে দীক্ষা দেন এবং তার আখড়ায় কৃষিকাজের জন্য রাখাল হিসেবে আশ্রয় দেন। পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করে মামুদজান চলে যান নিকলী উপজেলার মজলিশপুর নামক গ্রামের পাশে উন্মুক্ত হাওর এলাকার ফকির ভিটায়। গুরু আদুরীনাথের ন্যায় মামুদজান ফকির অসংখ্য গান রচনা করেন। তিনি মূলত মুর্শিদী, মারফতি ও আধ্যত্মিক গানের সাধক ছিলেন। এখনও তার গান শিষ্যদের কণ্ঠে গীত হয়।

তৎকালীন ফকির সমাজে মামুদজান ফকিরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তার গুরু ভক্তি ও সংগীত রচনা শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে আদুরীনাথের জীবদ্দশায় তিনি জনগণের প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মামুদজান ফকির নিরক্ষর ছিলেন। অথচ ফকিরি মতে দীক্ষিত হওয়ার পর অসাধারণ মেধা শক্তিতে তিনি মুখে মুখে গান রচনা করে তাতে তিনি নিজে সুর দিয়ে নিজেই গান গাইতেন। মামুদজান ফকিরের নাম ভণিতাযুক্ত অসংখ্য সাধন সংগীত, নিগম সংগীত, তত্ত্ব সংগীত, ভাব সংগীত, দেহতত্ত্ব সংগীত ও সৃষ্টি তত্ত্ব সংগীত রয়েছে। শুধু খোদা ও রাসুল প্রশান্তি নয়, সনাতন হিন্দু-বৌদ্ধ-নাথ ও চৈতন্যের বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ক গানও তিনি রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁর দুটি গান তুলে ধরা হলো :

(১)

দিন গেল মন রাত্র এলো
সময় থাকতে সাধন চাই
ডুবলে রবি ওঠবে নারে

www.pathagar.com

সোনার দেহ হবে ছাই।
যেদিন ভুবন পয়দা হলো
সেদিন রবি উদয় হলো
দিনের পর দিন ফুরালো
চিন্তা করে দেখ ভাই ॥
মাটির দেহ মাটি হবে
ভাই ৰন্ধু না সঙ্গে যাবে
প্রাণ-প্রেয়সী পড়ে থাকবে
যাইতে হবে আলেখ সাঁই ॥
এই দুনিয়া ভূতের মেলা
সময় থাকতে কর খেলা
অসময়ে ঘটবে বেলা
যাবার সময় কেহ নাই ॥
মামুদজান ফকিরে বলে
দিন কাটাইলাম মায়াজালে
বৃদ্ধকাল আসিবে শেষে
যমের খেলা দেখবে ভাই ॥

(২)

মুর্শিদ ও বুঝিতে আমি
কূল সন্ধান আর পাইলাম না
ব্যর্থ জনম গেল আমার ভাবনা ॥
পাগল মনরে-
বুঝিতে মুর্শিদের চরণ
বহুত বিষম সঙ্কট
তিন আলিফে জোগ মিশায়ে
করিও চরণ ভজনা
ব্যর্থ জনম গেল আমার ভাবনা।
পাগল মনরে-
যদি চরণ ভজতে চাও
কাঙ্গালিনীর বেসে যাও
কঠুর দেহ থাকতে চরণ পাবে না
ব্যর্থ জনম গেল আমার ভাবনা।
পাগল মনরে-
মামুদজান ফকিরে বলে
তরী যাও আনন্দে বাইয়ারে
নিক্তির কাটা ঠিক রাখিয়া
আনন্দে লও কিনারা
ব্যর্থ জনম গেল আমার ভাবনা।

www.pathagar.com

ফকিরচান্দ

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার ক্ষুদিরজঙ্গল ও জাফরাবাদ গ্রাম দুটির মাঝামাঝি জায়গায় একটি পুরনো বটগাছের নিচে সলিম ফকিরের মাজার সংলগ্ন ফকিরচান্দের মাজার রয়েছে। ফকিরচান্দ একজন আধ্যাত্মিক সংগীত সাধক ছিলেন। তার জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি সংসার ত্যাগী সাধক পুরুষ ছিলেন। মাজারে অবস্থানকারী ভক্তবৃন্দ এ সাধক সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। ফলে তার জন্মতারিখ জানা যায়নি। মৃত্যু সম্পর্কে যতদূর জানা যায় মাজারে প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ সোমবার দিন ওরস পালন করা হয়ে থাকে। জানা যায়, ফকিরচান্দ যৌবনেই পরমার্থের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। সমাজে বাসা বাঁধলেন কিন্তু ঘর সংসার পাতলেন না।

ফকিরচান্দ মরমিয়া ও অধ্যাত্মবাদের উপর অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার অধিকাংশই আজ স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। কিশোরগঞ্জের লোকঐতিহ্য সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর এই মরমী সাধক সম্পর্কে চেষ্টা করেও তেমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে তিনি তার কিছু গান সংগ্রহ করে ছিলেন। ফকিরচান্দ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মুর্শিদি মারফতি গানে পারদর্শী ছিলেন। কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ তাড়াইল উপজেলার গ্রামাঞ্চলে বাউল বৈরাগীদের কণ্ঠে আজও ফকিরচান্দের নাম ভণিতাযুক্ত গান শোনা যায়। নিম্নে তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করা হলো :

মনরে-
আমার গুরু ভজনা হইলো কই
আমার সাধন ভজন হইলো কই
আমার-আমার হইলো কই?
মনরে-
যদি গুরু ভজনে হইতো
অঙ্গে অঙ্গে মিলে যাইতো
আমার মুর্শিদ রঙ্গে রং ধরতো
নিজের রং থাকতো কই?
আমার-আমার হইলো কই?
মনরে-
মুখে গুরু গুরু বলি
অন্তরেতে নাই যে বুলি
আবার দেখলে পরে পরের নারী
ঐ না রসে মজি রই
আমার- আমার হইলো কই?
মনরে-
ফকির চান্দ অধমে বলে
সোনাতে সোহাগ দিলে
সোনা গলে
মুর্শিদ নামে পাথর গলে
আমার পাষাণ গলে কই?
আমার-আমার হইলো কই?

www.pathagar.com

অখিল ঠাকুর

বাউল সাধক ও লোক গায়ক কবি অখিল ঠাকুর। তিনি বাংলা ১৩২০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চৌদ্দশত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম প্রতাপ ঠাকুর চক্রবর্তী। মাতার নাম দেবজানী ঠাকুর চক্রবর্তী। অখিল ঠাকুরের প্রকৃত নাম অখিল ঠাকুর চক্রবর্তী। কিন্তু গায়ক হিসেবে তিনি অখিল ঠাকুর নামে খ্যাত এবং পরিচিত। কেউ কেউ তাকে অখিল গোস্বামী নামেও বলে থাকে। কিন্তু তার স্বরচিত গানের ভনিতায় দ্বিজ অখিল নাম ব্যবহার করেছেন।

এক সময় স্বদেশী আন্দোলনের গণসংগীত রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। লেখাপড়ার জন্য বাল্যকালে পিতা তাকে স্কুলে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু স্কুলের পথেই ছিল তৎকালীন দেশের প্রখ্যাত বাউল সাধক গায়ক ও গীতিকার নরোত্তম কাপালীর বাড়ি। কাপালী অখিল ঠাকুরের কণ্ঠে গানের সুর শুনে আকৃষ্ঠ হয়ে পড়েন। অখিল ঠাকুর ও কাপালীর কণ্ঠে গান শুনে আর বাড়ি ফিরে যাইতে চাইলেন না। সেই থেকে স্কুলের নাম করে সারাদিন বাউল নরোত্তম কাপালীর গানের আসরে বসে তার গানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অবশ্য বাবার কাছে ধরা পড়ার পর তিনি বাবার হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

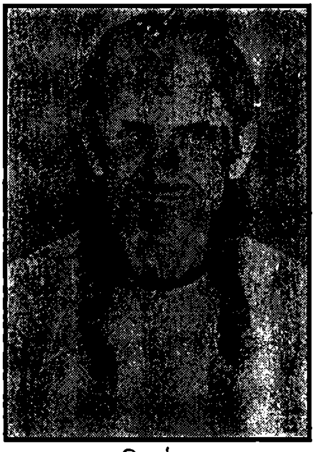

অখিল ঠাকুর

ব্রিটিশ আমলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি কৃষকদের পক্ষে গণসংগীত রচনা করে নিজেই হাটে-মাঠে-ঘাটে গান গেয়ে আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করতেন। পাকিস্তান আমলেও তিনি পশ্চিমাদের অত্যাচার নির্যাতনের কথা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা তার রচিত গানের মাধ্যমে গেয়ে বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত করতেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা ও কাহিনি নিয়ে রচনা করে ছিলেন বহু গান। তার একটি গান ছিল নিম্নরূপ :

ভুটো গেল পুট্টস হইয়া
টিক্কার আগুন নিব্বা গেল
কি দশ ঘটাইল বাংলার
কি দশা ঘটাইল।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সনে ভারতের কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল বঙ্গ শিল্পী সাহিত্যিক সম্মেলনে অখিল ঠাকুর স্বরচিত লোক সংগীত পরিবেশন করার যোগ্যতা ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৭ সনে দেশ ভাগের পর ঢাকা নাজিম উদ্দিন রোডে স্থাপিত প্রথম পাকিস্তানের রেডিও অফিসে অখিল ঠাকুর নিয়মিত লোকসংগীত পরিবেশন করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আপন ভোলা মানুষ। রেডিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলার পথে প্রান্তরে গান গেয়ে ফিরতেন অখিল ঠাকুর। তার প্রমাণ তার স্বরচিত গানে উল্লেখ আছে–

আমার মন তো বসে না গৃহ কাজে সজনী গো
অন্তরে বৈরাগীর লাউয়্যা বাজে।
সজনী গো কী করিব কোথায় যাব
এ দুঃখ কাহারে জানাব
মন মিলে তো মানুষ মিলে না।
ওরে কারও কথা কেউ শুনে না গো
যার তার ভাবে যে জন বুঝে
অন্তরে বৈরাগীর লাউয়্যা বাজে ॥

কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমী হলের এক সংগীত সন্ধ্যায় তিনি নিজের মুখে নিজের কথা বলেছিলেন এভাবে- "এই যে এত কিছু করলাম, তবু আজও দু'টি ভাত খেতে পাইনে, পরনের কাপড় সংগ্রহ করতে পারিনে, পরিবার পরিজনের মুখে হাসি ফুটতে পারিনে।" ভারতে, বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশনে একটি লোকসংগীত পরিবেশন করে গানটি বেশ জনপ্রিয় "সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী" এই গানের কথা ও সুর অখিল ঠাকুরের। তিনি নিজে এই গান কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় সকল অঞ্চলে যখন গেয়ে বেড়াতেন তখন কোন লোক শিল্পী ভারত বাংলাদেশের আর কোথাও এ গান কেউ গেয়েছেন এরূপ কথা শোনা যায়নি। অখিল ঠাকুর ছিলেন চার সন্তানের জনক। বড় ছেলে শেখর চক্রবর্তী মারা গেছেন। ছোট ছেলে নারায়ন চক্রবর্তী বর্তমানে ভারতের আসামে পুলিশ বিভাগে দারগা পদে চাকুরি করেন। দুই কন্যা মিনা চক্রবর্তী গৃহিনী। ছোট মেয়ে কল্পনা চক্রবর্তী আগারতলা বেতার কেন্দ্রের একজন লোক সংগীত শিল্পী। তার একটি তাত্ত্বিক গান নিচে তুলে ধরা হলো।

কি চমৎকার গাছ উঠেছে
ডালে ডালে ফুল
হাজার ডালে গাছের শোভা
রসটানে এক মূল।
যে গিয়াছে সে পথে
সে বলে ভাই তার মতে
ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষা
ভিন্ন ভিন্ন বোল।
হাজার ঘাটে লোক পাড় হইলে
একই নদীর কূল।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম

www.pathagar.com

খোদা তাল্লার অনেক নাম
পির-পয়গম্বর-শ্রী চৈতন্য
মুহাম্মদ রাসুল।
একের দয়া একের মায়া
একেতেই মশগুল।
এক মালিকের এই দুনিয়া
দ্বন্দ্ব-কেন তারে লইয়া
দ্বীজ অখিল না বুঝিয়া
হইয়াছে ব্যাকুল
বুঝতে পারলে অবহেরে
অকূলে পায় কূল।

অমর চন্দ্র শীল

অমর চন্দ্র শীল বাংলা ১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসে সদর উপজেলার যশোদলপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম স্বর্গীয় জগন্নাথ চন্দ্র শীল। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। তার গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বাংলাদশ বেতার ও টেলিভিশনে গীত হয়। তিনি নিজেও এক সময়ে বাংলাদেশ বেতার এর তালিকাভুক্ত কণ্ঠ শিল্পী ছিলেন। গ্রামীণ আবহাওয়ায় ছোট বেলা থেকেই লোক সংগীতের মায়াজালে বন্দী হয়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ির সংগীতের ওস্তাদ প্রাণেশ ভৌমিকের কাছে সংগীতের প্রথম পাঠ শুরু করেন। ওস্তাদ প্রাণেশ ভৌমিক এক সময়ে ভারতের শান্তি নিকেতনের সংগীত শিক্ষক ও প্রশিক্ষক ছিলেন।

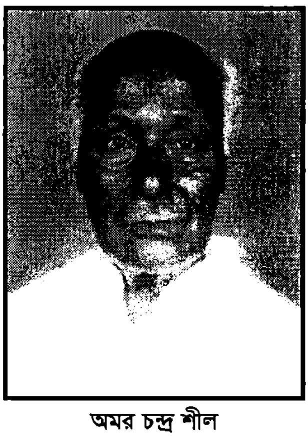

অমর চন্দ্র শীল

পরবর্তী সময়ে অমর চন্দ্র শীল কিশোরগঞ্জ জেলার প্রখ্যাত বাউল কবি গায়ক ও সুরকার সাধক অখিল ঠাকুরের কাছে লোকসংগীতের উপর দীক্ষা গ্রহণ করেন। অখিল ঠাকুরের সান্নিধ্যে সুদীর্ঘ সময় লোকসংগীতের তালিমের পাশাপাশি গান রচনা ও সুরারোপে পারদর্শীতা অর্জন করেন। এক সময় কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী

www.pathagar.com

এর প্রশিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ অমর চন্দ্র শীল। তার একটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে। আর্থিক অনটনে এবং ছোটবেলা থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। অমর চন্দ্র শীলের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী বিপুল ভট্টাচার্যের অন্যতম। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেলেও ছেলে-মেয়ে-নাতী-ন্যাতনী আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে সংগীত জগতে সুখেই আছেন। তিনি মূলত পল্লীগীতি, লোকগীতি, আধ্যাত্মিকতা ও বিচার বিচ্ছেদ গানের গীতিকার গায়ক ও সুরকার। এক সময় কবিগানও গেয়েছেন। তার গানের কথা গুলো বেশ সুন্দর, অপূর্ব ও অসাধারণ। নিম্নে তাঁর একটি গান দেওয়া হলো :

আপন আমার আর কে আছে
পরান বন্ধু বিনে
যার লাগিয়া পাগল হইয়া
ভাবি নিরজনে।
অথবা
সখিরে আমার বন্ধুয়ার নাই খবর
অথবা
আমার আসা নাইরে ফুরাইয়া যায় দিন
দিনে দিনে সোনার অঙ্গ হইতেছে মলিন
আমার আসা নাইরে ॥

বাউল তাহের উদ্দিন খাঁ

বাউল কবি তাহের উদ্দিন খাঁ কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার সাড়ং নামক গ্রামে বাংলা ১৩২৫ সালের ২১ ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। একজন বিশিষ্ট বাউল কবি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। তার অসংখ্য লোকসংগীত রয়েছে। লোক কবি হিসেবে তার লোকসংগীতগুলো খুবই জনপ্রিয়। ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন। বাউল গান বিষয়ক তাহের উদ্দিন খাঁন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থের নাম 'বাউল গীতিকা'। অন্যটি তার ভনিযুক্ত গান নিয়ে রচনা করেছেন 'তাহের গীতিকা' নামক আরও একটি গানের বই। গ্রন্থ দু'টি ইতোমধ্যে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে বাংলা ১৩৮৮ সনে নিজ গ্রামের বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন। কিশোরগঞ্জ জেলার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও বাউল তাহেরের গাওয়া বাউল গানের অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। ছেলেবেরা থেকেই তিনি নিজে গান রচনা করে নিজেই দোতারা বাজিয়ে গান গাইতেন।

কিশোর বয়সেই বাউল সম্রাট জালাল খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার কাছে বাউল সংগীতে দীক্ষা লাভ করেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ-সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অনেক জেলায় একজন বিখ্যাত বাউল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার গানের সংকলন 'তাহের গীতি' নামে খ্যাত পরিচিত। কিশোরগঞ্জ জেলার বাউলদের মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যমনি। যার ফলে তার জীবদ্দশায় যারা বাউল গানের জগতে

www.pathagar.com

প্রবেশ করেছেন তারা অনেকেই ছিলেন তার শিষ্য। বাউল তাহের উদ্দিন খাঁর শিষ্যদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন- বাউল আব্বাস উদ্দিন, বাউল আব্দুল জলিল, বাউল গিয়াস উদ্দিন, বাউল জাহেদ উদ্দিন, বাউল হোসেন আলী, বাউল আব্দুল মোতালিব, বাউল মোঃ আলী হোসেন, বাউল জয়নাল আবেদীন, বাউল সৈয়দ মুকিবুর হক, বাউল আবদুল বারেক মিয়া ও বাউল ভজন সরকার প্রমুখ অন্যতম। বাউল তাহের উদ্দিন খানকে তাড়াইল থানার তাড়াইল-সাঁচাইল ইউনিয়নের মানুষ এক নামে তাকে চিনে জানে। তখনকার সময়ে বাউল গানের আসরে বিভিন্ন এলাকায় থেকে আগত বাউলদের সহিত যুক্তিতর্কে বাউল তাহের উদ্দিন খাঁ ছিলেন সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই তাকে বাউলদের মধ্যে এ জেলার 'সেরা বাউল' বলা হয়। নিম্নে তার একটি গান দেওয়া হলো :

আসিয়া সংসারে রে ভুলিয়াছি তোমারে-রে
বিফলে গিয়াছে দিন গুরু না ভজিয়া-রে
না জানিলাম সাধন ভজন, না চিনিলাম মুর্শিদ-রে
মুর্শিদ নাম পরশ রতন, জাগে যার অন্তরে-রে
হায়রে দয়াল মুর্শিদ, দেখা দাও আমারে-রে ॥
ছায়া পাইবার আশে, রইলাম বট বৃক্ষের তলে-রে
পত্র ছিদ্রে রোদ্র লাগে, আপন কর্ম দোষে-রে
হায়রে ছায়াদল বৃক্ষ, ছায়াদাও আমারে-রে
নদীর পারে কইলে দুঃখ, পানি উজান ধরে-রে
বৃক্ষের তলে কইলে দুঃখ বৃক্ষের পাতা ঝরে-রে
তাহের মিয়ার সুখ হইলনা, জনম ভরিয়া-রে
বিফলে গিয়াছে দিন, গুরু না ভজিয়া-রে

বাউল মকবুল হুসেন

মকবুল হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দড়িজাহাঙ্গীর পুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম সাল জানা যায়নি। প্রথম জীবনে মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আরবি লেখাপড়া ছাড়াও কোরান হাদিসে তার বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। পরবর্তীকালে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনায় এবং ভাববাদে বাউল ধর্ম মতবাদে আসক্ত হন। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জেলা ভিত্তিক "আঞ্চলিক বাউল গান রচনা ও গায়ক প্রতিযোগিতা"য় মকবুল হুসেন প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। কিশোরগঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাউল মকবুল হুসেনের গাওয়া অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। তবে তার গানের কোন প্রকাশিত গ্রন্থ পাওয়া না গেলেও গানের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে জানা যায়।

বাউল মকবুল হুসেন ২০০১ মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে তিনি বাউল তাহের উদ্দিন খানের সান্নিধ্যে বাউল সংগীত শিক্ষা করেন এবং তার সাথে বিভিন্ন বাউল গানের আসরে যোগদান করে বাউল গানের গুঢ়তত্ত্ব অনুশীলন করার দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে নিজে নিজেই বাউল গানে বাউল তাহের উদ্দিন গানের সাথে প্রতিযোগিতামূলক আসরে বাউল গান পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাউল মকবুল গ্রামের এক কৃষক

www.pathagar.com

পরিবারের সন্তান ছিলেন। কৃষি কাজে অভাব অনটনের ফলে উপযুক্ত লেখাপড়া ছাড়াও সংসারের কাজে তেমন সময় দিতে পারেননি।

বাউল মকবুল হুসেন

আধ্যাত্মিকতা ও বাউল ধর্ম তাকে এতই আকর্ষণ করে তোলেছিল যে, তিনি পরবর্তী জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও লোকসংগীত গায়ক হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলায় সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাউল মকবুল আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রয়েছে তার অজস্র লোকসংগীত। মকবুলের গান কিশোরগঞ্জ জেলার এমন কোনো গ্রাম অঞ্চল নেই যেখানে তার একটি গান একজন মানুষের মুখে মুখে নেই। নিম্নে তার একটি গান প্রদত্ত হলো :

আর কতদিন প্রেমের খেলা খেলবি রে মকবুল
এ খেলা খেলবি রে মকবুল ও তুই খেলবিরে মকবুল
খেলার শেষে সন্দ্যা বেলায় দেখবি সবই ভুল।
পড়িয়া কু-সঙ্গীর সঙ্গে, খেলছ কত রং বেরঙের সোর গোল
পড়িয়া তুই প্রেম তরঙ্গে হারাবি যে দু'কূল।
করল প্রেম যারা ভালো ভেসে
তারা কেউ আজনাই দেখ ভবে
তুই একবার ভেবে দেখ নীরবে, আছে কি তোর কূল।
পড়িল যে মাটির ভবে, এই প্রেমকে সে ভালো ভাবে
প্রেম তো মরে নাই ভবে, করিয়া মরিতেছে সবে
তুই করিলে আর কী হবে, ফুটবে কি আর ফুল।

বাউল আলাউদ্দিন

কিশোরগঞ্জে করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গল গ্রামের এক কুঠিরে ১৯১৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন আলাউদ্দিন। পিতার নাম আছমত বেপারি। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। ছেলেবেলা থেকেই আলাউদ্দিনের কণ্ঠ ছিল জোরালো ও মিষ্টি। প্রথম জীবনে

www.pathagar.com

গ্রামের মাদ্রাসা মক্তবে ভর্তি হয়ে আরবি শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেকালে আলাউদ্দিনের কুরআন তালাওয়াত ও হাম-নাত-গজল শোনার জন্য মানুষ ভিড় জমাতো। তার গ্রাম এলাকার মস্ত বড় মৌলানা আহাম্মদ সাহেব আলাউদ্দিনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য সিলেটের বানিয়াচঙ এলাকার এক মাদ্রাসায় ভর্তি করেদেন।

সেখান থেকে এক সময় আলাউদ্দিনের জীবনে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। প্রথমে তিনি সরাজ বাজিয়ে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করেন। পরে সরাজ রেখে বেহালা বাজিয়ে গান ধরেন। মৃত্যু অবদি বাকী জীবন একজন আধ্যাত্ম সাধক ও বাউল সংগীত শিল্পী হিসেবে বেহালা বাজিয়ে গান গাইতেন। সংসার জীবনে এক কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে দত্তক এক পুত্র সন্তান গ্রহন করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তার কোন সন্তান ছিল না। বাউল আলাউদ্দিন এতোই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাকে এলাকার লোকজন পির বলে মনে করতো। এক সময় খুদির জঙ্গল গ্রামের পাশে নরসুন্দা নদী জলে নৌকায় চড়ে বঁড়শীতে মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলের সঙ্গে কতা কাটা কাটি হলে এক পর্যায়ে বৈঠা দ্বারা আঘাত করায় লোকটি পানিতে পড়ে গিয়ে পরবর্তীকালে মারা যায়। হত্যা মামলা রুজু হয় তার নামে। পুলিশ গ্রেফতার করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

আলাউদ্দিন মারফতি-মুর্শিদী-বাউল-বিচ্ছেদী গান গেয়ে জেলখানা মাতিয়ে তোলে। জজ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌছে যে, আলাউদ্দিন আসামী একজন বড় মাপের বাউল সাধক ও লোক সংগীত শিল্পী। জজ সাহেব একদিন তার গান শুনতে চান। আলাউদ্দিন তার রচিত মুর্শিদী-মারফতি-বাউলতত্ত্বের গান গেয়ে শুনান। মাননীয় বিচারক তার সংগীত শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে জজ সাহেব তাকে বেকসুর খালাস করে দেন। ৭০ বৎসর বয়সে লোক কবি বাউল আলাউদ্দিন ১৯৮৭ সনে নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন। বাউল গায়ক হিসেবে এতো জনপ্রিয় ছিলেন যে, সিলেট অঞ্চলের মানুষ তাকে সিলেটের বলে জানতেন। নিম্নে তার রচিত একটি গান প্রদত্ত হলো।

(১)

নবীগঞ্জের হাটে নৌকা ছাড় মন আমার
যদি যাইতে পার সেই বাজারে
জিনিস পাবে সস্তা দরে
ঠিক করিয়া নবীর তরীক ধর।
নৌকায় আছে ছয় জন দাঁড়ি
তারা অতি জুলুম কারী
এ সবরে আগে বাধ্যকর।
করিয়া যোগ সাধন, এ সবেরে কর বন্ধন
... ...
এ সবকে বাধ্য করিয়া, শরীয়তের বাদাম দিয়া
ঈমানের বৈঠা পাছায় মার।
হঠাৎ আসিলে তুফান, ঠিক রাখিও নিজের ঈমান
কত বেঈমান ডুবেছে সাগরে।
পঞ্চলাল তিরিশ মতি, কর তোমার সঙ্গের সাথী

www.pathagar.com

নূরের বাতি জ্বলবে নৌকায় তোমার
দেখিয়া নৌকার খুবি, তখন আমার দ্বীনের নবি
উঠাবে নাম নবির দপ্তর।
সেই বাজারে বলছে হরদম
নরম হইয়া জিনিস খরিদ কর
আল কেনা আতে, মিথ্যা দূর রাহাতে
বলছে হাদিস শরীফেতে
এই সব মাল তোমার নৌকাতে ভর।
বলছে কবি আলাউদ্দিন
সেই বাজারে গিয়া একদিন
বেপারি নাম যদি লেখাইতে পার।

আব্দুল জলিল

বাউল কবি আব্দুল জলিল কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার বোরো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে তার পিতা মারা যান। সংসারের অভাব অনটনের ফলে প্রাইমারি পাশ করে মায়ের সংসার চালানোর কাজে ফিরে আসেন। মাঠে গরু চড়াতেন। আর বটগাছের তলায় বসে মধুর রাগে বাঁশের বাঁশি বাজাতেন। তার এ বাঁশির সুরের মুর্ছনায় পথিকগণ আত্মভোলা হয়ে গাছ তলায় বসে বাঁশির সুর শুনতেন। ছোটকাল থেকেই তার সুরেলা কণ্ঠের গান শ্রোতাদের বিমোহিত করত। বাউল সংগীত চর্চায় তার প্রথম ওস্তাদ ছিলেন কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবি নারায়ণ দেবের পদ্ম পুরানের অন্যতম ভক্ত বোরো গ্রামের সংগীত সাধক যোগেন্দ্র সুত্রধর। আবদুল জলিলের কণ্ঠে বাউল সংগীতের আগ্রহ ও প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে শিল্পী যোগেন্দ্র সূত্রধর তাকে একটি বেহালা তার নিজ হাতে বানিয়ে দেন এবং বেহালা বাজানো শেখান। পরবর্তী পর্যায়ে মূলত মুর্শিদি মারফতি বাউল ধর্মতত্ত্ব লাভ করার জন্য তৎসময়ে তাড়াইল এর বিখ্যাত বাউল কবি তাহের উদ্দিন খানের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংগীতের উপর দীক্ষা নেন। বাউল তাহের উদ্দিন খানের সঙ্গে সে সময়ে বিভিন্ন বাউল গানের আসরে যুক্তি তর্ক বা পাল্টপাল্টি অর্থাৎ প্রশ্ন উত্তর মূলক বাউল গানে সুনাম অর্জন করেন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক লোকসংগীতের গায়ক ও গীতিকার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি দেহতত্ত্ব ও মুর্শিদী-মারফতিসহ অসংখ্য ভক্তিমূলক লোকসংগীতের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কিশোরগঞ্জ ছাড়াও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সিলেট-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি জেলাসমূহে তার গানের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স জানা যায়নি ফলে প্রকৃত জন্মতারিখ জানা সম্ভব হয়নি। কিশোরগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তার অডিও ক্যাসেটের গান শোনা যায়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে লোকগীতি গান পরিবেশন করতেন বলে অনেকে তাকে চট্টগ্রামের বাউল কবি বলে মনে করেন। বাউল কবি আবদুল জলিল কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান। কিশোরগঞ্জের মানুষের কণ্ঠে তার গান ধ্বনিত হয়। নিম্নে তার রচিত গান প্রদত্ত হলো :

www.pathagar.com

(১)

আমার মনের বেদনা, হায়রে সখী তোমরা জাননা
অল্প বয়সে প্রেম করিয়া, দিয়া গেল যন্ত্রণা।
আমি বন্ধুর আশার আসে, ঘুরি কত দেশ-বিদেশে
কোথায় যাব তার তালাশে, কে দিবে সান্তনা।
সাজাইয়া ফুল বিছানা, ঘরে বাইরে আনাগোনা
খাট পালং আর ফুলবিছানা, পড়িলাম কি ভীষম ফেরে গো।
বাউল জলিলেল অন্তর পোড়া, প্রেমের ব্যথা গেলনা।
আমার মনের বেদনা, হায়রে সখী তোমরা জাননা।
অল্প বয়সে প্রেম করিয়া, দিয়া গেল যন্ত্রণা।

গিয়াস উদ্দিন ফকির

গিয়াস উদ্দিন ফকির বাংলা ১৩৫৩ সালের ২৭শে বৈশাখ ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে কিশোরগঞ্জ জেলা সদর উপজেলার লতিবাবাদ ইউনিয়নের গাইটাল নামাপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাহমুদ হোসেন আর মাতার নাম হাজেরা খাতুন। বাড়ির নিকটস্থ রাকুয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যা পড়ালেখা করেন। পরবর্তী কালে এককালে রামানন্দ হাইস্কুল নামে খ্যাত এবং পরিচিত ছিল তিনি সেই হাইস্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। পৈতৃক কৃষিকাজে জড়িত হন। কিছুদিন নানান ব্যবসা কাজেও অংশগ্রহণ করেন। এত সব কাজের মধ্যেও স্কুলজীবন থেকেই তিনি ছড়া-কবিতা-গান ইত্যাদি লেখালেখি শুরু করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি গীতিবাদ্য প্রিয় হয়ে উঠেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে গানের আসরেই তার বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। কৈশোরে পদার্পন করতেই কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার সাড়ং গ্রামের প্রখ্যাত বাউল সাধক তাহের উদ্দিন খানের কাছে সঙ্গীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বাউল ধর্মমতে বিশ্বাসী হন।

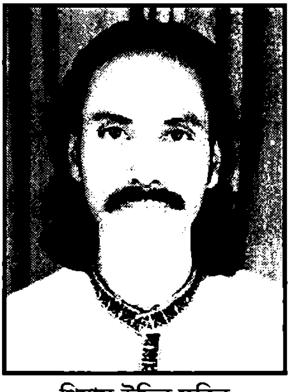

গিয়াস উদ্দিন ফকির

তার গান রচনার প্রতিভা অসাধারণ। ফকিরিতত্ত্বে দীক্ষিত হবার পর থেকে গিয়াস উদ্দিন ফকির মুর্শিদী-মারফতি-শরিয়তি এবং বাউল তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। সুফি সাধনার

www.pathagar.com

সকল দিকই তার গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অসংখ্য লোকগীতি রচনা করেছেন। চার ভাই এবং এক বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় তবে ভাইদের মধ্যে প্রথম। স্ত্রীর নাম হালিমা বেগম একজন গৃহিনী। তিন মেয়ে ও দুই ছেলের জনক। বাউল কবি গিয়াস উদ্দিন ফকির 'কিশোরগঞ্জ হাক্কানী বাউল সংঘ ও কিশোরগঞ্জ জেলা বাউল সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বাউল গানই তার এখন নেশা-পেশা। শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম-হাট-বাজার বিভিন্ন আসরে অন্য বাউল বয়াতীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে গান করেন। স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে জেলা তথ্য অফিসের গণসংযোগ বিভাগে বাউল গান পরিবেশন করে সরকারের বিভিন্ন প্রচার কাজে কাজ করে থাকেন। মধুর ব্যবহার, মার্জিত রুচিবোধ, ভদ্রোচিত চালচলন তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গিয়াস উদ্দিন ফকিরের গানের ভাব-ভাষা, ছন্দ, যোগি চিহ্ন ইত্যাদি অপূর্ব। নিম্নে তার রচিত একটি গান প্রদত্ত হলো :

আমি কি করিলাম গো!
আগে না জানিয়া মিছা ভবে আমার সব হারাইলাম গো।
কোথায় ছিলাম! কোথায় আইলাম! কোথায় যাইব গো।
ভাই বন্ধু আর পুত্র, কন্যা : সঙ্গের সাথি কেউ হইবে না গো।
কার লাইগ্যা এতই-ভাবনা! একা যাইতে হইবে গো।
আছে সেইজন সহায়সম্বল, হইয়া সাথের সাথি
ও যে কেমন করে নিভাইয়া যাইবে, রঙ মহলের বাতি গো।
যারে পাইলে হইতাম সুখী ইহকাল ও পরকালে।
কোথায় সেইজন রইয়াছে গোপন! সাধন হইল না গো।
বিনয় করে করিমানা, তোমরা ভবের প্রেমে কেউ মইজো না-গো।
বাউল গিয়াস উদ্দিনের ষোল আনা বৃথা হইল গো।

মোহাম্মদ মাতুমিয়া

বাউল কবি মোহাম্মদ মাতুমিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুর নামক গ্রামে ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল মমিন ভূঁইয়া। কবি বাল্যকালেই পিতাকে হারিয়ে চাচা আবদুল হেলিম ভুঁইয়ার স্নেহে লালিত পালিত হন। সে সময়ে সাম্প্রদায়িক বৈরী দৃষ্টির শিকার হয়ে কবি তৃতীয় শ্রেণির বেশি লেখাপড়ার সুযোগ না পেয়ে একদিন স্কুল থেকে বিতাড়িত হন।

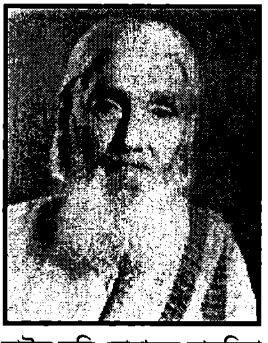

বাউল কবি মোহাম্মদ মাতুমিয়া

www.pathagar.com

বাল্যকাল থেকে তিনি কথায় কথায় পদ্য লেখা ও গীত বাদ্য প্রিয় হয়ে উঠেন। কৈশোরে পদার্পন করতেই এক পিরের মুরিদ হন। লিখেছেন অনেক গান। প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকটি গানের বই। তার 'গানের মালা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন– গানের তালে কে যেন আমায় নাচায়। মনে পড়ে আমার পিরের কথা। পির সাহেব একদা আমাকে মানা করলেন গান গাইতে। আমি গান গাইলে নাকি নেংটা পাগল হয়ে যাব। তখন আমি বয়সে যুবক, আমি গান গাইতে চাই, কিন্তু গায়েবি পির সাহেবের নিষেধ আমাকে মানতেই হয়। তাই গান গাওয়ার ইচ্ছা দমিয়ে গান লেখার কাজে মজে গেলাম। গানের রাজ্যে ডুবে দেখলাম, গান বিদ্যা মহাবিদ্যা। এই বিদ্যায় মানুষের মনের মরিচা দূর করতে পারে। তিনি লিখেছেন–

স্নান করিলে নদীর জলে
গা মাজিলে সাবান দিয়া
সাফ করিলে চামড়ার ময়লা
মনের ময়লা কই থুইয়া।

তবে পরবর্তীকালে আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি ভাষা তিনি বেশ ভালই জানতেন। উর্দু-হিন্দি ভাষায় তার বেশ কিছু গান-গজল রয়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে গানের আসরেই তার বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। সংসার জীবনে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বিভিন্ন আসরে তিনি বাদ্য যনত্র ছাড়া স্বরচিত গান গাইতেন আর স্বরচিত কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করতেন। তার গান রচনার প্রতিভা ছিল অসাধারন। সুফি সাধনার সকল দিকই তার গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পড় পয়লা বিস্‌মিল্লাহ্
বিস্‌মিল্লাহ বন্দনা আল্লার
নূর মোহাম্মদ সাল্লোল্লাহ্
পড় পয়লা বিস্‌মিল্লাহ্।

বয়োবৃদ্ধ শুভ্রকেশ ও দীর্ঘদেহী সৌম্য কাণ্ড এই বাউল লোক কবি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন। চারণকবি মোহাম্মদ মাতু মিয়া ভারত-বাংলাদেশের বেশ অনেক অঞ্চল ঘুরে গান ও কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছেন অগণিত বাংলার মানুষকে। ৬০-এর দশকে কবি তার স্ত্রী-কন্যা আত্মীয় স্বজন সকলকে ছেড়ে চলে যান ঢাকার পুরাতন শহর দয়াগঞ্জে। সেখানে তার ছোট ভাই আফতাব উদ্দিন আহম্মদ সাবান কারখানার একটি কক্ষে নিলেন আশ্রয়। ১৯৬৮ সালের কথা। পরিচয় হলো ওস্তাদ আমান উল্লাহ্ খান সাহেবের সঙ্গে। একে একে বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী সরদার আলাউদ্দিন আহম্মেদ এর সঙ্গে। তৎকালীন পত্রিকা দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈকি পাক জমহুরিয়াত ইত্যাদি পত্রিকায় তার সাক্ষাৎকার ও সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য প্রকাশিত হয়। পরিচয় হয় রেডিও পাকিস্তানের পরিচালক আশফাকুর রহমান, টেলিভিশনের জনাব মোস্তফা মনোয়ার এবং বি.এন.আর এর পরিচালক ড. হাসান জামানের সঙ্গে। বি.এন.আর তার প্রথম গানের বই প্রকাশ করেন। পরিচয় হয় সংবাদের শ্রী রনেশ দাসগুপ্ত, দৈনিক পাস্তিানের সাহিত্য সম্পাদক কবি আহসান হাবীব সাহেবের সঙ্গে। স্বাধীনতা উত্তর এম.এ. গফুর নয়নের সহায়তায় কথা শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে

www.pathagar.com

সপ্তাহকাল ব্যাপী ঢাকা পল্টন ময়দানে গণ-মুক্তি আন্দোলনের বিজয় ঘোষণা ও গণশিল্পীদের এক বিশাল অনুষ্ঠানে মোহাম্মত মাতু মিয়া তার স্বরচিত গান ও কবিতা গেয়ে ও পাঠ করে একই আসরে শ্রেষ্ঠ 'পল্লি বাউল কবির' সেতারের জয়মাল্যে ভূষিত হন। কবি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। ফলে অভাব-অনটন তাকে তার সারাজীবনের সাথী করে নিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে একটি গ্রন্থ প্রকাশের আশায় ঢাকার অলি গলি রাজপথে কত পথ যে পাড়ি দিয়েছেন তার শেষ নেই। এরপরও বলতে হয় তিনি ছিলেন একজন স্বার্থক বাউল সাধক লোক কবি। নিম্নে তাঁর একটি গান প্রদত্ত হলো:

বাউলা দেশের আউলা কথা
ভাও কইরা নাও বাও
নৌকা মাথায় লইয়া মাঝি
পাতলা বাইয়া যাও।
কাটলে মাথা থাকে যেথা
না কাটিলে মরন সেথা
শূন্যলতা কয়না কথা
মানুষ হইতে দাও।
মরায় গিলে জেন্ত মানুষ
মরার নাইরে দোষ
ধর্মজালের বেড়ায় সাইড়া
মন হারাইলে হুশ।
মাতু মিয়ার লাউয়া খানি
যেমন একটা তেলের খানি
বিনা হাতে দিয়া তালি
ভাঙ্গা ঢোল বাজাও।

বাউল মোক্তার উদ্দিন

বাউল কবি মোক্তার উদ্দিন কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার আগরপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মতারিখ জানা নেই। পিতার নাম আফাজ উদ্দিন। তিনি এ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোণা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিজের রচিত গান গেয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি প্রায় দুইশত গান লিখেছেন। বাংলাদেশ বেতারের তিনি একজন তালিকাভুক্ত বাউল শিল্পী ও গীতিকার। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

তার গানের ভাষা-ভাব-ছন্দের গভীরতা বাংলা লোকসংগীতের অমূল্য সম্পদ। তিনি মূলত বাউল, মারফতি, মুর্শিদী, বিচার, বিচ্ছেদ প্রভৃতি গানের গীতিকার ও গায়ক কবি। অভিভাবক শূন্য সংসারে আর্থিক অনটনে তিনি স্কুলে বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। ফলে ছেলেবেলা বা শৈশবকালেই তিনি গ্রামের স্বাভাবিক পরিবেশের কারনে এবং প্রভাবে বাউল গানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে উঠেন। তার স্মৃতি শক্তি এত

www.pathagar.com

প্রখর ছিল যে, তিনি অল্প সময়ে বহু গান শিখে ফেলেন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের মানুষদের মাঝে একজন নামকরা বয়াতি বলে পরিচিত হন। কৈশরে পদার্পন করতেই তিনি গীতি রচনা শক্তি লাভ করেন। আসরে উপস্থিত বুদ্ধি করে গানের উত্তর দিতে তিনি পারতেন। তার কণ্ঠ ছিল বড় মধুর এবং জোরালো। যৌবন প্রাপ্ত হলে তিনি বিবাহ করে ঘর সংসার করেন।

বাউল মোক্তার উদ্দিন

বয়সের ভারে বর্তমানে অনেকটা অবসর হয়ে পড়েছেন। অথচ অতীতের সারা জীবনই তিনি গান গেয়ে বেড়াতেন। বাউল গায়ক-গীতিকার-কবি মোক্তার উদ্দিন উপলব্দি করেছেন চারিদিকে ফাঁকিবাজ, জুয়াচোর, ধান্ধাবাজ, চিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, গুম, ঘুষখোর ইত্যাদির আনাগোনা। সুতরাং জীবনকে সুবুদ্ধিতে আশ্রয় করে সাধনায় ব্রতী হলে এবং সংগীত চর্চা করলে তবেই সেই পরম সুন্দর জীবন ইহকাল ও চরমসত্য পরকাল আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভ করা যাবে। গানের শব্দ চয়নে প্রায়ই কবি অনুপ্রাস সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং প্রত্যেকটা চরনের শেষে শুধু নয় মাঝেও বহু মিল দিয়ে ছন্দকে অদ্ভূত গতিশীল ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন। গাঁথুনির এ পরিপাঠ্য ছাড়াও বাউল গায়ক কবি অত্যন্ত সহজ কথায় তার মনের ভাব ভাষা প্রকাশ করেছেন। নিম্নে তার আত্মপরিচয়মূলক একটি গান প্রদত্ত হলো :

ভক্তির ডোরে বন্দি পাখি
আসলো এই দেহ পিঞ্জরে
কর্মফল ভোগ করিতে
জন্মনিল আগরপুরে
দুধ কলা পাইলোনা পাখি
কত কষ্ট যায় করে
সারা জনম কাটাইলো
অনিদ্রা অনাহারে
পাখি খাদ্য খুইজা বেড়াইতো

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বেতারে
কর্মফল ভোগ করিতে
জন্ম নিল আগরপুরে।
কিশোরগঞ্জ জেলায় বাড়ি
কুলিয়ারচর থানার অধীন
রামদি ইউনিয়নের মধ্যে
বাস করতেছি অনেকদিন
ও পাখির পোস্ট অফিস
ভাই সরারচরে
বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে
মনে কয় সুখি হইবো
রাত পোহাইলে আসেকাল
চোখ মেলিয়া চেয়ে দেখি
সামনে বাধা মায়া জাল।
মায়া নদী পাড়ি দিয়ে
ভাবছি সদাই কিনারে
বাজারের দক্ষিণ কোনে
হয়রে পাখির বসতি
আঁধার ঘরে পরে কান্দি
ঘরের ভিতর নাই বাতি
কি করিব রাস্তা হারা
দুই চক্ষুতে অশ্রু ঝরে
কর্মফল ভোগ করিতে
জন্ম নিলাম আগরপুরে।
পল্লি কবি মোক্তারে কয়
ঘাটে দেখছি মাঝি ভাই
কি ধন লইয়া দেশে যাইবো
হাতে একটি পয়সা নাই
মুরশিদ যদি করে দয়া
তবে হয়তো পার পাবো
কর্মফল ভোগ করিতে
জন্ম নিলাম আগরপুরে।

সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন

সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন সূরুজ মিয়া একজন সাধক পুরুষ। ১৯৪৫ সালের ১৫ এপ্রিল হবিগঞ্জ উপজেলার আদ্যপাশা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ আকবর আলী। পিতার মৃত্যুর পর পির বংশের লোক হিসেবে বর্তমানে গদীনশীন হয়ে ইসলামের দাওয়াতের খেদমতে মাজার কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত আছেন।

www.pathagar.com

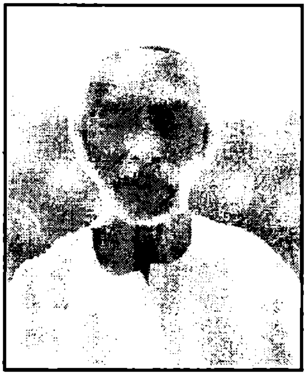

সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন

ছোটবেলায় শাযেস্তাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা শেষে শৈশবই পবিত্র কুরআন হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন শুরু করেন এবং পরবর্তী কালে এ বিষয়ে পারদর্শী হন। পিতার মৃত্যুর পর পূর্ব পুরুষদের ভক্তকূল কিশোরগঞ্জ জেলায় বেশি থাকায় তিনি হবিগঞ্জ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ছোট ভাই সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়াকে সঙ্গে করে করিমগঞ্জ উপজেলার বৌলাই নামক গ্রামে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। তার একটি গ্রন্থের নাম 'মর্তুজ গীতিকা'। মর্তুজ গীতিকা ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড কিশোর অফসেট প্রিন্টার্স নিউ মার্কেট রোড থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মাজার কেন্দ্রিক ওরস ছাড়াও সৈয়দ মর্তুজ হোসেন সুরুজ মিয়ার রচিত মারফতি, মুর্শিদি, নবিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গান নিয়মিত পরিবেশন করে থাকেন। তিনি গানে সৈয়দ মর্তুজ আলী বলে ব্যবহার করেছেন। নিম্নে তার একটি গান প্রদত্ত হলো :

সাধন ভজন না জানিলে
বৃথা যাবে এ জীবন
দেখলে নারে তালাশ করে
কোথায় তোর আছে আপন ॥
৪০ সেরে মন বুঝে নেয়
৮০ সেরে হয় ওজন
তালাসিয়া দেখনারে ভাই
কই আছে পরশ রতন ॥
সাধনে তার সাধ বুঝিলে
ভজনে হবে মিলন
যার বিনে হয় সে
নয় কাম সাধন ॥
গিয়া দেখ ভক্ত বাজারে
বিনামূল্যে কিনতে পারে
প্রেমের হাটে গেলে পাবে
যদি হয় রসিক সুজন ॥

www.pathagar.com

ভাব নাই যার অন্তরে
দাম নাই তার কোন খানে
যেমন অন্ধ হইয়া রইলে একা
ধাক্কা ঠেলায় যায় জীবন ॥
সৈয়দ মর্তুজ আলী মায়ার জালে
ভাবে শুধু বসে বসে
আমার আর হয় কি না হয়
তাই ভাবী সর্বক্ষণ ॥

সৈয়দ আবদুল আউয়াল চান মিয়া

সৈয়দ আবদুল আওয়াল চান মিয়া ১৯৫৭ সালের দিকে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার হুড়ারকূল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শায়েস্তাগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করেন। পিতা সৈয়দ আকবর আলী ছিলেন একজন পিরে কামেল ও ওলি। সৈয়দ আবদুল আউয়াল চান মিয়ার গানের ভনিতায় শুধু 'সৈয়দ চান মিয়া বলে' নামটি উল্লেখ পাওয়া যায়। বড় ভাই সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন সুরুজ মিয়া ও ছোট ভাই সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া এরা সকলেই আধ্যাত্মিক সাধনায় সংগীত সাধক হিসেবে অনেক গান রচনা করেছেন।

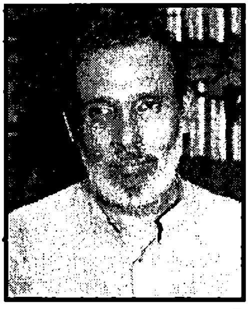

সৈয়দ আবদুল আওয়াল চান মিয়া

পড়াশোনায় সৈয়দ আবদুল আউয়াল খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেও খ্যাত ও পরিচিত। স্বাধীনতা উত্তর তিনি চলে আসেন কিশোরগঞ্জের গ্রামের বাড়ি। সেখানে বড় ভাই মর্তুজ হোসেন সুরুজ মিয়া ও সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করেন। সৈয়দ আবদুল আওয়াল চান মিয়া বেশ ক'টি গানের বই ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া 'মর্তুজ গীতকা'য় সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন সুরুজ মিয়া সৈয়দ আবদুল আউয়াল চান মিয়া ও সৈয়দ আবদুল আউয়াল তারা মিয়া তাদের তিনজনের গান প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তার একটি গান প্রদত্ত হলো :

একবার পাইলে তোমারে গো
লইতাম কোলে তোলি
কুলেতে লইয়া তোমায়
করতাম কুলাকুলি ॥

www.pathagar.com

মুখেথে মুখ মিশাইতাম
বুকে মিশাইতাম বুক
প্রেম তরঙ্গে ভেসে যাইতাম
সকল যাইতাম ভুলি।

মনের যত কথা আমি
কইতামরে খুলিয়া
শুন বন্ধু শুন কথা
কাছেতে আসিয়া
গেথে রাখছি ফুলের মালা
দিতাম গলে তুলি।

সৈয়দ চান মিয়া বলে
আমি তোমার নামে দেওয়ানা
তুমি দেখে দিও ওরে বন্ধু
ভুলে যেও না,
নইলে তোমার প্রেম জ্বালায়
যাবে সে যে জ্বলি ॥

সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া

সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার চাঁনপুর নামক গ্রামে ১৯৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ আকবর আলী। মাতার নাম সৈয়দা মালেকা খাতুন। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে তারামিয়া সর্বকনিষ্ঠ। তিনি একাধারে লোককবি, ছড়াকার, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক। দোতরা, ঢোল, বাঁশি আর দেশী যন্ত্র দিয়ে সুমধুর সুরের মুর্ছনায় দর্শক শ্রোতাদের মুহূর্তের মাঝে বিমোহিত করে তোলেন। আপন বড় ভাই সৈয়দ মর্তুজুল হোসেন ও সৈয়দ আব্দুল আউয়াল চান মিয়া তারা দু'জনেই সংগীত সাধক। কৃষি ভিত্তিক গান রচনায় 'বঙ্গবন্ধু' পদক ছাড়াও এ পর্যন্ত 'রাষ্ট্রপতি' পুরস্কার ও পদকসহ অসংখ্য পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত নিয়মিত শিল্পী ও গীতিকার। সাহিত্য রচনায় কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক 'সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ও সংগীতে বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক 'পদক-পুরস্কার ও সনদপত্র' লাভ করেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এ পাশ। ১৯৭৯ সালের ২৮শে মার্চ থেকে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি জেলা সদর কিশোরগঞ্জে চাকুরিতে কর্মরত আছেন। নিম্নে সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়ার একটি গান প্রদত্ত হলো।

পড় সবাই তৈয়ব কলমা
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্
মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্।
কলমার জিকির পরে যারা

www.pathagar.com

আল্লার এস্কে মত্ত তারা
যে হইয়াছে গৃহহারা
দীলে আছে রাসুলুল্লাহ্।
কলমা তুমার পাড়ের সাথী
দীলে জ্বালাও কলমার বাতি
কলমা পড় দিবা রাত্রি
হয় না যেন ভুল মন পাগলা।
দেখবি যদি খোদার ঘর
ঐ কলমা পুঞ্জি কর
ছয় লতিকায় কর জিকির
হইয়া ফানা ফিল্লাহ্।
তারা মিয়া করছে আশা
কলমা হলো মোর ভরসা
পার হইতে করছি আশা
মূল করেছি ইল্লাল্লাহ্॥

শাহ্ আইয়ুব বিন হায়দার

শাহ আইয়ুব বিন হায়দা ১৯৫১ সলের ২২শে সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার তেলীখাই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হায়দার আলী ভূইয়া ও মাতার নাম দুধ মেহের বিবি। তার প্রকৃত নাম মো. আইয়ুব আলী।

তিনি একাধারে কবি-গীতিকার ও সুরকার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬১টি। তার মধ্যে গানের বই ৩টি- দেহতরী, শানে কামলিওয়ালা (র.) ও বাঁশি কেন কাঁদে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ., এলএল.বি। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি অনেক ভাব গান রচনা করেছেন। শাহ্ আইয়ুব বিন হায়দারকে একজন সুরের সাধকও বলা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলার লোককবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম ও শিক্ষিত। শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক-সমাজসেবক-আইনজীবী প্রভৃতি পরিচয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ। তার একটি গান নিম্নে প্রদত্ত হলো :

হাওযার মাঝে হাওয়া ঘুরে
কোন সে হাওয়ার বলে
সেই হাওয়াটির কোন কারিগর
কোন আকাশের তলে॥
হাওয়ায় হাওয়ায় হয়না কেন
মধুরও মিলন
হাওয়ার মাঝে জাতের ভেদ
সেটা কোন কারন।
জাতে জাতে জাত মিশেনা
এক সাথে জাত চলে॥
হাওয়ার কি আর আছে রং
আছে কি স্বাদ গন্ধ

www.pathagar.com

কোন নমুনায় দেহটি তার
কোনটা ভাল মন্দ।
হাওয়ার মাঝে হাওয়া চলে
দোষ কি তাতে মিশিলে ॥
আইয়ুব শাহ্ কয় হাওয়ার গড়ন
হা-হু-হেরি মতো
ভেদ ভাঙ্গিয়ে কাফের হলো
অজানা যে কতো
হাওয়াতে হাওয়া চলে
থাকে জলে স্থলে ॥

ছাত্তার মাস্টার

মো. আবদুছ ছাত্তার ভূঞা সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে ছাত্তার মাস্টার নামে পরিচিত। পেশায় ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। তিনি ১৯৪৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিন্নাটি ইউনিয়নের পাটাবুকা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো. আলী হোসেন ভূঞা। আবদুছ ছাত্তার মাস্টার একজন কবি ও গীতিকার। তিনি বেশ কিছু লোক সংগীত রচনা করেছেন। এ চাড়া বাউল, মুর্শিদী, মারফতি, বিছার, বিচ্ছেদ গানও রয়েছে। ছড়াকার হিসেবেও ছাত্তার মাস্টারের বেশ সুনাম ও খ্যাতি রয়েছে। তার লেখা নাটক 'একটু অবহেলা ও ভুল যখন ভাঙ্গলো' মঞ্চস্থ হয়ে প্রশংসিত হয়েছে। তার একটি ছড়ার বই রয়েছে নাম 'ছড়ার বাঁশি'।

লোক সংস্কৃতির বিখ্যাত সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানে আবদুছ ছাত্তার মাষ্টারের স্বরচিত গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে পরিবেশন করা হয়েছে। শৈশব কালেই সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সংগীত রচনার প্রতি ঝোঁক ছিল। বাড়ির পাশে পাটাবুকা গ্রমের পির-ফক্বিরদের মাজার কেন্দ্রীক তখন বেশ সংগীত চর্চার সুন্দর পরিমণ্ডল ছিল। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলা শহরস্থ নগুয়া নামক এলাকায় নিজ বাসা বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করেন। নিম্নে তার একটি গান উদ্ধৃত করা হলো।

মুর্শিদ গো–
তোমার নায়ে লইয়া আমায়
দাও গো নদী পাড়ি
কেমনে পার হইব মুর্শিদ
লইয়া ভাঙ্গা তরী।
মুর্শিদ গো–
ভব নদীর লিলা খেলায়
ডুবল তরী আমার বেলায়
মন মন্দিরে ব্যথার জ্বালায়
এখন আমি কি যে করি ॥
মুর্শিদ গো–
তুমি আমায় দয়া করে

www.pathagar.com

নিও মুর্শিদ উদ্ধার করে
যাইতে আমি সেই পারে
হইয়া নায়ের সোয়ারি ॥
আমি অধম সাঝের বেলা
বুঝি নাই ভবের খেলা
ছাত্তারের এই মনের জ্বালা
কেমনে দূর করি ॥

পানু মাস্টার

পানু মাস্টারের প্রকৃত নাম মো. গোলাম রাব্বানী পানু। তিনি ১৯৫৫ সালের ২০ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার খুদিরজঙ্গল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফাজেল উদ্দিন আহাম্মদ। মাতার নাম মোছাম্মাৎ আক্তারুন্নেছা। পানু মাস্টার বর্তমানে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। ১৯৭১-৭২ এ স্বাধীনতা উত্তর তিনি সংগীত রচনা শুরু করেন।

এ পর্যন্ত তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। মোস্তফা জামান আব্বাসীর পরিচালনায়- 'ভরা নদীর বাঁকে' অনুষ্ঠানে তার গান পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী আবুল হাশেমের গাওয়া 'মুর্শিদ পদে সরলমতি আমার হইল না' এ গানটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিম্নে তার একটি গান হলো।

দুনিয়ার সবাই পাগল
আসল পাগল কয়জনে
কেউ দেখিনা পাগল বিহনে ॥
ইউসুফেরী রূপে পাগল
জুলেকা রমনী
চন্ডীদাস পাগল হইয়া
কইতো রজকিনী
মজনু পাগল লাইলী প্রেমে
লা-ইলাহার-ই-কারনে ॥
ফরহাদ ভবে পাগল হইল
শিরীর কারনে
ফকির দরবেশ পাগল হইয়া
জীবন কাটায় বনে
কৃষ্ণ প্রেমে রাধা পাগল
কুলেরী ভয় নাই মনে ॥
ওয়াছ কুরনী পাগল হইল
দীনের নবীর দায়
দায়াল নবী হইল পাগল
উম্মোতের আশায়
পাগল পানু হইল পাগল
থাকতে গুরুর চরণে ॥

www.pathagar.com

প্রভাত কানা

প্রখ্যাত বাউল প্রভাত কানার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জে। ১৯৭১ সনে পাক সেনাবাহিনীর হাতে তিনি নৃশংসভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার রচিত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন। এর চেয়ে আর কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

কানা বাছির

বাউল প্রভাত কানার মত আরও একজন প্রখ্যাত বাউল ছিলেন কানা বাছির। তার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তুল নামক গ্রামে। বাউল বাছির আজ আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আছে তার অসংখ্য গান। নিম্নে একটি গানের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা
জানলে তবে আইলাম-না।
আগ বাজারে যারা আইল
লাভের ব্যাপার তারা পাইল
আমি আইলাম-না।
শেষ বাজারে আমি আইসা আমিরে
বেঁচা কেনার বাও পাইলাম-না।

শামসুল ইসলাম হায়দার

শামসুল ইসলাম হায়দার কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ষাইটকাহন নামক গ্রামে বাংলা ১৩৩৭ সনের ২১শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষা আন্দোলনে ঢাকার ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে তিনি আওয়ামী মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন। আন্দোলন চলাকালে জনাব হায়দার নিউটাউনস্থ এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মিছিল মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন। গুরুদয়াল কলেজে পড়ার সময় থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন।

শামসুল ইসলাম হায়দার

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন শুরু হলে বিশেষত আবু তাহের খান পাঠান এর প্রেরণায় গান ও কবিতা রচনা করেন ও গণসংগীত গেয়ে বেড়ান। অর্থাৎ তিনি একজন গণসংগীতশিল্পী ও স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি নিজেই গান লিখতেন তাতে নিজেই সুর দিয়ে নিজেই কণ্ঠ দিতেন। নিচে তার একটি স্বরচিত গান উপস্থাপন করা হলো।

নাও ছাড়িয়া দে পাল তুলিয়া দে
চল চলাইয়া চলুক নৌকা মাইজ দরিয়া দিয়া
ভাইরে হেলিয়া দুলিয়া
ভাসানী সাব হাল ধইরাছেন
আতাহার আলী পাল ভাইরে
হক-সোহরাওয়ার্দী দাঁড়
তোমরা উইট্ট্যা পড়
হইয়া যাও পাড় নৌকা হইয়া যাও পাড়
নৌকার মধ্যে উইট্ট্যা ভাইরে হারিকেনডা লইয়া
ইডা মাইরা দেও ফালাইয়া
ভাইরে যাউক নিভিয়া গো।

প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী

প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার গোপদীঘি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। প্রমোদ রঞ্জন রায় তার অধিকাংশ কবিতার নাম ভাট কবিতা। কিন্তু তার নামের পূর্বে কিংবা নামের শেষে ভাট কবি বলে উল্লেখ নেই। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে শিলাবৃষ্টির দাপটে ইটনা ও নিকলী উপজেলার এলাকাবাসীদের প্রচণ্ড দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে গোপদীঘির প্রমোদ রঞ্জন রায়চক্রবর্তী 'শিলাবৃষ্টির কবিতা' নামক শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থের কপি থেকে নিম্নে তার কবিতা উপস্থাপন করা হলো। জানা যায় এত ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি এর আগে কখনও হয়নি। ফলে এ গ্রন্থের ভূমিকায় এর আংশিক কবিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

দিনে দিনে দিন গাহিল অপূর্ব ঘটন,
কোনো কালে কেউ দেখেনি শুনেনি কখন।
এ যে আজব লীলা-
এ যে আজব লীলা ভীষণ শিলা,
ধবংস করল দেশ
ময়মনসিংহের ডহর অঞ্চল শুনহ্ বিশেষ।
তবে বলে যাই, শুনেন ভাই সবে দিয়া মন
অপূর্ব শিলার খেলা করিব বর্ণন।।
সেদিন আটই চৈত্র। (১৯৫১ ইং)
সেদিন আইট চৈত্র, বেলা মাত্র ২ ঘটিকায়
বৃহস্পতিবারে এক ঝড় উঠিল হায়
কেবল শিলাবৃষ্টি
কেবল শিলাবৃষ্টি, লুটালুটি, গভীর গর্জ্জন

www.pathagar.com

হাটে মাঠে গৃহ পাঠে দারুণ বর্ষণ।।
বড় ভীত মনে–
বড় ভীত মনে, জনগনে, করে হাহাকার
সোনার ফসল বুরো ধানরে করল নৈরাকার।।
কত পশু পাখি–
কত পশুপক্ষী, রইল সাক্ষী, হইল হতাহত,
হতভাগ্য গৃহছাড়া হইল যে বিক্ষত
কত ঘর ভাঙ্গিল–
কত ঘর ভাঙ্গিল, ধবংস করল গাছের ডালপালা
ঘন্টা খানেক হইল পতন বড় বড় শিলা
ঘরঘরানি ডাক–
ঘরঘরানি ডাক, মহাপাক একি তুর্যধরণি।
প্রলয়েরি ঘনঘটা ডাকিল মেদিনী গরুবাছুর যত,
গুরু বাছুর যত, ঘাস খাইতেছিল, রাখাল সনে
হাম্বা রবে লেজ তুলিয়ে দৌড়ে প্রাণ পণে।
কোন আশ্রয় নাই।
কোন আশ্রয় নাই, শীলে তাই
দিলরে গা মেলিয়া
প্রাণ লয়ে রাখাল গেল এ মায়া ছাড়িয়া।
আর যে বলব কত–
আর যে বলব কত শস্য যত আলু, মরিচ, তিল
পি-শিয়া উঠাইয়া নিল নিদারুণ শিল।
দেখি ভূমির তলে–
দেখি ভূমির তরে টালে টালে হইল স্তুপাকার
এস্কিমোদের দেশ যেন বরফে বিস্তার।
পল্লী গোপদীঘি
পল্লী গোপদীঘি দুঃখ ভাগী ঘাগড়া, বাড়িবাড়ি
হাত কবিলা মিঠামন শুন দুখ ভারী।
আরও কত নাম।
আরও কত নাম, অষ্টগ্রাম
আদমপুর ইউনিয়ন আব্দুল্লাহপুর,
কেওয়ারজোড়, ঢাকী মালীয়ন।
আরও তাড়াইল থানা–
আরও তাড়াইল থানা শীলের হানা সাঁচাইল ও জাওয়ার।
দামিহা ইউনিয়নে হইয়াছে বিস্তার।
বিরাট ধ্বংস লীলা–
বিরাট ধবংস লীলা, যত শীলা, হানিল আঘাত

www.pathagar.com

সহসা হইল যেন বজ্র সম্পাত।
শীলা আসল যদি মহাবেদী হইল নিবারণ
ধূম্র জালে ভূমি ছাইল গগন।
একি গুলক ধান্ধা।
একি গুলক ধান্ধা, করল আন্ধা, তবু মানুষ হায়
দলে দলে বোর ক্ষতে ধান দেখিতে যায়।
দেখি কিছু নাই
দেখি কিছু নাই, শীলে ভাই আছে জমি ভরে।
পেয়ে মনো ব্যথা–
পেয়ে মনো ব্যথা, এ কবিতা রচিত করল যেজন
গোপদীঘি গ্রামে বাড়ি প্রমোদ রঞ্জন।
রায় চক্রবর্তী–
রায় চক্রবর্তী, এই কীর্তি হেরিয়া নয়নে
পরীল বিষাধ গীতি, ধ্যান মতি,
ভার ভাট কবিতা গাহিল
তবে কথা সাঙ্গ হইল।

লোককবি লক্ষ্মীকান্ত

লক্ষীকান্ত কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার কাগারচর গ্রামের কৃতী সন্তান। তিনি একজন লোককবি ছিলেন। তিনি অসংখ্য লোককবিতা, লোকগান ও লোকছড়া রচনা করেছিলেন। কিশোরগঞ্জের খাতক বিদ্রোহের উপর রচিত তার একটি লোককবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

কি অপূর্ব কলির লীলা ময়মনসিংহের এই জেলা,
লুট করিল দিনের বেলা গেরাম ষাট খানা।
বরাটিয়া, মির্জাপুর, জাঙ্গালিয়া, জামালপুর
বড়লোকের দালানবাড়ি ছোটলোকের ভাতের হাড়ী,
চুক্ষের সামনে যাহার পরে ছেরে কথা নাই।
জাঙ্গালিয়ার কিষ্টবাবু চল্লিশ হাজার দিলেন তবু প্রাণে ছাড়ে নাই,
দুইটি বন্দুক ছিল ঘরের পিতা পুত্রে গুলি করে,
কিষ্ট বাবুর একটি পুত্র বয়স আঠার মাত্র,
ডাকাত মারে জন সতের টুটা ছিলনা।
দুইজনে ধরে তারে নিয়া পুকুর পারে
আর একজনে ধরে দাও করে দুই খানা।
ঢাকার জেলার বিক্রয়মপুরে কাটিয়াছে জগত সারে,
মঠখোলার নবীন সারে করে তিন খানা।
বাঁশের চোঙ্গায় জলখাই, কলার পাতায় ভাত খাই থালা জুটেনা,
বলছি আমি লক্ষ্মীকান্ত হয়ে গেলাম সর্বশান্ত উপায় দেখিনা
কি ওপুর্ব ... গেরাম ষাটখানা।

www.pathagar.com

ছফির উদ্দিন

ছফির উদ্দিন একজন ভাটকবি ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কাটাবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম আদম খান। স্কুলজীবন থেকেই কবি ছফির উদ্দিন দেশের স্বদেশী মুক্তি আন্দোলনে প্রেরণাদানমূলক অনেক গান ও কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে (বর্তমানে সরকারি বালক বিদ্যালয়) দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদেন। সেখানে থেকেই শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি। কিন্তু অসংখ্য গণজাগরণমূলক গীতিকবিতা ও গান অব্যাহত গতিতে তিনি রচনা করে গেছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের কৃষকের দুর্দশা ও মুক্তির পথ নির্দেশক "মুক্তিমন্ত্র" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কিছুদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়। কিন্তু পুনর্মুদ্রণ আর হয়নি। ছফির উদ্দিনের ভাটকবিতাগুলোর একটি অংশবিশেষ নিম্নরূপ–

শুন নেকজাত একবাত হইল ইয়াদ
এই দুনিয়াতে ভাই ঘটিল এক বিবাদ।
করিল দুই সাদী বাদাবাদী কত হয় ভাই
তাহার সকল কথা সবাইকে জানাই।
যবে বিবাহ দুছরা করবার ইচ্ছা মনে হইল যার
প্রথমা বিবিকে তার পুছে বারে বার।
তুমি বল যদি আর এক সাদী করিবারে চাই
সুখেতে জিন্দেগী করি মিলে মিশে খাই।
বলি তোমাকে সুখে সুখে যাইব মোদের দিন
কাজ কর্ম হইব কম ঘারে আনিলে সতীন।
খাইবা বান্দা ভাত উৎপাত না করিবায় আর
এই মত কত কথা তোমারে জানাই বার বার।

উল্লেখ্য, লোককবি ছফির উদ্দিন ১৯৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ছফির উদ্দিনের জীবনে দারিদ্রতা ছিল তার নিত্যসঙ্গী। তারই মধ্যে তিনি সাহিত্য ও সংগীত রচনায় ছিলেন জনপ্রিয় লেখক লোককবি ও গীতিকার।

গোপাল মোদক

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলা জাফরাবাদ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা গোপাল মোদক। পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র মোদক ও মাতার নাম হেমলতা। নানান জায়গায় হিন্দু শাস্ত্রীয় রামায়ণ গান গেয়ে জীবন চালান। প্রাইমারী স্কুলে পড়াকালে শিক্ষকরা তাকে গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করতেন। প্রথম জীবনে তিনি শ্যামা সংগীত "চাইনা মাগো রাজা হতে" ও বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করতেন।

১৫ বছর বয়সে প্রথম গান ও যন্ত্রসংগীত শিক্ষাগুরু সতীশচন্দ্র বিশ্বাস। তার কাছে ৫ বছর শিক্ষা নেন তিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩ টাকা দিয়ে একটি 'কৃত্তিবাস রামায়ণ' বই সংগ্রহ করে গান শিখেন এবং কিশোরগঞ্জ বিন্নাগাওয়ে রামায়ণ গান করেন। সেই থেকে শুরু হয় বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গান গাওয়া। সেই থেকে গানকে

www.pathagar.com

তিনি মনের গভীরে ঠাঁই দিয়ে হৃদয়ে স্থাপন করেছেন এক গানের জগৎ। তিনি পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি ও জারি গান গাওয়ার পাশাপাশি নিজে গান লিখেন ও সুর করে থাকেন। গোপাল মোদক গানের মাধ্যমে জীবনের শেষের দিন পর্যন্ত মানুষের মাঝে গানের মধ্য দিয়ে সেবা করতে চান।

গোপাল মোদক

গায়েন গোপাল মোদক এর দলে রামায়ণ গানে করতালে রয়েছেন হরেন্দ্র রায়, হারমোনিয়াম বাজান অজিত কুমার সূত্রধর, দোতরা বাজান হরিধন পাল। বাঁশিতে প্রদীপ মণ্ডল, মন্দিরায় রাখাল বসাক ও খোলে রিপন চন্দ্রবর্মণ।

গোপাল মোদক ও তার দল

তিনি মূলত কৃত্তিবাস রামায়ণ থেকে গান ও কাহিনি গেয়ে থাকেন। তার সকল মঞ্চায়ন 'সীতার বনবাস'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে ১ বৎসর যাবৎ 'সীতার বনবাস' প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের। ২০০৮ সনে ৫,৬,৭ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নাট্যমণ্ডলে মঞ্চায়ন করেন "সীতার বনবাস"। তিনি আবেগী কণ্ঠে বলেন- "আমি আর কিছু চাই না", "সার্থক আমার জীবন", "সার্থক আমার রামায়ণ সাধনা"।

আর্থিক অসচ্ছলতা পারিবারিক দৈন্যদশা তার জীবন থেকে অনেকগুলি দিন পেরিয়ে গেলেও তিনি গানকে তার অন্তর থেকে সরাতে পারেনি। তাই আজও গানের মাঝেই বেঁচে আছেন রামায়ণ গানের গায়েন শিল্পী গোপাল মোদক।

www.pathagar.com

ইসলাম উদ্দিন বয়াতি

কিশোরগঞ্জ জেলা করিমগঞ্জ উপজেলা নোয়াবাদ ইউনিয়নের নোয়াবদ গ্রামের পালাকার পালাগানের জগতে লোকজ সংস্কৃতির এক আলোচিত নাম ইসলাম উদ্দিন বয়াতি। পিতার নাম রবীউল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা বেগম।

মক্তবে সামান্য লেখাপড়া জানা ইসলাম উদ্দিন পিতার মৃত্যুর পর ভাইদের অনুশাসনে লেখাপড়া ছেড়ে কৃষিকাজে জড়িয়ে পরেন। মক্তবে পড়া অবস্থায় আবু সিদ্দিক নামে হারমোনিয়াম মাস্টার তার গানের সুর শুনে গ্রামের ঝুমুর যাত্রা পালা 'কাসেম মালা' পালাগানে কাসেম চরিত্রে সর্বপ্রথম অভিনয় করেন। তখনকার সময়ে পুরুষ দিয়ে মেয়ে বা নারী চরিত্রে অভিনয় করানো হতো। ঝুমুর যাত্রা পালা যেহেতু গান নির্ভর তাই হারমোনিয়াম মাস্টার ঠিক করল যে ইসলাম উদ্দিনকে দিয়েই এই যাত্রা পালাগান করানো সম্ভব। তাই তার বড় ভাইকে অনেক অনুরোধ করে-ই-তাকে এই গানে আনতে হলো। এই পালাগানটি নিজ গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মঞ্চায়ন করে অনেক প্রসংশার পর "জীবন্ত কবর" নামে আরও একটি যাত্রাপালা গান নিজ দলের সহযোগিতায় মঞ্চায়ন করেন। সম্ভবত ১৯৮৯ সালের কথা, নেত্রকোনার কুদ্দুছ বয়াতী একবার তার গ্রামে কিস্‌সা বা পালাগান গাইতে আসে। তখন থেকেই তার চিন্তা ঝুমুর যাত্রা ছেড়ে কীভাবে কিস্‌সা পালাগান শেখা যায়। সে নেত্রকোনা কুদ্দুছ বয়াতীর বাড়িতে গিয়ে তার নিজ খরচে গান শেখানোর জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। বাড়ি ফিরে তার সাইকেল ও অন্যান্য জিনিস বিক্রয় করে নেত্রকোনায় কেন্দুয়া কুদ্দুস বয়াতীর বাড়িতে এক বৎসর যাবৎ প্রশিক্ষন দিলেও পরে পালাগানের উত্তর দেওয়া 'ডাইনা' বলে পরিচিত গায়েন বা দোহারী হাশেমের মাধ্যমে তার মূল শিক্ষায় 'কিস্‌সা বা পালাগান' মুখস্থ করে পরবর্তীকালে বয়াতী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন।

নেত্রকোনা কেন্দুয়া এলাকার কদমশ্রী গ্রামে প্রথম পালা বা কিস্‌সা পরিবেশনের মাধ্যমে কপাল খুলে গেল নতুন বয়াতী ইসলাম উদ্দিনের। পরবর্তীকালে খালিয়াজুরীর বিভিন্ন গ্রামে পালা পরিবেশন করে জীবনের প্রথম ২৪ দিনে ২,৮৩০/- টাকা উপার্জন করেন। উক্ত টাকা উস্তাদের হাতে দিয়ে তিনি চলে আসেন নিজ গ্রামে নোয়াবাদ, করিমগঞ্জ।

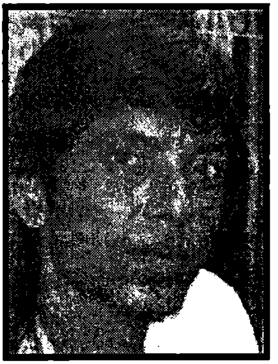

ইসলাম উদ্দিন বয়াতি

www.pathagar.com

তার শ্রম, সাধনা, নিজস্ব মেধা, চিন্তা চেতনা, বৈচিত্র্যপুণ্য শিল্পীজীবনে কিশোরগঞ্জের লোকজ সংস্কৃতিতে পরিচিতি করিয়েছেন, পাড়া গায়ের ইসলাম উদ্দিন।

ইসলাম উদ্দিন পালাকারের রয়েছে পালার বিশাল ভাণ্ডার। নিজস্ব আঙ্গিকে তার তৈরি পালাগুলোর মধ্যে 'গুলে হরমুজ, রামবিরাম, এমরান বাদশা, রাজুমালা, অরবুলা, রূপকুমার, কমলা রাণী, সাগর দিঘি, মতিলাল, জাহাঙ্গীর বাদশা, আলমাস, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, উতলা সুন্দরী ও কাকা ধরের খেলা'। তার সহায়ককারী হিসেবে একজন 'ডাইনা' থাকে। তার কাজ হচ্ছে হাস্যরস সৃষ্টি করা ও গায়েনের সঙ্গে বিভিন্ন পার্শ্ব চরিত্রের উত্তর দেওয়া।

পালাগানে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে বাঁশি, ঢোল, জিপসী, মন্দিরা আর হারমোনিয়াম। হারমোনিয়ামে রয়েছেন মোসলেম উদ্দিন ফকির, ঢোল বাজান জজ মিয়া, আড় বাঁশি বাজান আবদুল আলী, পাতা বাঁশি বাজান সিরাজ মিয়া, চটি বাজান ফজলু মিয়া, মন্দিরা বাজান আবদুল কাদির। পালার উপকরণ হিসেবে রয়েছে বালিশ, শাড়ি, ওড়না, চাবুক, তীর, তবলা, মালা, ঘুঙুর ইত্যাদি। তার দলের সহযোগী ৫ থেকে ৭জন সদস্য। তাদের বলা হয় 'দোহারি'। দোহারি কখনও কখনও পরিবর্তন হয়। দলের 'ডাইনা' হচ্ছেন আবদুল আলীম তিনি আড় বাঁশি বাদক। তাকে ঘিরেই জমে উঠে মঞ্চের মূলত নাট্যরূপ নানান কথা ও কাহিনি, গল্প এবং কিস্‌সা পালা।

ইসলাম উদ্দিন বয়াতি

কিস্‌সাগানের মঞ্চে কিস্‌সাকার-গায়েনের সাথে সংলাপে অংশ নেন। কিসস্াকারের প্রশ্ন উত্তরে গায়েনদের মধ্য থেকে যিনি সর্বদা কথার উত্তর দেন তাকে 'ডাইনা' বলে। কিস্‌সার আসরে মঞ্চে 'ডাইনা' নামের গাইন বসে দোহার দলের সবার 'ডান' দিকে সে জন্যই তার নাম 'ডাইনা'। গ্রামে সাধারণত কোনো বাড়ির ভেতরে বা বাইরের উঠানে কিসস্া গানের আসর হয়। এ ক্ষেত্রে দুটি বা একটি কাঠের চকি পেতে মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের উপরে থাকে রঙিন কাপড়ে তৈরি ছোট একটি সামিয়ানা। আর সে মঞ্চের চারদিকে বসে সাধারণ দর্শক। এ ধরনের আসর সাধারণত দিনে হয় না, হয় রাত্রিতে। কোথাও কোনো চকির ব্যবস্থা না হলে উন্মুক্ত খালি উঠানে পাটি কিংবা চাটি অথবা ধারী বিছিয়ে আসর বসে। দর্শক শ্রোতাদের জন্য বিছানো হয় কোথাও নৌকার পাল কোথাও খড়। তার বেশির ভাগ পালা-ই ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

নিম্নে তার পালাগানের বন্দনার কিছু অংশ বিশেষ দেওয়া হলো :

আল্লাহর নাম লইলাম দমে এই আসরে এসে
ওরে যে আল্লাহ্ তুলিব মোরে হাশরে ময়দানে (২)
দোয়া ওরে পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর
ওরে পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা হেনস্থান
উরদিশিতে বাড়ায় সেলাম মোমিন মুসলমান।

কিস্সা শুরুর সময় বন্দনা গান

পাষাণ মনরে মনরে আমার
হরদমে লইও আল্লার নাম।।
দমে দমে লইও নাম জিরানী না দিও
পাষাণ মনরে আমার
হরদমে লইও আল্লার নাম। (২)
প্রথমে আল্লাজির নামে লিখা করলাম শুরু
দ্বিতীয় বন্দনায় করলাম রাসুলে হুজুর সরো
একদিকে উদয় গো বানু চৌদিকে পশর।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার
হরদমে লইও আল্লার নাম। ঐ
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত
যেখানে হয়েছে সৃষ্টি, মালমের পাথর
হাত উঠায়ে মারে পাথর বুক পাতিয়া লয়
বুকে পড়িয়া পাথর খণ্ড খণ্ড হয়।।
পাষাণ মনরে মনরে আমার
হরদমে লইও আল্লাহর নাম। ঐ
তারপরে বন্দনা করলাম মদনপুর মাজারে
সে জায়গাতে আছে রওজা শাহসুলতান পিরে।
তার পরে বন্দনা করলাম সিলেট শহর
শাহাজালালের চরন বানলাম বসিয়ে আসর।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার
হরদম লইও আল্লার নাম।ঐ
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা বড়স্থান
যেখানে হয়েছে সৃষ্টি কিতাব আর কোরআন।
তারপরে বন্দনা করলাম নবিজির চরণে,
যিনি আমায় করিবে পার হাশর ও ময়দানে।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার,
হরদমে লইও আল্লার নাম। ঐ
দক্ষিণে বন্দনা করলাম কালীধর সাগর,

www.pathagar.com

সে সাগরে বাইত ডিঙ্গা চান্দু সওদাগর,
চারকোণা বন্দনা কইরা মন করিলাম স্থির,
স্থির উপর বাইন্দা লইলাম আশি হাজার পির।।
পাষাণ মনরে মনরে আমার, হরদম লইও আল্লার নাম।ঐ
আশি হাজার পির বান্দিলাম, নয়লাখ পেগাম্বর
গাজী কালুর চরন বানলাম, সুন্দর বনজঙ্গল
গাজী সাহেবের পিতা নামটি বাদশা সেকান্দর
এক রাতে বান্দে তিনি বিরাট নগর।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার, হরদম লইও আল্লার নাম।ঐ
পিতা-মাতার চরণ বানলাম বসিয়া আসরে,
যে মায়ের গর্ভে রাইখা দিয়াছে ছাড়িয়া, মায় জানে সন্তানের ব্যথা,
আর জানেরে কে, যে মায় দশমাস দশদিন রাখছিল উদরে।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার,
হরদম লইও আল্লার নাম। ঐ
উস্তাদের চরণ বানলাম বসিয়া আসরে,
তার চরণে নোয়াই মাতা,
ঘুরি দেশ বিদেশে
শিক্ষাগুরু কুদ্দুছ মিয়া,
কেন্দুয়া থানা বাড়ি
আমার নামটি ইসলাম উদ্দিন,
সভায় করলাম জারি।।
পাষাণ মনরে, মনরে আমার,
হরদম লইও আল্লার নাম।
দমে দমে লইও না জিরানী না দিও,
হরদম লইও আল্লার নাম।

লোকগীতিকার মুক্তি চৌধুরী

পারিবারিক নাম মুক্তার উদ্দিন খান চৌধুরী হলেও মুক্তি চৌধুরী নামেই কিশোরগঞ্জ শহরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি সমধিক জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে কবি-ছড়াকার, আবৃত্তিকার, সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা ও নাট্যকার। বহুবিধ গুণের অধিকারী এই বরেণ্য শিল্পী ১৯৫৭ সালের ৯ই জুলাই কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার কিরাটন গ্রামের চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সিরাজ উদ্দিন খান চৌধুরী ও মায়ের নাম হাজেরা খাতুন। ছোটবেলা থেকে স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিসরের সাথে তিঁনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হন।

তাঁর গানের গুরু একসময়ের কিশোরগঞ্জ জেলার গুণী সংগীতজ্ঞ ও নাট্যকার মৃণাল কান্তি দত্ত। স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার চাইতেও তিঁনি ব্যস্ত থাকতেন এখানকার নানাবিধ সাংস্কৃতিক-কর্মকাণ্ডে। তাঁর অজস্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই

www.pathagar.com

অঞ্চলের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত লোকগীতিকা-পালা রচনা আর মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব তাঁকে বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে।

মৈয়মনসিংহ গীতিকা ও প্রচলিত পালাসমূহের অবলম্বনে লোকনাট্যের আদলে মুক্তি চৌধুরী বেশ কিছু পালা রচনা করেছেন। এসব পালাসমূহ হলো মহুয়া, বীরাঙ্গনা-সখিনা ও কান্দে সুজন বিরহে ইত্যাদি বিখ্যাত। তিনি বেশ কিছু মঞ্চ-নাটকও রচনা করেছেন যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সখিনার বিলাপ, কেমন আছি আমরা ও মাতব্বর। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাহিনি অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন নাটক চেতনায় একাত্তর। তাঁর রচিত লোকনাট্যপালা-গীতিকা ও মঞ্চনাটক কেবল কিশোরগঞ্জ জেলাতেই নয় ঢাকাসহ দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। সেগুলো যথেষ্ঠ প্রশংসিত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী ও শিশু একাডেমীতে তিনি দীর্ঘদিন প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিশোরগঞ্জের লোকসংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা মুক্তি চৌধুরী লোকগীতিকা-পালা রচনা ছাড়াও অসংখ্য জারি-গান, বিয়ের গান দেশাত্ববোধক গান রচনা করেছেন। তিনি শুধু শিল্পীই ছিলেন না- ছিলেন কর্মনিষ্ঠ সংগঠকও। বৃহস্পতি নাট্যসংগঠন, উদীচী, কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক সংস্থা ছাড়াও তিনি নানামুখী সমাজকল্যাণকর সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। লিখেছেন অসংখ্য দুর্নীতি-বিরোধী গান আর ছড়া।

কিশোরগঞ্জ জেলার লোক-সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে এতে সবিশেষ অবদানের জন্য ঐতিহ্য-সন্ধানী এই বরেণ্য শিল্পী পেয়েছেন গুণীজন সম্মাননা। সৃজনশীল, প্রচারবিমুখ, প্রগতিশীল আর নিরলস এই সাংস্কৃতিককর্মী ও শিল্পী ২০১০ সালের ৬ই মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

বিজন কান্তি দাশ

কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়া পাড়ায় জন্মেছেন; বেড়ে উঠেছেন তিনি। চৌষট্টি বছর বয়সী এই প্রবীণ গীতিকার একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার ও লোকপালাকার হিসেবে কিশোরগঞ্জ শহরে বেশ পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন।

তার লিখিত চন্দ্রাবতী পালাটি ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই লোকনাট্যপালাটি ১৯৯০ সালে কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রথমে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এরপর কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এটি মোট ঊনত্রিশবার মঞ্চস্থ হয়।

২০০০ সালে তিনি রচনা করেন অপর একটি লোকনৃত্যনাট্য মলুয়া সুন্দরী; এটিও ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে রচিত।

এই দুটি পালাই আঞ্চলিক ভাষায় বিশেষত তিনি কিশোরগঞ্জের স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা এতে প্রয়োগ করেন।

১৯৯৫ সালে স্মৃতি অম্লান নামে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে অপর একটি গীতিকাধর্মী পালা রচনা করেন। এটিও স্থানীয় সাংস্কৃতিক জগতে বেশ সুনাম বয়ে আনেন।

এই প্রবীণ পালাকার শারীরিকবাবে অসুস্থ হয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন।

www.pathagar.com

ওস্তাদ আব্দুর রশিদ

ছিয়াত্তর বছর বয়সী বর্ষীয়ান লোকসংগীতশিল্পী ওস্তাদ মো. আব্দুর রশিদ। এক সময়ে, কিশোরগঞ্জ লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনায় ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। মূলত পুথিপাঠ ও জারিগান পরিবেশন করতেন তিনি। তার গুরু ছিলেন ওস্তাদ খোয়াজ উদ্দীন আহমেদ। চল্লিশ বছর বয়স থেকে এই শিল্পী ও তার দলের পরিবেশনা দিয়ে এ অঞ্চলে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

এক সময়ে নিজের বাড়িতে বিপুল লোকসমাগমের মধ্য দিয়ে জমজমাট লোকসংগীতের আসর করতেন। সেখানে আশেপাশের নানা অঞ্চলের লোকশিল্পীরা গানবাজনা করতে আসতেন। সারা রাত ধরে এই অনুষ্ঠান চলত। মূলত আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন মানুষের কাজকর্ম কম থাকত তখন এই আসরগুলো অনুষ্ঠিত হতো বিভিন্ন স্থানে।

এক সময়, এই জেলার নানা স্থানে তিনি তার দল নিয়ে গিয়ে জারি গান গেয়ে আসতেন। শুধু কিশোরগঞ্জেই নয় তিনি ঢাকাতেও একসময়ে জাতীয় জাদুঘরে জারিগান ও পুথিপাঠের পরিবেশনা উপস্থাপন করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন পাল

কীর্তনীয় ক্ষেত্রমোহন পাল যিনি দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে শুধু কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেই নয় এদেশের নানা স্থানেই কীর্তন ও রামায়ণপালা পরিবেশন করে আসছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিশোরগঞ্জ জেলায় অসংখ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে বা বৈষ্ণব-ভক্ত-শিষ্যের বাড়িতে তাদের বাৎসরিক-আয়োজনে নানা কীর্তনের আসর বসে। এই সমস্ত আসরে কখনো দুদিন কখনো তিনদিন ধরে নাম-সংকীর্তন ও লীলা-কীর্তনের জমজমাট অনুষ্ঠান চলে।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোতে কীর্তনীয় ক্ষেত্রমোহন পাল তাঁর দল নিয়ে হাজির হয়ে কীর্তন করেন; রামায়ণ-ভাগবত পাঠ করেন। তিনি টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে পালা-গান পরিবেশন করেন।

শ্রী-চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী যে-কোনো নিম্নবর্গীয় মানুষজনই সম্মানের সাথে অবস্থান করতে পারেন। দীক্ষিত হতে পারেন। এমনকি, হিন্দু ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরেও যে-কোনো মানুষ এই বৈষ্ণব ধর্মের ধারায় জীবন অতিবাহিত করতে পারে।

কীর্তনীয় ক্ষেত্রমোহন পাল প্রয়াত বৈষ্ণব-গুরু মন্টু গোঁসাইয়ের শিষ্য। তার কীর্তনের শিক্ষাগুরু হলেন ক্ষিতিশ চন্দ্র পাল। ক্ষেত্রমোহন পাল রামায়ণের 'পিতা-পুত্রের পরিচয়', 'সীতার বনবাস' 'পিতা-পুত্রের যুদ্ধ', 'রামের বনবাস' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' 'সীতা হরণ' প্রভৃতি পালাগুলোই বেশি পরিবেশন করেন। রামায়ণের এই সমস্ত পালাগুলোই সাধারণ মানুষেরা বেশি পছন্দ করে। সারা রাত ব্যাপী এই পালাগুলো পরিবেশিত হয়।

এগুলো শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নয়, হিন্দু-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই সমস্ত পালা-কীর্তনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানা বিষয়ে লোকশিক্ষা ও লাভ করেন।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

গল্প বলা ও শোনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আবহমানকাল ধরে মানুষ তার অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি গল্পের মাধ্যমে বলতে চায়। এসব মৌলিক গল্পই লোককাহিনি। লোককাহিনি মূলত স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর।

ভেলুয়া সুন্দরীর কিস্‌সা

ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনি এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। ভেলুয়া সুন্দরীর বাবা অত্যন্ত অহংকারী, হিংসুটে লোক ছিলেন। বর্ণ হিন্দুর দাবীদার। হীরাধর সওদাগর ছিল সাধারণ পরিবারের ছেলে। সকলেই এগারসিন্দুর গ্রামের বাসিন্দা।

ভেলুয়া সুন্দরী পরমা সুন্দরী বলে খ্যাত ছিল। হীরাধর ও অত্যন্ত সুপুরুষ এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী ছিল। উভয়ের মধ্যে বাল্য বয়সেই অব্যক্ত ভালবাসা ফুটে উঠেছিল। ভেলুয়াকে আম কুড়ানিতে হীরাধর সাহায্য করেছে। ভাল সিঁদুরে আমটি নিজে গ্রহণ না করে ভেলুয়াকে খেতে দিত। ঢিল ছুড়ে হোক কিংবা গাছে উঠে হোক ভাল ভাল আম ভেলুয়াকে দেবার চেষ্টা করত। তখন অন্য সাথিরা বলত হ্যাগো হীরা দাদা, কেবল তুমি ভেলুয়াকে আম দাও। তখন ভেলুয়া একটু লজ্জিতও হতো বটে। এমনি করে ভেলুয়াকে নদীর ঘাটে সাঁতার কাটা শিক্ষা দিত। যেখানেই ভেলুয়াকে পেত, সেখানেই একটু স্নেহ দিতে চেষ্টা করত। হীরাধর ও ভেলুয়াদের বাড়িতে কোন পুঁজা অথবা পিঠা পার্বণের অনুষ্ঠান হলে, অনাহত আমন্ত্রিত হয়েই হাজির হতো। ভেলুয়াও মনে মনে তার অপেক্ষায় থাকত। তাৎক্ষণিক ভেলুয়া বসার জন্য একটি আসন এনে দিত। মাঝে মধ্যে এসে সাক্ষাৎ করে যেত। পার্বণে চুপে চুপে পিঠাও দিয়ে যেত। এমনি ভাবেই একটা অব্যক্ত বাল্য ভালবাসা তাদের মধ্যে বিরাজ করত। কালের প্রবাহে উভয়ের বয়স বৃদ্ধিতে ভেলুয়া ঘরে বন্দী হয় আর হীরাধর ধনোপার্জনে বিদেশে গমন করে। অনেক দিন অপেক্ষার মধ্যে কখনও কখনও বাল্যের ভালবাসা স্মৃতিপটে ভেসে উঠত কি না কে বলবে?

দেহশ্রী ভেলুয়া ষোড়শ বয়সে পৌঁছলে অবর্ণনীয় রূপ আরও বৃদ্ধি পেল। ভেলুয়ার হিংসুক বাবা সুন্দরী মেয়ের বংশ গৌরবের কারণে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেন না। এরই মধ্যে হীরাধর সওদাগর বহু ধন রত্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। এর সুনাম এবং ধন রত্নের কথা শুনে সবাই সমালোচনা মুখর হয়ে উঠল। ভেলুয়ার কারণেও উক্ত খবর পৌঁছল। বাল্যের নানা কথা ভেসে উঠতে লাগল। হীরাধরের আপাদ মস্তক কায়াকৃতি রূপ লাবণ্য সকলেই এক যোগে নয়ন যুগলে ভেসে উঠল।

www.pathagar.com

তেমনি ভেলুয়ার পূর্ণ জ্যোৎস্না লোকিত মুখ মণ্ডল, উরুলম্বিত কাল কেশ, ঈগল নাশিকা, প্রশস্ত ললাট, ধনুকাকৃতির ভুরুযুগল আয়তক্ষেত্র অতি লাবণ্যময় বাহুযোগল, সকলেই হীরাধরের নজরে একসঙ্গে ভাসতে লাগল। বাল্যের ভালবাসার স্মৃতি পটে জেগে ওঠে। এমনি বাল্যের ভালবাসার আলোড়ন উভয়ের মধ্যেই চলতে লাগল। উভয়েই উভয়ের শ্রীদর্শন ভালবাসা বিনিময়ের জন্য অস্থির দিনযাপন করছে। কিন্তু কোনো সাক্ষাৎ মিলছে না।

হীরাধর-ভেলুয়ার বাড়ির আশপাশ, নদীর ঘাট চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করেও যেহেতু হীরাধর কে নিয়ে আগে পরেই নানান কথা সমালোচনা হয়েছিল, ইদানিংও সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। একদিন হীরাধর অন্যমনস্কে ঘোরাফেরা করতে করতে ভেলুয়াদের আম বাগানে এসে উপস্থিত। তখনই বাল্যের নানা কথা ভেসে উঠল তখন একটি আম্র বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে ভেলুয়ার নানা কথায় ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে রইল।

ভেলুয়া ও একজন সঙ্গিনী নিয়ে বিকাল বেলায় পায়চারী করতে করতে গোধুলি লগ্নে এসে আম্র কাননে উপস্থিত হলো। হঠাৎ নীরবস্থানে একটি লোককে বসে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল। সঙ্গিনী আস্তে আসে, বাকরুদ্ধ অবস্থায় অগ্রসর হতে লাগল। নিকটতম হয়ে হীরাধরকে সে চিনল, বাকহীন অবস্থায় কিচুক্ষণ দাঁড়িয়ে হীরাধরকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। হীরাধর চক্ষু বুজে বসেই রইল। সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসতে লাগল। অপেক্ষা আর সম্ভব নয় ভেবে ভেলুয়া বসে উঠল দাদা বাবু এখানে বসে কি ভাবছেন? এমনি ধ্যান ভঙ্গ হলো। চমকিত নয়নে চেয়ে দেখল সামনে ভেলুয়া। উভয়েই উভয়ের প্রতি অনিমেষ নেত্রে বাকরুদ্ধ অবস্থায় তাকিয়ে রইল। আবার ভেলুয়া বলে উঠল দাদা বাবু এখানে কেন? হীরাধর বলল আম কুড়াতে, ভেলুয়া একটু হেঁসে বলল এখন তো আমের সময় নয়। হীরাধর অকুল নয়নে ভেলুয়ার মুখ পানে চেয়ে বলল সিঁদুরে আমি কি আর পাব না? ভেলুয়া আস্তে আস্তে মাথা নিচু করল। উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আবার ভেলুয়া বলল, দাদা বাবু শুনেছি অনেক ধনরত্ন নিয়ে এসেছেন, আর ... কিছু ... না এমনি হীরাধর ভেলুয়ার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। উভয়েই ভাবাবেগ বাকরুদ্ধ অবস্থায়, ভয় বিহ্বলতার মধ্যে দিয়ে স্তব্ধ হলো। তারপর আস্তে আস্তে যার যার পথে চলে গেল। ভেলুয়া সঙ্গিনীকে নিয়ে অতি সাবধানে ঘরে ফিরে শয্যায় শায়িত হলো। হীরাধর বাড়ি গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিবার প্রস্তুতি নিল। হীরাধর ও ভেলুয়ার মনে আকর্ষণ শক্তিতেই উভয়ের সাক্ষাৎ মিলল। কিন্তু উক্ত সাক্ষাতে ভালবাসার যে ঘর্ষণানল প্রবাহিত হতে লাগল তাতে ভেলুয়া শয্যাশায়ী হয়ে পরল। এই আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায় না ঔষধেও ধরে না। দানা পানি ত্যাগে চেহারা বিলীন, এহেন অবস্থা দৃষ্টে পিতা মাতা একান্তই উদগ্রীব হয়ে পড়লেন।

বৈদ্য কবিরাজ ডেকে রোগের কোনো আলামত পাওয়া যায় না। ঝারা ফুঁক চলছে, আরোগ্যের কোনো লক্ষণ নেই।

মেয়ে লোকের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, তা চিরসত্য। পরিবারস্থ সকলেই অস্থির দিনযাপন করছে। এ হেন অবস্থা দৃষ্টে, ভেলুয়ার সঙ্গিনী বাটিস্থ কয়েকজনের নিকট হীরাধরের সাক্ষাৎ বর্ণনা করলে সকলেই ভেলুয়ার অসুস্থতার কারণ বুঝতে পারলেন। তৎসময়ে হীরাধরের বিবাহ প্রস্তাবও এসে পৌছে। ভেলুয়ার অহংকারী বাবা

www.pathagar.com

অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হতে পারেন, কিন্তু বাটিস্থ সকলেই একমত হয়ে শানে বাঁধা ঘাটসহ একটি দিঘি আর একটি সোনার পালঙ্ক যদি দিতে পারে তবে বিয়ে দেব।

উক্ত সংবাদে হীরাধর হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ল, ভেলুয়াও মর্মাহত হয়ে ভাবতে লাগল। তাৎক্ষণিক সহসঙ্গিনী কে ডেকে বলল, হীরাধর বাবুকে গিয়ে বলবি অদ্য রজনীতে নিশীথ সময়ে আম্র কাননে সাক্ষাৎ দেবার জন্য। উক্ত খবর হীরাধর অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং নৈরাশ্যের বদলে মনে আশার সঞ্চার হলো। উভয়েই দ্বিতীয় সাক্ষাতের অপেক্ষা করতে লাগল। দিন অতিবাহিত হলো; রাত্রিও আসল। কিন্তু আকাংখিত সময় আর সহজে আসে না। যথা সময়ে অপেক্ষায় উভয়েই ছটফট করছে। উভয়ের চোখে ঘুম নেই। সময় ঘনিয়ে এসেছে, বাটিস্থ সকলেই নীরবে নিদ্রিত। তখন ভেলুয়া অতি সাবধানে ঘর থেকে বের হয়ে আম্র কাননের দিকে অগ্রসর হতে লাগল ক্রমেই আম্র কানন আলোকিত হতে লাগল; যেন চন্দ্র সূর্যের মিলন হচ্ছে। কে বলবে বনের পশু পাখি এ দৃশ্য দেখছিল কিনা। বৃক্ষের একটি পাতাও নড়ছে না। আকাশের তারকারাজী ও মিট মিট করছে এমনি স্তব্ধ মুহূর্তে উভয়েই নিকটতম হয়ে নির্বাক স্তব্দ মূর্তির মত দাড়িয়ে রইল।

ভেলুয়া : কম্পিত স্বরে বলল বাবার প্রস্তাবে আপনি ভয় পেয়েছেন?

হীরাধর : অবশ্যই

ভেলুয়া : ভয় নেই

হীরাধর : কেন?

ভেলুয়া : পালঙ্কের স্বর্ণের তো পরিমাণ উল্লেখ নেই।

হীরাধর : তবে কি সামান্য স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দেবে?

ভেলুয়া : হ্যাঁ তাই করবেন।

হীরাধর : পরে যদি গণ্ডগোল বাধে।

ভেলুয়া : তখন আমি বুঝব কি করতে হবে।

পাখি প্রভাত গান গেয়ে উঠল; তখনি উভয়েই চমকে উঠল।

হীরাধর : ভেলুয়া বাল্যের কথা তোমার মনে আছে?

ভেলুয়া : মনে না থাকলে কি আর নিশীথ রাত্রে আম্র কাননে এসেছি। এমনি হীরাধর ভেলুয়ার হস্তদ্বয়ে চুম্বন করত। আম্র কানন ত্যাগ করল। তাৎক্ষণিক বাতাস বইতে লাগল। পাখি সব আবার প্রভাত গান গেয়ে উঠল। সময় যে কিভাবে বয়ে গেল, কেউ অনুধাবন করতে পারল না। উভয়েই এসে শয্যায় গিয়ে কে কি ভাবছিল কে বলবে।

প্রভাতে হীরাধর ভেলুয়ার বাবার নিকট সকল দাবী মেনে সম্মতি প্রস্তাব পাঠিয়েদিল। ভেলুয়ার বাবা বিবাহের লগ্ন দেখে তারিখ ও সময় সূচি নির্ধারীত করল। হীরাধর সর্বকাজ সমাধানার্থে শত শত লোক লাগিয়ে দিলেন। বিবাহ লগ্নের সময় সূচির আগেই উভয় পক্ষের প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হলো। আগামী কল্য বিবাহ। উভয়পক্ষের বাড়িতে অহোরাত্র আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে প্রভাত সূর্য উদিত হলো। বিবাহ বাদ্যও বেজে উঠল। সকলে বর কনেকে বিয়ে সাজে সাজ্জিত করতে আরম্ভ করল।

www.pathagar.com

সখিগণ ভেলুয়াকে ঘিরে নৃত্যগীত করতে লাগল। বিবাহ লগ্নের যথাযথ সময়ে বর এসে কনে বাড়িতে পৌঁছল। পুরোহিত শুভলগ্ন সময় সূচিতে বিবাহ কার্য আরম্ভ করল। বাদ্য বাজতে লাগল। অমনি আনন্দের মধ্য দিয়ে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। তারপর আহারাদি সম্পন্ন করে বর-কনে নিয়ে যাত্রা করিল। সন্ধ্যালগনে বাড়ি পৌঁছল। সখিগণ নৃত্য, গীত, শানাই বাজানায় আকাশ মুখরিত করে তুলিল। বৃদ্ধ বণিতাগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলিতে লাগল অদ্য চন্দ্র সূর্যের মিলন রজনী। সখিগণ বাসর ঘর সজ্জিত করতে লাগিল। সকল ক্রীয়া কর্মাদি সম্পন্ন হলে বর কনেকে সখিগণ বাসর গৃহে পৌঁছে দিল। কিয়ৎমান উভয়ে নীরব রইল। কে কি বলিবে স্থির করিতে পারছিল না। হঠাৎ হীরাধর বলল আমাদের বাল্যের আম কুড়নির ভালবাসা যৌবনের ভালবাসা আমতলাতেই ইতি টানলো? ভেলুয়া বলল আম তলা কি সহজ স্থান যে আমতলা হইতে একদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্থমিত হয়েছিল হয়তবা একদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য এই আমতলাতেই উদিত হবে। গ্রাম্য মোড়লগণ খুন খারাপির পরামর্শ করে খুন খারাপি করছে আবার এই আমতলাতেই বসে মীমাংসা করছে। কত ভালবাসার সৃষ্টির স্থান এই আমতলা, আবার বিচ্ছেদের স্থান এই আমতলা। লোক ছড়ায় উল্লেখ আছে-

আম গাছেতে নাইরে আম কোটা কেন লাড়,
তোমার সনে নাই পিড়িতি আঁখি কেন ঠার।

আর আমি আম কুড়ানির ভালবাসা হতেই ভালবাসার জন্ম নিয়ে আজ আমি আপনার বাসর গৃহে। তাৎক্ষণিক হীরাধর বললে লাগল সুন্দরী ভেলুয়ার এই আমই আমাকে ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছে এবং আমই আমার শিক্ষা গুরু।

ফাল্গুনে যখন আমার মুকুল আসে তখন মুকুলের ঘ্রাণ বসন্তের হাওয়ায় মিশে সুগন্ধে গ্রাম বাংলা আনন্দে মুখরিত করে তুলে। তকনই আমের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় যখন আমের কুঁড়িগুলো হয় তখনই কুঁড়ি দেখতে ভাল লাগে। অর্থাৎ তুমি যখন আমকুঁড়ি কুড়াতে তখন তোমার কিশোর বয়স। আবার এ বয়সেই আম কুঁড়ি খেতে একান্ত ভাল লাগে। যখন কুঁড়িগুলো বড় হয়ে অল্প অল্প সিঁদুর রঙ ধরে, তখন যুবক যুবতীরা কাঁটা মিঠা কাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। আবার যখন পূর্ণ যুবক যুবতীর বয়স ধারণ করে, তখন আমের বুকটি টক টকে পূর্ণ সিঁদুরে রঙ ধারণ করে, তখন আমটি তাৎক্ষণিক না খেয়ে অধিক মানুষ হাতে রাখতে ইচ্ছে করে। ভেলু মনে হয় তোমার সে রকম বর্তমান বয়স। তাইত ফলের রাজা আম। উভয়েই একটু হাঁসি দিয়ে ভেলুয়ার হাত ধরে পালঙ্কে উঠলেন। এমনি আনন্দ ভালবাসার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কিছুদিন পর হীরাধর সওদাগরিতে যাবার জন্য মনস্ত করল। ভেলুয়াও মত প্রকাশ করল। সওদাগরি নৌকা সাজিয়ে সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করল। আগামী কালই যাত্রা করবেন। আরও একটি রাত্র ভেলুয়ার সঙ্গে ভালবাসা বিনিময় করে রজনী অতিবাহিত করল।

প্রভাতে হীরাধর মা-বোনকে অনুরোধ করলেন, ভেলুয়াকে দিঘির ঘাটে যেতে দেবে না এবং বাড়ির দর্জাও যেন অতিক্রম না করে। উক্ত আবেদন করে হীরাধর মায়ের পদধুলি নিলেন এবং ভেলুয়ার হস্ত চুম্বন করত, বিদায় হলেন। কিছুদিন ভেলুয়া আনন্দের মধ্যে দিয়েই দিন অতিবাহিত করছেন। ভাগ্যের পরিহাস ভেলুয়ার জীবনে দুঃখের কালো ছায়া নেমে এলো। শাশুড়ি মা-বোনের হিংসা জাগ্রত হলো। ভেলুয়াকে

www.pathagar.com

ডেকে বলল স্নানাহারের পানি আমরা আর আনব না। তোমাকে আনতে হবে। সে আর কি করবে। নিয়মিত আনতে লাগল। চাটিগাঁয়ের আমীর সওদাগর একদিন এগারসিন্দুরের নৌবন্দরে বাণিজ্য নৌকা নিয়ে আসা যাওয়ার পথে ভেলুয়াকে দিঘির ঘাটে দেখে পাগল হয়ে গেল। মনস্থির করিল হরণ করবে।

সময় ও সুযোগের জন্য ওৎ পেতে থেকে একদিন সে দিঘির ঘাট হতে ভেলুয়াকে হরণ করে নিয়ে যায় চট্টগ্রামে। সে সময় নদী পথে চট্টগ্রাম থেকে এগারসিন্দুর পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বণিকেরা বাণিজ্য করতে সবসময়ই আসত। এককালে এগারসিন্দুর ছিল প্রাচীন নৌবন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

টীকা : সিঙ্গুয়া নদীর তীরে ভেলুয়া সুন্দরীর বাড়ি নদী দিঘির ঘাট যেখানে চট্টগ্রামের বণিক আমীর সওদাগর ওরফে কাঙ্গোয়া সওদাগর এগারসিন্দুর এসেছিলেন। ভেলুয়া সুন্দরীর দিঘির ঘাটের ভগ্নাবশেষ আজও এ স্থানে রয়েছে। এটাই ভেলুয়া সুন্দরীর ঘাট নামে পরিচিত। হীরাধর ভেলুয়াকে উদ্ধার করে আনবে প্রতীক্ষায় ছিল আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী। এ স্থানটি কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল ও ঐতিহাসিক জনপদ।

ভেলুয়ার উদ্ধার পর্ব

হীরাধরের মা-বোন একান্তই চিন্তিত হয়ে পড়ল, হীরাধর বাড়ি আসলে তারা কি জবাব দিবে, অনেক ভেবে-চিন্তে পরামর্শ করে নেয় যে, ভেলুর দোষেই ভেলো অপহৃত হয়েছে। আমাদের নিষেধ অমান্য করে পুকুর ঘাটে যাওয়া আসা করত এবং সওদাগরদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করত, এমন একটা মনগড়া, মিথ্যা বানোয়াট গল্প তৈয়ার করে রাখল।

অন্যদিকে কঙ্গো ভেলোয়ার উপর অমানবিক অত্যাচার করে চলছে তাকে বিবাহে রাজী করার জন্য। কিন্তু না- ভেলুয়া অটল। ভেলুয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করে সতীত্ব রক্ষা করে চলছে। আর ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রেখে নীরব প্রার্থনা করছে ভগবান আমাকে রক্ষা কর। নৌকা প্রবল বেগে ছুটে চলছে। কিছুক্ষণ পর পর ভেলুর উপর নির্যাতন চলছে। ভেলুয়া মাঝে মধ্যে ছৈয়ের বাইরে এসে কত কথাই ভাবছে, এখন যদি আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী হীরাধর আসত এমন নানা কল্পনা করছে আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছে।

এমন সময় অনেক দূরে একটি নৌবহর দেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে ভগবান ঐ বহনটি যদি আমার প্রিয় স্বামীর হতো তবে তার সম্মুখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতাম। এমন সময় বহর নিকটতম হয়ে পরল আর ছৈয়ের উপর বসা হীরাধরকে চিনতে পারল। তৎক্ষণাৎ ভেলুয়া হীরাধর বলে চিৎকার করে দুই হাত উড়িয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনি হীরাধর মাঝি-মাল্লাকে ডাক দিয়ে একটি কাছি (দড়ি) ভেলুয়ার সম্মুখে ফেলে দিল। ভেলুয়া কাছি ধরে ফেলল। আর মাঝি-মাল্লা সকলে কাছি টেনে নৌকায় তুলল। পালের নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে প্রবল বেগে চলছে। আর কঙ্গোর নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলছে। তার নৌকার বেগ থামিয়ে প্রতিকূলে এসে হীরাধর বহর ধরা অসম্ভব মনে করে বিফল মনোরথে ফিরে যায় কঙ্গো সওদাগর।

www.pathagar.com

এদিকে বাণিজ্য বহর নিয়ে হীরাধর নিজ ঘাটে গিয়ে পৌছল, উক্ত সংবাদে গ্রামের লোক সকল, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা এসে ঘাটে ভীড় করল এবং একটি মাত্র প্রশ্ন ভেলুয়াকে কিভাবে উদ্ধার করল। হীরাধর সকলকে ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। সকলেই একবাক্যে বলে উঠল ভগবান ভেলুয়ার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। হীরাধরের মা-বোন একান্তই ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। হীরাধর ভেলুয়া এক সাথে বাড়ির নিকট হলে, মা-বোন চিৎকার আরম্ভ করে দেয়। এই কুলঙ্গার, অসূচি মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে পা রাখবানা, সে বাড়িটাই অসূচি হয়ে যাবে। কোন এক দেশের এক শেখ বেটার সাথে ইচ্ছামত চলে গেছে। আবার তাকে তুমি নিয়ে এসেছ। যদি তাকে বাড়ি নিয়ে আস তবে এখনই আমরা চলে যাব। সে জাতি চ্যূত হয়েছে তাকে কি করে গ্রহণ করব।

হীরাধর হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কিভাবে মাকে ছাড়ে আর কি-ভাবেই বা একটি পরীক্ষিত সতীসাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। এই মহা সমস্যা পরে নিশুতি রাতে ভেলুয়াকে নিয়ে এগারসিন্দুরের সন্নিকটে জামালপুর সাধু-বাবাজির আখড়ায় উপস্থিত হয় এবং পদধুলি নিয়ে যাবতীয় বলার চেষ্টা করে। তৎক্ষণাৎ বাবাজি হীরাধরকে থামিয়ে বলতে লাগল্ তোমার কিছুই বলতে হবে না। আমার সকল কিছু জানা আছে। আমার কথা শুন, তোমার স্ত্রী সতী স্বামী ভক্ত, প্রেম, ভালবাসা দিয়ে জীবন বাজী রেখে অটল থেকে সে একজন স্বর্গ তুল্য দেবী হয়ে গেছে। অদ্য রাতে সকলের অদৃশ্যে গয়া-কাশি, বৃন্দাবন চলে যাও। তৎক্ষণাত বাবাজির উপদেশে প্রস্তুতি নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে গেল তারা। স্থানীয় কেউ খবর জানল না, সকলেই হায় হায় করতে লাগল্ সেই হতে হীরাধর বংশ নিপাত হলো।

এখনও ভেলুয়ার পুকুর ঘাটের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। পাকুন্দিয়া উপজেলার ইতিহাস খ্যাত এগারসিন্দুর এলাকায় যেখানে বঙ্গবীর ঈশা খার দুর্গ নির্মিত হয়েছিল তার সন্নিকটে। ভেলুয়া সুন্দরীর গল্প কাহিনি কিচ্ছা কিশোরগঞ্জের নিজস্ব কাহিনি। তাই এ অঞ্চলে এ গল্প-কথা-কাহিনি বা কিচ্ছার খুবই জনপ্রিয়তা রয়েছে। মানুষের মুখে মুখে এ কাহিনি আজও প্রচলিত আছে।

চম্পা ও তার সাত ভাই

এক ছিল রাজা। তার ছিল সাত রানি। অহংকার বড় ছয় রানিদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরানি খুব শান্ত। এজন্য রাজা ছোটরানিকে সকলের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।

কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত রাজার ছেলেমেয়ে হয় না। এত বড় রাজ্য, কে ভোগ করবে? রাজার মনে দুঃখ অনেক।

এভাবে দিন যায়। অনেকদিন পর ছোটরানির সন্তান হবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না; পাইক পিয়াদা ডেকে রাজা রাজ্যে ঘোষণা করে দিলেন- 'রাজা রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, মিঠাই-মণ্ডা, মনি-মানিক যে যত পারো, এসে নিয়ে যাও।

বড় ছয় রানিরা হিংসায় জ্বলে মরতে লাগল।

রাজা নিজের কোমরের সাথে ছোটরানির কোমরে এক সোনার শিকল বেঁধে দিয়ে বললেন, 'যখন ছেলে হবে, একটি শিকলে নাড়া দিও, আমি এসে ছেলে দেখব।' বলে, রাজা রাজ-দরবারে গেলেন।

www.pathagar.com

ছোটরানির ছেলে হবে, আঁতুড়ঘরে কে যাবে? বড়রানি বললেন 'আহা, ছোটরানির ছেলে হবে, তা অন্য লোক দিব কেন? আমরাই যাব।'

বড়রানিরা আতুড়ঘরে গিয়ে শিকলে নাড়া দিলেন। অমনি রাজসভা ভেঙে ঢাক-ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে মণি-মানিক সাথে করে রাজা এসে দেখেন কিছুই না।

রাজা ফিরে গেলেন।

রাজা সভায় বসতে না বসতেই আবার শিকলে নাড়া পড়ল। রাজা আবার ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, এবারও কিছুই না। মনের কষ্টে রাজা রাগ করে বললেন- 'ছেলে না হতে আবার শিকল নাড়া দিলে, আমি সব রানিকে কেটে ফেলব।' বলে রাজা চলে গেলেন।

একে একে ছোটরানির সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হলো। আহা, ছেলেমেয়েগুলো যেন, চাঁদের পুতুল, ফুলের কলি। আঁকুপাঁকু করে হাত নাড়ে, পা নাড়ে আঁতুড়ঘর আলো হয়ে গেল।

ছোটরানি আস্তে আস্তে বললে, বুবু কী ছেলে হলো একবার দেখালে না।

বড়রানিরা ছোটরানির মুখের কাছে অঙ্গভঙ্গি করে হাত নড়ে, নথ নেড়ে বলে উঠল 'ছেলে না, হাতি হয়েছে, ওর আবার ছেলে হবে'- কটা ইঁদুর আর কটা কাঁকড়া হয়েছে'।

শুনে ছোটরানি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

নিষ্ঠুর বড়রানিরা আর শিকল নাড়া দিল না। চুপিচুপি হাঁড়ি-সরা এনে ছেলেমেয়েগুলোকে তাতে পুরে পাশের গাঁদায় পুতে রাখলেন। তারপর শিকল ধরে টান দিল।

রাজা আবার ঢাক-ঢোলের বাদ্য বাজিয়ে, মণি-মানিক সাথে নিয়ে এলেন। বড়রানিরা হাত মুছে, মুখ মুছে, তাড়াতাড়ি করে কতগুলো ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা এনে দেখাল দেখে রাজা রাগ হয়ে ছোটরানিকে রাজপুরী থেকে বের করে দিলেন। বড়রানিদের মুখে আর হাসি ধরে না, পায়ের মলের বাজনা থামে না। সুখের কাঁটা দুর হলো, রানিরা মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন।

ছোটরানি ঘুটে-কুড়ানি দাসী হয়ে, পথে পথে ঘুরতে লাগলেন।

এমন করে দিন যায়। রাজার মনে সুখ নেই, রাজার রাজ্যে সুখ নেই, রাজপুরী খাঁ খাঁ করে, রাজার বাগানে ফুল ফোটে না।

একদিন মালি এসে বলল- 'মহারাজ, ঘর সাজানোর জন্য ফুল পাই না, আজ যে পাশগাদার উপরে সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুল ফুটে আছে'।

রাজা বললেন- 'তবে সেই ফুল আন, ঘর সাজাব'।

মালি ফুল আনতে গেল।

মালিকে দেখে পারুল গাছের পারুলফুল চাঁপাফুলকে ডেকে বলল- 'সাত ভাই চম্পা জাগরে!'

অমনি সাত চাঁপা নড়ে উঠে সাড়া দিল 'কেন বোন পারুল ডাকোরে।'

পারুল বলল, 'রাজার মালি এসেছে, ফুল দিবে কি না দিবে?'

সাত চাঁপা তুরতুর করে উপরে উঠে গিয়ে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল-

'না দিব, না দিব ফুল ছুটব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল!'

www.pathagar.com

দেখে শুনে মালি অবাক হয়ে গেল। ফুলের সাজি ফেলে দৌড়ে গিয়ে রাজার কাছে খবর দিল। আশ্চর্য হয়ে রাজা এবং রাজসভার সকলে সেখানে আসলেন।

রাজা এসে ফুল তুলতে গেলেন, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদের ডেকে বলল-

'সাত ভাই চম্পা জাগরে!'

চাঁপারা উত্তর দিল, 'কেন বোন পারুল ডাকোরে?'

পারুল বলল, 'রাজা এসেছেন,

ফুল দেবে কি না দেবে?

চাঁপারা বলল-

'না দিব না দিব ফুল, ছুটব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজার বড় ছয় রানি,

তবে দিব ফুল।'

বলে চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠল।

রাজা বড়রানিদের ডাকলে। বড়রানি মল বাজাতে বাজাতে এসে ফুল তুলতে গেল। চাঁপাফুলেরা বলল-

'না দিব, না দিব ফুল, ছুটব শতেক দূর,

আগে আসুক রাজার মেজরানি, তবে দিব ফুল।'

তারপর মেজরানি আসলেন, সেজরানি আসলেন, ন'রানি আসলেন, কনেরানি আসলেন, কেউই ফুল পেলেন না। ফুলেরা গিয়ে আকাশে তারার মতো ফুটে রইল।

রাজা গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

শেষে দুয়োরানি আসলেন; তখন ফুলেরা বলল-

'না দিব, না দিব ফুল, ছুটব শতেক দূর,

যদি আসে রাজার ঘুঁটে কুড়ানি দাসী,

তবে দিব ফুল।'

তখন খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল্ রাজা চৌদোলা পাঠিয়ে দিলেন, পাইক পেয়াদা চৌদালা নিয়ে মাঠে গিয়ে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটারানিকে নিয়ে আসল।

ছোটরানির হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেড়া কাপড়, তাই নিয়ে তিনি ফুল তুলতে গেলেন। অমনি সুড়ুসুড় করে চাঁপারা আকাশ থেকে নেমে এল, পারুল ফুলটি গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলো; ফুলের মধ্য হতে সুন্দর সুন্দর চাঁদের মতো সাত রাজপুত্র, এক রাজকন্যা 'মা মা' বলে ডেকে, ঝুপঝুপ করে ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী ছোটরানির কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সকলে অবাক! রাজার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল। বড়রানিরা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

রাজা তখন বড়রানিদেরকে কেটে পুঁতে রাখার নির্দেশ দিলেন। সাত রাজপুত্র, পারুল মেয়ে আর ছোটরানিকে নিয়ে রাজা রাজপুরীতে গেলেন। রাজপুরীতে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। মহাসুখে দিন কাটাল।

www.pathagar.com

উতলা সুন্দরী ও কাকাধরের খেলার কিস্‌সা

আসরের শুরুতে বাদ্যকর ও দোহারগণ সারিবদ্ধভাবে বসে প্রথমে যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে নেন। তারপর শুরু হয় কনসার্ট। সম্মিলিত বাদ্যবাদনে কনসার্টে বেজে ওঠে একটি জনপ্রিয় ভাটিয়ালি গানের সুর 'বাও কুইড়া বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে'। অত্যন্ত দ্রুত তালের এই কনসার্টের মধ্যে সুসজ্জিত বেশে পালাকার ইসলাম উদ্দিন পর্দার আড়াল থেকে আসরে একে একে সবগুলো বাদ্যযন্ত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে, প্রণাম করে নিয়ে হাতের ইশারায় কনসার্ট থামিয়ে বন্দনায় টান দেন : পাষাণ মনও রে আমার/ওরে হরদমে লইও আল্লার নাম/দমে দমে লইও নামটি আল্লাজী নবীরও॥

তার বন্দনায় আরও বেশি আবেগ সঞ্চার করে দোহারদের উচ্চকিত দোহারকি। বন্দনার আকুতি মেশানো সুরে-কথায় যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিমের পর পির পয়গম্বর বন্দনা করা হয়। ওস্তাদ গুরুর সঙ্গে পিতা-মাতার চরণ বন্দনা করে পালাকার তার বন্দনায় ইতি টেনে মূল পালায় প্রবেশ করেন। বন্দনাগীত শেষে ধরেন পালার বর্ণনাগীত :

সুনাপুরে বাড়ি তার গো/ও গুণের বাবা, সুনাপুরে ঘর/ওরে বান্ধে বাড়ি কাহারও আশায়/বান্ধে সারে সারে গো/ এই যে, বাড়িরও ভিতরে বাবা সুনারও পুরী/আবার ভিতরে বানাইল বাদশা সভা করবার বাড়ি/সভা কইরা আছেন যত ভদ্র শ্রোতাগণ/কাকাধরের খেলা এখন করিব বর্ণন ॥

আল্লা পাক দিছে তারে বুড়া। আল্লা পাকের ইচ্ছায় পুরী বান্ধছে, বাড়ি বান্ধছে, বাদশার জন্ম নিয়েছে–এ কোন শহর?

: আই?

: সুনাপুর শহর।

: ওই

বাদশা ইব্রাহিম নাম ডাকিয়া জানাই খবর। ওই যে ডাকিয়া কথা বলে উজিরের দরবারে :

: উজির?

: মুনিব।

: তুমার কাছে আমি মনস্তাব রাখি।

: কীরম মনস্তাব?

: আল্লা পাকের দুয়াতে আমি বারো মুল্লুকের বাদশা হয়েছি সুনাপুর শহরে। আল্লা পাকে আমার কাঞ্চনলীলা, সুনামানিক কুনু দিক দিয়ে রাখছেনি বাকি। আমি শোনো ইব্রাহিম বাদশা যদি ইচ্ছা করি সুনা দিয়া বান্ধতাম পারি রাজ্যের চারকুনা...

ওই বলিয়া প্রভুজী, 'উজির?'

: হুঁ

: মাছে চিনে গহিন গাঙের পানি। পাখি চিনে ডাল। মায়ে জানে পুতের বেদন। যার তিনডা ছাল। আমি আল্লার দরবারে পাঁচ ওকতো নামাজ পড়ি, সকাল বিকাল কুরান পড়ি। আল্লা পাকে আমাকে বারো মুল্লুকের বাদশাহী দান করেছে সুনাপুর শহরে। কুনু দিক আল্লা আমারে রাখছে না কুম করে...কিন্তু আমি এক দুঃখের দুঃখী...।

www.pathagar.com

: কীরম দুঃখ?

উজীরের ভূমিকায় ডাইনা আব্দুল আলীমের সঙ্গে কথোপকথনে এ পর্যায়ে বাদশার ভূমিকায় পালাকার ইসলাম উদ্দিন গানে বাদশার বেদনা প্রকাশ করেন :

আল্লা আমার ছেড়াক না দেন সুনাপুর শহরে। /ওরে মানসেরেও দেখিবে আল্লা সন্তান আছে ঘরে।/আমারে দেখিবে কে গো বলি যে তুমারে।/ওরে সন্তানেরও পাগল আমি আমার সন্তান নাই।/কী অপরাধ করছি আমি দুনিয়ার মাঝারে।

এ পর্যায়ে বাদশা সন্তান প্রত্যাশায় দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। রানীকে বলেন, 'এই তোর সন্তান হয় নাই।'

'স্বামী?'

'এই শোন আমি কী কই। আগামী বছর যদি আমার সন্তান দান নাই কর...নতুন দামান হয়ে যাবো বিবাহে।'

'স্বামী, তুমি বিয়া করতা চায়ছো?'

'হয় হয় করাম।'

'তার কারণ?'

'সন্তানের অভাবে।'

'স্বামী, স্বামী গো, আমি তুমার পায়ে ধরি স্বামী।'

'কুনু কথা নয়।'

বাদশার মুখে দ্বিতীয় বিবাহের কথা শুনে বেগমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। বেগম-রানীর সে অনুভূতি পালাকার গানে প্রকাশ করেন।

বেগম তার কান্নার মধ্যে বাদশাকে পুনরায় আল্লার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, 'স্বামী গো, আল্লায় যদি সন্তান না দেয় তাইলে আমাগো ক্ষমতা নাই সন্তান নিবার...স্বামী আমি আশা নিয়েছি মনে, স্বামী তুমাকে নিয়ে চলে যাব আমি নাটক মন্দির ঘরে।'

'তার কারণ?'

'স্বামী গো, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়াম আল্লার দরবারে...আমাদের পর যদি আল্লার দয়া হয়...সন্তান দিয়ে আমাদের তিনি খুশি করবেন।'

বেগমের কথামতো বাদশা কাজ করেন। আল্লার আরশ তাদের কান্নায় কেঁপে ওঠে। প্রসন্ন হয়ে তাদের সন্তান জন্মের ব্যবস্থা হয়। পৃথিবীতে বাদশার ছেলে জন্ম নেয়। তার নাম রাখা হয় সুনাহর। সুনাপুর শহরের বাদশার পুত্র সে। তার সাথে দোস্তী করে দেওয়া হয় উজিরপুত্র মুনীবের। দুই দোস্ত একসাথে বেড়ে ওঠে। একসাথে স্কুলে যায়। প্রাইমারি স্কুল অতিক্রম করে তথা হাইস্কুল থেকে পাস করে।

পালাকার বর্ণনা করতে থাকেন : "লাউয়ের পুত বাওয়ে বাড়ে। কিচ্চার পুত বড়বড়াইয়া বাড়ে। একে দুয়ে করিয়া মন সুনাহর সেয়ান-সাবদ হয়ছে সুনাপুর শহরে। সুনাহরের মা একদিন আসিয়া কয়, 'বাবারে আমি হইছি বুড়া, কবে যে মারি মুড়া। তার নাই ঠিক। জীবন থাকতে তোরে যদি সুন্দর একটা বিয়া দিয়া সুখী করাইতে পারতাম...।' সুনাহর

www.pathagar.com

তার দোস্ত মুনীবকে সব ঘটনা খুলে বলে। মুনীর বলে, 'আপনার মায়ে বলেছে আপনাকে বিয়ে করাইবার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের মতো সুন্দর কন্যা চোখে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুনীর আসবে না আপনার দরবারে। আমি আজকেই রউনা করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।' সুনাহরের অনুমতি নিয়ে মুনীরে একে দুয়ে করিয়া মন চাবুক নিছে হাতে। তার মনমতো একটা ঘুড়া সাথে নিয়া সে রউনা করে সুনাহরের জন্য— "আমার পাগলা ঘুড়ারে/তুমি কইর মানুষ কই লইয়া যাও? / ওরে আছিলো না মুনীর বেটা শোনো কীবা করে / চাবুক নিছে হাতে তুলে গেল ঘুড়াশালা ঘরে / সাড়ে নয় হাজার ঘুড়া থেইকা ঘুড়া বেছে লয়ে/ রউনা দিল ঘুড়ায় চইড়া সুনাহরেরও তরে.../আমার পাগলা ঘুড়ারে.../উলু ঝুলু নদীনালা খালবিল ডোবা ঝোলা/পাহাড় পর্বত সুন্দর ঘুড়া যায়ও পার হয়ে/চৈত্র মাসের ধুলা বালি হাওয়ায় দেয় উড়ায়ে/আমার পাগলা ঘুড়ারে/তুমি কইর মানুষ কই লইয়া যাও।"

পাগলা ঘোড়ার এই গানটিই যেন ইঙ্গিতে পুরো আখ্যানে এনে দিল নতুন বাঁক। যে বাঁকে বন্ধুর জন্য পাত্রী দেখাতে এসে পাত্রী উতলার রূপে বন্ধু মুনীর নিজেই দেওয়ানা হয়ে গেল এবং বন্ধু হয়ে উঠল বন্ধুর শত্রু। ফুলের বনে অপরূপ কন্যা উতলা সুন্দরীকে দেখে মুনীর মুগ্ধতায় হঠাৎ করেই দুষ্ট হয়ে ওঠে। মুনীর ভাবে, "আমি দোস্তের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি বিদেশ নগরে, কিন্তু এমুন সুন্দর নারী আমি দেখিয়া পাগল হয়েছি। আমি সুনাপুর শহরের উজিরের ছেলে। উজিরের ছেলের সাথে সূর্যরাজ বাদশা তার মেয়ের বিয়ে দেবে না। কিন্তু যেভাবেই হোক আমার পাইতে হবে। দোস্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েটারে সুনাপুরে যদি নিতাম পারি তাইলে : দুস্তেরেও যে মারিয়া ফেলবাম বাসরও রাইতে/যারে দেইখে হইছি পাগলা আমি তারে পাইতে হবে/ এত সুন্দর মেয়ে আমি দেখি নাই কুনুখানে/ কী করে যে বানাইল বিধি এমুন সুন্দর করে/নিমক হারাম হইয়া গো গেছি ওই না রূপ দেখে/মেয়েটা যে পাগল করলো আমার প্রাণপাখি যায়রে।"

বাসর রাতে বন্ধুকে মেরে উতলাকে ভোগের স্বপ্ন মুনীরের বিফল হয়। কারণ বাসর রাতটা সূর্যরাজ শহরে ঘটে উতলার ইচ্ছায়। মুনীর মনের কষ্টে সারারাত বাসর ঘরের পেছনে বসে কাটায়। শেষ রাতে বেড়ার আড়াল থেকে মুনীর শুনতে পায় সূর্যরাজ বাদশা কাকাধরের খেলা জানেন। সে এক অদ্ভুত খেলা। মানুষের দেহ ফেলে রেখে আত্মা নিয়ে পাখি ও অন্যান্য জীবদেহের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়।

ইসলামউদ্দিন পালাকারের ভাষায় : রাত্রের যে সময়ে প্রভাত হইয়া যাইবো তখন উতলা কইতাছে তার স্বামীর কাছে যে, 'স্বামী আগামীকাল্য আমার বাবা আপনাকে ডেকে নিয়ে বলবে যে, যেকোনো একটা জিনিস চাওয়ার জন্য, আপনে সেই মুহূর্তে যদি আমার বাবার রাজ্যটা চান তো তবে রাজ্যটা আপনার নামে লিখে দিবে। কিন্তু আপনে কোনো কিছু জিনিস চায়বেন না।'

'তো কী চাবো'?

'আমার বাবার কাছে একটি কাকাধরের আছে... সেই খেলাটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়।'

এই কথাটা মুনীরে শুনলো, মুনীর ভাবলো যদি খেলাডা আমিও শিখতে পারি, প্রয়োজনবোধ আমি দোস্তেরে না মাইরে দোস্তেরে ভরতাম আমি কাকের ভিতরে...আর

www.pathagar.com

দোস্তের ভিতর আমি যাব। তখন দোস্তেরে নিয়া আসে শিকারে। শিকারে গিয়া তার দোস্তেরে ঘুমের মধ্যে রাইখা একটা কাকপাখি মারে...মাইরে কাকপক্ষীকে তার দোস্তের কাছে আনে। বলল যে, দোস্ত এই দেখ আমি একটা কাকপক্ষী আনছি, একটা মরা কাকপক্ষী...দোস্ত আপনি গুপ্তভাবে আপনার শ্বশুরের কাছ থেকে কাকাধরের খেলা শিখছেন। কিন্তু আমাকে আপনি এহনও জানাননি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমারে আপনি কাকাধরের খেলা না দেহাইছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শিকার করতে যাবো না। তখন তো সুনাহর বিপদে পইড়া গেছে। বলে যে, দোস্ত কাকাধরের খেলা আমার কাছে আছে, আমি শিখে আইছি। কাকাধরের খেলা আমি আপনারে দেহাইবো দেশের বাড়িতে গিয়া। মুনীর তো জোর কইরে ধরছে। ধরার পরে সে কাকাধরের খেলা দেখাইতে বাধ্য হইল। বলল যে, একটু পানি নিয়া আসো। মুনীরে কিছুটা পানি আনল। মন্ত্র পইড়া সুনাহর একটা উতার পানি তৈইর করছে। কইরা তার দোস্তের হাতে দিছে যে, আমি যে সময় কাকের ভেতরে যাব কাকের ভেতরে যাওয়ার পরে যে সময় আপনার খেলাধুলার তৃপ্তি আসে সে সময় আবার পানিটা আমার গায়ে ছিটাইয়া দেবেন, দেওয়ার পরে পাখি পইড়া থাকবো কিন্তু আমি আবার মানুষ হইয়া যাইবো। উতার পানিডা দিয়া মন্ত্র পাট কইরা নিজের দেহের মধ্যে যহন ফু দিল তহন সাথে সাথে নিজের দেহডা পইড়ে গেল, রুহুটা বের হয়ে পাখির ভিতর গেল। তখন মরা পাখিডা জীবন পাইল। তহন মুনীরে চিন্তা করতাছে যে, দোস্তেরে এহানে রাইখা আমি দোস্তের ভেতর যাইতাম পারি। তখন ওই কয়তাছে যে, 'দোস্ত, ওই চেয়ে দেখেন সামনে একটা বৃক্ষ দেখা যায়। আপনে এহান থেইকা ওহানে এক থেকে তিনবার পর্যন্ত যাইবেন আর আসবেন। তারপরে আমি উতার পানি ছিটাইয়া দিবো।' তখন পাখিটা একবার গেল দুইবার গেল। যে সময় তিনবার যাইয়া রিটান দিবো ওই সময় সে উতারটা গাঙের মধ্যে ফেলে দিলো। ফেলে দিয়া, যেহেতু কাকাধরের খেলা মুনীরেও জানে, মুনীর মন্ত্র পাট কইরা নিজের দেহের মধ্যে ফু দিছে। মুনীরের বডি পইড়ে রইছে, তার রুহু বাইর হইয়া গেছে গা সুনাহরের দেহের ভেতরে। হইয়া গেছে গা সুনাহর রূপে মুনীর। সুনাহর মুনীর হওয়ার পরে তার যে বডিডা আছে সেই বডিডারে কাইটা সাগরে ভাসাইয়া দিছে। নিজের বডিডা ভাসাইয়া দিছে। সে অর্জিনাল সুনাহর হইয়া গেছে। তহন ওই পাখিডা কী করছে? চিন্তা করতাছে পাখিডা যে, আমার দোস্তে চক্রান্ত কইরা সে আমার ভিতরে গেছে...এহন তো উতলার সতীত্ব নষ্ট করবে। যাক, আমি তার কাছে না গিয়া উতলারে আগে সচেতন করি। তহন পাখিডা মুনীরের আগে যায়গা উতলার কাছে। গিয়া দেখে যে উতলা পাকঘরে। তহন উতলার কাঁধে বসে। উতলা দেখে যে, এটা কাকপক্ষী বয়ছে। তহন উতলা চিন্তা করে, ব্যাপারটি কী! কাকপাখি ত আমার গায়ে বসতে পারে না। আমার স্বামী গেছে হরিণ শিকারে, আমি স্বামী কাকাধরের খেলা জানে। আমার মনে হয় যে, কোনো ভেজাল লাইগা গেছে। তহন পাখিডারে এহান থেকে আনে সামনে রাখছে। সামনে রাইখা উতলা চিন্তা করতাছে, এহন আমি পাখিডারে যাচাই করি কীভাবে। তহন পাখিডারে সামনে রাইখা কয়তাছে, 'পাখি, আমার স্বামী কাকাধরের খেলা জানে, সে গেছে তার দোস্তর নিয়া হরিণ শিকারে...যদি কোনো চক্রান্তের বিনিময়ে আমার স্বামী পাখির ভিতর গিয়া থাকে আর তুমি যদি

www.pathagar.com

সত্যিকার আমার স্বামী হয়ে থাকো...তাইলে আমার হাতে আস।' তহন পাখিডা তার হাতে উওড়ে বসে। তহন তো সেই উতলা জানতে পারলো যে, এটি সত্যিকার অর্থে আমার স্বামী। তহন পাখিডারে পিঞ্জিরার ভেতরে বন্দি কইরা উতলা চিন্তা করতাছে যে, এহন তো মুনীর আয়বো আমারে নষ্ট করার জন্য...গ্রাস করার জন্য আইতাছে। তে আমি তার সঙ্গে একটু অভিনয় করত হইবো। আর অভিনয় না করি তাইলে আমার বিপদ হইতে পারে। সে তো জানতাছে যে, সে মুনীর। কিন্তু অন্য কোনো লুকে তো জানতাছে না যে, সে মুনীর। সবাই তো জানতাছে সে সুনাহরই আসতাছে। শিকার থেকে বাড়িতে আয়ছে। আওয়ার পরে উতলার কাছে গেছে। উতলা কয়তাছে, 'স্বামী, তুমার দোস্ত?'

'দোস্তেরে তো আমি হারাই ফেলাইছি।'

'তুমার কথা তো আমি কিচু বুঝি না। তা বেশ, আরাম করো, আমি পাকঘরে পাক করতাছি।' তহন ওই বেটা তো হইল তার পাগল। সে কয়তাছে, 'পাকশাক তুমারে কিছু করতে হইবো না তাড়াতাড়ি আস। আমি তুমারে নিয়া একটু আরাম করাম।' তহন উতলা কইতাছে, 'না, এই মুহূর্তে আমি তুমার কাছে আইতাম পারি না। আমার কাপুড়চুপুড় নষ্ট হইছে। তুমি সাত দিন পরে আমার কাছে আইবা।' এহন সে তো মানতাছে না। সে কয়তাছে, 'আমি এক দিনের সময় দিতে রাজি না। তুমি এহন আমার কাছে আইও।' তর্ক করতে করতে উতলা কয়লো যে, 'তুমি সাত বছর পরে আইবা।' সে বাড়ে উতলাও বাড়ে। উতলা আসার পরে উতলা পাখিডারে আবার বন্দি করে রাখে। সে উতলা আবার গেছে মুনীরের কাছে। গিয়া কইতাছে, 'স্বমী, তুমারে তো বারো বছরের লাইগা ধর্মের বাপ ডাকছি। ছয় বৎসর তোমারে আমি মাপ দিয়া একটা শর্তে যাইতেছি। আমি তুমারে একটা পরীক্ষা দিয়াম, যদি পরীক্ষায় পাস করতে পারো তাইলে ছয় বৎসর মাপ, আর যদি পরীক্ষা ফেল করে ফেলাও তাইলে আরও ছয় বছরের জন্য বাপ হইবা। আরও বারো বৎসর থাকতে হইবো।'

'তে কী পরীক্ষা?'

পরীক্ষা হইলো এইটুকু– তুমি একশ একটা পাঁঠা কিনে আনবা। তোলোয়ার লয়ে খিলখানার মাঠে থাকবা। আমি একটা একটা পাঁঠা ছাড়বো, তুমি একটা একটা কোপ দিয়া বলি দিবা। যদি একশ একটা পাঁঠা বলি দিতে পারো তাইলে তুমি আমার। আর যদি এর মধ্যে একটা পাঁঠা মরে যাই গা, তাইলে কিন্তু তুমি আবার পরীক্ষায় ফেল করছো।'

মুনীর তহন একশ একটা পাঁঠা কিনে আনল। আর এদিক দিয়া উতলা সুন্দরী কী করছে? এক পাঁঠারে তার দাসীরে নিয়াবাধ্য করে একটা পাঁঠারে গলা টিপা মাইরে ফেলছে। মুনীর আয়া দেহে একটা পাঁঠা মরা পড়ে রয়ছে। তহন উজিরে কয় মুনীরের কাছে, 'হুজুর পাঁঠা তো একটা মারা গেছে।'

'কীভাবে?'

'বলতে পারতেছি না।'

উতলা বলছে যে, 'তুমার পাঁঠা মারা গেছে। তুমি তো পরীক্ষা ফেল করেছ। তুমি

www.pathagar.com

পরীক্ষায় ফেল। তুমি আরও ছয় বৎসরে বাপ। তবে মুক্তি দিতে পারি একটা শর্তে।'

'কী শর্তে?'

'তুমি মন্ত্র কইয়া যাওগা পাঁঠার ভিতরে। তহন পাঁঠার ভেতরে গেলে তো পাঁঠা ভালো হয়ে যাইবো গা। পাঁঠা ভালো হয়ে গেলে আমি পাঁঠাডারে বলি দিয়াম। পাঁঠা বলিও ঠিক হয়ে গেল গা। পাঁঠা বলি দিওয়ার পরে তুমি আবার আয়া পড়বা তুমার ভিতরে।'

আর এদিক দিয়া তার পাখি স্বামীরে কয়ছে যে, 'স্বামী যে সময় আমি মুনীররে পাঁঠার ভেতরে ঢুকায় ফেলবাম এ সময় দাসী তুমারে পাখিডারে মাইরে ফেলবো। পাখিডা মাইরে ফেললি রুহু বাইর হইয়া আইবো। রুহুটা বাইর হইলে সে আমার স্বামীর ভেতরে ঢুইকা পড়বো।'

উতলা পাখিডার কাছে একটা দাসীরে ফিট করছে। আর এদিক দিয়ে সে নিজে উতলা সুন্দরী তোলোয়ার নিছে হাতে। মুনীররে হুকুম দিছে, তুমি মন্ত্র কইয়ে পাঁঠার ভেতরে যাও। পাঁঠাটা আমি নিজ হাতে বলি দিলেই পাঁঠা বলিও ঠিক হয়ে যাওক। পাঁঠা বলি দিওয়ার পরে তুমি আবার তুমার ভেতর আসে পড়তি পারো। তহন মুনীরে তো চিন্তা করে, কাকাধরের খেলা তো আমার কাছে আছে।

সে কী করে উতলার যুক্তি নিয়া সে মন্ত্র পাট কইরা সে নিজের দেহে ফু দেওয়ার পরে সুনাহরের বডি পইড়ে থাকে। তার রুহু বাইর হয়ে যায় গা পাঁঠার ভেতরে। যাওয়ার পরে এইদিক দিয়া পাখিডারে দাসী মাইরে ফেলায় গলা টিপা...এই যে পাখিডা মারা যায় সুনাহরের রুহুডা বাইর হয়ে যায় গা–এই রুহুডা আইয়া আবার সুনাহরের ভেতরে চলে যায়।"

এইভাবে উতলা সুন্দরী নিজের স্বামীকে ফিরে পায়। সমগ্র পালা পরিবেশনায় এক ইসলাম উদ্দিন হয়ে উঠেছিলেন অনেকজন। কখনো তিনি পালাকার, কখনো তিনি বাদশা, বেগম, সুনাহর, মুনীর, উতলা সুন্দরী, উজির, কাক ইত্যাদি। আর অভিনয় উপকরণ হিসেবে বালিশের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করার মতো। একই বালিশ কখনো হয়েছে ঘোড়া, কখনো চিঠি লেখার কাগজ, প্রসব বেদনায় বেগমের শোবার বালিশ ইত্যাদি। এ ছাড়া অভিনয় উপকরণের মধ্যে ছিল একটা পাটের দড়ি, একটি লাঠি, প্লাস্টিকের পুতুল, গামছা ইত্যাদি। ইসলাম উদ্দিনের অভিনয়ের চরিত্র পরিবর্তনে বেশ সচেতনার ছাপ আছে, নাচ ও আবেগের অভিব্যক্তিগুলোর ভেতর তিনি সবসময় একটা সুনির্দিষ্ট মাপ রেখে যান, তাতে কোনো বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে না। তার অভিনয়ক্রিয়া সহযোগীর ভূমিকায় দোহারদের দলে বসে ডাইনা আবদুল আলীমও ছিলেন প্রাণবন্ত এবং পরিমিতি বোধসম্পন্ন। পালা শেষে ইসলাম উদ্দিনের সঙ্গে কথা হয় আমার। লন্ডনে ও ঢাকায় পালাভিনয় করেছেন তিনি। তিনি জানান, 'এইসব করতে তো একটা ভাব লাগে। গ্রামে সেই ভাবটা পাওয়া যায়। গ্রামের জনগণ সবকিছু ভাষা বুঝতে পারে। আবার শহরে গেলে, শহরে ভাষা বলতে আমাদের খুব ভেজাল হয়। ঢাকা গেলে একটা সমস্যা লাগে আমার বুঝাইতে গিয়ে। বোঝে, তবে একটা পরিশ্রম নিয়ে করতে হয়। যেমন গ্রামের অনুষ্ঠান আমি ছয় ঘণ্টা করলেও এতটুকু পরিশ্রম হয় না। কিন্তু শহরে দুই ঘণ্টা করলেই পরিশ্রম হয়। একটা হিসাবের ভিতরে কথা বলতে হয়।'

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

আবহমান-কাল ধরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নানা কাহিনি বা জনশ্রুতি বর্ণিত হয়ে আসছে – এসব জনশ্রুতিই কিংবদন্তি। কিংবদন্তি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা।

রাজা নবরঙ্গ রায়ের কিংবদন্তি

ঈসা খান ১৬০৪ সনে এগারসিন্দুর হতে জঙ্গলবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে, রাজা নবরঙ্গ রায়ের বাড়ির অতিক্রম কালে অত্যন্ত মুগ্ধকর সুগন্ধ পেয়ে অশ্ব থামালেন। জনৈক ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, উক্ত ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে? তখন ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল এই সুগন্ধ আসছে রাজা নবরঙ্গ রায়ের বাড়ি হতে। তাৎক্ষণিক একজন সিপাহী পাঠালেন রাজা নবরঙ্গ রায়কে ডেকে আনার জন্য। বীর ঈসা খানের খবর পেয়ে নবরঙ্গ রায় তাড়া হুরা করে গেরুয়া রঙ্গের চাঁদর গলায় মুড়িয়ে এসে শ্রদ্ধানিবেদিত প্রাণে ঈসা খানকে অভিবাদন জানালেন।

খান জিজ্ঞাসা করলেন উক্ত ঘ্রাণ কিসের? রায় বললেন দেবতার ভোগের ঘ্রাণ মসনদে আলা বঙ্গবীর আজ যদি আপনি দেবভোগের শরিক হতেন, তবে আমি চিরসুখী হতাম এবং রাজ্য হারার গ্লানি, দুঃখ কষ্ট অনুতাপ সকলই ভুলে যেতাম।

খান রায়ের বাণী ও শ্রীদর্শনে অত্যান্ত বিগলিত হয়ে পরলেন। তখনই অশ্ব নবরঙ্গ রায়ের বাড়ি অভিমুখে ফিরালেন, অশ্ব ছুটে চলল। রায়ের বাড়ি পৌঁছলে আতিথেয়তা সম্পন্ন করে, একটি স্বর্ণের পাত্রে দেব ভোগ এনে ভক্ষণের আবেদন করলেন।

ঈসা খান অত্যন্ত আনন্দ মনে দেবভোগ ভক্ষণ করলেন। তিনি রায়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে দিনপাত করছেন?

রায় বলতে লাগলেন উদার মনা, বঙ্গবীর মসনদে আলা, আমি রাজ্য হারা হয়ে সাগর পাড়ে এক সাধুর আস্থানায় বসে থাকতাম। একদিন স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে সাধুর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলে সাধু বললেন একটি বিগ্রহ মূর্তি এনে এখানে স্থাপন করার জন্য স্বপ্নে নির্দেশ রয়েছে। তখন আমি একটি মূর্তি এনে যথাস্থানে স্থাপন করত; প্রতিদিন নিয়মিত ভোগ নিবেদন করে থাকি। এমনি ভাবধারায় আমি জীবনযাপন করছি। মসনদ আলা বঙ্গবীর আপনি আমাকে রাজ্য হারা করে আর এক নতুন রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি আর্শীবাদ করুন, এমনি ভাবধারায় যেন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।

ঈসা খান রায়ের অতি নম্র ব্যবহার এবং তার উক্ত বাণী শ্রবণে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে বিগলিত প্রাণে, ক্রন্দন প্রায় গদ গদ স্বরে বললেন, আপনার রাজ্য আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। অমনি নবরঙ্গ রায় নত শিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন মসনদে আলা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আর রাজত্ব করব না, আমি আজীবন দেবপুজারই ব্রত থাকব।

ঈসা খান রায়ের মনোবৃত্তি বুঝতে পারলেন, খান অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পরলেন। তিনি কী করবেন? কিছুক্ষণ রায়ের মুখপানে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থেকে বললেন চলুন আপনার দেবমূর্তি আমি পরিদর্শন করব। সৈনিকদের একটি অশ্ব রায়কে দিয়ে একসাথে দুই অশ্বারোহনে যথাস্থানে যাত্রা করলেন। তথায় পৌছে অশ্বপৃষ্ঠে থেকেই যথাস্থানে সর্বত্র ঘুরে দেখেন এবং দেবঘরের নিকটতর হয়ে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে অশ্ব ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

খান রায়কে জিজ্ঞাস করলেন দেবোত্তর জরুরি আবশ্যকীয়তার কী করবার আছে। রায় বললেন একটি দিঘি, দেবমন্দির এবং রথযাত্রার জন্য ভূমির দরকার। তখন ঈসা খান ৫০ একর ভূমির দিঘির পরিকল্পনা নিলেন, যাকে কোঠামন দিঘি বলা হয়। আর দেব মন্দিরের জন্য যত অর্থের দরকার হয় আমি দেব। রথযাত্রা এবং দেবালয়ের জায়গা জামি যতটুকু আবশ্যকীয় সমুদয় লাখেরাজ দেবোত্তরে দিয়ে দিলাম।

আর বেতাল মৌজা, দেবতার দেবোত্তরে লাখেরাজ দিয়ে দিলাম। উক্ত মৌজার আয়ের অর্থ দেবতার ভোগের জন্য ব্যয় করবেন। তখন হতে উক্ত মৌজার নামকরণ হয় ভোগবেতাল। প্রতিটি ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

তখন হতে গোপী নাথের বাড়িতে প্রতি বৎসর রথযাত্রা আরম্ভ হয়। বাংলার হিন্দু ধর্ম প্রাণ, আবাল, বৃদ্ধ বণিতা, লক্ষ লক্ষ যাত্রিক এসে ভিড় জমাত। সে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হতো, গজে মানুষে বিরাট রথটিকে টানত।

মঠখোলার অষ্টমীর স্নান কালীবাড়ি আর গোপীনাথের বাড়িতে রথযাত্রা এগারসিন্দুর এবং দেওয়ান ঈসা খানের এক অপূর্ব ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে- এই কিংবদন্তি।

বাউলাই নদী নামের কিংবদন্তি

বাউলাই ধনু নদীর একটি শাখা নদী। ধনু ভারতের মেঘালয় রাজ্যের যাদুকাটা ও ধোমালিয়া পাহাড়িয়াা নদীগুলো এর উৎস। সুনামগঞ্জের ভিতর দিয়ে এ নদী বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট-সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের উত্তর নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি হয়ে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় প্রবেশ করেছে। এক ভাগ সনপুর, বেতাগা, বসদিয়া হয়ে এবং অপর ভাগ বাদলা নাসিরুজিয়াল, সহিলা হয়ে নিকলী উপজেলার সিংপুরের এখানে মিলিত হয়ে 'মগরা নদী' নামে প্রবাহিত এবং পরিচিত। অন্য শাখাটি ইটনা থেকে মিঠামইন উপজেলা পর্যন্ত এর নামকরণ বাউলাই। বাউলাই নদীর অপর আরও একটি নাম রয়েছে "বৌলাই" বলে। জনশ্রুতি রয়েছে পৌরাণিক কোন এক আমলে এ নদী বক্ষে কোন এক কুলবধূকে অপহরণ করার পর-তার পেছনে ধাবিত মাঝি মাল্লাদের চিৎকার ধ্বনি 'বৌ-লিয়ে' এ শব্দ উচ্চারণ থেকে পরবর্তীকালে "বৌলাই" নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়। অপর একটি জনশ্রুতি রয়েছে এভাবে- 'বাও' হলো বায়ু বা বাতাস। ঘূর্ণীয়মান বাওবাতাসে এ নদীর উত্তাল তরঙ্গায়িত দু'কূল সর্বদা ঢেউয়ের আঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হতো। সেই ঘূর্ণীয়মান 'বাও'এর সাথে 'লিলুয়া' নামক শান্ত বাতাসের সংস্পর্শে এসে এ নদীর নামকরণ হয়েছে 'বাও-লাই' থেকে বাওলাই নদী।

নরসুন্দা নদী নামের কিংবদন্তি

কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বদিকে চৌগঙ্গায় ধেনু নদীর মোহনা থেকে উৎপন্ন হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ও পশ্চিমে হোসেনপুরের টোক হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে যে নদী এটিই নরসুন্দা নামে পরিচিত। এ নদীটির সর্ম্পকে নিম্নরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে। সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। তখন চৌগঙ্গায় থাকতেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। একদিন সে পরিবারে পরিচয়হীনা এক কিশোরি দাসী জুটলো। দাসীর চরিত্র ব্যবহার ও বিশ্বস্ততার গুণে কিছু দিনের মধ্যেই গৃহস্বামী খুবই মুদ্ধ হলেন। দিন যায় একদিন ব্রাহ্মণ চাইলেন ব্রাহ্মণীসহ ব্রহ্মপুত্র সর্বপাপ হরা ও পবিত্র জলে স্নান করতে যাবেন। এদিকে সুন্দা দাসীও বায়না ধরলেন

www.pathagar.com

সেও তাঁদের সঙ্গে পবিত্র জলে স্নান করতে যাবে কিন্তু বাড়িতে আর কোন লোকজন না থাকায় দাসীকে তারা সঙ্গে নিতে রাজী হলো না।

নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সাজ-গোজ করে নানা উপাচার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন এমন সময় সেই সুন্দা সুন্দরী বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে একটি গাঁদা ফুল তুলে এনে ব্রাহ্মণীর হাতে দিয়ে বললো "মা -আমার এই সামান্য উপহারটুকু আমার নাম করে ব্রহ্মার জলে ভাসিয়ে দিও।" ব্রাহ্মণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাসীর দেওয়া ফুলটি অন্যান্য উপাচারের এক পাশে ফেলে রাখলেন। সেকালের পথ! যান বাহন নেই - হেঁটে হেঁটে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তিন দিনে গিয়ে পৌঁছালেন ব্রহ্মপুত্রের বাঁকে। একে একে পূজা ও স্নান করে ব্রহ্মার জলে উপহার ভাসিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কি আশ্চর্য ! দুজনের কাউরই পা আর সামনের দিকে এগোয় না ! ব্যাপার কি যতই এগুতে চায় দু'হাটু ভেঙ্গে যায়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বললো দেখ; উপাচারে কোন ভুল হলো কিনা? ব্রাহ্মণীও ব্রাহ্মণকে একই প্রশ্ন করে- না, কোন পাপের ফল বিপদে পড়ে দু'জনেই হায় হায় করছেন। এমন সময় ব্রাহ্মণীর সুন্দা দাসীর কথা মনে হলো। হ্যাঁ তাইতো। দাসীতো তাকে একটি ফুল দিয়েছিল ব্রহ্মার জলে ভাসিয়ে দেয়ার জন্যে। সেটিতো দেওয়াই হয়নি। তবে কি সেই ফুল? ব্রাহ্মণী তখন ব্রাহ্মাকে সব ঘটনা খুলে বললেন আর সুন্দা দাসীর নাম নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফুলটি ব্রহ্মার জলে ফেলে দিলেন।–কি আশ্চর্য ! ফুলটি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর ভেসে উঠল দু'টি হাত! দেবতা নিজ হাতে নিলেন দাসীর দেওয়া সে ফুলটি। এ দৃশ্য দেখে দু'জনেই মুর্চ্ছা গেলেন।

এক সময় মুর্চ্ছা ভাংলে স্বামী-স্ত্রী বাড়ির দিকে রওনা হলেন। ব্রাহ্মণ বাড়ির দিকে হাঁটে আর চিন্তা করে সুন্দা দাসী। এই মহৎপ্রাণা নারীকে আমি কি না দাসী বানিয়ে রেখেছি। আমার কি উপায় হবে। একবার বাড়ি যেতে পারলে হয়, তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো পাপ মুক্তির জন্যে। যত শীঘ্র সম্ভব দুজন বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরেই ব্রাহ্মণ আগে সুন্দা দাসীর খোঁজ নিলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণের ভাব দেখেই সুন্দা দাসী সব বুঝে নিয়েছে, সে বললো এ বিষয়ে আর কিছুই বলতে হবে না। আপনাদের বরং মঙ্গলই হবে। দয়া করে আমাকে ছুঁবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নাছোড়, তিনি সুন্দা দাসীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবেন তাই ব্রাহ্মণ দাসীর দিকে গলবস্ত্র হয়ে এগুতে থাকলেন। ব্রাহ্মণ এগোয় আর সুন্দা দাসী পিছায়। এ ভাবে কিছু দূর যাওয়ার পর বেগতিক দেখে সুন্দা দাসী এ বাড়ির আনাচও বাড়ির কানাচ, আম বাগান, কাঁঠাল বাগান দিয়ে দৌড় শুরু করলেন। সুন্দা দাসী দৌড়ায় আর ব্রাহ্মণও তার পেছনে পেছনে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ হয়রান হয়ে আরেকবার পেছনে ফিরে দেখেন তাঁদের দৌড়ানো পথে নদী হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে ব্রাহ্মণ আর কি করবেন তার মনতো দাসীর পায়ে ক্ষমা চাইতে উন্মুখ, তাই সে দৌড়াতেই থাকেন। দৌড়াতে দৌড়াতে সুন্দা দাসী এক সময় টুকের কাছে ব্রহ্মপুত্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর তার পেছনে ব্রাহ্মণও তাই করলেন– তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্রহ্মপুত্রের অথৈ জলে। সেই যে পড়লেন পড়লেনই– এরপর আর কেউ কোন দিন তাঁদের খোঁজ পায়নি। সেই সুন্দা দাসীর এঁকে বেঁকে দৌড়ানো পথই আজ "সুন্দা নদী"। স্বর্গ থেকে সুন্দার নরলোকে আগমন হেতু 'সুন্দার' সঙ্গে 'নর' যোগ হয়ে আজ নদীটি 'নরসুন্দা' নামে খ্যাত হয়েছে।

www.pathagar.com

নদীটির নামকরণ সম্পর্কে অপর একটি মতবাদ–কিশোরগঞ্জের কোন কোন অঞ্চলে আঞ্চলিকভাবে শালুক বা বেঁট গাছ 'সুন্দিলত' এবং এর ফুল 'সুন্দিফুল' নামে পরিচিত। সে দিক দিয়ে কারও কারও মতে এককালে বর্তমান নরসুন্দার নদীর দু'পাশে এত বেঁট ও বেঁট ফুলের সমারোহ ছিল যে– বর্ষাকালে নদীটি বেঁট বা সুন্দি ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। এ থেকে অনেকের ধারণা সে সুন্দি ফুলের সমারোহ থেকেই নদীটি প্রথমে 'সুন্দা' পরে ক্রমবিবর্তনে নরসুন্দায় রূপ লাভ করেছে। অবশ্য এর সমর্থনে বর্তমান নরসুন্দা সংলগ্ন লতিবাবাদ মৌজায় একটি বৃহত্তর বিলের নাম দেখা যায় 'সুন্দিরবন'। জলময় বৃহত্তর এ বিলটি এক সময় অসংখ্য সুন্দি গাছ ও সুন্দিফুলে ছেয়ে থাকত বলেই নাকি এর নামকরণ করা হয়েছিল 'সুন্দিরবন' আঞ্চলিক উচ্চারণে 'হুন্দিবন'। নদীটির নামের উৎস সম্পর্কে উল্লিখিত কাহিনি ও কিংবদন্তি ছাড়াও অনেকের মতে এককালে নদীটির দু'পাশে এত "নিসিন্দা" গাছের সমারোহ ছিল যে– এ অসংখ্য নিশিন্দা গাছ থেকেই উচ্চারণ বিবর্তনে নিশিন্দা কালক্রমে শিন্দা>শুন্দা হতে সুন্দা "নরসুন্দা" হয়ে গেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার সখিনার প্রয়াণ কাব্যে উল্লেখ আছে এ ভাবে–

বিহরিছ মন সুখে নরসুন্দার তীরে
সমতটে নরসুন্দা কপোতাক্ষ সম।

কালীর কুঁড় নদী নামের কিংবদন্তি

বর্তমান গুরুদয়াল কলেজের সামনের নরসুন্দা নদীর গভীর জলাশয়টিই 'কালীর কুঁড়' নামে পরিচিত। এ কুড়ঁটির নামকরণ সম্পর্কে সুন্দর একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এবং এর সঙ্গে শহরের প্রধান কালীমন্দিরটির ও যোগাযোগ রয়েছে। কিংবদন্তিটি নিম্নরূপ :

সে দীর্ঘকাল আগের কথা। সেকালে নরসুন্দার খাঁজে খাঁজে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, আর সে মাছ ধরার জন্যে নরসুন্দার আশপাশ এলাকায় গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি জেলে পল্লি। এমনি এক জেলে পল্লিতে বাস করত খুবই দরিদ্র এক জেলে পরিবার। স্ত্রী আর একমাত্র পুত্র সন্তান নিয়ে জেলের সংসার। নদীর খাঁজে খাঁজে সারাদিন মাছ ধরে তা সন্ধ্যায় বিক্রি করে জেলে কোন প্রকারে সংসার চালায়! কিন্তু একবার হয়েছে কি, পর পর দু'দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও জেলে একটি মাছও ধরতে পারেনি। মাছ ধরতে না পারায় দু'দিনই জেলের সংসারে হাঁড়ি চড়েনি। এমনি করে দু'দিন কেটে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন ভোর না হতেই জেলে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং সে জাল বর্তমানে উল্লিখিত কুঁড়ে এনে ফেললো। জাল ফেলার কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো জালে কি যেন পড়েছে এবং জাল থেকে অনবরত বুদ্ বুদ্ বের হতে লাগল। জেলে খুশিতে বাগ বাগ-! নিশ্চয়ই আজ ভাগ্যগুনে একটি বড় মাছ পড়েছে! কিন্তু না – কিছুক্ষণের মধ্যেই জালে পড়া সে প্রাণিটি জালসহ কুড়েঁর মধ্যে ডুবে যেতে লাগল। জেলের হাতে ধরা জালের দড়ি শেষ হয়ে গেলেও সে কোন মতেই জালটি ধরে রাখতে পারছে না এ অবস্থায় নিরূপায় জেলে জালের দড়ির শেষ প্রান্তটি একটি বাঁশের খুটায় বেধে জালটি কুঁড়ের পানিতে ছেড়ে দেয় এদিকে প্রাণিটি জালটিকে মাঝ কুঁড়ে নিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে বসে।

নিরূপায় জেলে একটি কলার ভেলা তৈরি করে কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে সারাদিন চেষ্টা

www.pathagar.com

করেও জালটি তুলতে সক্ষম হয়নি। জাল যতই টানে ততই বুদবুদের ফুটি বের হয়। জেলের মনে দুঃখ আর ধরে না। দুঃখের দুদিনের সঙ্গে তিন দিন যোগ হয়। বিফল মনোরথ জেলে শেষ পর্যন্ত জালটিকে এভাবে রেখেই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে। সারাদিনের ক্লান্তি শ্রান্তিতে অভুক্ত অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ঘোড়ে সে স্বপ্ন দেখে যে এক দেবী তাকে বলছে আগামী কাল ভোরে তোমার ছেলেটিকে সেই কুঁড়ে পাঠালে জালটি সহজেই উঠে আসবে এবং এ জালের সঙ্গে যা উঠে আসবে তা থেকেই তোমাদের পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। ফলে তোমাদের আর মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে না। এ স্বপ্ন দেখার পর জেলের ঘুম ভেঙ্গে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। পরিবারের একমাত্র ছেলে, তাকে জাল আনার জন্যে সেই কুঁড়ে পাঠানো ঠিক হবে না। কারণ দৈব বিপাকে তারও অঘটন ঘটতে পারে। অপরদিকে দেবী প্রদত্ত স্বপ্ন! এ মুহূর্তে কি করা যায়। এ নিয়ে সে যখন চিন্তা ভাবনা করছে তখন জেলের স্ত্রী বিষয়টি জানতে চাইলে জেলে তার স্ত্রীর কাছে পূর্বাপর ঘটনাটি খুলে বলে। এতে দুজনেই উদ্বিগ্ন হয় এবং স্থির করে যে, পরদিন ভোরে জেলে পল্লির আরও দু'চার জনের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়টি সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

পরদিন ভোরে জেলে পল্লিতে বিষয়টি সর্ম্পকে পরামর্শ করতে গেলে সবাই এক বাক্যে জালটি তোলার জন্যে ছেলেকে পাঠানোর পরামর্শ দেয় এবং শত শত জেলে, নৌকা ও ভেলা নিয়ে ছেলেটি সহ সে কুঁড়ের মাঝখানে যায় এবং ছেলেটিকে জাল টানতে বলে। ছেলে জাল ধরে টানার সঙ্গে সঙ্গে জালটি স্বচ্ছন্দে উঠে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কুঁড়ের কিনারে এনে জালটি উপরে তুললে তার মধ্যে দেখা যায় কালো চিক্ চিকে পাথরের একটি কালীর বিগ্রহ। এ অভাবনীয় ঘটনায় স্থানীয় জেলে পল্লিগুলোতে বিরাট সারা পড়ে যায় এবং সবাই মিলিত ভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধান দুর্বা দিয়ে এ প্রতিমাটিকে কুঁড়ের পার্শ্বস্থ একটি বিরাট বট বৃক্ষের নীচে স্থাপিত করে এবং সেদিন থেকেই এ বিগ্রহটি স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের জাগ্রত দেবী হিসেবে পূজিত হতে থাকে। পূজা অর্চনা ও বিগ্রহের মূল সেবাইত হিসেবে জেলের ঐ ছেলেটিকে নির্বাচিত করা হয়। এ থেকে জেলের সংসারের অভাব অনটনও চিরতরে দূর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে যে কুঁড়টি থেকে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল সে কুঁড়টির নামকরণ করা হয় "কালীর কুঁড়"।

উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে অপর আরও একটি ঘটনার সংযোগ রয়েছে। অর্থ্যাৎ আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের কালীমন্দিরটি যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত এ স্থানটিতেই ছিল একটি বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষের নিচেই উল্লিখিত কালীর বিগ্রহটিকে স্থাপন করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এ বিগ্রহটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে একটি ছোট মন্দির। পরবর্তী পর্যায়ে বর্তমান মন্দির। বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের প্রাক্কালে সেই বিরাট বটবৃক্ষটি উৎপাটিত করা হয়। বড় মন্দিরটি নির্মাণের পূর্বকাল পর্যন্ত এর সেবাইত ছিলেন স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের লোকজন এটির পরিচালনায় দায়িত্বও ছিল জেলে সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তী পর্যায়ে কিশোরগঞ্জকে মহকুমায় উন্নীত করা হলে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ পেশাজীবীরা জেলে সম্প্রদায়

www.pathagar.com

ও তাদের পুরোহিতকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা একটি সার্বজনীন কমিটি গঠন করেন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করে মন্দিরটি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। যতদূর জানা যায় মন্দিরের বর্তমান জায়গাটিও প্রকৃতপক্ষে রাকুয়াইল জেলে সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ছিল।

আখড়া বাজার নামের কিংবদন্তি

বর্তমান জেলা সদর ও নরসুন্দা নদীর দক্ষিণ পশ্চিমাংশের শহর এলাকাটি "আখড়া বাজার" নামে পরিচিত। এ স্থানটির নামকরণের উৎস নির্ভর করছে বর্তমান জেলা শিল্পকলা পরিষদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পরিধি নিয়ে স্থাপিত হিন্দু সম্প্রদায়ের এককালের বিখ্যাত ধর্মীয় পীঠস্থান আখড়া মন্দির ও মন্দিরে স্থাপিত শ্যামসুন্দরের বিগ্রহের উপর। যা নাকি পরবর্তী শ্যামসুন্দরের আখড়া নামে খ্যাতি লাভ করে। এ আখড়াটি কবে কোন সময়ে যে এ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয় তার কোন সঠিক কাল সন বা তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে এ আখড়াটির প্রতিষ্ঠা নিয়ে সুন্দর একটি জনশ্রুতি প্রচলন রয়েছে। জনশ্রুতিটি নিম্নরূপ–

দীর্ঘকাল আগের কথা- সে সময়ে কিশোরগঞ্জ শহরের অধিকাংশ এলাকার ন্যায় বর্তমান শ্যামসুন্দর আখড়ার স্থানটিও ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এবং এর থেকে লোকালয় ছিল বেশ দূরে। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেলো সে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ স্থান থেকে ধোঁয়া উঠছে। প্রতি সন্ধ্যায় একই স্থান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে একদিন স্থানীয় বেশ কিছু লোকজন একত্রে জড়ো হয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জঙ্গলে প্রবেশ করে দেখলেন জঙ্গলের মধ্য অংশে কতটুকু স্থান- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উলঙ্গ প্রায় এক সাধু পুরুষ একটি ছোট কালো কষ্টি পাথরের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ সামনে নিয়ে ধূপ ধোনা জ্বালিয়ে হোম করছেন। জড়ো হওয়া লোকজন দূর থেকে এ দেখেই ভয়ে ভয়ে সে স্থান থেকে সরে এলেন। যে সময়ের কথা সে সময়ে বর্তমান কিশোরগঞ্জের অধিকাংশ এলাকায় ছিল হয়বতনগরের প্রভাবশালী জমিদারদের দেওয়ানির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরদিন ভোরেই লোকজন জমিদার বাড়ি নিয়ে স্বয়ং জমিদারকে বিষয়টি জানালেন। সংবাদটি শুনেই জমিদার তার পাইক পেয়াদাকে হুকুম করেন- যাও এখুনি সেই সাধুকে ধরে নিয়ে এসো। জমিদারের হুকুম পেয়ে পাইক পেয়াদারা ছুটলেন সেই জঙ্গলে গিয়ে সাধুকে জমিদারের ফরমান জানালেন। কিন্তু সেই সাধু অনড়। পাইক পেয়াদাদের কথা যেন গ্রাহ্যই করলো না। কি করবে পাইক পেয়াদা আবার ফিরে গেলেন-জমিদারের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানালেন। জমিদার বললেন–

কোন কথা শুনতে চাইনা-, সাধুকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে এসো। জমিদারের হুকুম ! কি করবে। পাইক পেয়াদারা আবার সে স্থানে গেলেন। সাধুকে আবারও অনুনয় বিনয় করলেন- তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু এবার ও সাধু সম্মত না হওয়ায় তারা সবাই সাধুকে বলপূর্বক ধরে উঠাতে চাইল,- কিন্তু এতগুলো লোক শক্তি প্রয়োগ করে সাধুর স্থান থেকে তাকে এক তিল পরিমাণও নড়াতে পারল না। পাইক পেয়াদারা আবার ফিরে গিয়ে জমিদারের কাছে বিস্তারিত জানালেন। এবার জমিদার হুকুম দিলেন–যাও হাতীশালা থেকে হাতী নিয়ে যাও। সাধুকে হাতী দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে আসবে। এবার পাইক পেয়াদারা মাহুত ও হাতীসহ সে জঙ্গলে গেলেন কিন্তু কি আশ্চর্য!

www.pathagar.com

হাতীও সাধুকে একতিলও নড়াতে পারলো না। কি আর করা, হাতী নিয়ে সবাই জমিদারের কাছে ফিরে গিয়ে বিবরন জানালেন। এবার জমিদার বুঝতে পারলেন–সাধু সাধারণ লোক নয় কামেল সাধু। কারণ সে জমিদারও ছিলেন অধ্যাত্ম সাধনার সাধক। এবার তিনি কি করলেন–একটি হাতির কপালে কিছু সিঁদুর দিয়ে মাহুতকে হাতিটিসহ আবার সে জঙ্গলে সাধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাতিটি সাধুর কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে হাতির কপালের সিঁদুর দেখেই সাধুও সব বুঝতে পারলেন এবং এবার সঙ্গে সঙ্গেই বিগ্রহটি ঝোলায় নিয়ে হাতির আগে আগে হেঁটে জমিদার বাড়ি গেলেন।

লোকজন যথারীতি সাধুকে জমিদারের দরবার কক্ষে নিয়ে গেলে– জমিদার সাধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশেষ কক্ষে নিয়ে বসলেন। সেখানেই সাধু জানালেন যে– তিনি পশ্চিম দেশ থেকে তার আরাধ্য দেবতার নির্দেশক্রমে দেবতাসহ হেঁটে হেঁটে এদেশে এসেছেন এবং উল্লিখিত স্থানটিতে তার দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ পেয়ে এখানে অবস্থান করছেন। এ ছাড়াও জমিদার সাধুর কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে পরদিনই সাধুর চিহ্নিত স্থানটির জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির, আখড়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্যে শত শত লোক নিয়োগ করলেন।

এইরূপে এক মাসের মধ্যেই স্থানটিতে বিরাট আখড়া মণ্ডব, নবরত্ন, মন্দির ইত্যাদি তৈরি হয়ে গেল। এরপর একদিন ঘটা করে সে মন্দিরে শ্যামসুন্দরের সেই বিগ্রহটি স্থাপন করা হলো– আর জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থেকে বা হাতের কড়ে আঙ্গুলে সিঁদুর নিয়ে সাধুর কপালে সে সিঁদুর লাগিয়ে দিলেন এবং সে দিন থেকে সাধুকে এ আখড়া মন্দির ও বিগ্রহের সেবাইত বা মোহান্ত নির্বাচিত করলেন। এবং আখড়ার জন্যে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি লাখেরাজ হিসেবে দানপত্র করে দিলেন। এ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলো শ্যাম সুন্দর আখড়া। হয়বতনগর জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ আখড়ার সেই প্রথম মোহান্ত থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত নতুন কোন মোহান্ত নির্বাচিত হলেই তাকে প্রথমেই সে জমিদার বাড়ির উত্তরাধিকারীর বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে কপালে দেওয়া সিঁদুরের টিপ দিয়ে এ পদে অভিষিক্ত হতে হয়েছে। শোনা যায় এ প্রথাটি কয়েক যুগ পূর্বেও বিদ্যমান ছিল।

পাগলা মসজিদ নামের কিংবদন্তি

কিশোরগঞ্জ শহরের পশ্চিমাঞ্চলের হারুয়া মৌজাধীন 'পাগলা মসজিদ'। এ মসজিদটিকে ঘিরে সাধারণ নর-নারীর মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে–এ মসজিদে মানত করলে সন্তানহীনা সন্তানবতী হয়, স্বল্পায়ু সন্তান দীর্ঘায়ু লাভ করে, বাঁজা গাভী গর্ভধারণ করে, অফলা বৃক্ষ ফলবান হয়, প্রথম প্রসবিত গাভীর দুধ এ মসজিদে উৎসর্গ করলে সে গাভী প্রচুর দুধ দেয়, প্রথম বৃক্ষের ফল এতে উৎসর্গ করলে সে বৃক্ষে প্রচুর ফল ধরে, 'খাটাল' বা কাটাল ভাঙ্গার প্রথম মাছটি এতে উৎসর্গ করলে জেলেরা সে খাটালে প্রচুর মাছ পাবে ও নতুন ফসলের প্রথম অংশ এতে উৎসর্গ করলে সে বছর কৃষকের ঘর ফসলের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে। এছাড়া পাওয়া যাবে ব্যক্তিগত মামলা মোকদ্দমা ও বালা মুছিবৎ থেকে মুক্তি। কোন দ্রব্য হারিয়ে গেলেও এ মসজিদে এসে বলে গেলেই হারানো দ্রব্য প্রাপ্তি ঘটবে এমনকি চোরাই মাল ও চোর আপনা থেকেই এসে মালিককে দিয়ে

www.pathagar.com

যাবে। শুধু তাই নয়! কারও অমঙ্গল করতে চাইলেও এ মসজিদে এসে গোপনে মনবাসনা জানিয়ে গেলেই কাজ হয়ে যাবে।

এ ছিল সাধারণ নরনারীর ধারণা ও বিশ্বাস। এছাড়া এ মসজিদে এসে ইট উল্টিয়ে দিয়ে কোন কথা বলে গেলেও কাজ হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে। ইটকে আঞ্চলিক ভাষায় 'হান' উল্টানো বলে। এ বিশ্বাস ও জনশ্রুতির ধারাটি এক সময়ে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে শুধু কিশোরগঞ্জ ও স্থানীয় এলাকাই নয়– কিশোরগঞ্জ ছাড়িয়ে দূরদূরান্ত গ্রাম-গঞ্জ থেকেও নিয়মিতই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের নর নারী তাদের দুঃখ দৈন্য থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় দু'তিন দিনের পথ ভেঙ্গে–কেহ নৌকায় কেহ হাঁটা পথে এখানে এসে জমায়েত হতেন, মানত আদায় করতেন আবার কেহ এখানে শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যেও আসতেন। এক সময়ে বলতে গেলে সারা বছরই পুণার্থী ও নানা মনস্কামনায় আগত নরনারীর ভীরে মসজিদ এলাকাটি জমজমাট থাকত। মসজিদ সম্পর্কে নিম্নরূপ জনশ্রুতি পাওয়া যায়–

সে কবেকার কথা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না– তবে যে সময়ের কথা সে সময়ে বর্তমান নরসুন্দার পরিধি ছিল দক্ষিণে হয়বৎনগর থেকে উত্তরে রাখ্‌খ্যুয়াইলের শেষ সীমা পর্যন্ত। আর এ নরসুন্দা ছিল বেগবতী স্রোতস্বতী ও প্রমত্তা এক নদী। সে নদীর স্রোতে শুধু খড়কুটা নয়, - মানুষের ঘর বাড়িও ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল– এ নদীর প্রবল স্রোতধারার মধ্যেই মাদুরে আসন করে এক অধ্যাত্ম সাধক পুরুষ ভেসে আসছেন। তার আসন নদীর ঠিক মধ্যস্থানে–(বর্তমান পাগলা মসজিদ এলাকা) এসে স্থির হয়ে গেল। স্থির হলো তো হলোই– কোন নড়চড় নেই।

এভাবেই কেটে গেল কদিন। কিন্তু দেখা গেল এ কদিনেই স্থানটিতে ধীরে ধীরে চড়া জেগে উঠেছে। সাধক ধ্যানেই মগ্ন, এ দিকে স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরতে নদীতে আসে আর এ অলৌকিক ব্যাপার দেখে দূর থেকেই এ সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, কিন্তু ভয়ে কেহ সে চড়ার কাছে যেতে সাহস পায় না। এভাবেই আরও ক'দিন কেটে গেল। এ দিকে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। নদীর পাশেই রাখ্‌খ্যুয়াইল গ্রামের জনৈক গোয়ালা দেখল–তার নতুন বিয়াতী একটি গাভী দুধ দিচ্ছে না। গোয়ালা প্রতিদিন শত চেষ্টা করেও গাভিটির বাঁট থেকে এক ফোটা দুধও বের করতে পারছে না। এতে গোয়ালার মনে সন্দেহ হলো এবং ভাবলো নিশ্চয়ই তার রাখালের কারসাজি। –অর্থাৎ রাখাল প্রতিদিন নদীর চড়ায় গরু চড়াতে গিয়ে গাভীর সব দুধ দোহন করে খেয়ে আসে। এই না ভেবে গোয়ালা বিষয়টির জন্যে সরাসরি রাখালকে অভিযুক্ত করল। কিন্তু রাখাল সরাসরি এ অভিযোগ অস্বীকার করে।

পরদিন রাখাল গরুর পাল মাঠে নিয়ে ছেড়ে দেয় এবং দূর থেকে "কবলী" নামের সে গাভিটির প্রতি সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে থাকে। রাখাল অন্যদিন দুপুরে খেতে বাড়ি যায় কিন্তু আজ সে বাড়ি না গিয়ে সারাক্ষণ কবলীর দিকেই লক্ষ্য নিয়ে বসে থাকে। গাভীটি এতক্ষণ পালের সাথে ঘাস খাচ্ছিল। কিন্তু যেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে আর অমনি সে পাল ছেড়ে ধীরে ধীরে নরসুন্দার জলে গিয়ে নেমে পড়ে সাঁতার কাটতে থাকে। এদিকে রাখাল ও গাভীটির পেছনে পেছনে নদীর জলে নেমে সন্তর্পণে

সাঁতরিয়ে এগুতে থাকে। ইতিমধ্যে গাভীটি নদী সাঁতরিয়ে সেই অধ্যাত্ম সাধকের চড়ায় গিয়ে উঠে। রাখালও পেছন পেছন সেই চড়ায় এক পাশে গিয়ে চুপ করে সব দেখতে থাকে। রাখাল দূর থেকে দেখছে গাভীটি ধ্যানমগ্ন অধ্যাত্ম পুরুষের পাশে রক্ষিত একটি পাত্রে বাঁটের সম্পূর্ণ দুধ ঢেলে দিয়ে আবার নদী সাঁতরিয়ে পালে গিয়ে মিলে আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। রাখাল প্রথম দিন স্বচক্ষে এ দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু পরদিনও সে একই ঘটনা দেখে বাড়ি ফিরেই গোয়ালকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি বলল। কিন্তু গোয়ালা ঘটনাটি স্বচক্ষে না দেখে বিশ্বাস করতে চাইল না। কাজেই পরদিন রাখালের সঙ্গে গোয়ালা নিজেও গরুর পালের সঙ্গে নদীর চড়ায় গিয়ে গোপনে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে যথাসময়ে সেই গাভীটি নদীর জলে নেমে সাঁতার দিলে পেছন পেছন গোয়ালাও নদীর জলে নেমে সাঁতরিয়ে সে চড়ায় গিয়ে দুর থেকে স্বচক্ষে বিষয়টি দেখে তার মনে আর সন্দেহ রইল না যে এ কামেল সাধক। সাধারণ পাগল বেশে এ দেবতার ছলনা!! পরক্ষণেই গোয়ালার মোহমুক্তি কেটে যায় এবং সে সব ভুলে সে সাধকের পায়ে গিয়ে পড়ে; আর সে সাধকও গোয়ালাকে সস্নেহে গ্রহণ করেন। এতে পরদিন থেকে এ গোয়ালা তার পরিবার পরিজনসহ এ সাধক পুরুষের কাছে এসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহাত্মার সেবক হন। এবং সেদিন থেকেই সাধকের জন্যে গোয়ালার বাড়ি থেকে সকাল বিকেল দু' বেলা গাভীর দুধ পাঠানো শুরু হলো। কারণ সাধক একমাত্র কাঁচা দুধ ছাড়া অন্য কোন খাবার গ্রহণ করতেন না। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল গোয়ালার সংসারে অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক পাল গরুর স্থলে দু'পাল গরু হয়ে গেছে, এক পোড়া জমি থেকে দু'পোড়া জমি হয়ে গেছে। গোয়ালার সাংসারিক উন্নয়ন ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দের খবর জেনে রাখ্খুয়াইলসহ চার পাশের গোয়ালা, জেলে, তাঁতিরা এক এক করে এসে এ সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন।

তাছাড়া অল্পদিনেই এ সাধকের গুণ-জ্ঞান চারপাশে ছড়িয়ে পড়লে চারপাশ থেকে শত শত নরনারী এ চড়ায় এসে মহাত্মাকে এক নজর দেখে যেতে লাগলেন এবং ক্রমান্বয়ে এ চড়ায় ভক্ত শিষ্যদের বদৌলতে সাধকের জন্যে একটি হোজরাখানা তৈরি করা হলো। অনেকেই স্থায়ী বসত-বাটী করে দিতে চাইলেও তাতে সাধকের কোন অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে এ হোজরাতেই তিনি তার কাল কাটিয়ে গেছেন। উল্লিখিত সাধক সর্ম্পকে নানা অলৌকিক কাহিনি জনশ্রুতি রয়েছে। এ সাধকের প্রয়াণের পর তাঁর হোজরার পাশেই তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয় এবং হোজরাখানার স্থানটিতেই– পরবর্তী কালে নির্মিত হয় একটি মসজিদ। এ মসজিদটি পরবর্তীতে পাগল সাধকের স্মৃতি হিসেবে "পাগলা মসজিদ"–নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করে।

কাতিয়ারচর নামের কিংবদন্তি

কাতিয়ারচর গ্রামের অর্দ্ধাংশ মারিয়া ইউনিয়ন ভুক্ত এবং বাকি অর্ধেকাংশ পৌরসভাধীন। এলাকাটি পৌরসভার পশ্চিমাংশের শেষ প্রান্ত নরসুন্দা নদীর পাড় দিয়ে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত। এর দক্ষিণে জেলা বোর্ডের হোসেনপুর-কিশোরগঞ্জ সড়ক আর উত্তর পার্শ্বে নরসুন্দা নদী। পূর্বদিকে হয়বৎনগর পশ্চিমে প্যারাভাঙ্গা। এ গ্রামটির 'কাতিয়ারচর' নাম

www.pathagar.com

হওয়ার পেছনে একজন বুজুর্গ ব্যক্তির আধ্যাত্ম সাধনার জনশ্রুতি রয়েছে। কাহিনিটি নিম্নরূপ - হয়বৎনগর দেওয়ার বাড়ির একজন বিশিষ্ট দেওয়ান (কারও মতে মানোয়ার দাদ খান মতান্তরে জুলকদর খান) মহাত্মা খিজির ভক্ত ছিলেন- এক রাতে স্বপ্নাদিষ্ট হলেন- তিনি দেখলেন মহাত্মা খোয়াজ খিজির তাঁকে বলছেন– "তুমি যদি সাধনায় পূর্ণতা লাভ করতে চাও তবে হারুয়ার পাশ্ববর্তী নরসুন্দার বাঁকে একটি বিন্নাগাছ আছে–একটি নীচে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। এভাবে নিয়মিত চল্লিশ দিন স্থানটিতে আলো দিয়ে গেলেই তুমি সাধনায় পূর্ণতা লাভ করবে এবং আমার ও দেখা পাবে।" স্বপ্নাদেশের পর দেওয়ান সে দিনই স্থানটির সন্ধানে বের হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নরসুন্দার সে বাঁক ও বাঁকের পাশেই একটি বিন্নাগাছ দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গের কর্মচারীদের নিয়ে গাছের নীচের অংশটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আসলেন এবং সেদিন সন্ধ্যে থেকেই প্রতিদিন স্থানটিতে নিজে যেয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

এভাবে দিন যেতে লাগলো, দিনের পর দিন যেয়ে চল্লিশ দিন পূর্ণ হতে আর মাত্র একদিন বাকী। কিন্তু দৈবক্রমে সেদিন সকাল থেকেই শুরু হলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি সেই সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বিকেল থেকেই দেওয়ান আলো নিয়ে অপেক্ষা করছেন নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্যে- কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বক্ষণেও সে ঝড়ো হাওয়া থামার কোন লক্ষণ না দেকে তিনি নিজাম নামে দেওয়ান বাড়ির লাকড়ি কাটার একজন কর্মচারীকে ডেকে বল্লেন নিজাম আজ এ আবহাওয়ায় নরসুন্দার পাড়ে আমি তো যেতে পারছিনে, কিন্তু আলোতো জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে হবে?

এখন কি করি- তুমি কি আজ আমার হয়ে সেখানে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে পারো? নিজাম সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন, কারণ নিজাম প্রকৃতই ছিলেন খোয়াজ খিজিরের একজন ভক্ত ও গোপন সাধক। নিজাম রাজী তো হলেন এখন আলো নিয়ে এ ঝড় বৃষ্টিতে এতদুর যাবে কি করে?– অনেক চিন্তা ভাবনার পর সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে কুপি জ্বালিয়ে একটি বাঁশের 'চাটাই' স্থানীয় নাম 'কাতিয়া' মুড়ি দিয়ে তিনি খিজিরের নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন এবং নির্ধারিত স্থানে গিয়ে আলো জ্বালালেন। কিন্তু কি বিস্ময়ের ব্যাপার এত ঝড় বৃষ্টিতেও আলো নিভলো না। এদিকে আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই নরসুন্দার পানি থেকে উঠে এলেন সৌম্যশান্ত শুশ্রুমণ্ডিত সাদা আলখেল্লাধারী বিরাট এক পুরুষ। তাঁকে দেখে নিজাম তো ভয়েই অস্থির। কিন্তু সেই সৌম্য শশ্রুধারী নিজামকে অভয় দিয়ে বললেন– নিজাম প্রকৃত সাধনায় তুমিই কামিয়াব হয়েছ। এখন বলো তুমি কি চাও?

নিজাম ভয়ে ভয়েই উত্তর দিলেন– : না হুজুর আমি কিছুই চাই না-বরং যদি কিছু দিতে হয় আমার মনিবকেই দিবেন। কিন্তু সেই মহাত্মা বললেন- না-যা পাওয়ার সে আর পাবে না-বরং তুমিই কামালিয়াত প্রাপ্তির যোগ্য সাধক। আজ থেকে তুমি যা বলবে তাই হবে; এখন থেকেই তোমার অন্তর দৃষ্টি খুলে যাবে। বলেই সেই সাধক পুরুষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজাম ও বাহ্যজ্ঞান হয়ে সেখানেই পড়ে রইলেন। এ দিকে সারারাত এবং পরদিন সকালেও নিজামের সাক্ষাৎ না পেয়ে দেওয়ান গেলেন সেই নির্ধারিত স্থানে। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন নিজাম বিন্নাগাছের একটি চিকন ডালে

www.pathagar.com

শয়ন করে ঘুমিয়ে আছেন। এতে দেওয়ানের আর কিছুই বুঝতে বাকি রইলো না। সেদিন এবং সেইক্ষণ থেকে তিনি ও উন্মাদের মত হয়ে গেলেন- এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দেওয়ান পরিবারে 'পাগলা দেওয়ান'- নামে পরিচিত হয়ে গেছেন আর এ দিকে দেওয়ান পরিবারের কাঠ কাটা কামলা নিজাম খিজিরের আশীর্বাদে কামালিয়ত লাভ করে "নিজাম শাহ আওলিয়া" নামে বিখ্যাত সাধক হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন।

পরবর্তী জীবনে এ সাধক অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁর সাধন স্থানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তার মরদেহ সমাহিত স্থানের পাশেই দেওয়ান বাড়ির দেওয়ানদের প্রচেষ্টায় একটি দরগা ও একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। উল্লিখিত মসজিদ ও দরগার স্মৃতিটুকু কালের আবর্তে "নিজাম শা" আওলিয়ার 'মজিদ ও দরগা' নামে আজও কাতিয়ারচর গ্রামের পূর্বাংশে এবং নরসুন্দার দক্ষিণপাড়ে টিকে আছে। তাছাড়া স্থানীয় এলাকায় এ সাধক সম্পর্কে অসংখ্য কেরামতের কাহিনি কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে। 'কাতিয়ারচর' গ্রামের নামকরণের উৎস সন্ধানের আলোচনাতেই আমরা ফিরে যাচ্ছি- অবশ্য উপরে আলোচিত কাহিনিটি উল্লিখিত গ্রামটির নামকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই এ কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে।

গ্রামটির নামকরণের পেছনে অন্যরূপ জনশ্রুতিও রয়েছে। নিজাম শাহ ঝড় বৃষ্টির কালে আলো নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার সময় বাঁশের চাটাই বা যে 'কাতিয়াটি' মাথায় দিয়ে গিয়েছিলেন সেটি ঝড় বষ্টির পর নরসুন্দায় চড়ায় ফেলে রাখলে সেই স্থানটি কাতিয়ার ন্যায় চতুভুর্জ আকৃতি ধারণ করে ফলে। তা থেকেই স্থানটি 'কাতিয়া' এবং নদীর 'চর' এ দুটি শব্দ মিলে 'কাতিয়ারচর' নামকরণ করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে এককালে বর্তমান কাতিয়ারচর গ্রামটিতে বাঁশ বেতের কারিগর সম্প্রদায়ের নিবাস ছিল এবং সে গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে নিয়মিত অসংখ্য 'কাতিয়া' বা চাটাই তৈরি হয়ে স্থানীয় হাট বাজারগুলোতে বিক্রয় হতো, এ থেকে কাতিয়া তৈরির এলাকা এবং নদীর চর মিলিত হয়ে গ্রামটির নাম কাতিয়ারচর হয়েছে। প্রাচীন আমলে এ অঞ্চলে প্রচুর ঝাড় ছিল। বর্তমানেও কিছু বাঁশঝাড়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

কোষাকান্দা নামের কিংবদন্তি

পাকুন্দিয়া উপজেলার দু'মাইল দক্ষিণে মূল রাস্তা সংলগ্ন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের নাম কোশাকান্দা। গ্রামের এ নামাকরণের পেছনে যে কিংবদন্তিটি প্রচলিত রয়েছে– কিংবদন্তিটি নিম্নরূপ : বাংলার বারভূইয়া প্রধান ঈশা খাঁ দিল্লীর দরবার হতে বাইশ পরগনার দেওয়ানি সনদ নিয়ে তাঁর রাজধানী জঙ্গলবাড়িতে ফেরার পথে কীর্তিনাশা নদী শ্রীপুরের ঘাটে শ্রীপুর রাজকেদার রায় ও চাঁদ রায়ের বাল্য বিধবা ভগ্নী ছোনামনিকে দেখে মুগ্ধ হন। সোনামনিও ঈশা খাঁর প্রতি আকৃষ্ঠ হন। এতে সে রাতে ঈশা খাঁ তার কোশার বহর নিয়ে শ্রীপুর ঘাটে রাত্রিযাপন করেন এবং শেষ রাতে অসংখ্য প্রহরী বেষ্টিত রাজবাড়ি থেকে সোনামনিকে হরণ করে সূর্য উঠার পূর্বক্ষণেই কোশার বহর জঙ্গলবাড়ির উদ্দেশ্যে শ্রীপুর ত্যাগ করেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কোশা শ্রীপুর থেকে ঢাকায় এসে পৌছায়। জঙ্গলবাড়িতে পৌছানোর পর সোনামনিকে বিয়ে উপলক্ষ্যে সে সমস্ত উপঢৌকন, মিষ্টি, পান-সুপারী

www.pathagar.com

ও সিদুঁর ক্রয় করেন তা তিনি ঢাকা থেই ক্রয় করে আলাদা একটি কোশা ভর্তি করে নেন। আবার কোশার বহর জঙ্গলবাড়ির উদ্দেশ্যে ছাড়লেন। সে কোশার বহর শীতলক্ষা, বানার ও ব্রক্ষপুত্র হয়ে এগার সিন্দুর পৌছালেন। তৎসময়ে ব্রক্ষপুত্র থেকে মির্জাপুর হয়ে একটি শাখা নদী জঙ্গলবাড়ির সঙ্গে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো। পরদিন ঈশা খাঁ এগার সিন্দুর থেকে সে নদীতে জঙ্গল বাড়ির উদ্দেশ্যে কোশা ছাড়লেন। কোশা ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঈশা খাঁ স্বপ্নে দেখলে জলের অধিষ্ঠাত্রী গঙ্গাদেবী তাকে বলছেন– "হে ঈশা তুমিতো আমার বোনঝি সোনামনিকে আগামীকাল বিয়ে করতে যাচ্ছ, এ উপলক্ষ্যে সবাইকে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য ঢাকা থেকে এক কোশা মিষ্টিও নিয়ে আসছে তবে আমাকেও এ মিষ্টির একটি অংশ সামনের কুঁড়ে (বর্তমান কোশাকান্দা গ্রামটি সে নদী ও ব্রক্ষপুত্রের মোহনা ছিল) দিয়ে যেও।" ঈশা খাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, স্বপ্নের কথাও তিনি কাউকে বললেন না। ইতিমধ্যে কোশার বহর উক্ত কুঁড় পাড় হয়ে যাওয়ার সময়ে মিষ্টান্ন ও পান-সুপারি ভর্তি কোশাটি সেই কুঁড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এতে ঈশা খাঁ অন্যান্য বহরের কোশা দিয়ে শিকল লাগিয়ে ডুবন্ত কোশাটিতে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

শেষ পর্যন্ত এ কোশাটি সেখানেই রেখে তিনি চলে গেলেন। নদীটি দিন দিন চর পড়ে ভরাট হলে সেই কোশাটিও চরের তিন চার হাত উপরের দিকে ভেসে উঠে ঠিক কোশার ন্যায় একটি টেকে রূপ লাভ করে। এর কিছুদিন পরেই কোশার আগা পাছায় দুটি তালগাছ জন্মায় এবং প্রতি অমাবশ্যার রাত্রিতে তালগাছ দুটিতে তীব্র আলো ঝিলিমিলি করতে থাকে। ক্রমে কোশার চারপাশের জায়গা মানুষ আবাদ করে ফেলে। কিন্তু কোশার আকৃতি যুক্তস্থানটিতে কেহ আবাদ করতে সাহস পায় না। একবার সে গ্রামেরই কোন লোক নাকি কোশার আকৃতিযুক্ত অংশে কোদালের একটি কোপ দেওয়ায় মাটি থেকে গলগল করে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং যে কোপ দিয়েছিল সে সেদিন থেকেই চিরদিনের জন্য বধির হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত ঐ বংশের লোকেরা বংশ পরম্পরায় বধিরতা রোগে ভুগে আসছে। স্থানীয় লোকদের কাছে আজও তারা 'ধুনদার' বংশ বলে পরিচিত। সে থেকে স্থানীয় লোকদের ধারণা যে কোশাযুক্ত কোন অংশ কাটলে তাদের ক্ষতি হবেই যার ফরে সে টেকটি আজ পর্যন্ত অবিকল কোশার আকৃতি বিশিষ্ট অবস্থায় রয়েছে। এ কোশা থেকেই গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছে কোশাকান্দা।

বেবুদ রাজার দিঘি নামের কিংবদন্তি

বেবুদ রাজার দিঘি মূল এগারসিন্দুরের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় বস্তুগুলির মধ্যে একটি। এ দিঘিটি পঞ্চাশ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। এ দিঘিটি সম্পর্কে এরূপ কিংবদন্তি যে, সে অনেক কাল আগে বেবুদ নামে একজন হাজং রাজা এখানে বসবাস করতেন এবং এ দিঘিটির পাশে ছিল হাজং রাজার রাজধানী। এ দিঘিটি বেবুদ রাজা প্রজাদের মঙ্গলার্থে কাটিয়েছিলেন বলে আজ পর্যন্ত এটি বেবুদ রাজার দিঘি নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

জানা যায়, হাজং রাজ বেবুদ এর রাজত্বকালে এদেশে একবার প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। প্রজা বৎসল বেবুদ রাজা প্রজাদের হিতার্থে একটি বিরাট পুকুর খননের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উদ্যোগ অনুযায়ী পুকুরও কাটা হতে লাগলো। হাজার হাজার শ্রমিক

www.pathagar.com

দিনরাত পুকুর কাটছে তো কাটছেই। কিন্তু পানির নামগন্ধ নেই। রাজারানি প্রজাবৃন্দ সবাই ব্যাকুল। এরমধ্যেই রাজা একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে তার রানি যদি পুকুরে নেমে জলদেবীকে স্বহস্তে অর্ঘ নিবেদন করে একমাত্র তা হলেই পুকুরে পানি উঠবে নতুবা নয়। স্বপ্ন দেখার পর পরই তিনি জেগে উঠলেন এবং বিমর্ষ মনে পায়চারী করতে লাগলেন। কারণ রাজার সদ্য বিবাহিতা পত্নী, তাকে কি করে সে পুকুরে পাঠানো যায়। অধিক রাত্রে রাজার এ বিচলিত অবস্থায় রাণীরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি রাজাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন রাজা দ্বিধাগ্রস্থ হয়েও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের ঘটনা খুলে বললেন।

রাজার মুখ থেকে স্বপ্নাদেশ শোনার পরই রানি আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন এবং বললেন সে তো আমার সৌভাগ্য একেতো আমার অর্ঘ্য নিবেদনে জলদেবী তুষ্ট হবেন অন্যদিকে আমারই নিবেদনে হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত নরনারী তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে। রাণীর এ সরল ও স্বাচ্ছন্দ্য উক্তিতে রাজা খুশি হলেন এবং পরদিন যথারীতি রানি এক বাটি কাঁচা দুধ, পান সুপারি ও সিদুঁর নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পুকুরে নামলেন, কি আশ্চর্য। দেখতে দেখতে পুকুরের চার পাশ থেকে স্বচ্ছ জল এসে পুকুর ভরে দিল কিন্তু সে যে উৎসর্গিত প্রাণ, রানি সে পানি থেকে উঠতে পারলেন না। শত চেষ্টা করেও পুকুরের জলে রাণীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এ দিন থেকে রাজাও পাগল হয়ে গেলেন। এবং খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু 'হায় চম্পা' 'হায় চম্পা' (রাণীর নাম ছিল চম্পাদেবী) বলে ঘুরতে লাগলেন। এভাবে পনর দিন যাওয়ার পর এক অমাবশ্যার রাত্রে রাজা দেখলেন তার রানি আরও দুজন সঙ্গিনীসহ সোনার নৌকায় সোনার বৈঠায় জল ক্রীড়া করছেন। এ দৃশ্য দেখে রাজা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। পনরদিন পর পূর্ণিমার রাত্রে আবার একই দৃশ্য দেখলেন। এ দিন রাজা রাণীর বিরহ আর সইতে পারলেন না। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন পানিতে।

এ দিকে রাজার এ অবস্থা দেখে রানি ঘাটের পাশে নৌকা ভিড়ালেন এবং সে এক সিঁড়িতে বসে রাজাকে নির্দেশ দিলেন অন্য সিঁড়িতে বসার জন্য। এবার রানি রাজাকে বললেন, 'দেখ তোমার বিরহে আমিও বিরহিতা, কিন্তু তুমি জান না আমি মানবী নই- আমি দেব কন্যা, সাপ ভ্রষ্ট হয়ে মানব কুলে জন্মগ্রহণ করে তোমার সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে নরলোকের সাহায্য করে আবার দেবলোকে ফিরে গেছি। কিন্তু তোমার প্রেম ভালবাসা সর্বক্ষণই আমাকে পীড়া দেয় কাজেই আমি প্রতি অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার রাতে তোমাকে দেখার ছল করেই এখানে আসি তবে আজ থেকে কথা রইলো তুমি আবার বিয়ে করো সংসারী হও আর এই নাও আমার আংটি যখনই তোমার আমাকে মনে পড়বে তখন যদি এ আংটি নিয়ে ঘাটে আস তবে তখন তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সাবধান কোনদিন ভুলেও আমাকে ছুঁতে যেয় না। আর এ আংটি যেন আর কারও হাতে না পড়ে। এই বলে রানি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা সেই আংটি হাতে নিয়ে ঘরে ফিরে স্বস্থির জীবনযাত্রা শুরু করলেন। এবং সেদিন থেকে রাজা রাণীর কথা মনে করে প্রতিদিন ঘাটে গিয়ে গভীর রাতে রাণীকে দেখতে পান। কিন্তু রাণীকে রাজা ছুঁতে পারে না। এভাবে রাজার দিন আসে দিন যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন আংটিটি হারিয়ে যায়। রাজা হয়ে উঠলেন পাগল প্রায়। রাজা আংটি খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলেন আংটি চোরার বিলে।

www.pathagar.com

আংটি চোরার বিল নামের কিংবদন্তি

বেবুদ রাজার দিঘির দক্ষিণ-পূর্বাংশে একটি নীচু খানাযুক্ত জলাশয়ই আংটি চোরার বিল নামে পরিচিত। এক সময়ে এ বিলটির পরিধি ছিল বিরাট ও ব্যাপক এবং সারা বছরই জলে পরিপূর্ণ থাকত কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিলটি দিন দিন ভরাট হয়ে বর্তমান আবাদীর রূপ নিয়েছে। বিলটির নামকরণ সম্পর্কে স্থানীয় এলাকায় যে কাহিনি প্রচলিত তা বেবুদ রাজ ও বেবুদ রাজার দিঘি সম্পৃক্ত। পূর্ব অধ্যায়ের বেবুদ রাজার দিঘির নামকরণের উৎসের কাহিনি যেখানে শেষ হয়েছে এ কাহিনি সেখান থেকেই শুরু অর্থাৎ মায়াবী রানি প্রদত্ত আংটি নিয়ে রাজা প্রায় প্রতি রাত্রেই দিঘির ঘাটে গিয়ে রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এভাবেই দিন কাটছিল কিন্তু একদিন রাজা পরিষদ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নিকটবর্তী জলাশয় অর্থাৎ বিলে নৌকা বিহারে গেলেন। নৌকা বিহার-কালেই রাজার নিকট রক্ষিত সেই অলৌকিক আংটিটি রাজার একজন বন্ধু দেখতে পায় এবং রাজাকে এ আংটি প্রাপ্তির কাহিনি বলার জন্য বারবার পিড়া-পিড়ি করতে থাকেন।

শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে রাজা পূর্বকথা বিস্তৃত হয়ে আংটি প্রাপ্তির কাহিনি খুলে বলেন। এ ঘটনা শোনার পর থেকে রাজার বন্ধুটি কৌশলে আংটি হাত করার জন্য মতলব আঁটতে থাকে এবং এক সময় সে সুযোগও এসে যায়। রাজার তন্দ্রা অবস্থায় আংটিটি কৌশলে চুরি করে ফেলে কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আংটিটি বিলের পানিতে পরে যায়। এ অবস্থায়, বন্ধুটি রাজার কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে রাজা উন্মাদ হয়ে যায়। রাজার অপরাপর পাত্র-মিত্ররা বিলের পানি ছাঁকা ছাঁকা করেও আর হারানো আংটি ফিরিয়ে পায়নি। সে ঘটনার পর থেকেই এ বিলটির নাম হয় আংটি চোরার বিল নামে।

ভেলুয়ার দিঘি নামের কিংবদন্তি

মূল এগারসিন্দুরের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রাচীন শঙ্খ নদীর মোহনার পার্শ্ববর্তী গ্রামে শান বাঁধানো ঘাটযুক্ত প্রাচীন দিঘি রয়েছে। দিঘিটি ভেলুয়া রানির দিঘি নামে এলাকায় সমাধিক পরিচিত। এ দিঘিটির সঙ্গে ভেলুয়া রানির নাম যুক্ত করণের পেছনে-পূর্ব বাংলায় প্রচলিত ও জনপ্রিয় ভেলুয়া সুন্দরীর পালার কাহিনিটির অনেকাংশে যোগাযোগ ও মিল রয়েছে।

এক্ষণে ভেলুয়ার কাহিনিতে না গিয়ে শুধু দিঘির নামকরণ অংশের কাহিনিটি তুলে ধরছি–ভেলুয়া জনৈক ভূ-স্বামীর পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যা। হীরাধর নামে জনৈক যুবক তার রূপে মুগ্ধ হয়। এদিকে ভেলুয়া সুন্দরীও হীরাধরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পরে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ভেলুয়ার বাবার কাছে ঘটক পাঠালে রাজা জানিয়ে দেন যে, ছ'মাসের মধ্যে যে যুবক একটি নৌযান ও বাড়ির আঙ্গিনায় জোড়া দিঘি দিতে পারবে তার কাছেই আমার মেয়েকে বিয়ে দেব। এ কথা শুনে হীরাধর অর্থ সংগ্রহের জন্য তখনই বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ও বাণিজ্য থেকে প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করে বহু সংখ্যক লোক লাগিয়ে একটি ময়ুরপঙ্খী নৌকা বানিয়ে নাম দেন ভেলুয়া সুন্দরী ও বাড়ির আঙ্গিনায় পুকুর কেটে শান বাঁধানো ঘাট তৈরি করে পুকুরের নাম দেন ভেলুয়া সুন্দরীর দিঘি এবং ভেলুয়ার পিতা ঘটকের কাছে দেওয়া তার শর্তানুযায়ী মহাউল্লাসে ভেলুয়া সুন্দরীকে হীরাধরের কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের পর ছ'মাস কাটে। এবার ভেলুয়ার অনুরোধে হীরাধর শতশত মাঝিমাল্লাসহ সওদাগরী নৌযান নিয়ে ভীন দেশে

www.pathagar.com

বাণিজ্যে রওনা হন। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

অর্থাৎ সুদূর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নৌযান নিয়ে এগারসিন্দুর বন্দরে আগত জনৈক কাংগোয়া নামক সওদাগর একদিন শঙ্খ নদীর ঘাটে ভেলুয়াকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয় এবং কাংগোয়া সওদাগর একরাতে ভেলুয়াকে অপহরণ করে চাটগায় নিয়ে যায়। এদিকে ছ'মাস পর বাণিজ্য থেকে ফিরে সে ভেলুয়াকে না পেয়ে তার সন্ধানে চাটগার উদ্দেশ্যে সহায় সম্পদ ফেলে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়।

গ. লোকপুরাণ

পুরাণ প্রাচীনকাল সম্বন্ধিত। ভারতীয় সংস্কৃতির মূলাধার পুরাণ। পদ্মপুরাণে আছে 'যাহা প্রাচীনতা কামনা করে তাহাকে পুরাণ বলা হয়।' ভারতবর্ষের লোকপুরাণ কাহিনির অন্যতম উদাহরণ হলো রামায়ণ ও মহাভারত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধার্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে পুরাণের দান অনস্বীকার্য।

বাংলার আঞ্চলিক লোকপুরাণ হিসেবে খ্যাত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য। এ কাব্যে চাঁদ সওদাগর, বেহুলা ও মনসার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। লোকপুরাণে সাধারণত বিশ্বের সৃষ্টি, প্রলয়, বিশিষ্ট রাজা, ঋষি, দেবতা, দৈত্য-দানব ইত্যাদির বংশ বিবরণ এবং তাদের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করা হয়। নিম্নে একটি লোকপুরাণ বর্ণনা করা হলো :

এক দরিদ্র পেটুক ব্রাহ্মণ। খেতেই পায় না। যদি বা সামান্য কিছু জোটে তাতেও একটা ভজঘট লাগবেই।

সেই বামুন ঠাকুর কোন ভাগ্যের জোরে নেমন্ত্রণ পেল রাজবাড়িতে। কিন্তু নোংরা আর ছেঁড়া জামা-কাপড় নিয়ে যে রাজবাড়িতে যাবে তারও হাল দেখে দারোয়ান 'তফাত যাও' বলে তাড়িয়ে দেয়! বামনি কাপড় সেলাই করে ভাল করে ধুয়ে, বালিশের নিচে রেখে ঠিকঠাক করে দিল।

রাজবাড়িতে পৌছে অভ্যর্থনা, আর থরে থরে সাজানো খাবারও মিলল। বামুন গ্রোগ্রাসে গিলছে- অমনি অঘটন। কোত্থেকে এক টিকটিকি এসে পড়ল থালে। বামুন এ্যা-রাম কয়ে ওঠে পড়ল। রাজা বামুনদের খাওয়া দেখতে এলেন। ওই বামুনের কাছে এসে বললেন : কি ঠকুর তৃপ্তির সঙ্গে উদরপূর্তি হয়েছে তো!

বামুন : আপনার দয়ার শেষ নেই। যাদের পাহাড় বানিয়ে দিয়েছিলেন। পরিবেশকরাও যারপরনাই যত্নআক্তি করছিল। আমারই কপাল মন্দ। কোত্থেকে এক টিকটিকি এসে পড়ল খাবার থালায়। খাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেল।

রাজা নিজের লোকদের ওপর হম্বিতম্বি করে বললেন : এই বামুন ঠাকুরকে আজ অতিথিশালায় নিয়ে যাও। আমি কাল স্বহস্তে পরিবেশন করে তাকে খাওয়াব।

পরদিন রাজকীয় আহারের আয়োজন করা হলো। বামুন যাচ্ছে মনের সুখে পরম তৃপ্তিতে। রাজা মাঝে মাঝেই বলছেন! কি আনন্দ! কি আনন্দ! মা তারা সবই তোমার ইচ্ছে।

বামুনের হুশ নেই। একবার এটা খায় তো আবার ওটা। মুখ আর হাত সমানে চলছে। খাওয়া প্রায় অর্ধেকটা হয়ে গেছে তখন বিধাতার দুষ্টুমতি খেলা শুরু হলো। বিধাতা নিজেই একটা সোনা ব্যাং সেজে বামুনের পাতে লাফিয়ে পড়ল বামুন মনের

www.pathagar.com

আনন্দে চর্মচুষ্য লেহপেয় গিলছেই। সেই ব্যাং শুদ্ধ গলধঃকরণ করে ফেলল অমৃত স্বরূপ সেই খাদ্যের শেষ গ্রাস।

খাওয়া-দাওয়া শেষ মহানন্দে বাড়ি ফিরছে বামুন। এক বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় বামুন। আকুতি শোনে : 'সে বামুন আমাকে ছেড়ে দে।' বামুন ঠিক বুঝতে পারেন না কার এ আকুতি।

আবার ওই আকুতি শুনে বলেন : কে হে তুমি? অমন করে মুক্তি চাইছ!

-আমি বিধাতা। ছদ্মবেশে তোর পাতে লাফিয়ে পড়লাম তোর খাবার নষ্ট করতে। তুই ভ্রূক্ষেপই করলি না। কোন একটা 'পদ' মনে করে রাক্ষসের মতো গিলে ফেললি। এখন তোর পেটের ভেতরে বন্দী হয়ে আছি।

বামুন : আমাকে গরিব করে রেখেছ। ভাল-মন্দ খেতে পারি না। আজ আমাকে খাদ্য বঞ্চিত করতে চেয়েছিলে। শয়তান, আজ তোমাকে ছাড়চিনে। পেটের ভেতরে হজম হয়ে যাও।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বিধাতা বলে : আমার দম আটকে যাচ্ছে- আমাকে উগলে ফেল বাছ- জানে বাঁচি। বামুন কোনো আমলই দিচ্ছে না বিধাতার কথায়। বাড়িতে, এসে সে আয়েশ করে তামাক সেবন করতে থাকে। বামনিকে বলে : ওহ! জব্বর খাইয়েছে গো। পোড়া তামাকের বিকট গন্ধ আর ধুয়ায় বিধাতার প্রায় আইতাই করে।

ওদিকে বিধাতার বন্দী দশায় স্বর্গমর্তপাতাল অমল হয়ে পড়েছে। দেবতারা শলাপরামর্শে বসে দেবী লক্ষ্মীকে পাঠালেন। লক্ষ্মীদেবী এসে বামুনকে তোয়াজ করে বললেন : বামুন ঠাকুর, বিধাতাকে তুমি কয়েদ করেছ, ত্রিভুবন যে প্রলয় হয়ে যাবে।

বামুন : 'বামনি, আমার লাঠিখানা দে তো। বেটির কোমর ভেঙ্গে দেই। নচ্ছার বেটি এত দিন আমার ভাগ্যে কিসসু বরাদ্দ করেনি। আজ তার মজা দেখাই, একথা শুনেই লক্ষ্মী হাওয়া।

এরপর এলেন সরস্বতী। একই কথা বললেন : বিধাতা বিহনে বিশ্ব সংসার যে ধ্বংস হতে যাচ্ছে। তার সঙ্গেও একই রকম মোকাবিলা হলো। তিনিও পালিয়ে বাঁচলেন।

এরপর এলেন মহাদেব। বামুন শিব ভক্ত। তার কথা অমান্য করতে পারল না বামুন বামনি। মহাদেব তাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। তখন বামুন মুখ ব্যাদান করে হাঁ করল আর তাতেই বেরিয়ে এলেন সোনা ব্যাং রূপী দেবতা। ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেল পৃথিবী।

ঘ. পুথিপাঠ

মধ্যযুগে মুসলমানরাই এদেশে পুথি সাহিত্যের প্রচলন করেন। হিন্দু দেব-দেবী-রথী-মহারথীদের গুণকীর্তনে তাদের ধর্ম বর্ণনায় যখন এদেশের হিন্দু সাহিত্যিককুল দিশেহারা তখন তারই পাশাপাশি প্রতিবেশী মুসলিম ভাবধারায় তাদের নিজ ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনায় একটি সাহিত্য চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এরি নাম পুথি সাহিত্য। পুথি সাহিত্য শুধু মাত্র ধর্মের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মিশ্র ভাষায় জনগণের মনের ক্ষুধা মিটানোর জন্য পরবর্তী কালে স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বর্ণনামূলক কাহিনি নিয়েও পুথি রচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

পুথি পাঠ ও রচনা সেকেলে বলে বলা হলেও আজও গ্রাম বাংলার পল্লি অঞ্চলে সুর করে পুথি পাঠের আসর প্রাকৃতজনদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত লোককবি সাহিত্যিকগণ এসব সাহিত্যের রচয়িতা। ক্ষীণপ্রায় ধারাটি বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় হলেও একসময় এটি খুবই নন্দিত হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা কিশোরগঞ্জবাসী গর্ব করে বলতে পারি গোটা বাংলাদেশের মধ্যে কিশোরগঞ্জে পুথি সাহিত্যচর্চা ও রচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থান।

কিশোরগঞ্জের মুন্সী আবদুর রহিম প্রায় ৪৬টি পুথি গ্রন্থের লেখক হিসেবে সুপরিচিত পুথিকার ছিলেন। তাঁর 'বিধবা বিরহ বৃত্তান্ত' নামক পুথিটি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মুন্সী আবদুর রহিম এর ৬টি বিখ্যাত পুথি বর্তমানে লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তার গ্রামের বাড়ি গলাচিপা নামক গ্রামে বর্তমান হোসেনপুর উপজেলার অন্তর্গত। কিশোরগঞ্জের আরও একজন পুথিকার ছিলেন মুন্সী আজিমুদ্দিন। তার প্রকাশিত পুথির সংখ্যা প্রায় ৪৫টি। তার অসংখ্য পুথির মধ্যে বেশ কয়টি পুথি লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। ভাষাবিদ হিসেবে তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় পুথি রচনা করেছেন। তার 'আসক নামা' পুথিটি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও কিশোরগঞ্জে মুন্সী শাহ আব্দুল করিম তার পুথির সংখ্যা ৯টি, মুন্সী মুমিন উদ্দিন, শ্রী কালীহর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত পুথিকার ছিলেন। পুথি রচনায় বিদ্যালঙ্কার তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাধি। তিনি 'ঈশান মিশ্র বংশম' নামে একটি সংস্কৃত ভাষায় পুথি রচনা করেছিলেন। এটি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুথিটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তার গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলা শহর সদর যশোদলপুর নামক গ্রামের ভট্টাচার্য পাড়া। পুথিকার মোহাম্মদ মুন্সী, মুন্সী হাফেজ উল্লা ভুইয়া এবং পুথিকার সিদ্দিক আলীর নাম এ জেলার পুথিকারদের মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। পুথি পাঠক হিসেবে যারা প্রখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর হয়বতনগর এলাকার উসুমুদ্দীন, ধলিয়ারচরের লেহামুদ্দিন, কুঁড়েরপাড়ের খুশীর বাপ এদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ জেলার নিকলী উপজেলার বুধু চৌকিদার, কুলিয়ারচর উপজেলার আব্দুল মালেক এর নাম অন্যতম।

পুথি পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে পাঠকগণ 'বন্দনা' গেয়ে থাকেন। বন্দনার পর আসরের সকলকে সালাম জানায়ে পুথিপাঠ শুরু করেন। নিম্নে এরূপ 'বন্দনা'র উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। যেমন :

আর পরথমে আল্লাহর নাম
পরথমে আল্লাহর নাম সার করলাম লওনা বদনে
আর হবে না মানুষ জন্ম এয়ছা আর ভূবনে
পরথমে আল্লাহর নাম।
পরথম- পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা তীর্থস্থান
সেইখানেতে হইছে গো পয়দা কিতাব আর কোরান
পরথমে আল্লাহর নাম।
তারপরে বন্দনা করি পূর্বে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর
পরথমে আল্লাহর নাম।

www.pathagar.com

তারপরে বন্দনা করি দক্ষিণে সায়র
সেইখানেতে করত গো বাণিজ্য চান্দু সওদাগর
পরথমে আল্লাহর নাম।
চাইরদিক বাইন্ধা আমি আসর করলাম স্থির
তারপরে বাইন্দা লইলাম আশি হাজার পির
পরথমে আল্লাহর নাম।
আসর কইরা বইসা আছুইন যত মুসলমান
ছোট বড় সবার কাছে আমাদের সালাম
পরথমে আল্লাহর নাম।

বাংলাদেশে যে কয়টি জেলায় পুথি সাহিত্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর ময়মনসিংহ বর্তমানে ৬টি জেলায় বিভক্ত। এই ৬টি জেলায় সর্বমোট ১৯ জন প্রাচীন পুথিকারের নামের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী প্রাচীন পুথিকারদের সংখ্যা বেশি। পুথিকার মুন্সী আব্দুর রহিম এর 'দেল দেওয়ানা' পুথিকাব্যের কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেমন :

ধ্যায়ান করিয়া কহলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
দম ছাড়িবার কালে মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ।
এহিরূপে কতদিন কহিতে কহিতে
হইবে সে এই জ্ঞান তখন দেলেতে।
আমি নাহি পির নহি জমি ও আসমান
কেবল আছেন পাক সোবহান।
এরূপ খেয়াল হবে যখন দেলেতে
পৌছিবেন গিয়া তবে নূর তজল্লিতে।

এই পুথিটি ছিল ফকিরি বা আধ্যাত্মিক ভাব বর্ণনায় সমৃদ্ধ কাব্য। শরিয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত ইত্যাদির পরিচয় এতে বিদৃত। মুন্সী আব্দুর রহিম রচিত 'গাজী কালু চম্পাবতী' একটি প্রখ্যাত পুথি। এর কিছু অংশ নিচে তুলে ধরা হলো।

বিসমিল্লাহ বলিয়া গাজী এক ফুঁক দিল
যত বাঘ ছিল সব ভেড়া হইয়া গেল।
কালু ভাই বলে গাজী গো মোচর দিল
চাম্পার অঙ্গেতে হাত অমনি পড়িল।
গনিয়া দেখিল চাম্পা লিখেছে বিধাতা
গাজীর সঙ্গেতে চাম্পা এক সূতে গাঁথা।
হইবে সাহেব গাজী প্রাণেশ তাহার
গাজী বিলে সংসারেতে পাতি নাই আর।
চম্পাবলে যৌবন অমূল্য ধন সপিনু তোমারে
যাহা ইচ্ছা হয় নাথ কর তুমি মোরে।

www.pathagar.com

গাজী বলে যতদিন না হইবে বিবাহ বন্ধন
ততদিন তব সাথে না হবে মিলন।

পুথিকার মুন্সী আবদুর রহিম তার 'গাজী কালু চম্পাবতী' পুথির চৌরাশি পৃষ্ঠায় তার আত্ম পরিচয় দিয়েছেন এভাবে। যেমন :

আবদুর রহিম আমি হীনের বচন
পরিচয় শুন মোর কোথায় ভবন।
ময়মনসিংহ জিলা বিচে গলাচিপা গ্রামে
আশুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে।
বাটির দক্ষিণে নদী সুন্দনা নামেতে
মহকুমা হয় কিশোরগঞ্জের অধীনেতে।
জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তপাতি
আছি দীনহীন আমি করিয়া বসতি।

পুথিকার মুন্সী সিদ্দিক আলীর পুথি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে প্রকাশিত হয়। তার পিতামহ ছিলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার চরপলাশ গ্রাম বর্তমানে কিশোরগঞ্জে অবস্থিত। পাকুন্দিয়া উপজেলার চরপলাশ সেখানে তিনি জঙ্গলকেটে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। পুথিকার আজিমুদ্দিন তার পুথি কাব্যে নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে–

জেলা ময়মনসিংহ আছে দেশ বাঙ্গালায়
হাজরাদী পরগনা চর দেহুন্দায়।
জঙ্গলবাড়ি হইতে মোড়া পুরুবে সে গ্রাম
কদিমি বসতি ছিল গোজাদিয়া গ্রাম।
হীন আজিমুদ্দি বান্দা অতি গোনাগার
সত্তরের পরে পাঁচ বয়স যাহার।

পুথিকার মুন্সী আজিমুদ্দিন রচিত 'দুখের সাগর' নামক পুথিতে তিনি সমাজের সকল দুঃখীদের নিয়ে লিখেছেন এভাবে-

প্রজার বড়ই দুঃখ রাজা অবিচারী
বেপারে পড়িলে টুটা দুঃখিত বেপারী।
বাদশার বড়ই দুঃখ হইলে জাঞ্জাল
পণ্ডিত দুঃখিত পুত্র হইলে বাঙ্গাল।
পরবাসে বড় দুঃখ হাঁড়ি টুটে যার
তা হৈতে দুঃখিত যার দুই পরিবার।
কেতাব লিখিয়া যারা নগরে ছাপাইতে
তা হৈতে দুঃখিত আর নাহি পৃথিবীতে।

পুথিকার মুন্সী মমিনদ্দীন এর বাড়ি ছিল গ্রাম দাকুনিয়া থানা হোসেনপুর জেলা কিশোরগঞ্জ। পুথিকার মোহাম্মদ মুন্সীর বাড়ি ছিল গোজাদিয়া থানা করিমগঞ্জ জেলা কিশোরগঞ্জ। পুথিকার মুন্সী হাফেজ উল্লা ভূঁইয়ার বাড়ি ছিল গ্রামের নাম বেলদী থানা পাকুন্দিয়া জেলা কিশোরগঞ্জ।

www.pathagar.com

ঙ. ভাট কবিতা

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার চিকনীরচর গ্রামের নিরক্ষর লোককবি লাল মাহ্‌মুদের একটি ভাট কবিতার অংশ বিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো :

প্রথমে আল্লাহ্ নবি মনে ভাবী লেখা করি শুরু
মাতা-পিতার চরণবন্দি দয়া কর গুরু।
আমি গুনাহ্‌গার (২) পরোয়ার ডাকি বারেবার
নিদানকালে নিও আমায় করিয়া উদ্ধার।
ডাকে লাল মামুদ (২) এই সভাতে করুন ও কাহিনি
এসব কথা বলতে আমার চোখে আসে পানি।
জেলা কিশোরগঞ্জ (২) সদর থানা বড়ইতলা গ্রাম
সাড়ে তিনশ' মানুষ মারছিল এহিয়া গোলাম।
দারুন আশ্বিন মাসে (২) বিশ তারিখে
বুধবাইর‍্যা দিন, বরইতলায় ঘটাইলো কারবালার ও চিন্।
দ্যাশের রাজাকারে (২) বুধবারে হামলা দিল ভাই
নাশতা খাওয়ার সময় দে না করি কী উপায়।
সাথে আলবদরে (২) অস্ত্র ধরে ভয় দেখাইয়্যা
সাড়ে তিনশ' মানুষ মারলো বন্দুক দিয়া গুঁতাইয়্যা।
নিয়া বরইতলা (২) করল দলা কাতারে বসাইয়্যা
মেশিন গানের গুলি ছাড়ে পশুর মতন হইয়্যা।
লাগলো দৌড়া দৌড়ি (২) হুড়াহুড়ি পলাইয়া যায়
দ্যাশের ভাই রাজাকারে সামনে দিয়া আটকায়।
দে-না পালাইতে (২) বন্দুক হাতে বেনেট দিয়া পাড় মারে
বেয়নেটের পাড় খাইয়া মানুষ নামে ক্ষেতের পড়ে।
ক্ষেতে আঁটু পানি (২) রক্তে জানি হইয়া গেল লাল
কলা গাছের মতন মানুষ পড়ে ছিল টালে টাল।
যেমুন জৈষ্ঠ মাসে (২) ঝড়-বাতাসে কলাগাছ ফালায়
লাশের উপরে পইড়্যা কানতো জনম দুখী মায়।
যত স্বামী হারা (২) ছেলে হারা কেউ হারাইলো ভাই
তাদের মতন জনম দুঃখী দুনিয়াতে নাই।
দ্যাশের কিছু মানুষ (২) হইল বেহুঁশ রাজাকারে যাইয়া
কয়দিন পড়ে লুন্দি অইছিন মুরগী-খাসী খাইয়া।
কত আৎকা মুন্সী (২) ফটকা মুন্সী কইর‍্যা মুন্সীর পোলা
পরের গাছের লাউ খাইয়া ঠ্যাঙ্গের গুছা ফুলা।
মুন্সী চেরাগ আলী (২) খাইত খালি খতমের দাওয়াত
পশ্চিমার সাথে গিয়া মিলাইত হাত।
মুন্সী বরকত আলী (২) নব্বই তালি জুব্বা দিত গায়

ইমামতী ছাইড়্যা শেষে আল বদরে যায়।
শোনায় মিষ্টি কথা (২) যথাতথা ইসলামেরও বাণী
আস্তে আস্তে কাপড় তুলে ভিতরে শয়তানি।
যারা আল্লা ভক্ত (২) ঈমান শক্ত দলাদলি নাই
ঐ সমস্ত আলেমগণরে ধন্যবাদ জানাই।
হায়রে রাজাকারে (২) লুটপাট করে খাসী গরু খায়
মুরগা-মুরগি খাইয়ালাইছিন পশ্চিমা উন্দায়।
আইলো মুক্তিযোদ্ধা (২) অস্ত্রশুদ্ধা গেরিলা বাহিনী
এ সব দেখে রাজাকারের মুখে নাই পানি।
তখন পাঞ্জাবিয়া (২) দিশাহারা হইয়া গেল ভাই
রাজাকাররে থুইয়া তারা ঢাকার শহর যায়।
তখন রাজাকারে (২) চিন্তা করে কিশোরগঞ্জে বইয়া
পশ্চিম দ্যাশের বাবাজিরা গ্যাছে গান্দি থুইয়া
এখন কি করিব (২) কোথায় যাব যাবার রাস্তা নাই
মুক্তিযোদ্ধার পায়ে ধইর‌্যা জীবন ভিক্ষা চায়।
ও বেইমানের দল (২) চোখের জল পড়ে বাইয়া বাইয়া
কত মানুষ ভাইস্যা গেছিন স্বাধীনের লাগিয়া।
হায়রে রেজার বংশ (২) হইল ধ্বংস মইর‌্যা হইল শ্যাষ
মুক্তিযোদ্ধা আইস্যা পড়ে স্বাধীন করল দ্যাশ।
এখন এই পর্যন্ত (২) আদি অন্ত ক্ষমা দিলাম ভাই
মুক্তিযোদ্ধার চরণেতে সালামও জানাই।

কুলিয়ারচর উপজেলার বাগপাড়া গ্রামের লোককবি মো. আবদুল মালেক রচিত স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার নিয়ে লেখা আরও একটি ভাট কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো :

প্রাণে মনে লাগে
কইতে বড় বেথা
একটু খানি রইয়া হুনুইন
দেশ বিদেশের কথা।
যে দেশে থাকি আমি
সে দেশের কথা কই
অচিন দেশের নাম
কেমনে আমি লই।
ভৈরব বাজার করল উজার
সর্বলোকের জানা
মানিক খালি, চানপুরে
কিচছুতা রাখছে না।

www.pathagar.com

যশোদল, কিশোরগঞ্জ আর হোসেনপুর
পাঞ্জাবিরা হাইট্টা কেমনে
আইলো এত দূর।
চৈতারভিটা, পাট্টা করিয়া ভরমনা
তারপরে দুষ্টের দল গেল পাকুন্দিয়া থানা।
পাকুন্দিয়া থানায় গিয়া তারা
কোন কাম করিল
মেন্দি দালালরে তারা
সংগ্রহ করিল।
পাড়ায় পাড়ায় অত্যাচার
করে তারা গিয়া
তারপর দালালেরা হিন্দু নারীপুরুষ
আনে তারা ধরিয়া।
তারপরে পাক বাহিনী
কোন কাম করিল
ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরারে
রাজাকার বানাইল।
রাজাকার বানায়া তারা
কোন কাম করে
পাড়ায় পাড়ায় গিয়া তারা
অত্যাচার করে।
এইসব দেখিয়া মানুষ
করে হায়রে হায়
কি সব আইলো দেশে
পালাইবার জায়গা নাই।
কুলে মাইয়া-ছেলে লইয়া মানুষ
রাস্তায় লইছে আড়া ...
ছাগল বখড়ি গরু বাছুর
তারাও হইল বলির পাড়া।
হায়রে এ দেশ পাকবাহিনী
করল ছারখার
কী সুন্দর নাম দিয়াছে
তুই রাজাকার।
রাজাকার-রাজাকার
কোথায় তোরা আজ
আল্লাহ তায়ালা তোদেরকে কী

www.pathagar.com

দেয়নি শরম লাজ।
স্বাধীনতার ইতিহাস
কত দুঃখের ভাই
এমন ইতিহাস
পৃথিবীতে নাই।

মো. আব্দুল মালেক রচিত গাছের মূল্য সম্পর্কিত ভাট কবিতার কিছু অংশ এখানে বিবৃত হলো :

শুনলে হইবেন চমৎকার
বলি গাছের কী বাহার
আম-কাঠাল কয় লাগাও চারা
ভালো কইরা দিয়া বেড়া
দশ বছর পরে ভাই
ফল পাইবাইন চমৎকার।
শিমুলে কয় লাল ফুল
আমি হইলাম জগতের মূল
আমার তুলা দিয়া হয়
লেপতোশক আর গালিচা
শুনলে হইবেন চমৎকার।
বেলগাছ উঠিয়া কয়
আমার নামটি মহাশয়
আমার পাতা পূজা দিয়া
করে কত নমস্কার
হুনলে হইবেন চমৎকার।
আবার নারকেলে উঠিয়া কয়
আমার শক্তি কম নয়
কচি ডাবের পানি খাইলে
পেশাব অইবো পরিষ্কার
শুনলে হইবেন চমৎকার।
হরফিয়ে কয় গেরা কলা
তোমার থেকে আমি ভালা
আমারে খায় কত
এসড্ড আর বেরিস্টার
শুনলে হইবেন চমৎকার।
পানে কয় সুপারির সাথে
আমরা আছি সবার সাথে
আমাদের হয় দরকার

www.pathagar.com

বিয়ে সাদি দয় দরবার
শুনলে হইবেন চমৎকার।
নিসিন্দা আর ভিগো কয়
আমাদেরকে সিমানায় রয়
আমাদেরকে বানায় যেমন
এই সিমানার চৌকিদার
শুনলে হইবেন চমৎকার।
বটগাছ কয় সান্দার বেডা
তরে আবার ডরায় কেডা
তর গায়ে কাঁটা দেখলে
কত ভয় লাগে আমার
শুনলে হইবেন চমৎকার।
বদ্ধিরাজ আর কৃষ্ণচূড়া
শেউড়া হয় শরতানের গুড়া
শ্মশানে দেইকগা পুড়া
হইয়া থাকগা ছারখার
আরতো রয়েছে বাকী
হরতকি আর আমলকি
লজ্জাবতির ঔষধ ভালা
করলে দেখছি ব্যবহার
জামে কয় আমি কালা
আমারে খাইলে পরে
রক্ত হইবো পরিষ্কার।
রঙ্গি আর গজারি বলে
আমরা থাকি চিরকালে
আমাদেরকে নিয়া বানায়
কত লঞ্চ নৌকা ইস্টিমার।
ছুত্রা বলে এই যন্ত্রণা
আমার কথা কেউ কইলো না
আমারে ছুয়া দেখলে
আমার যে কত পাওয়ার।
মেন্দি বলে আমি মিন্দি
তরা সব আমার বান্দি
আমাকে নিয়া দেয়
নতুন বউয়ের উপহার
শুনলে হইবেন চমৎকার।

www.pathagar.com

চ. লোকছড়া

ছড়া বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন একটি শাখা। কবে কখন কোথায় এর উদ্ভব তার কাল নির্ণয় করে কথা বলা খুবই দুরূহ। কিশোরগঞ্জের প্রাচীন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লোকছড়ার উপস্থিতি এবং তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এসব লোকছড়ায় এ অঞ্চলের উজান-ভাটি-হাওর জনপদের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা, আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, আচার- সংস্কার, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এসব লোকছড়া এক অঞ্চলের হলেও কালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে কিংবা তা মানবিক আবেদনে সার্বজনীন। আমরা জানি প্রাচীন ঋগ্‌বেদে ও ঘুমপাড়ানির ছড়ার কথা উল্লেখ আছে। আমাদের কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় নিত্যে ব্যবহার্য সকল বস্তু এবং চিত্র লোকছড়ায় ফুটে উঠেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে নিচের লোকছড়াটি কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত।

(১)

জমিতে যার পড়ে না পা
তারে জমিদার কয়
সন্তান সম পালে যার জমি
তারা জমিদার নয়।
জমিদারের মাডি
সেলাম কইরা আডি
যদি মাটি লড়ে
কিল খাইয়া মরে।
খাজনা খাজনা করিছ না
খাজনার নাই কড়ি
খাজনার দায়ে মাগী পোলা
গলায় দিবাম দড়ি।
দরাদরি মারামারি
হুদাই ঘুরাঘুরি
খাজনার দায়ে বিক্রি করি
আপন উদরের ছেরি।

(২)

আল্লা দিছে পাল্লা ধারী
খদায় দিছে জমিদারি
কড়ি দিয়া লড়ি ছড়ি
কুনু ব্যাডার ধারণা ধারি।
শান্তিলতাবাঁশের পাতা
বাঁশ ঝুম ঝুম করে
শান্তিলতার বিয়া হবে
জমিদারের ঘরে।
চাচা গেল বাজার

www.pathagar.com

বরহি নিল চুরে
শান্তিলতারে তুইল্যা নিল
জমিদারে জুড়ে।

(৩)

সাজনা গাছের বাজনা গো
কেডা দিব খাজনা গো।
খাজনার বড় ঠ্যালা
পাওনা পয়সা ম্যালা।

(৪)

জমিদারের প্যায়দা নারে
জমিদারের ডাহাইত
দিনের বেলা দেহা যায় না
আয়ে গভীর রাইত।
জমিদারের জমি চাষ
খাজনা ট্যাকসো দিয়া
সেই জমি কাইর‍্যা নিলো
মাথাত বাড়ি দিয়া।

(৫)

জমিদারের মাডি, সেলাম কইরা আডি
যদি মাডি লড়ে, ঠেঙ্গা খাইয়া মরে।
জমিদারের লাডি, হাওরের মাডি
ফলায় আমন ধান, বলায় আবাদের মান।
জমিদারের নাম, নায়েবের কাম।
জমিদারির ঠাঁট যার, গালগপ্প সার তার
জমি নাই জিরাত নাই, জমিদারি ভাব।

এ ধরনের ঐতিহাসিক অনেক লোকছড়া লুকিয়ে আছে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে। এরকম লোকছড়া সাধারণত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের মুখে মুখে তৈরি হয়ে থাকে। ছড়াগুলোতে অতীতের জমিদারদের প্রভাব-প্রতাপ ছাড়াও তাদের প্রতি জনসাধারণের কষ্টের কারণে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারই বাস্তব চিত্র।

শিশু বিষয়ক লোকছড়া

নবজাত ভূমিষ্ঠ শিশুর আদর যত্ন আপ্যায়ন ঘুম পাড়ানো গোসল দেওয়া কিংবা শিশুর কান্না থামানোর জন্য গ্রাম বাংলার নারীপুরুষ-ছেলে-মেয়ে-বৃদ্ধরাও নানান কথামালা দিয়ে ছন্দ আকারে মুখে মুখে ছড়া বলে থাকেন। এ ধরনের ছন্দোবদ্ধ বাক্য কে বা কারা অথবা কোন মা-বাবা এসব সৃষ্টি করেছিলেন তা জানা যায় না। শুধু বলা যায় এগুলো

www.pathagar.com

আমাদের অমূল্য সম্পদ। আমাদের পূর্ব পুরুষদের বংশানুক্রমে ঐতিহ্য। নিম্নে শিশু বিষয়ক কিছু লোকছড়া দেওয়া হলো :

(১)
আয় আয় চান
আমার আবুর চোখে
ঘুম দিয়া যাও।

(২)
চানরে চান
তুই আমার জান
তোর কিছু অইলে আমি
অইব খান খান।

(৩)
আয়রে চান লইড়্যা
কলাগাছ ধইর‍্যা
কলা অইছে বাত্তি
মাথায় ধরিছ ছাত্তি।

(৪)
আবু কাইন্দো না
কাইন্দো না রে
বড় মিয়ার বেডা
তোর কান্দনে ঝরে মাতা
ওশুদ দিব কেডা।

(৫)
আবু নারে নারে
ধেনু গাঙ্গের পাড়ে
আবু কইর‍্যা ডাক দিলে
উইর‍্যা আইয়া পড়ে।

(৬)
আবুর শরীর নরম
জ্বর উঠছে গরম
একটু কুলঅ লও গো
হেই ঘরের বউ গো।

(৭)
ঘুমঘুম ঘুমঘুম
ঘুমওয়ালীর ছাও

www.pathagar.com

ঘুমের লাগি দিতাছি গো
পাংখা দিয়া বাও।

(৮)
ঘুম পাড়ানি নানা-নানি
আমরার বাড়িত আইয়ো
খাট দিবাম পালং দিবাম
বিছানা পাইত্যা বইয়ো।

(৯)
নিন্দা বলিরে–
আমরার বাড়িত আইয়ো
খাট নাই পিঁড়ি নাই
মাদুর পাইত্যা বইয়ো
আবুর চোক্ষ ঘুম নাই
ঘুম দিয়া যাইও।

(১০)
অলি ললিরে
কলা বাদুরের ছাও
পাইল্যা লাইল্যা সেয়ান করছি
দুধ ভাত খাও।

(১১)
আবু কাইন্দো নারে
বিয়া করাইবাম
আসমানের তারা দিয়া
বউ সাজাইবাম।

(১২)
বিলাতি মায়া গো
বাবুল কেরে কান্দে
আমরার বাবুল বাড়ি করব
আসমানের ঐ চান্দে।

(১৩)
মায়া গো মায়া
পুতে কেরে কান্দে
দুধ ভাত খাইত
কোলে উঠ্যা বইত।
মায়া গো মায়া

www.pathagar.com

পুতে কেরে কান্দে
বাইরে বাইরে যাইতো
গোল্লাছুট খেলতো।

(১৪)
উমালিরে উমালি
মেরালির ছাও
আমরার আবু ঘুমাইছে
একটু নাম্যা যাও।

(১৫)
আয় আয় চান
আবুর কপালে
টিপ দিয়া যা

(১৬)
আয় আয় চাঁদ মামা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

(১৭)
খোকন খোকন ডাক পাড়ি
খোকন গেছে কার বাড়ি
খোকনের ভাত কাকে খায়
খোকনরে তুই ঘরে আয়।

(১৮)
ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো,
খাজনার উপায় কী ?
আর কটা দিন সবুর কর
রসুন-বুনেছি।

(১৯)
খুম পাড়ানি মাসি পিসি
আমরার বাড়ি আইয়ো
খাট নাই পালঙ নাই
খুকুর চোখে বইয়ো

www.pathagar.com

বাটা ভরা পান দিবো
গাল ভইর‍্যা খাইয়ো
খিড়কি দুয়ার খুইল্যা দিবো
ফুড়ৎ কইর‍্যা যাইয়ো।

(২০)
শুকুন রাজা গির্দুনী
একটু দাওয়াই দিবানী
দেম দেম বেলে
আবুদুবু ঘুমাইলে।

(২১)
আয় চান, চান লড়িয়া
আমার চান্দের কপালে চান
টুককু দিয়া যা।

(২২)
হাইট্রা যাইতে জাঙ্গাল দিয়াম
পানি খাইতে দিঘি দিয়াম
হাল বাইতে বলদ দিয়াম
দুদ খাইতে গাই দিয়াম
সোনার মালা গলাত দিয়াম
রাজার বেড়ি আইন্যা দিয়াম
আমার চান্দের কপালে চান
টুককু দিয়া যা।

(২৩)
ঐ চাঁদে বাস করে
প্রিয় চাঁদ বুড়ি
তারাগুলো চারপাশে
দেয় হামাগুড়ি।
খোকার সাথে চাঁদ মামা
খিলখিল হাসে
সারি বেঁধে মেঘগুলো
নীলাকাশে ভাসে।
খোকা হাসে খুকি হাসে
মিটি মিটি তারা
পূর্ণিমার চাঁদ তাই
হয় মাতোয়ারা।

www.pathagar.com

(২৪)
হাবুত হুবুত গোসল করে
আমার যাদু মনি
হাত নাড়াইয়া পা নাড়াইয়া
কতই টানাটানি।

(২৫)
আমার আবু গোসল করে
হাস্‌সিয়া হাস্‌সিয়া
আমার আবু গোসল করে
ভাস্‌সিয়া ভাস্‌সিয়া।

(২৬)
আমার আবু ঘুমায় রে
কাল বাদুরের ছাও
বাদুর গেছে মধু খাইত
বইয়া নিদ্রা যাও।

(২৭)
আয় ঘুম আয় ঘুম
আবুর আরাম লইয়্যা
ঘুমের বাড়ি লইয়া যাও
মনির চোখে বইয়া।

(২৮)
আমার আবু লাল টুকটুক
দুদ খায় ঢুক্ ঢুক
এইত আবু খাইল দুদ
আচ্ছা বেডা বাপের পুত।

(২৯)
আমার আবু হাঁটেরে
টাপুর টুপুর পায়
এই উড়ে এই পড়ে
দুঃখু নাহি পায়।

(৩০)
বাবু আইব বেড়াইয়া
দুদ দিয়াম জুড়াইয়া
ঘাইম্যা আইব দৌড়াইয়া
ভাত দিয়াম বাড়াইয়া।

www.pathagar.com

(৩১)
একটু খানি ছেলে
আত্তি মারবে বাগ মারবে
সামনে ধইর‍্যা দিলে।

ঘুড়িমেলা বিষয়ক লোকছড়া

(১)
নিকলী গ্রামের ঢাগস ঘুড়ি
নজর কেবল কাড়ে
যত দেখি স্বাদ মেটেনা
দেখার ইচ্ছে বাড়ে।

(২)
ঘুড়িরে ঘুড়ি
চিল হয়ে উড়ি
ঘুড়িরে ঘুড়ি
সাপ হয়ে উড়ি
ঘুড়িরে ঘুড়ি
মাছ হয়ে উড়ি
ঘুরিরে ঘুড়ি
জাহাজ হয়ে উড়ি
ঘুড়িরে ঘুড়ি
প্রজাপতি হয়ে উড়ি
ঘুড়িরে ঘুড়ি
ঘুড়িরে ঘুড়ি
ফিংগে হয়ে উড়ি
ঘুরিরে ঘুড়ি
ঢোল হয়ে উড়ি
ঘুরিরে ঘুড়ি
মানুষ হয়ে উড়ি।

(৩)
উড়ালাম ঘুড়ি লাগলো প্যাচ
মাজনা সুতায় কাটালো ঘ্যাচ
কাটলো সুতা কাটালো ঘুড়ি
লাগলো দেখ দৌড়াদৌড়ি।

www.pathagar.com

(৪)

পাখির মতো নীল আকাশে
হরেক রকম ঘুড়ি
ইচ্ছে করে ঘুড়ির মতো
আকাশেতে উড়ি।

(৫)

বাজিপুরের বাক্স ঘুড়ি
উড়ছে ঘুড়ি উড়ছে
ফুড়ৎ ফুড়ৎ শব্দ করে
মনের সুখে ঘুরছে।

লোকমেলা বিষয়ক লোকছড়া

(১)

মায়া গো মায়া কর কী?
বান্নির পয়সা দিবানি।
সাইট ধারের বান্নিত থাইতাম
তোমার লাগি কিতা আনতাম।
চাচীর লাগি কাচি আনতাম
দাদার লাগি বডি দা।
তোমার লাগি কিতা আনতাম
বইল্ল্যা দেও মা।

(২)

মেলা থাইক্যা আনছে বাটি
হাঁড়ি পাতিল পোড়া মাটি
কোন কুমারে গড়ছে ঘটি
আনা দুধে বইছে দই।
কুমার হাসে কুটি কুটি
কিনছে কত দা-বটি
বাপ-দাদার হাতের ঘটি
দই ভালো তো কেমনে কই।

(৩)

বান্নি মেলা বান্নি মেলা
বিন্নি সারি সারি
কদমা কত কিনে নিব
যাব গ্রামের বাড়ি।
বাড়ি গিয়া মা-বোনেরে

www.pathagar.com

কিনে দিব পিঠা
মিস্ত্রি মলাই গুড় বাতাসা
মণ্ডা বড় মিঠা।

(৪)

ও বুড়ি সুতা কাট
কাইল অইব মেলার হাট
মেলার হাটে যাব না
চরকি মরকি কিনব না।
চরকা আমার ঘুরে
নাতিন জামাই ঘরে
মেলায় চলে বুড়ি
বেড়ায় ঘুড়ি ঘুড়ি।

প্রবাদ প্রবচন বিষয়ক লোকছড়া

প্রবাদের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। মঙ্গল কাব্যসমূহে প্রবাদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে পৃথিবীর প্রথম প্রবাদ সংগ্রাহক বলা হয়। আমাদের দেশে ডাকের কথা, খনার বচন ইত্যাদি নামে প্রবাদ প্রবচনের কথা জানা যায়। রামায়ণ-মহাভারতে এমনকি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও প্রবাদের ব্যবহার রয়েছে। বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের ইতিহাস বাঙালিদের দিয়ে শুরু হয়নি। একজন বিদেশি রেভা রেন্ড উইলিয়াম মরটন (১৮৩২খ্রি.) প্রথম ৮০৩টি প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত প্রবাদ বিষয়ক কিছু লোকছড়া এখানে বিধৃত হলো।

(১)

এমুন কথা কইও
কেউ না কয় ঝুট্
এমুন জা'গাত বইয়ো
কেউ না কয় উঠ্।

(২)

দো-দেল বান্দা
কলেমা চোর
না পায় বেহেশ্ত
না পায় গোর।

(৩)

এক বাপের এক পুত
খাইয়া করে লুত লুত
এক বাপের এক ঝি
কনি বাইয়া পড়ে ঘি।

www.pathagar.com

(৪)

পরের পুতে মারে মাছ
চোখ পাহাইয়া চায়
নিজের পুতে মারে মাছ
ইচ্ছা মতন খায়।

(৫)

দাদা ডাকছে চুদির ভাই
আনন্দের আর সীমা নাই
দারোগা ডাকছে চাচী
আমি কি আর আছি।

(৬)

যার লাগি করলাম চুরি
হেয় ডাহে চোরা
কামলা দিয়া মায়না পাই না
নসিব আমার বুড়া।

(৭)

বাজিতপুইর‍্যা ভাই
উচিত কথা কইয়্যা যাই
পথে পাইলে টানাটানি
বাড়িত গেলে নাই।

(৮)

চৈত মাইয়া আহালে
ভুইত্যা আলু কপালে
কই গেলারে পুলাপান
বদনা ভইর‍্যা পানি আন।

(৯)

অসি পাতা যশি যশি
নারকেল পাতার তরকারি
ছুডুলোক বড় অইলে
জুতারে কয় আলমারি।

(১০)

ভিক্ষা কইর‍্যা জীবন বাঁচে
আত পাতিনা কেউর কাছে
জামাই থইয়া ধরছি হাঁই
আমার মতন সতি নাই।

www.pathagar.com

(১১)

দিনে ডাহে রাইতে ডাহে
কাঞ্জির জাউ খাইয়া
হউরি-বউয়ে কাইজজা করে
ভাঙ্গা কুলা লইয়া।

(১২)

কইরা লও গো পুতের বৌ
দিনে তরে দিছে
এমুন দিন আছিন আমার
খদায় কাইড়্যা নিছে।

(১৩)

ডহি ভইরা রান্ধি আমি
ডহি ভরা ভাত
খাওনের বালা খাই আমি
ডহি পুছা ভাত
বাজানরে কইও গিয়া
ভালা সুহে আছি
আউল্যা ফলার বাড়ি খাইয়্যা
ঘর দিঘালে নাচি।

ধাঁধা বিষয়ক লোকছড়া

লোকছড়ায় আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত বেশ কিছু ধাঁধার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে শব্দ চয়ন স্বর সুরে একটি স্থায়ী ছন্দে ছড়ায় রূপ লাভ করেছে। সাধারণত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধা-মননে একজন অন্যজনকে মগজ ধোলাই করে ছড়ার মাধ্যমে ধাঁধাকেও প্রশ্নের উত্তরে আগ্রহের সৃষ্টি করে। ছড়া শুধু শিশুদের মন ভুলানো আনন্দের জন্য নয়।

কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে ছড়ার মাধ্যমে পরস্পরের বুদ্ধি ঝালাই এবং বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার প্রতিযোগিতাও নেওয়া হয়। এতে খুব সহজ বিষয়কে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে এমন কূট প্রশ্নে ছড়া বলা হয়ে থাকে প্রতিপক্ষ যেন ধাঁধায় পড়ে যায়। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত ছড়াধর্মী কতিপয় ধাঁধা মিশ্রিত লোকছড়া বিধৃত হলো।

(১)

উন্দা রইছে ধুন্দা অইয়া
বৈরাগী রইছে চাইয়া
গাছের গুডা গাছ অ রইছে
কষ পড়ে তার বাইয়া।
(উত্তর: কলারথোর)

www.pathagar.com

(২)
হাসতে হাসতে যায় নারী
পর পুরুষের পাশে
ঢুকবার কালে কান্নাকাটি
ভিতরে গেলে হাসে।
(উত্তরঃ চুরি পড়ার দৃশ্য)

(৩)
ঠেলার পরে ঠেলা
পাছায় দুই ডলা
তারপরে বুবুজান
জড়ায়ে ধরে গলা।
(উত্তরঃ কলসিতে পানি ভরার দৃশ্য)

(৪)
লম্বা সাদা দেহ তার
মাথায় টিকি রয়
টিকিতে আগুন দিলে
দেহ পুড়ে হয় ক্ষয়।
(উত্তরঃ জ্বলন্ত মোমবাতি)

(৫)
আজব এক জিনিসরে ভাই
দেইখ্যা আইলাম হাঠে
আষ্ট পাও দুই হাঁটু
লেজ আছে তার পিঠে।
(উত্তরঃ দাড়িপাল্লার দৃশ্য)

(৬)
তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর ছাইরা দিলে
আকাশেতে উড়ে।
(উত্তরঃ চিতল/চিলপাখি)

(৭)
চার পায়ে বসি
আট পায়ে চলি
বাঘও না, কুমীরও না
আস্তা মানুষ গিলি।
(উত্তরঃ পালকি বেহারা)

www.pathagar.com

(৮)
ছুড়ুমুড়ু জিনিসটা
হাতে হাতে যায়
বড় বড় গাছের লগে
যুদ্ধ করত চায়।
(উত্তরঃ কুঠার)

(৯)
ছুডু বেলায় ঘুমটা দিয়া
যায় শ্বশুর বাড়ি
যৌবন কালে ল্যাংডা থাহে
পরে না সে শাড়ি।
(উত্তরঃ বাঁশ জন্মানোর দৃশ্য)

(১০)
মাথায় মুকুট গোল গাল
পেটের ভিতর হাত-পা
চলে কিন্তু নড়ে না
এইডা কি-তা-বল না।
(উত্তরঃ শামুক)

(১১)
বৃষ্টি অইলে গোসল করে
শরীর ভিজে না মাথার প'রে
একশো কলসি পানি দাও
তবু শুকনা তার গাও।
(উত্তরঃ কচুপাতা)

(১২)
ছুড়ুমুড়ু জিনিসটা
পানি-এ ভূর ভূর করে
রাজা আইয়ে বাদশা আইয়ে
তুইল্যা সেলাম করে।
(উত্তরঃ হুঁকো)

নারীসমাজ বিষয়ক লোকছড়া

(১)
চুল নাই বেডির
চুলের লাগি কান্দে
কচু পাতার ডিফা দিয়া
লম্বা খোঁপা বান্দে।

www.pathagar.com

(২)

ঘরে মরছে পুতের বউ
বাইরে মরছে ঝি জামাই
পরে পরেই গ্যাছে গা
এই বারের বালাই।

(৩)

আমি করি ঝি-ঝি
ঝিয়ে করে হাঁই হাঁই
খাইয়া দাইয়া কামাই
ঝি-বাঁচলে জামাই।

(৪)

মাছ খাইলে ইলিশ
লাং ধরলে পুলিশ
বাইল দিয়া লাঙ্গে
নিয়া কমড় ভাঙ্গে।

(৫)

এলহা ঘরে এলহা গিত্তাইন
খাইতে বড় সুখ
মরবার সময় ধরুইয়া নাই
এইডাই বড় দুখ।

(৬)

আদরের লইল্যা
বিয়া দিয়াম বোয়াইল্যা
আমিও বুইড়্যা অইছি
হাঙ্গারও চল অইছে।

(৭)

লাঙ্গের আশায়/হাঁই আরাইলাম
হুনতে আচম্বিত/লইয়া যায়গা কাচারিত।

(৮)

আশা করছে ভগবতি
পুতের ঘরে অইব নাতি
নাই তার জ্ঞাতিগুতি
অইয়া পরছে ঠ্যাংগা মতি।

www.pathagar.com

(৯)
ঘর জামাই ঘুর ঘুর করে
ঘরে নাইগা চাল
আদুরি না কান্দে গো
ফুলাইয়া ফুলাইয়া গাল।

(১০)
আশি টেহার খাসি দিলাম
নব্বই টেহার ভঁইষ
তেও জামাই খায় না
ক্ষেত দিতে কইছ।

(১১)
পান খাইছি চেপ ফালাইছি
মুখ করছি লাল
জামাই আমার আইন্যা দিছে
লাল কমলার ছাল।

(১২)
জামাই বাবু কমলা লেবু
একলা খাইও না
বুবাই আমার চেংড়া মানুষ
কিছুই বুঝে না।

(১৩)
বুইর‍্যা জামাই পুইড়্যা খাইল
লবণ মাখাইয়্যা
জোয়ান জামাই ঘরে আনলাম
তেল মাখাইয়্যা।

(১৪)
দেখ তো জামাই আনছে কী
এক পোয়া জিলাপি
এরে দে, তারে দে
ঘর দিখালে বিলায়ে দে।

(১৫)
সাদা কচু কাল কচু
কচু তিন জাত
কচুর শাক তুলতে গিয়া
হউরি করে রাগ।

www.pathagar.com

পোড়া কাল কচু শাক
তাতে নাই জিরে
বউ-শাশুড়ি ঝগড়া করে
বাড়ি বাজিতপুরে।

(১৬)

এক মার এক পুত
আনন্দের নাই সীমা
দিন রাইত কয় বেডি
পুতের গরীমা।
আল্লাদে আল্লাদে বেডি
পুতেরে করাইল বিয়া
দুই দিন বাদে পুত
গেল আলগা অইয়া।
বউয়ের রান্ধা যেমন তেমন
ভইনের রান্ধা ছাই
মা জননী রানলে আমি
কেমুন কইরা খাই।

(১৭)

বউ আমার যমের দূত
পানি মিশায়ে দেয় দুধ
কি কইতে কি কই।
মনে পড়েনা ধুত্তুরি
পুতের বউ ভাত দেনা
এই দুঃখে মরি।

(১৮)

সতিন সতিন গাঁথি মালা
সতিন হইলে বড় জ্বালা।
সতিন গেছে শাক তুলতে
সাপে দিছে পা।
সত্য পিরের সাপ অইলে
সতিন ধইর‍্যা খা।

(১৯)

বউ ক্যারে কান্দে
বড় ডেগে রান্ধে।
নয়া ভাতের গন্ধে
ডাইল ছালুন রান্ধে।

www.pathagar.com

পাতে দিলে খিদে যায়
মুখে দিলে বমি আয়।

(২০)

নেও গো তারে রইয়া সইয়া
নয়া বউরে দেও বুঝাইয়া।
চোখের জলে বুক ভাইসা যায়
মনের দুখে রাত কাইট্যা যায়
আনবার বেলা কয় পা'য়ে ধরি
অহন কয় যাওগ্যা বাপের বাড়ি।

(২১)

মন দিছি যারে
প্রাণ দিছি তারে
বারে বারে চালি পরেও
মন দেব না কারে।
সব শত্রুর মুখে ছাই
মনের মত স্বামী পাই
স্বামীর আগে মরন কয়
আমার যেন তাই অয়।
এই কথাডা জানি তায়
ঠাকুর দেবতার চরণ পায়।

বউ–শাশুড়ি বিষয়ক লোকছড়া

(১)

বড় ছেলের বউগো তুমি
নামটি তোমার হীরা
একশ্ টেহার নতুন শাড়ি
কেমনে গেল চিরা?
কেচা বাঁশের বেড়া ছিল
ঘন ঘন গিরা
হউর দেইখ্যা ঘোমটা দিতে
আঁচল গেছে চিরা।
হউরি মারলো টুকনা
জামাই মারলো বারি
ছিঁড়লো কেমনে হারামজাদী ?
একশ টেহার শাড়ি।

www.pathagar.com

(২)

রাগ কইরনা বউ গো
আমি তোমার মা
তুমিও যদি তাড়াও তবে
দাঁড়াই কোন গাঁ।
দুয়ারে দুয়ারে যায় শাশুড়ি
পাড়ায় পাড়ায় যায়
সকল নিন্দা থুইয়া বুড়ি
বউয়ের নিন্দা গায়।
মরল নারে মাইল্যা বুড়ি
পাইড়া দিতাম মাডি
মুখ দিয়া ভইর‍্যা দিতাম
বরাক বাশেঁর গুড়ি।

(৩)

এমন শাশুড়ি দেখছি না গো
যমে থুইয়া যায়
আমার লাইগ্যা বান্দর মুখী
রাখছিল আল্লায়।
আমার স্বামী বাড়ি আইলে
দেখি কার বিচার করে
হাট কুন্নিরার চউখ্যে যেন
মরিচ ভাইঙ্গা পড়ে।
বউয়ে করে বিরান বড়া
শাশুড়িরে দেয় থুড়া থুড়া
বউগো বিরান দিলানা?
বিরান খাইছে বিলাইয়ে
দারুণ বিলাই
ধরতে পারলাম না।

(৪)

ও বাজান বাজান গো
কই বিয়া দিলা গো
দুই বেডা কাঁহারো
নাইওর তুইল্যা ঝাঁহারো।
মা মরছিল ছোডু থইয়া
বাপ করছিল বিয়া
কি পোড়া পুড়ল গো
কাডের আগুন দিয়া।

www.pathagar.com

(৫)

এমুন কান্দন কানছনি কেউ
যার হইছে গো বিয়া
তারামনি বারা ভানে
ঢেহিত পাড়া দিয়া।
দুইখ্যার মা চাইয়া রইছে
জামাই আইয়ে না
তারামনির পায়ের জুড়ে
ঢেহি উডে না।

(৬)

আইব জামাই নিব ঝি
মার পরানে কইব কি?
মায়ে কান্দে ভইনে কান্দে
গলায় গলায় দিয়া
পানিত কান্দে পানি কাউড়ি
গাছে কান্দে টিয়া।
পরের পুতে নিত আইছে
ঢোলে বাড়ি দিয়া
ঢোল বাজে টেনর টেনর
শানাই বাজে রইয়া।

(৭)

আলা বালা ফুলের ডালা
মায়ে কয় জ্বালা জ্বালা
বাপে কয় বিয়া দিয়ালা
ভাইয়ে কয় থাউক
ভাবী কয় কিল্লাই
বাড়া বাইন্ধা খাউক।

(৮)

ডহি ভইরা রান্ধি আমি
ডহি ভরা ভাত
খাওনের বালা খাই আমি
ডহি পুছা ভাত।
বাজানরে কইও গিয়া
ভালা সুহে আছি
আউল্লা ফলার বাড়ি খাইয়া
ঘর দিগালে নাচি।

www.pathagar.com

কইয়া লও গো পুতের বৌ
দিনে তরে দিছে
এমুন দিন আছিন আমার
খদায় কাইর‌্যা নিছে।

(৯)

মা পিন্দে ছিড়া কাপড়
গিড় অ-গাড়া দিয়া
বউ পিন্দে রঙিন শাড়ি
বারিন্দা লাগাইয়া।
মা' খায় পানি ভাত
মরিচ পুড়া দিয়া
বউয়ে খায় দুধ ভাত
সবরি কলা দিয়া।
মা' করে চিড়া-বাড়া
ভাঙ্গা ঘর অ বইয়া
বউয়ে করে লেহা পড়া
হেলান চেয়ার অ বইয়া।

(১০)

কত পুড়া পুড়লা গো আল্লাহ
পুইড়্যা করলা ছাই
কার কাছে করবাম নালিশ
জগতে কেউ নাই।
সই গো সই
নাইল্যা ক্ষেত অ বই
নাইল্যা ক্ষেত অ বইয়া বইয়া
দুঃখের কথা কই।
সুখ নাইরে সুখ পরানের বুড়ি
তর জ্বালাতে আমি অহন
দ্যাশে দ্যাশে ঘুড়ি।

(১১)

বিটলা বাড়ির কাইল্যা বউ
রানতো জানে না
ডাইল অ উঠছে বগর বগর
নুন তো দিল না।
কাউলহা আনছি বিয়া করাইয়া
আউজ্জা মারে ফাল

www.pathagar.com

বউ বড় ভাল গো
গোষ্ঠীর দেহায় ঝাল।
ভালা রান্ধি বুড়া রান্ধি
হাঁইয়ে যদি খায়
পাড়া-পড়শির কথায় আমার
বাল ফালানি যায়।

(১২)

এক পয়সার তৈল
মাগী কেমনে খরচ অইল
কেরে তোর দাড়ি মোর গায়
আর দিলাম ছেড়ার মাথায়।
ছেরা ছেরির বে অইলো
সাত রাইত গীত অইলো
কোন অভাগী ঘরে আইলো
বাহী তেলডা ঢাইল্যা নিলো।

(১৩)

অনুপমা অমুক ধর
চায় না যেতে স্বামী ঘর
বাপ বলছে-আয় আয়
মা বলছে-আচ্ছা থাক
ভাই বলছে-দূর করে দাও
বউ বলছে-স্বামী বাড়ি যাক।

(১৪)

জামাই আইয়া কিল ধুমাধুম
চল বাপের বাড়ি
লাঙের লগে কথা কইয়া
কেমনে ছিরলে শাড়ি।
বাড়ির পাশে বাঁশ ঝাড়
ঘন ঘন গিরা
টাট্টিত গিয়া পার হতে
শাড়ি গেল ছিরা।
মিছা কথা কইছ না আর
গালে দিল টুকনা
হউরি আইয়া ঘর দিঘালে
জুইরা দিল বকনা।

www.pathagar.com

নারীর আবেগ বিষয়ক লোকছড়া

(১)
মামা গেল বাজারে
মামীর উঠল জ্বর
তোর মামা বাড়িত নাই
আইনজা মাইরা ধর।

(২)
চাচী গো, চাচা কই
গেছে ধান কাডা
ক্ষেতে অইছে খুনাখুনি
সুযোগ পাইয়া কাম থুইয়া
চাচী হাদে বুনি।

(৩)
কামলা মুনি কামলা মুনি
করে সবাই কানাকানি
পাবদা গাছের চোড্ডু বুনি
দেইখ্যা হাসে কামলা মুনি।

(৪)
দেউরা রে তোর বাউরা কথা
ভাল্লাগেনা গায়
তোর ভাইয়ে বিদেশ গেছে
যৌবন আমার অমনি যায়।

(৫)
চান উঠছে ফুল ফুটছে
গাছ তলায় কে?
আংটি পড়া ভাসুর পুরুষ
ঘোমটা টেনে দে।
ঘোমটার নিচে পুংটা নাচে
যৈবন পুইড়্যা ছাই
কার কাছে করতাম নালিশ
জামাই কপালে নাই।

(৬)
হারা রাইত উজাগরি
হাই মাউগে দরবার করি
কি আর কইগো সোনা
মুছকাইয়া ভাংছে গরদানা।

www.pathagar.com

(৭)
খাইতে পিনতে টানাটানি
হারাদিন ঘ্যান ঘ্যানানি
পানচুনের দেহা নাই
হারা দিন তুই তাই
এর উপরে মাইর ধোর
কেমনে করি হাইর ঘর ?

(৮)
বিয়ান বেলা রান্দে
আছর বেলা খায়
হউরি বউয়ের কাম
তবু না ফুরায়।

রাজনৈতিক লোকছড়া

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে যুগ যুগ ধরে রাজনীতি মানুষকে যেমন সমাজ চিন্তা ভাবনায় স্লোগান তৈরি করতে শিখিয়েছে তেমনি বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় এ দেশে অনেক রাজনৈতিক লোকছড়া সৃষ্টির উদাহরণ রয়েছে। নিম্নে রাজনৈতিক বিষয়ক কিছু লোকছড়া দেওয়া হলো :

১. ভোটের বাক্সে লাথি মার
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

২. ভোটের দাবি ভাতের দাবি
কোন দাবিটা আগে
এখন ভীষণ পেটের খিদা
ঘুরে ফিরে ভাতের দাবি জাগে।

৩. কায়দা আজম ফিরে যাও
উর্দু ভাষায় করে রাও
উর্দু-ফারসি-ইংরেজি
পড়তে আমরা নিমরাজি
পড়লে পড়বাম বাংলা
অইলে অয়্যাম কামলা।

৪. পি ডি পির নূরুল আমীন
ভুট পাইছে থুরা
ভূড়ের বাক্স খুইল্যা দ্যাহে
খালি জুতার মুড়া।

৫. ভুট দিছলাম দেইখ্যা হুইন্যা
পাইছি ভুড়ের ফল
পেডের ভুহে ভাত পাইনা
উদাম পুটকির তল।

www.pathagar.com

৬. ভুট দাও ভুট দাও
পাবলিক মরে ভুহে
আরেকবার ভুট চাইলে
মুইত্যা দিয়াম মুহে।

৭. লেনি লেনি করিস না
ধরছি নেতা ছাড়ছি না
ব্যাকতা দিয়া ভুডের বাক্‌স
ভরত কেডা চায়
যে হালারা ফাল-ফালায়া
ভুডের লেনি খায়।

৮. ভুট্টু গেল পুট্টুস হইয়া
টিকক্যার আগুন নিব্বা গেল
কি দশা ঘটাইল বাংলার
কি দশা ঘটাইল।

৯. ইলিশ মাছে তিরিশ কাটা
বোয়াল মাছের দাড়ি
টিক্‌কা খান ভিক্ষা করে
শেখ মুজিবের বাড়ি।

১০. আইয়ুব মোনায়েম দুই ভাই
এক দড়িতে ফাঁসি চাই ?

১১. তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।

১২. বীর বাঙালি অস্ত্র ধর
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

১৩. ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়
লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়।

১৪. হাত মে বিড়ি মুখে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

১৫. সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি
বোমা ফালাইছে জাপানি
বোমার ভিতরে কেউটে সাপ
ব্রিটিশ বলে বাপরে বাপ।

১৬. হাতির পর হাওদা
ঘোড়ার পর জ্বীন
চলে যাও চলে যাও
ওয়ারেন হেস্টিংস।

www.pathagar.com

১৭. জেলের তালা ভেঙেছি
মুজিব ভাইকে এনেছি।

১৮. তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
পূর্ব বাংলার প্রতি বাড়ি।

১৯. বিশ্বে এলো নতুন বাদ
মুজিববাদ - মুজিববাদ।

২০. মুজিব তোমার ভয় নাই
স্বাধীন ছাড়া গতি নাই।

২১. মুজিব তুমি এগিয়ে চলো
আমরা আছি তোমার সাথে।

২২. মুজিব হত্যার পরিণাম
বাংলা হবে ভিয়েতনাম।

২৩. একাত্তরের হাতিয়ার
গর্জে উঠুক আরেক বার।

২৪. স্বৈরাচার নিপাত যাক
গণতন্ত্র মুক্তি পাক।

২৫. কি বলব ভাই
একাত্তরের কথা
মনডা বর ভার
সোনার দেশটা
ইয়া হিয়া
করল ছাড় খার।

২৬. বাঙ্গলা বরায়ে বাঙ্গালী
চেরা বগিরদ এ তাঁতারী।

২৭. পশ্চিমে বাল্লালী, পূবে মসনদে আলী।

২৮. আমার দেশ তোমার দেশ
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

২৯. পরিষদ না রাজপথ
রাজপথ রাজপথ।

৩০. ঘরে ঘরে দুর্গ গড়
বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

৩১. এ্যাকশান এ্যাকশান
ডাইরেক্ট এ্যাকশান।

www.pathagar.com

খেলাধুলা বিষয়ক লোকছড়া

কিশোরগঞ্জে আরও যেসব লৌকিক খেলাধুলা রয়েছে এগুলোর মধ্যে ইচিং-বিচিং খেলা, পানিঝুপ্পা খেলা, তই তই খেলা, নাভি খেলা এটি কোথাও কোথাও লাই খেলা নামে পরিচিত। জলপুকুরে নদী নালা হাওরে অনেক খেলার প্রচলন আছে তার মধ্যে 'পানি খেলা' একটি অন্যতম খেলা। এসব খেলা জেলা কিশোরগঞ্জের হাওর জনপদে বেশি প্রচলিত। তই তই খেলাটিও পানির খেলা। এ খেলাধুলা সম্পর্কীত লৌকিক ছড়াগুলো নিম্নরূপ :

(১)
তই তই তই
বগা মাইর‍্যা ডুলাত থই
ডুলার থলি ভাঙ্গা
অমুকের হউরির হাঙ্গা
বগা অইল কুঁইয়্যা
ভূঞা খায় চুঁইয়্যা।

(২)
চি কুত কুত তারে নারে
বাবুই ডাকে বারে বারে
বাবুইয়ের মাইয়া
নাচে কাঁচা কলা খাইয়া।

(৩)
চি কুত কুত খুদের মালা
কম পানিতে গাড়ি চালা।

(৪)
এক চি দুই চি তিন চি মালা
পর্বত কাইট্টা পানিত ফালা
পর্বতে মারলে টান
দিঘি খুইদ্যা পানি আন
পর্বতের নাম কী
কাংড়া কাংড়া কলসি।

(৫)
ধরছি চি ছাড়তাম না
না মাইরা আইতাম না।

(৬)
চি চি কুত কুত বিলাতি দুধ
আমরা আমরা কাইজ্জা লাগজি
ভাবীর কি দুষ ?

www.pathagar.com

(৭)

চিয়ারে চিয়া
তর মারে করবাম বিয়া
কাডের নোলক দিয়া।

(৮)

চি চি চিক্কন
থালি ভরা পাক্কন।

(৯)

চি কুত কুত কদুরে
কলা খাইলো বাদুরে
কলার ভিতরে আলি নাই
দুলা ভাইয়ের হালি নাই।

(১০)

চিরে চি করবাম কী
ডাবা-ডুবা ভাইঙ্গালছি।
চি চি দৌড়ানি
আমার নাম মৌরানি।

(১১)

চি কুত কুত দিয়া যাই
চুলে ধইর‍্যা টাইন্যা যাই।

(১২)

চি কুত কুত নাইল্ল্যার আলি
গোল্লা ভরি আলি আলি।

(১৩)

চি কুত কুত কুতানি
লাইলী আমার মামানী
মজনু আমার ভাই
পইলা চি খেলাই।

(১৪)

পইলা চি ছেলামালী
গোল্লা ভরি আলি আলি।

www.pathagar.com

(১৫)
চিরে চি এলাচি
দারচিনি দিয়া খাইচি।

(১৬)
এক চি দুই চি এলাচি গুডা
রক্ত পড়ে ফুডা ফুডা।

(১৭)
চি চি আইচ্ছা
কবুতরের বাইচ্চা
কবুতর মইর‍্যা গেলে
বাহাদুরের বাইচ্চা।

(১৮)
চি কুত কুত লাই
লাল ঘোড়া দৌড়াই
ঘোড়ার সাথে গাড়ি
চাবুক মারি।

(১৯)
চি চি চাচ্চা
বাবুলের বাচ্চা
বাবুল কান্দে
কাঁচা কলা রান্ধে।

(২০)
চি কুত কুত তারে নারে
কোকিল ডাকে বারে বারে।

(২১)
কুত কুত লাইয়া
বাবুলের মাইয়া
বাবুলে কান্দে
কাঁচা কাডোল খাইয়া।

(২২)
চিয়ালো চিয়া
তোর বাড়ি বিয়া
পান নাই, সুপারি নাই
তুলসী পাতা দিয়া।

www.pathagar.com

(২৩)

চি-চি- করব কি
তোর আগে দৌড়াইছি
ঘন্টার আগ, বনের বাঘ
ফেওচ্যা মারি ঝাঁক ঝাঁক।

(২৪)

চি-কুত কুত তাইরে
তোর সাথে ও বনে নারে
না বনিলে বনায়া দিয়াম
ধাপ্পুর ধাপ্পুর কিলায়া দিয়াম।

(২৫)

চি-কুত কুত তাইরে নারে
ঘন্টা বাজে বারে বারে
একচি-দুইচি কচুর ডাটি
ধর্ম মাছের কর্ম কাটি।

(২৬)

চি-লো-চি
এ্যালং ব্যালং ছ্যাং
কাটলো আমার ঠ্যাং
তবু আমি ঘুরি ফিরি
করি ড্যাং ড্যাং।

(২৭)

চি-মারলাম শিকলের গোটা
হাতি মারলাম মোটা মোটা
ভইষ মারলাম লাফে
তেউরাল কাঁপে।

(২৮)

চিরে চি রানছস কী
বৈচা মাছের শুটকী
খাইলে লাগে চুটকি।

(২৯)

চিয়ারে চিয়া
খালাম্মার বিয়া
খালাম্মার সাথে

www.pathagar.com

খালু ঐ
বাজারে থাইক্যা
কিন্ন্যা আনছে
এক পাইল্যা দৈ।

(৩০)

চি চি দৌড়ানি
আমার নাম মৌরানি।

(৩১)

হাডুডু
এতাইয়া রে বেতাইয়া
কুমড়া পাতা চেতাইয়া
কুমড়া হইল বাত্তি
এই মারলাম লাত্তি।

(৩২)

আমি গেছলাম দলানে
দেইখ্যা আইছি ছোলা
তোমরা সাক্ষী থাইক্য
এইড্যা আমার পোলা।

(৩৩)

খেইল্লো না গো খেইল্লো না
খেল্লে বড় গোনা
আত পাত্ত ভাংলে
যাইবা ডাক্তার খানা
ডাক্তার খানা বন্ধ
বাইত বইয়া কান্দ।

(৩৪)

কলা গাছের ডাগ্‌গা
বেডা অইলে আগ্‌গা।

(৩৫)

কলা গাছের লউ
তর মা আমার বউ
বউ...বউ...বউ।

www.pathagar.com

(৩৬)

আমার ছল খইলে
কী সুখ পাইলে
পাথর দিয়া বুক বান্ধাইলে
পাথর কালা
জন্ম জ্বালা....জ্বালা জ্বালা।

(৩৭)

চুদুর-ভুদুর করিস না
খেলতে আইসা মরিস না।

(৩৮)

ল্যাংড়া গেছে ভেংরার কাছে
খেলত হাডুডু খেলা
খেলতে খেলতে গেছে তার
সকাল-সন্ধ্যা বেলা।

(৩৯)

এই ছেরাডা বেহাইয়্যা
খেলতে চায়না দেহাইয়্যা
হাটে চলে বেহাইয়্যা
কথা বলে কেহাইয়্যা।

(৪০)

হাডুডু খেলতে গেলাম
ফুরায়া গেল বেইল
বেইলের ভিতর লেখা আছে
হাডুডু খেইল।

(৪১)

হাড্ডু-ডু, হাড্ডু-ডু আনাইয়া
নৌকা দিলাম বানাইয়া
যদি নৌকা উড়ে
বিয়া করবাম দূরে।

(৪২)

হাডুডু ডুগুডুগু
হাডুডু ডা
ডাইয়ারে ডুগুডুগু
ডাইয়ারে ডা

www.pathagar.com

ডাইয়ায় কামুর দিলে
বাঁচতে না।

(৪৩)

ওই কাবাডি কাবাডি চিলিকদার
আডিড গুডিড খবর দার।

(৪৪)

কাবাডি কাবাডি বিন্দাবন
ঘড়ি বাজে ঠন্‌ঠন্‌
ঘড়ির লাফে তউরাল কাঁপে
তউরালের ঝিকিমিকি বাওই নাচে।

(৪৫)

জামতলা ঝামুর ঝুমুর
বরই তলা বিয়া
ঐ আসতেছে জামাল মিয়া
পাগড়ী মাথায় দিয়া।
পাগড়ীর ভিতর লম্বা চুল
কী সুন্দর কইন্যা পুতুল
পুতুল যাবে শ্বশুর বাড়ি
দামাল মিয়ার লম্বা দাড়ি।

(৪৬)

ড্যাং ড্যাং সোয়ারি
বউয়ের মাতাত তাগাড়ি
বউ বড় ভারী
তাল গাছের গুড়ি।

(৪৭)

পুতুল নিয়া খেলা করি
মাগো তোমার পায়ে পড়ি
ইস্‌কুলেতে যাইতাম না
বেতের বারি খাইতাম না।

(৪৮)

পুতলার নাম সীতা
মাথায় বান্ধি ফিতা
কানে দেই দুল
ভালবাসার ফুল।

www.pathagar.com

(৪৯)

নেলির সাথে খেলি না
হেই বাড়ির সেলিনা
তার সাথে আড়ি
যাইনা তার বাড়ি।

(৫০)

পুতলারে ভাডি দ্যাশ অ যাইবা ?
ভাডি দ্যাশ অ নদী নাই
খালে বিলে পানি নাই।
ভাডি দ্যাশ অ পুকুর নাই
বিষ্টি বাদলার সময় নাই
পুতলারে ভাডি দ্যাশ অ যাইবা ?

(৫১)

দেশে আইল আউলি বাউলি
আসমান আইলো হাইজ্যা
পরের ঘরে যাইব পুতলা
নতুন বই সাইজ্যা।

(৫২)

পড়ি ক্লাশ ওয়ান
হব বড় জোয়ান।
পড়ি ক্লাশ টু
খাই সা-গু।
পড়ি ক্লাশ থিরি
খাই ভাত ইরি।
পড়ি ক্লাশ ফোর
খাই কলার থোর।
পড়ি ক্লাশ ফাইভ
যেন ইংরেজ সাইব।

পড়ি ক্লাশ সিক্স
মাথা বিষে দেই নিক্স।
পড়ি ক্লাশ সেভেন
গুড বাই হেভেন।
পড়ি ক্লাশ এইট
ইসকুলের গেইট।
পড়ি ক্লাশ নাইন

www.pathagar.com

ভেড়ি গুড ফাইন।
পড়ি ক্লাশ টেন
মানুষ হও ম্যান।

(৫৩)

একে একে এক
সবাই চেয়ে দেখ।
দুই একে দুই
কোথায় গেলি তুই।
তিন একে তিন
একটা কিছু কিন।
চার একে চার
পাকা আমটি পার।
পাঁচ একে পাঁচ
কিনব একটা ছাঁচ।

ছয় একে ছয়
হবে হবে জয়।
নয় একে নয়
সবে এটা কয়।
দশ একে দশ
একটু খানি বস।

(৫৪)

এক এ-একরামপুর
দুই এ-দুলালপুর
তিন এ-তেঘরিয়া
চার এ-চারিগ্রাম।
পাঁচ এ-পাঁচলী পাড়া
ছয় এ-ছয়সুতী
সাত এ-সাঁতারপুর
আট এ-অষ্টগ্রাম
নয় এ-নগুয়া।
দশ এ-দশকানিয়া
এগার এ-এগারসিন্দুর
বার এ-বার আউলিয়ার মোড়,
তের এ-তেরপট্টি
চৌদ্দ এ-চৌদ্দশত

www.pathagar.com

পনর এ-পানান বিল
ষোল এ-শোলাকিয়া
সতের এ-সতরদ্রোন
আটার এ-আটার বাড়ি কাচারি
উনিশ এ-উনদাই বিল
কুড়ি এ-কুড়িগাই।

(৫৫)

ডায়া ডুক্কু বিন্দাবন
ঘড়ি বাজে ঠন্ ঠন্।

(৫৬)

ডুক্কু ডুক্কু মন গুডা
হাত্তি মারলাম গুডা গুডা
বইশ মারলাম লাফে
তরোয়াল কাঁফে।

(৫৭)

উতি নারে ধুতিনা
তিন দিন ধইরা মুতিনা
তিন দিনের জ্বরে
মাথা বিষ করে।

(৫৮)

উত্তরি ধুত্তরি কইতরি নালা
ভাংনা মাছে দিছে গালা
ভাংনা মাছের ঘাড়ে তেল
রান্ধুনী পলাইয়া গেল্।

(৫৯)

আউচি নালা কচু ঘর
ধাইয়া ধাইয়া চুলে ধর।

(৬০)

এতাইয়ারে বেতাইয়া,
লাউপাতা চেতাইয়া,
কুমড়া পাতা ডুগ ডুগ,
খাড়োরে গোলামের পুত।

www.pathagar.com

(৬১)

আমি গেলাম পুবে
বাঁশ কাটলাম কোবে,
বাশেঁর নাই আগা
ডুইর‍্যা বাঘা।

(৬২)

আমি গেছলাম গৌরিপুর
দেইখা আইলাম দুইচোর
দুইচোরে বারা ভানে
ধাপ্পুর ধুপ্পুর।

(৬৩)

আমি গেলাম উত্তরে,
ধান খাইলো কইতরে
চিল কাবাডি ছিঁলুকদার
হাড্ডি গুড্ডি খবরদার

(৬৪)

ডাইয়ারে ডুক্কু ডুক্কু ডাইয়ারে ডা ডাইয়া
কামুড় দিলে মানুষ বাঁচে না।

(৬৫)

উমারে উমা পান খাইয়া ঘুমা
পানের চুড়ে, দলান ফাড়ে।
দলানের ঝিকিমিকি, বাঐয়ে নাচে
বাঐয়ের লেদা, মারলাম ভেদা।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা। একটি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো লোকশিল্পে ফুটে উঠে। শিল্পকলার সকল মাধ্যমে লোকশিল্প ব্যবহৃত হয়। নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প ইত্যাদি লোকশিল্পের অন্যতম উদাহরণ।

১. লক্ষ্মীর সরা

লক্ষ্মী হিন্দুদের জনপ্রিয় দেবী। মন্দিরে এ দেবীর পূজা হয় না। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী দেবী পূজিত। হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে পূজার জন্য বিগ্রহের বিকল্প হিসেবে লক্ষ্মীর সরা ব্যবহৃত হয়। পূজা শেষে সরা গৃহ সজ্জার জন্য ঘরে রক্ষিত হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে লক্ষ্মী দেবীর বিগ্রহ বা মূর্তি পাওয়া যায়। তথাপি শহরাঞ্চলে এবং গ্রামে মূর্তির চেয়ে সরা ঘরে রাখার জন্য লক্ষ্মী সরার ব্যবহারই অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়। সরাতে লক্ষ্মী দেবীর প্রতিকৃতিই লক্ষণীয়। লক্ষ্মী সরা হিন্দু ধর্মীয় লোকচিত্র ও লোকশিল্পের এক বর্ণাঢ্য অনুশীলন।

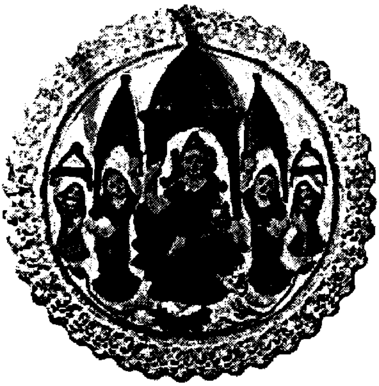

লক্ষ্মীর সরা

আর শখের হাঁড়ি বা সাধারণ সরা চিত্র খাঁটি লোকজ চিত্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। সখের হাঁড়ি ও সাধারণ সরা চিত্রে রয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতার ছাপ। সখের হাঁড়ি ও সরা চিত্রে বিচিত্র অঙ্কনের মটিফ লতা পাতা ফুলের ছবিসহ লোকজ দৃশ্যের প্রাধান্য বেশি। লক্ষ্মী সরা হিন্দুদের পূজা পার্বণে ব্যবহৃত হলেও সখের হাঁড়ি ও সখের সরা চিত্র হিন্দু -মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ব্যবহার করে। লক্ষ্মী সরা ছাড়াও কিশোরগঞ্জের হিন্দু সমাজে দুর্গা-গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর সরা চিত্র চোখে পড়ে। সাধারণত মাটির পাতিলের ঢাকনির নাম সরা বা ঢাকুন-ঢাকনি। পল্লি গ্রামে নিত্যদিন সংসারে ব্যবহার্য সরা কখনো চিত্রিত হয় না।

www.pathagar.com

হিন্দু সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানে চিত্রিত সরা অপরিহার্য। মুসলমান সমাজে গ্রামে বিবাহে চিত্রিত হাঁড়ি পাতিল ও সরা ব্যবহৃত হয়। তাতে ধর্মীয় কোনো উপলক্ষ্য নেই সম্পূর্ণ লোকজ। মুসলিম সমাজে এককালে রঙিন সখের হাঁড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানের যাবতীয় মিষ্টি দ্রব্য ও দধি বর-কনে পক্ষের বাড়িতে বহন করে নেওয়া হতো। এ যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় হাঁড়িতে দধি বহন করে তবে হাঁড়িগুলো চিত্রিত নয়। কিশোরগঞ্জে এ যুগে লক্ষ্মী সরা, সখের হাঁড়ি ও সাধারণ সরা চিত্র খুব একটা দেখা যায় না। তবে লক্ষ্মী মূর্তি বা বিগ্রহ প্রায় গ্রামে কিংবা শহরে বাজারে কিংবা কোনো বিশেষ বাড়িতে ক্রয় বিক্রয় করতে দেখা যায়।

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর শহরের নগুয়া-বত্রিশ এলাকায় বিশিষ্ট বিগ্রহ শিল্পী হীরা লাল পাল লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি তৈরি করে বিক্রি করেন। এছাড়া নিকলী গ্রামে মনিন্দ্র মোহন আচার্য, ধীরেন্দ্র মোহন আচার্য, দামপাড়ার শনি ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীগণ মূর্তি তৈরি ও পূজা পার্বণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তাদের হাতে তৈরি মূর্তি অত্যন্ত কারু মণ্ডিত ছিল। তারা বেশ কয়েক বার দুর্গা মূর্তি তৈরি করে এলাকায় পুরস্কৃত হয়েছেন। তবে লক্ষ্মী সরা একটি অনন্য চিত্র শৈলী।

২. মৃৎশিল্প

পোড়া মাটির পুতুল কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে নয়াকান্দি গ্রামে কিছু পরিবার এখনও তৈরি করছেন তাতে খ্যাতি রয়েছে। পূর্বে বিভিন্ন গ্রামে এর বিস্তৃতি ছিল। করিমগঞ্জের নয়াকান্দি গ্রাম ছাড়াও নিকলী উপজেলার কুমার পাড়া, কুমার ছাড়াসহ জেলার আরও অনেক স্থানে মাটির জিনিসপত্র তৈরি হয়। আজকের কারখানাজাত পণ্যের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতির যুগেও কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে পোড়ামাটির তৈরি গৃহস্থালি দ্রব্যাদি বা তৈজসপত্র কিছু না কিছু তৈরি হচ্ছে। এসবের মধ্যে কলসি, হাঁড়ি, পাতিল, খাদা, ঢাকনি, সানকি, গামলা, কলকে, পেয়ালা, থালা, মটকি, জালা, দীপাধার, বিভিন্ন ধরনের খেলার পুতুল, ঠুলি, ঝাঁজরা, পিঠার সাঁচ, নানা রকমের খেলনা ইত্যাদি। গ্রাম বাংলার নারী- মৃৎচিত্র শিল্পের রানী।

গোটা বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক মৃৎশিল্পের ইতিহাসের পূর্ব-ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের কুমার সম্প্রদায়ের অবদানের কথা উল্লেখ আছে। বিশেষ করে নারীদের ভূমিকা বেশি। এ অঞ্চলে মৃৎশিল্পের প্রচলন ও তৈরি খুবই প্রাচীন। প্রায় তিন হাজার বছর আগের তৈরি মাটির হাঁড়ি-পাঁতিল, বাটি-বদনা, হুকো-কলসি, থালা-বাসন, মটকা-মাটির চারি ইত্যাদি এ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর ও নিকলী উপজেলা সদর কুমার ছাড়া নামক গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোর কিছু জিনিস কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির জাদুঘরে রক্ষিত আছে। মৃৎশিল্পের সাথে মানব জাতির পরিচয়ের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে মৃৎশিল্পের দানও অপরিসীম। বিশ্ব বরেণ্য নৃতত্ত্ববিদ লুই হেনরি মর্গান মন্তব্য করেছেন- হরপ্পা, মোহেনজাদারো থেকে শুরু করে ভারত-বাংলাদেশের বৃহত্তর অঞ্চল ময়মনসিংহের কুমার সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ যে মৃৎপাত্র খেলনা তৈরি করতেন তার সঙ্গে পাহাড়পুর, ময়নামতি, হরপ্পা,

www.pathagar.com

মোহেনজোদারোর ধ্বংসস্তূপ হতে প্রাপ্ত মৃৎশিল্পের সাদৃশ্য রয়েছে। তাই মৃৎশিল্পে বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের নারীপুরুষ কুমার সম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রাচীন।

ড. নীহার রঞ্জন রায় তার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক আদিপর্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আমলে সিন্ধু নদের তীরে এসে সম-সাময়িক লোকেরা যে প্রাচীন মাটির পাত্র হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি তৈরি করত, গ্রাম বাংলার নদীর ধারে, পুকুর পাড়ে, বটের ছায়ায় বসে বাঙ্গালী নারীরা, বাঙ্গালী পুরুষ কুমারেরা যৌথভাবে আজও তাই করে। এই কুমারদের সাথে কিশোরগঞ্জের নারীপুরুষ কুমারদের অবদানের কথাও বলা হয়েছে। মৃৎপাত্র তৈরিতেও কুমার সম্প্রদায়ের বসতি হিসেবে কিশোরগঞ্জ একটি প্রাচীন অঞ্চল। বাঙ্গালির ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাতের সঙ্গে মাটির তৈরি শানকির খাবারের বা বাসনের ঐতিহ্য রয়েছে।

৩. তাঁতশিল্প

তাঁতের কাপড় সাধারণত পূর্বে হিন্দু তাঁতি ও যোগী এবং মুসলমান জোলারা তৈরি করে থাকত। এক সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে কাপড়ের কল বসিয়েছিলেন। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাজিতপুরে নকশি পাড়ের দামি শাড়ি তৈরি হতো এবং তা কলকাতায় রফতানি হতো। কিশোরগঞ্জের তানজেব নামক কাপড় ঢাকার মসলিনের সংগে পাল্লা দিত। তখনকার দিনে বাজিতপুরে মসলিন কাপড়ের ৪০ টি পরিবার কাজ করত এবং উৎপাদিত কাপড় ঢাকায় বিক্রি হতো। ১৯ শতকে একটি তানজেব তৈরি করতে তিন দিন সময় লাগত এবং খরচ হতো নয় আনা। কিশোরগঞ্জের তানজেব ও বাজিতপুরের মসলিন দিল্লীর বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বাংলাদেশের সুমহান মসলিন ঐতিহ্য মণ্ডিত তাঁত ও বস্ত্র বয়ন শিল্পে কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নারীদের অবদান এবং অংশগ্রহণ বিশিষ্টতার দাবিদার। আর পুরুষদের অবদান তো অনস্বীকার্য। মসলিন শিল্পের প্রাচীন অঞ্চল হিসেবে স্ব-চক্ষে পর্যবেক্ষণ করে সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির যে ছয়টি বিখ্যাত স্থান নামের সঙ্গে উৎপাদিত কেন্দ্রের নাম ঐতিহাসিক জেমস টেলর বর্ণনা করেছেন- তার মধ্যে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর ছিল অন্যতম। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের বত্রিশ ও কুলিয়ারচর উপজেলার রামদী ইউনিয়নে এক সময় মসলিন কাপড় তৈরি হতো। কালক্রমে এ শিল্প ধ্বংস হয়ে গেলেও শেষ চিহ্ন স্বরূপ কুলিয়ারচরের আগরপুর হাড়িয়া কান্দা গ্রামে এখনও কিছু তাঁতের কল ও ব্যবসা বিদ্যমান আছে। মসলিন তৈরির বাকি অঞ্চলগুলো ছিল ঢাকা জেলায়। ফলে বাংলার ইতিহাসে 'ঢাকার মসলিন' বা 'ঢাকাই মসলিন' এর ব্যাপক পরিচিতি ছিল।

জঙ্গলবাড়ির 'জঙ্গল ঘাস' মসলিন সমগ্র বাংলার বিখ্যাত বস্ত্র বলে প্রসিদ্ধ ছিল। এককালে স্থানীয় যোগী সম্প্রদায়ের নারীপুরুষদের দ্বারা তৈরি দেশি প্রাচীন পদ্ধতির বস্ত্র 'যুগ্যা কাপড়' কিশোরগঞ্জ জেলায় সর্বত্রই প্রস্তুত হতো। কিশোরগঞ্জ জেলার এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে একটি পাড়ার নাম 'যুগীহাটি বা যোগিপাড়া' নেই। 'মনসা মঙ্গল' ও মৈমনসিংহ গীতিকায় মলুয়ার বিয়ের প্রস্তাবে স্থানীয় 'পাটের শাড়ী'র কথা উল্লেখ আছে। মনসা মঙ্গলের প্রাচীন কবি কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান নারায়ণ দেবের 'পদ্ম পুরাণে'

www.pathagar.com

পাটের শাড়ির কথা উল্লেখ রয়েছে। এভাবে-

লাল বর্ণ পাট শাড়ি
নীলাম্বরী আদি করি
শত বস্ত্র লহ বহুর্তর।

মলুয়া কাব্যে উল্লেখ আছে-

পাটের শাড়ি পিন্দ্যা কন্যা সুখ নাহি পায়
হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুরায়।
হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্র মাস খায়
পাটের শাড়ী বেইচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাস খায়।

বস্ত্র তৈরির কার্পাস তুলা এক সময় কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার কার্পাসা ইউনিয়ন গ্রামে ও কুলিয়ারচর উপজেলার কাপাসাসিয়া নামক গ্রাম ছাড়াও ঢাকা জেলার কাপাসিয়া প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত মসলিন ও পাট জাত দ্রব্যে মিশ্রিত বস্ত্র বয়ন তাঁত নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে আজ ঢাকার নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়লেও প্রাচীন ইতিহাসে বিশ্ববরেণ্য পর্যটক ইবনে বতুতা ত্রয়োদশ শতকে এগারসিন্দুর ভ্রমণ কালেও তিনি এখানে মসলিন কাপড়ে বিদেশে রপ্তানীর কথাই তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে মসলিনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আজ অবশ্যই কিশোরগঞ্জের জঙ্গল বাড়ি, বাজিতপুর, বত্রিশ, এগারসিন্দুর এসব অঞ্চল খ্যাতি ও সুনাম পাওয়ার যোগ্য প্রাপ্য।

লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য' গ্রন্থে উল্লেখ আছে- বাংলার নবাব তখন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি মোগল সম্রাটদের জন্য সে সময়ে বাংলাদেশের চারটি আড়ং থেকে মসলিন কাপড় সংগ্রহ করে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। এই চারটি আড়ং এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি আড়ং ছিল কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। মসলিন তনজেব বা তানজেব কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর ছিল একচেটিয়া খ্যাতি। কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান কেদারনাথ মজুমদার তার গ্রন্থ ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ-এ লিখেছেন সে সময়ে কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুর মসলিন কাপড় তনজেব চাঁদর ও গোলাবতন ধুতি সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কিশোরগঞ্জে সর্বপ্রথম ওলন্দাজরাই কিশোরগঞ্জ সদর ও বাজিতপুরে কুঠি নির্মাণ করে মসলিন কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তারপর সুলতানি আমল, মোগল আমল, ঈশা খাঁর আমল , ইংরেজ আমলে বণিকগণ তাদের ধারাবাহিক কুঠি হস্তগত করে এ অঞ্চলে মসলিন তৈরি ও এর ব্যবসা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই সময়ে কিশোরগঞ্জের বত্রিশ এলাকার প্রামানিক প্রধান কৃষ্ণ দাস প্রামাণিক মসলিন কাপড় তৈরি ও ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। কৃষ্ণ দাস প্রামাণিকের সন্তান ব্রজকিশোর মতান্তরে নন্দকিশোরদের অবনতির পরপরই কিশোরগঞ্জে মসলিন বস্ত্র শিল্পের ব্যবসার অবনতি ঘটেছে বলে জানা যায়। ড. আবদুল করিম লিখেছেন জঙ্গল বাড়ির তাঁতিরা এককালে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে মসলিন শিল্প তৈরি কাজে এ এলাকার নারীপুরুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে জেমস টেলর জঙ্গল বাড়িতে এসে তিনি সে সময়ে একশত ঘর মসলিন তাঁতি পরিবার দেখেছিলেন। তাঁর মন্তব্যে জানা যায়-বাংলার বিখ্যাত মসলিন শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ছিল কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের বত্রিশ, এগারসিন্দুর, কুলিয়ারচরের রামদী উল্লেখযোগ্য। আজ এসব অঞ্চলে তাঁত শিল্প বা বস্ত্র বয়ন শিল্পের নাম গন্ধটুকুও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৪. দারুশিল্প

অতি প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় পাথর বা অন্যান্য ধাতু অপ্রতুল হওয়ায় দারুশিল্প স্বাভাবিকভাবেই প্রসার লাভ করেছে। দারুশিল্প বা কাঠ খোদাই শিল্পীসুতার মিস্ত্রি হিসেবেই পরিচিত। এরা কাঠের হাতা, প্রদীপের গাছা, পেটরা, বাকস, চারা, চইর‍্যা, খড়ম, পাউরি, আলনা, আলমারি, আয়নাযুক্ত ড্রেসিং টেবিল কাঠ নির্মিত জিনিসের মধ্যে সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, পালকি, নৌকা, দৌড়ের নৌকা, পিড়ি, খাট-পালং, বেলুন ইত্যাদি ছাড়াও অভিজাত শ্রেণির ব্যবহারের মধ্যে নক্‌শা ও খোদাইকৃত আসবাবপত্র, চৌকাঠ,মসজিদ,মন্দিরের পিলার, মূর্তি, রথ, সিন্দুক, দরজা, জানালার পাল্লায় খোদিত কাজ, ঘরের পার্টিশন, সৌখিন টেবিল, চেয়ার খোদাইকৃত হাতবাক্স, লাঠি, বৈঠা ও নৌকার অগ্রভাগের কারুকার্য ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে।

কিশোরগঞ্জ শহরে 'খড়মপট্টি' নামে একটি অভিজাত শ্রেণির মহল্লার নামকরণ রয়েছে। জানা যায়, এককালে এ স্থানে সৌখিন দারুশিল্পীদের স্থায়ী বসতি ছিল। তাদের উৎকৃষ্ট কাঠের তৈরি বৌলাওয়ালা খড়ম তৈরিও ব্যাপক ব্যবহার থেকেই এই খড়মপট্টি নামের উৎপত্তি ও খ্যাতি। কিশোরগঞ্জের বাইরেও খরমপট্টির নামের বিস্তৃতি ছিল। কিশোরগঞ্জের পূর্বাঞ্চল বহু নদ-নদী ও খাল বিলে পরিপূর্ণ হওয়ায় ঐসব নদ-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নৌশিল্প গড়ে উঠে। বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত নৌকা ছাড়া দৌড় বা বাইচের নৌকাও তৈরি হয়। এ অঞ্চলের বাইচের নৌকা সারিন্ধা জাতীয়। এসব নৌকায় গুলুই এর কাজ এমনকি ছইয়ের কাজও দেখার মত। নানা রং এ কারুকার্যমণ্ডিত ও খোদাইকৃত নৌকার অগ্রভাগ অনেক সময় মকর, সিংহ, ঈগল পাখি, ময়ূর, রাজহংস ইত্যাদির অনুকরণে তৈরি হয়। কোন কোনটিতে তামা পিতলের কাজও হয়। ঈশা খার জঙ্গলবাড়ি, এগারসিন্দুর , সাদী মসজিদ, হয়বতনগর জমিদার বাড়ি, মসজিদ, ইটনা আনন্দ মোহনবসুর বাড়ি, জাওয়ার সাহেব বাড়ি, বৌলাই সাহেব বাড়ি, ভাগলপুর সাহেব বাড়ি, ইটনা সাহেব বাড়ি ও গাঙ্গাটিয়া জমিদার বাড়ি ইত্যাদির কাঠ শিল্পের স্মৃতির কীর্তির ঐতিহ্য আজও চির উজ্জ্বল।

এছাড়া কাঠ খোদাইয়ে মূর্তি তৈরি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে রথে ব্যবহৃত মূর্তি কিশোরগঞ্জে স্বর্গীয় বিরাজ মোহন রায় এর বাড়িতে এক সময়ে জাঁকজমকের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কটিয়াদীর আচমিতা রথের জন্য বিখ্যাত ছিল। খোদাই কাজে সুতার মিস্ত্রি ছাড়া ফরাজী হিসেবে কিশোরগঞ্জের তারাপাশাতে এক পরিবার আছে। তারা এক সময় সৌখিন কুদানো ও খোদাই কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ পরিবার পুরাতন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। এখানে কবি জসীমউদদীনের লেখা (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৯, ৪র্থ

www.pathagar.com

সংখ্যা) থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। তিনি বলেছেন– "কিশোরগঞ্জে এক বৃদ্ধ মুসলমান খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের পানের বাটা তৈরি করে। তাঁর গাঁয়ে রঙিন লতাপাতা ও ফুল আঁকা হয়। এক কিশোরগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এরূপ পানের বাটা দেখি নাই।"এছাড়া ছুতার মিস্ত্রিগণ কৃষি কাজে ও গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরি করে থাকে। যেমন- লাঙ্গল. গাইল, ছিয়া, আচড়া বা বিন্দা, পিড়ি, বেলুন, জলচৌকি, চৌকি ইত্যাদি। কিশোরগঞ্জ জেলায় সূত্রধরদের নির্মিত কাঠশিল্পের ঐতিহ্য ও খ্যাতি এককালে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে নিকলী উপজেলার জজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রির সুনাম ছিল অন্যতম। সৌখিন আসবাব ও তৈজসপত্রের উপর তার পেশা নির্ভরশীল ছিল।

বাজিতপুরের নৌশিল্প স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিল। নিকলী - বাজিতপুর - তাড়াইল - করিমগঞ্জ - ইটনা - মিঠামইন - অষ্টগ্রাম - ভৈরব-কুলিয়ারচর এলাকার নৌকাই এককালে এ জেলাবাসীর জীবন-জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ইত্যাদির একমাত্র অবলম্বন ছিল। বাকি উপজেলার মধ্যে হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য-যাতায়াত নৌকার মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর যোগাযোগ ছিল।

কিশোরগঞ্জে এককালে বেদে ও গাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করত। এসব সম্প্রদায়কে ঘিরেই কিশোরগঞ্জের নরসুন্দা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে পরবর্তীকালে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস নির্মাণ হয়। কোষা-কোষি, ডিঙ্গা-ডিঙ্গি, কুন্দা-কোন্দি, পাতাম, খিলুয়া, সরঙ্গা, ভাওয়াইল্যা, পানসী, রপ্তানী, গইস্তা, উদলা, দৌড়ের নাও ইত্যাদি নানা আকৃতি-প্রকৃতির নৌকা কিশোরগঞ্জের নৌশিল্পের গঠন। বিশেষ করে বাজিতপুরের পাতাম নৌকার চ্যাপ্টা গলুই বিশিষ্ট, উভয় গলুই চ্যাপ্টা হলেও সামনের অংশ সমতল পৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ঠ উঁচু। পাতাম অন্য নৌকা থেকে সর্বাপেক্ষা মোটা ও দীর্ঘ। এ নিয়ে লোকছড়ায় উল্লেখ আছে-বাজিতপুইর‍্যা পাতাম নাও/ উল্টা দিকে বাও। সাধারণত নৌকার পেছন অংশ উঁচু থাকে কিন্তু এ নৌকার পেছন দিক পানির প্রায় সমতল। ডিঙ্গি জাতীয় পানসী ভাওয়াইল্যা উচ্চ বিত্তদের বিলাস-বাসন এবং 'নাইত্তর' যাতায়াতে ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়ে মৈমনসিংহ গীতিকার রূপবতী পালাকাব্যে উল্লেখ আছে- বাপের বাড়ির পানসীরে কোথায় চল্যা যাও/ মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও। দেওয়ান ভাবনা পালাকাব্যে আছে- ভাওয়াইল্যা সাজাইতে কইল আপন শ্বশুরে/ পতি উদ্ধারিতে কন্যা যায় ভাবনার ঘরে। ঘর বাড়ি নির্মাণে প্রাচীন কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে কাঠ মিস্ত্রিদের কাছে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলার সংস্কার রয়েছে।

প্রবাদে উল্লেখ আছে- দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা/ পূর্ব দুয়ারী তার প্রজা/ উত্তর দুয়ারীর মুখে ছাই/ পশ্চিম দুয়ারীর খাজনা নাই। নিকলী উপজেলার সাইটধার নামক এলাকার প্রাচীন চন্দ্রনাথ গোসাইর আখড়াতে কাঠশিল্পের অসাধারণ কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তার মধ্যে নকশাকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনি। বাংলার প্রাচীন চিত্র রীতিতে খোদাই করে উৎকীর্ণ রয়েছে। কটিয়াদী ভোগ বেতাল গোপীনাথ জিউর মন্দিরের অভ্যন্তরে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত কাঠের তিনটি প্রাচীন বেশ বড় আকারের মূর্তি রয়েছে। নিকলী মোহরকোনা নামক এলাকায় লাল গোসাইর আখড়ার অভ্যন্তরে প্রাচীন দারুশিল্পের কাঠের ফ্রেমে তৈরি বেশ কিছূ দেব-দেবীর মূর্তির দৃশ্য অযত্নে পড়ে আছে। কিশোরগঞ্জে কোন জমিদার-তালুকদার বাড়ির পুরাতন 'পালঙ্ক' গুলো এ এলাকার দারুশিল্পের ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

৫. ঘর-বাড়ি-শিল্প

কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে কথায় কথায় প্রবাদ বলে- ছাপরবনের টুই উদাম। আর এই ছাপরবন কারিগর শিল্পীরা এককালে এ জেলার সৌখিন কাজগুলো তারাই নির্মাণ করেছিল। তবে তাদের নিজেদের বাড়ি ঘরের অবস্থা ভাল ছিল না বলেই তাদের প্রতি এ প্রবাদ বলা হয়ে থাকে। আজকের যুগে দালান বাড়ি তারও আগে টিন কাঠের ও পূর্বে বাঁশ-বেত, শন-ছন-বন-হলদে খড়ের ঘর থেকে শুরু করে সৌখিন বাংলা ঘর তৈরি করতেন। এককালে মাটির ঘরও ছিল। এখনও এ জেলার পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, কটিয়াদী ছাড়াও জেলা সদর কিশোরগঞ্জ শহরস্থ খড়মপট্টি জোড়া পুকুর পাড়ে একটি বাসা বাড়িতে মাটির ঘর দেখতে পাওয়া যায়। উজান-ভাটির-হাওর অঞ্চলে এককালে টিন কাঠের তৈরি দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ি ঘর দেখা যেত।

এখনও কিছু কিছু পূর্বের তৈরি দ্বিতল, ত্রিতল বাড়িঘর পুরোনো স্মৃতি হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জের লৌকিক গৃহনির্মাণ শিল্পের চিরায়ত উপকরণ বাঁশ-বেত-কাঠ-টিন-ছন-বন-নলখাসড়া-ইকর-পাটশোলা, তালপাতা, তালগাছ, সুপারিগাছ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাড়িঘর বলতে- কাচারি বাড়ি, বাইরঘর , বৈঠকঘর, রান্নাঘর, বাংলাঘর, গোয়াইল ঘর, জুম্মাঘর, মণ্ডপঘর, আর্চালা ঘর, নাটমন্দির, ঢেঁকি ঘর, আঁতুর ঘর , আটচালা ঘর, চৌয়ারী ঘর, দু'চালা ঘর, বারোয়ারি ঘর, চারচালা ঘর, চৌচালা ঘর, চৌকারি ঘর ইত্যাদি নামকরণে বাড়ি ঘর নির্মিত হতো। আর এসব নির্মান শিল্পীদের বলা হতো 'ছাপরবন'। বাড়ির নিকানো বড় আঙ্গিনাকে বলা হয় উঠন স্থানীয় ভাষায় 'উডান'। সাধারণত কিশোরগঞ্জের বাড়িঘরের বাহিরে ও অভ্যন্তরে বাঁশের তৈরি ঝাঁপ বা ভেলকির কারুকার্যে ছাপরবনদের বিকল্প নেই। গৃহগুলোর বেড়া জাতীয় দেয়াল তৈরিতে আজও ছাপরবনদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। এক সময় দরজা-জানালা, দরং-দেউরি-জাফরি-ঝাঁপ-ভেলকি ইত্যাদিতে যে অলংকরণ কাজ করত তাদেরই ছাপরবন বলত। বিশেষ আলপনা চিত্রে সুন্দিবেত দ্বারা সুদক্ষ হাতের সুনিপুন লতা-পাতা-ফুল নকশা করা কাজ আজ ও তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার পির সাহেব বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য মণ্ডিত ঘরের নাম 'জুইতের ঘর' অন্যটির নাম 'জলটুঙ্গি ঘর' আজও বিখ্যাত। কিশোরগঞ্জের বত্রিশ এলাকার প্রামাণিক বাড়ির দিঘিতে প্রতিষ্ঠিত জলটঙ্গি নামক ঘরটির অতীত স্মৃতি চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

৬. নকশিকাঁথা

সাধারণত কাঁথা গ্রাম বাংলার মেয়েদের শিল্প। কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে বাংলার গ্রামীণ মহিলা শিল্পীরা এ কাজ করে থাকে। নক্শি কাঁথার কাঁচামাল হলো পুরানো শাড়ি ও শাড়ির পাড় থেকে আহরিত রঙিন সুতা। কিশোরগঞ্জের কাঁথায় আছে রং এর উজ্জ্বলতা এবং বাটিকের সাবলীলতা। কাঁথার মটিফ কিন্তু ধার করা নয়। সমাজেরই পারিপার্শ্বিকতা থেকে তা নেওয়া। হিন্দু-মুসলমান ভেদে কিশোরগঞ্জে মুসলিম রমনীদের কাঁথা শিল্পে অবদান বেশি। নক্শি কাঁথা নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন : লেপ কাঁথা, সুজনী কাঁথা, নক্শি থলে, বর্তন ঢাকনী, রুমাল কাঁথা, দস্তরখান, আরশীলতা, বালিশের কভার, পান প্যাচনী, জায়নামায কাঁথা, থলে, বোচকা কাঁথা, পবিত্র কুরআনের গিলাফ

www.pathagar.com

ইত্যাদি। হিন্দু রমনীদের তৈরি কাঁথা সাধারণ সাজ-সজ্জা আর মুসলিম নারীদের কাঁথাগুলো শিল্পজাত লোকজশিল্প। কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চল থেকে উঁচু এলাকায় নক্‌শি কাঁথার প্রচলন বেশি এবং কারুকাজের দিক থেকেও অনেক পার্থক্য।

বর্তমানে এ শিল্প আধুনিকতার চাপে অবলুপ্তির পথে। হয়ত কোন কোন সৌখিন লোকের ঘরে দু'একখানা কাঁথা আজও টিকে আছে। এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে, কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত লোকঐতিহ্য সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুরের কাছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাঁথা সংগৃহীত রয়েছে। মাঝে মধ্যে এগুলোর প্রদর্শনী হয়। নিম্নে কাঁথার পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

লেপকাঁথা-গায়ে দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে শীত নিবারণের জন্য এক ধারণের কাঁথা। অলংকরণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে এটি ভারি কাঁথা নামেও পরিচিত। অর্থাৎ মোটা কাঁথা।

সুজনী কাঁথা-ঘরে বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহৃত এবং নক্‌শী যুক্ত। এটি পাতলা বা হাল্কা ধরনের কাঁথা।

নক্‌শি থলে-পান, সুপারি রাখার জন্য বিশেষ করে তৈরি ঠাস বুনন নক্‌শি যুক্ত থলে কাঁথা।

বর্তন ঢাকনি-অতিথি আপ্যায়নের সময় স্বচ্ছল পরিবারে খাবারের থালা ঢাকা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত নক্‌শাযুক্ত কাঁথা।

রুমাল কাঁথা-এটি শুধু রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত, হাল্কা নক্‌শাযুক্ত এক ধরনের বিশেষ ছোট কাঁথা।

দস্তরখান-অনেক অতিথি একসাথে খাওয়ার সময়ে বর্তনের নিচে ব্যবহার করা হয়। নক্‌শা স্বল্প। বাসনের নিচের বিছানা কাঁথা।

আরশীলতা-আয়না, চিরুনী জড়িয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত। সাধারণত লতাপাতা ফুল ও জ্যামিতিক নক্‌শাযুক্ত হয়ে থাকে এই কাঁথা।

বালিশের কভার-বালিশের উপরে ঢাকনা হিসেবে ব্যবহৃত। অত্যন্ত কারুকার্য মণ্ডিত। দেখতে চমৎকার ও আকর্ষণীয়।

পান প্যাচনি-পান পেঁচিয়ে রাখার জন্যই এর নাম পান প্যাচনি। ঠাস বুনন ও নক্‌শা যুক্ত ছোট আকারের কাঁথা।

জায়নামায কাঁথা-নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মসজিদের মিনার এবং জ্যামিতিক নক্‌শা যুক্ত রঙিন সুতায় বুনন কাঁথা।

বোচকা কাঁথা-পোটলা বাঁধার জন্য অত্যন্ত কারুকার্য মণ্ডিত কাঁথা।

কুরআন শরিফের গিলাফ- পবিত্র কুরআন শরিফকে ঢেকে বেধে রাখার জন্য জ্যামিতিক নক্‌শা যুক্ত হয়ে থাকে এই কাঁথা।

আসন কাঁথা-মিলাদে মৌলভী, বিয়েতে বর, পূজায় পুরোহিতদের বসার জন্য যে কাঁথা তাহলো আসন কাঁথা।

বায়তন কাঁথা-বইপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র মোড়ানো বা ঢাকার জন্য কাঁথা হলো বায়তন কাঁথা।

www.pathagar.com

মটিফ কাঁথা-প্রতীক ধর্মী বা রীতিবদ্ধ চিত্র অঙ্কিত হয়। যেমন-জীবন বৃক্ষ, পদ্ম, চাঁদ, তারা, চক্র, বৃক্ষ, আয়না, চিরুনী প্রভৃতি।

পাইর কাঁথা-শাড়ির পাইর বলতে আচলের শেষ দুই প্রান্তের অথবা মাঝখানে আড়া, খাড়া, বা তেসরা ডোরাকাটা সেলাইয়ের কাঁথাই পাইর কাঁথা।

শিশুর কাঁথা- নবজাত শিশু থেকে কোলের শিশু অথবা একটু বড় শিশু যারা বিছানায় প্রশ্রাব করে দেয় তাদের ব্যবহৃত কাঁথাই শিশুর কাঁথা। শিশুর বিছানা ও গায়ে দেবার জন্য তিন প্রকার কাঁথা ব্যবহৃত হয়। যেমন-চিত্রিত কাঁথা, মটিফ কাঁথা ও পাইড় কাঁথা। বর্তমান যুগে শিশুর ব্যবহারিক দিক দিয়ে প্রচলিত কাঁথাই সমাজ সংসারে উল্লেখযোগ্য কাঁথা। বাংলার নারীদের সূচিকর্মের তাগিদেই নকশি কাঁথার জন্ম হলেও এর কারু কর্ম লোকশিল্পের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সৃষ্টি। কাঁথায় প্রস্ফুটিত চিত্রগুলো অবলোকন করলে সত্যিই অশিক্ষিত কোথাও নিরক্ষর বঙ্গ ললনাদের রসবোধ শিল্প চেতনা এবং নান্দনিকতার যে পরিচয় মেলে তা অবাক হওয়ারই কথা। এখন গ্রামাঞ্চলে পূর্বের ন্যায় নকশি কাঁথা আর তেমন তৈরি হয় না। যা হয় তা সাধারণ কাঁথা হিসেবে পরিচিত। নকশি কাঁথার লোকশিল্প বিলুপ্তির পথে সেই সঙ্গে আমরা হারাচ্ছি বঙ্গ নারীদের এক অমূল্য সম্পদ। যার কৃতিত্ব একমাত্র গ্রাম বাংলার নারীদের। এককালে কিশোরগঞ্জের কাঁথাশিল্প ছিল অধিকতর সমৃদ্ধ।

৭. বাঁশ-বেত-শিল্প

শহরের কিছু দালান কোঠা বা আধা পাকা বাড়ি ছাড়া কিশোরগঞ্জের সর্বত্রই বাঁশ ও বেতের প্রচলন রয়েছে। বলতে গেলে বাঁশ বেত ছাড়া গ্রামীণ জীবন অচল। কিশোরগঞ্জ, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, কুলিয়ারচর, এমনকি ভৈরব উপজেলার মানিকদী গ্রামে এখনও প্রচুর বাঁশ জন্মায়। ভৈরব উপজেলার একটি জনপদের নাম রয়েছে 'বাঁশগাড়ি'। ঘরবাড়ির কারুকীর্তির উৎস ঝাপ, বেড়া, দরজা, ভেলকী ইত্যাদি। যারা ঘরের উপরোক্ত জিনিস তৈরি করে তাদের বলা হয় 'ছাপরবন' (ঘরামি)। কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে স্বচ্ছল গৃহস্থ পরিবারে এক সময়ে ঝাপ, দরজা বা ভেলকির প্রচলন ছিল। এখনও গ্রামে পুরানো দিনের বনেদী বাড়িতে এর কিছু নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। দরজা বা ভেলকির যে সূক্ষ্ম কাজ শুধু বাঁশ বেতের দ্বারাই হতে পারে তা চোখে দেখা ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না।

বাঁশ বেতের আর একটি উপকরণ হলো কৃষি কাজে ব্যবহৃত কৃষকের উপকরণ যেমন-মাথাল, বিন্দার ফাল, ঢাল, ঘুটনী, কুলা, ডালা, চালনী, খাঁচা, কাঠা, সের হাতপাখা ইত্যাদি। আর মাছ ধরার জন্য উইন্যা, চাই, বানা, ডুলা, খলুই ইত্যাদি কিশোরগঞ্জের প্রতি অঞ্চলেই বহুল প্রচলিত। কিশোরগঞ্জে অনেক গ্রামের নাম পাওয়া যায় বাঁশহাটি। দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য বাঁশের ঝাঁড়। বাঁশ বেতের পাটি এবং মুত্তার বেতের পাটিও এক সময়ে প্রচুর তৈরি হতো এবং এগুলো এত সূক্ষ্ম কারুকাজ মণ্ডিত যে তা কলকাতা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সংরক্ষিত ইংরেজ কালেক্টর সাক্সির গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে। বাঁশের, বেতের জায়নামায, পাটি এবং চাটাই প্রতি অঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিশোরগঞ্জে একটি

www.pathagar.com

গ্রামের নাম রয়েছে কাতিয়ারচর অন্যটি সুন্দিরবন। এতে প্রমাণ করে কাতিয়া অর্থাৎ বাঁশের চাটি অন্যটি সুন্দি বেত থেকে সুন্দিরবন নামকরণের উৎপত্তি। বাঁশ বেত শিল্পীর শিল্প প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন বার বাংলার ঘর। মৈমনসিংহ গীতিকায় বার বাংলার ঘর, বাংলাঘর, বার দুয়াইর‍্যা ঘর ইত্যাদি বহু নামে এ শিল্পীদেরই জয়গান করা হয়েছে। অর্থাৎ কিশোরগঞ্জে এসব ঘর নির্মাণের কারিগরদের বসতি ছিল। এখনও তাদের উপস্থিতি কিশোরগঞ্জে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে এক সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র তৈরি হতো বাঁশ ও বেত দিয়ে। গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বাঁশ বেত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য জিনিসপত্র নিজের মত সুন্দর করে বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি হয়। কারুকাজ সম্পূর্ণ অনেক জিনিস তৈরি হয় এর মধ্যে দারি, ছাড়ি, জায়নামায, পার্টিশন, সিলিং, ছাই বা উনিয়া, যাকে মাছ ধরার ফাঁদ বলা হয়। খাঁদি কাছা বা জাহুন, উড়া, মুড়া, ঘরের বেড়া সহ অনেক জিনিস বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়, এই বাঁশ দিয়ে। এক সময় এদেশে বাঁশ শিল্পের কারুকাজ সম্পূর্ণ পেশাদার কারিগর ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্লাস্টিক জাতীয় সামগ্রী আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া চাহিদার অনুপাতে লোকশিল্পগুলি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বাঁশ ও বেত শিল্পে নির্মাণ প্রক্রিয়া ও ব্যবহার কৃত হাতিয়ার এর মধ্যে প্রধান হাতিয়ার হলো দা। দা দিয়ে বাঁশ কেটে বিভিন্ন কাজে কারুকাজ দিয়ে তৈরি করে এই সব জিনিস পত্র। বাঁশ হলো এ শিল্পের প্রধান সামগ্রী।

৮. পটচিত্র

লোকচিত্র বা লোকজচিত্রেরই একটি মাধ্যম হচ্ছে পটচিত্র। মোটা কাপড়ে পটচিত্র কাহিনি চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করতেন। লোকচিত্রের মধ্যে পটচিত্র একটি প্রাচীন চিত্র পদ্ধতি। যারা পটচিত্র অংকন করে থাকেন তাদের বলা হয় 'পটুয়া'। কিশোরগঞ্জও 'পট' আঁকার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এখন তা বিলুপ্ত প্রায়। কিশোরগঞ্জ বিশেষ করে 'ভাটি অঞ্চলে' পটুয়াদের বিশেষ প্রভাব ছিল। পটুয়ারা সাধারণত হিন্দু আচার্য শ্রেণির ব্রাহ্মণ, তবে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান পটুয়াও দেখা যায়। মনে করা হয় মুসলিম আমলে এর প্রসার ঘটে। তারা সাধারণত গাজীর পট দেখিয়ে বেড়াতেন। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় আছে জঙ্গল বাড়ির দেওয়ান ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুরের কন্যা সখিনার চিত্র পট দেখেই প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন।

এছাড়া পটচিত্রের মধ্যে কিশোরগঞ্জ এলাকার 'রাজা হরিশচন্দ্র', 'রামায়ণের কাহিনি', 'কৃষ্ণলীলা', 'বেহুলা লক্ষীন্দর কাহিনি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজে গৃহস্থ বাড়িতে গৃহপালিত গরু বাছুরের কল্যাণ কামনা, বাড়িঘরে উইপোকা ধ্বংস এবং বিভিন্ন রোগ বালাই নিবারণের জন্য কিশোরগঞ্জে লৌকিক পির গাজীর পালার পট পালা ক্রমে গীত হতো। এখন পট আর পটুয়াদের দেখা যায় না। এককালে কিশোরগঞ্জে বৈদ বা বাইন এবং গাইন নামক সম্প্রদায় শ্রেণির লোকেরা পট ব্যবসা ও পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। নাগারচি নামক মুসলিন সম্প্রদায়ের লোকেরাও পট চিত্রের কাহিনি গীত সুরে গ্রামে গ্রামে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বর্তমানে এসব উল্লিখিত সম্প্রদায়ের লোকেরা নানান পেশায় জড়িত রয়েছেন। পটচিত্র বা পটশিল্প এ অঞ্চলে খুব একটা প্রচলিত নয়। নিকলী উপজেলার নিকরহাটি নামক গ্রামে প্রাচীন

www.pathagar.com

লোকচিত্রশিল্পী ইলিয়াস সিকদার অন্যসব চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি পটচিত্র কাপড়ে অঙ্কন করতেন। জানা যায়, এককালে কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমির প্রাচীন চিত্রশিল্প ইলিয়াস সিকদারের হাতে আঁকা ছিল। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইলিয়াস সিকদারের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্পগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। তার হাতে আঁকা নিকলী গোড়াচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কাঠের তৈরি মডেল বা নক্শা সেটিও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের সময় বিনষ্ট হয়ে যায়।

৯. নকশিপাখা

হাত পাখা গ্রাম বাংলার ব্যবহারিক জিনিসের মধ্যে একটি। তা থেকে কিশোরগঞ্জও পৃথক নয়। গরমের দিনে প্রখর রৌদ্রে ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য গ্রামের মানুষের কাছে পাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। খরতাপ থেকে শরীর শীতল করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলেও গ্রামের মেয়েরা পাখা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকর্মও যোগ করেছেন একান্তভাবে মনের নান্দনিক তাগিদে। নিকলী দামপাড়া গ্রামে হিন্দু রমনীদের হাতে তৈরি বাঁশ বেতের পাখা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং সুক্ষ্ম কারুকার্যে বিখ্যাত। হাত পাখার উপাদানের মধ্যে কাপড়, তালপাতা, পাটি, বাঁশ বেত, ছন, কাঁশ সুপারি গাছের খোল ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাপড়ে সুতা দিয়ে সূচীকর্মের মাধ্যমে তৈরি হয় এক প্রকার "কাপড়ের পাখা" এবং পারিপার্শ্বিক নানা মটিভের সংযোজন হয়ে থাকে।

বাঁশের বেত দিয়ে যে পাখা তৈরি হয় তা প্রথমে বেতকে রঙিন করে পরে বুননের মাধ্যমে নক্শা অংকন করে থাকে। ছন কাঁশ জাতীয় পাখাও সুতার সাহায্যে যুক্ত করে জ্যামিতিক নক্শা ফুটিয়ে তুলে। পাটিতে নক্শা কেটে পাখা তৈরি হয়। এছাড়াও 'লেখাপাখা' বলে একধরনের "ফুল তোলা পাখা" হয় এবং তা সাধারণত কাপড় অথবা বাঁশের বেতের বুননের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এতে সমাজ জীবনের অনেক নীতিকথা ও সুবচন উৎকীর্ণ থাকে। যেমন :

১. হাত পাখা নড়ে চড়ে
বন্ধুর কথা মনে পড়ে।

২. সোনার হাতে রূপার পাখা
ভুলিও না আমার কথা।

৩. সুন্দর হাতে পাখা ধর
আস্তে আস্তে বাতাস কর।

৪. নদীর জল ঘোলাও ভাল,
জাতের মেয়ে কালোও ভাল।

৫. ফুল তোলা পাখা
আদর সোহাগ মাখা।

৬. শীতে তুমি লুকিয়ে থাক
গরমে দাও দেখা
আদর করে নাম রেখেছি
তাইত তোমায় পাখা।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে সুপারি খোলের পাখা, বাঁশের পাখা, তালের পাখা, কাপড়ের পাখা, চাটাই পাখা, সুতার পাখা, মুক্তা বেতের পাখা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এক ধরনের চিত্র পাখা, লেখা পাখা কোনোটাতে এক ধরনের মুখোমুখি দুই পাখি কোনোটাতে 'মনে রেখো' বা 'ভালোবাসা' ইত্যাদি বাণী লেখা পাখা সাধারণ মানুষের গরমের দিনের নিত্য সঙ্গী। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে পাখাকে আঞ্চলিক স্থানীয় ভাষায় 'পাঙখা' কোথাও 'পাহা' বলা হয়। গ্রাম-গঞ্জে যেভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে তাতে আবারো ঘরে ঘরে হাত পাখার প্রচলন বা ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাংখা ও পাহা এ দুটি শব্দই কিশোরগঞ্জের উজান-ভাটির হাওর জনপদে ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়। তাই 'পাখা আমার সখা'।

১০. নকশিপিঠা

যে চালে ভাত হয়, সে চালেই পিঠাও হয় সেই চাল, পিঠা, ভাত নিয়ে কিশোরগঞ্জে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে-

পিঠা অইলো চিটা চিটা
পুইরা অইলো ছাই
পিঠার চাল দিয়া
ভাত রাইন্ধা খাই।

পিঠা তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপরিচিত। পিঠার প্রধান উপকরণ চালের গুড়োর সংগে নারিকেল, গুড়, দুধ, তালের রস, কলার রস মিশিয়ে কখনো পানিতে সিদ্ধ করে কখনো পুড়িয়ে, কখনও ভাপে দিয়ে বা তেলে ভেঁজে নানা রকম রসে বা সিরায় ভিজিয়ে তৈরি হয় উপাদেয় খাদ্যবস্তু। এমনকি ঝাল জাতীয় পিঠাও তৈরি হয়। বিভিন্ন পিঠার নামও আলাদা। যেমন- নক্শি পিঠা বা পাক্কন পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ পিঠা, পুলি পিঠা, কলার পিঠা, তালের পিঠা, মেরা পিঠা, ভাপা পিঠা, ডোবা পিঠা, চ্যাপা পিঠা, পোড়া পিঠা, থামি পিঠা, ভাতপিঠা, ছিটারুটি পিঠা, পাটি সাপটা পিঠা, তিলের পিঠা, তেলের পিঠা, চাছি পিঠা, আন্দেশা পিঠা, কড়ি পিঠা, মালপোয়া পিঠা, ক্ষীর পুলি পিঠা, মালাই পিঠা, নারিকেল ভাজা পুলি, চই পিঠা, দুধ পায়েস পিঠা, লাউ পায়েস পিঠা, লবঙ্গ পিঠা, লরি পিঠা, পুতুল পিঠা, জামাই পিঠা, হলদি পিঠা, মসলা পিঠা, বড়া পিঠা, সিঙ্গারা পিঠা, দুধ চিতই, সমসা পিঠা, দুধ পুলি, সেমাই পিঠা, ঝাল শেওই, হাজারি গুড়ের পায়েস, খেজুরের রসের পায়েস, দুধ শিন্নি, দুধ বরফী, ক্ষীর, ফির্নি, জর্দা নিমকী ইত্যাদি। তবে লোকশিল্পের নিরিখে ও শিল্প কর্মের দিক থেকে নক্শি পিঠাই সবার সেরা। এ পিঠা শুধু বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু অঞ্চলে তৈরি হয়ে থাকে। নক্শি পিঠার নক্শার মটিফ সাধারণত লতাপাতা, ফুল, ব্যবহারিক তৈজসপত্র, মাছ, পাখি ইত্যাদি।

নক্শা তৈরির উপকরণ অতি নগন্য খেজুর কাটা, সুই, মন কাটা, বাঁশের ছিলকা। এগুলোর সাহায্যে অভিজ্ঞ হাতের নিপুণতায় অতি সূক্ষ্ম দাগ কেটে বিভিন্ন নক্শা করে থাকে। এ সব পিঠার সুন্দর নামকরণও রয়েছে। যেমন-কাজল লতা, শঙ্খ লতা, হিজল লতা, সজনে পাতা, ভেট-ফুল, উড়িফুল (সিমের ফুল), কন্যা মুখ, জামাই মুচরা, সতিন

www.pathagar.com

মুচরা, সাগর দিঘি ইত্যাদি। মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে-রসমলাই, রসগোল্লা, কাচাগোল্লা, দই, সন্দেশ, ছানা সন্দেশ, বরফি-সন্দেশ, কালোজাম, জিলাপী, মোহনভোগ, লালমোহন, ছানামূখী, চমচম, খাজা, গজা, আমেত্তি, বুন্দা, রাজভোগ, মলাইকারি।

১১. আলপনা চিত্র

আলপনা শব্দটিই আসলে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস জাত। আইল প্রস্তুত করা বা আলপনা চিত্র দ্বারা সীমারেখা অংকনের জন্যই মূলত মেয়েরা আলপনা এঁকে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হলেও আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত শিল্প প্রকরণ। আলপনা আঁকার জন্য প্রধান উপকরণ আতব চালের গুড়ো। চালের গুড়ায় একটি নেকড়া ভিজিয়ে হাতের তালুতে রেখে মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা আঁকা হয়। বিয়ের কুলা, ডালা, ঘরের মেঝ ইত্যাদিতে আধুনিক আলপনায় রংয়ের ছোয়া লাগায় তা বিচিত্র রং- এ রঞ্জিত হয়েছে। কিশোরগঞ্জের শহরে ও শহরতলী অঞ্চলেই আলপনার ব্যবহার অধিক, তবে থানা বা গ্রাম পর্যায়ে আলপনা আঁকা ও হয়ে থাকে। মৈমনসিংহ গীতিকার 'কাজল রেখা' নামক পালা কাব্যে উল্লেখ আছে–

আলপনা আইক্যা কন্যা জ্বালে ঘরেতে বাতি
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি।
জোড়া টাইল আঁকে কন্যা আর ধান ছড়া
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা ঘর লক্ষীর পাড়া।

আলপনার ভিতর দিয়ে গ্রাম বাংলার হাজার বছরের বঙ্গ ললনা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মকর্মের বাইরেও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার মুক্ত বুদ্ধি বিকাশে স্বীয় চিত্ত বৃত্তির এক অপরূপ রূপ চরিতার্থতার পথ দেখিয়েছেন-এখানে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একদা রান্নাঘর ছিল নারীদের শিল্পশালা, আলপনা শোভিত আঙিনা উঠান ছিল তাদের চিত্র শালা, পিড়া বারান্দা, নামারূপ কারু খচিত সামান্য পাটের দড়ির শিকা, মাটির হাঁড়ি রঞ্জিত চিত্রিত শোভা -এ সকল ছিল তাদের চিত্র শিল্পগুণ। আলপনা যে ধরনের ছিল তার হিসেব মেলে না। ফুল, ফল, লতা, পাতা, নদ-নদী, মাছ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, চন্দ্র, তারা, সূর্য, নক্ষত্র এ ছাড়াও কুলাচিত্র, ঘটচিত্র, দেয়াল চিত্র, সরাচিত্র, হাঁড়ি চিত্র; ধানছড়া, কলমীলতা, পিঁড়িচিত্র ইত্যাদি। আলপনার রং এর সাথে কখনো কখনো সিন্দুর ও ইটের গুড়ি, কালো ছাই ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। গোবর মিশ্রিত আলপনা সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে আঁকা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্রত পূজা পার্বণে সর্বদা আলপনা আঁকা হয়। লৌকিক আলপনা চিত্র গুলোই গ্রাম-বাংলার পল্লি জীবনের দৃশ্য দেখা যায়।

আলপনা

www.pathagar.com

১২. পাটশিল্প

কিশোরগঞ্জে এক সময়ে করিমগঞ্জী নামক পাটের খ্যাতি ছিল। উৎপন্ন হতো প্রচুর। লম্বায় ছিল দীর্ঘ এবং উজ্জ্বল ও শক্ত। এছাড়াও নিকলী উপজেলার দামপাড়া নামক এলাকায় ইংরেজ আমলে পাটের বিখ্যাত কারখানা গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে বিরলা কোম্পানি, চিটাগাং কোম্পানি, ডেবিট কোম্পানি, রেলি কোম্পানি পরবর্তী কালে আদমজী কোম্পানি বাওয়া কোম্পানি প্রভৃতি কোম্পানির পাট ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে বৃটিশ আমলে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এসব কোম্পানিগুলো বিলুপ্ত। ফলে এককালে এ অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হতো বলেই পাটের ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। পাট শিকার প্রধান উপকরণ হলেও নক্‌শি ও কারুকার্যের জন্য এতে রঙিন সুতো, পুতি, ঝিনুকের বোতাম, কড়ি এমনকি এঁটেল মাটির গোলক করে শুকিয়ে তাও ব্যবহৃত হয়।

কিশোরগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন ধরনের নক্‌শি শিকা প্রচলিত। তা মাটির হাঁড়ি, কলসি, বোতল, ঠুলি ইত্যাদির জন্য অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিকার ব্যবহারিক ও কারুকার্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে অবহিত করা হয়। যেমন- কবুতর খুপী, তারাফুল, ইচার ঠ্যাং, টাকাফুল, চড়াফুল,উড়িফুল, বেঁটফুল, হিজলপাতা, কাজলপাতা ইত্যাদি। পাট ও শিকা তৈরির উপকরণ। শিকাগুলো সাধারণত মুঠাশিকা, নেংটা শিকা, চাক শিকা ও কড়ি শিকা নামে খ্যাত ও পরিচিত। কিশোরগঞ্জের সর্বত্র শিকা ব্যবহৃত হয়।

১৩. কাগজ শিল্প

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর সগরা নামক গ্রামের পাশের গ্রামের নাম রয়েছে 'কাগজী কাটা' গ্রাম। এখানে এককালে কাগজী নামক সম্প্রদায়ের প্রাচীন বসতি ছিল। এরা অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। যতদূর জানা যায়- কারখানায় তৈরি কাগজের পূর্বে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কিশোরগঞ্জে স্থানীয়ভাবে কাগজ তৈরি হতো। কাগজ তৈরির প্রধান উপাদান পাটের সংগে শামুক বা ঝিনুকের চুনের মিশ্রণ দেওয়া হতো। আট-দশ দিন ভিজিয়ে রাখার পর ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে থেতলান মণ্ড তৈরি হয়। এরপর পরিষ্কার পানিতে রেখে শক্ত কাঠি দিয়ে নেড়ে মিশ্রণের পর কাগজের সাইজ মত বাঁশের তৈরি খাঁচায় রাখা হয়। পানিতে ডোবানো পাতলা মণ্ড এদিক ওদিক হেলিয়ে দুলিয়ে সমভাবে মণ্ড খাঁচার তলায় লাগিয়ে নেওয়ার পর কিছুক্ষণ কাঠের তক্তার উপর রাখা হতো, যাতে সম্পূর্ণভাবে পানি ঝড়ে যায়। তারপর দেয়ালের গায়ে কাগজ খণ্ডটি এঁটে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিট রৌদ্রে শুঁকিয়ে নেওয়ার পর আঁতপ চালের আঠা তুলি দিয়ে মৃদুভাবে কাগজের উপর লাগানো হয়। এরপর আবার রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে ছোট এক টুকরো মসৃণ পাথর দিয়ে ঘঁষে নিয়ে মসৃণ বা পালিশ করে নিলেই কাগজ সম্পূর্ণ লেখার উপযোগী হয়ে যেত। পালিশ করার কাজে শামুকও ব্যবহার করা যায়। তেতুঁল বীচি বা হরিতাল বেটে কাগজ মেখে হরিদ্র রং করা হতো। এর ফলে কাগজে পোকা লাগা এবং কালি চুপসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত।

www.pathagar.com

কাগজশিল্প অষ্টগ্রামে একটি বিরাট কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত কাঁচামালের সহজলভ্যতাই প্রধান কারণ। এখানে শামুক, ঝিনুক ও পাট পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। অষ্টগ্রামে এককালে অনেক ঘর 'কাগজী' নামক সম্প্রদায় স্থায়িভাবে বসবাস করত। তাদের বসতি থেকেই অষ্টগ্রামে 'কাগজী গ্রাম' নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। নামের শেষে অনেকেই 'কাগজী' পদবি ব্যবহার করেন। অনেকে অন্য পেশায় চলে যাওয়ায় এ শিল্প এখন বিলুপ্ত প্রায়। কাগজ শিল্পের ইতিহাস পাঠে যতদূর জানা যায়- মোগল আমলে ঢাকার নওয়াব ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তিনি সরকারি মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ তৈরির জন্য বাংলাদেশে 'কাগজী' সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোককে এনে সে সময়ে ঢাকায় তাদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে দেন। উদ্দেশ্য এদের দিয়ে এ অঞ্চলের উপকরণ দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি করানো এবং এটাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করা। শুরু হলো ঢাকাসহ তার আশে পাশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কাগজ তৈরির কারখানা।

'বাংলাদেশের প্রাচীন হস্তশিল্প কাগজ' এই শিরোনামে সচিত্র বাংলাদেশ জুন ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের এক তথ্যে উল্লেখ রয়েছে- 'ঢাকার নওয়াব শায়েস্তা খাঁ সে সময়ে ঢাকার আশে পাশের শহরতলীতে বসবাসরত প্রায় এক লক্ষ লোক কাগজ তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল।' এই এক লক্ষ লোকের মধ্যে সে সময়ে কিশোরগঞ্জ জেলা সদর, কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রামে যারা বসবাস করত এরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের তৈরি কাগজ সে সময়ে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, চেন্নাই প্রভৃতি অঞ্চলে নিয়মিত রপ্তানি করা হতো। কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে এখনও এ সব 'কাগজী' সম্প্রদায়ের কিছু লোক এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কাগজী কাটা গ্রামে 'কাগজী' সম্প্রদায়ের কিছু লোক বসবাস করেন। তবে তাদের বর্তমান পেশা কাগজ তৈরি নয়, প্রেসে কাগজ কাটা, বুক বাইন্ডিংসহ নানান পেশায় জড়িত। অষ্টগ্রামে যারা বসবাস করেন তাদের বর্তমান পেশা ব্যবসা ও কৃষিকাজ।

এ বিষয়ে 'আদি শিল্প: চিরন্তন সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এম.এ. কাইয়ুম লিখেছেন-বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম ও বাজিতপুর প্রচুর পরিমাণে হাতে তৈরি কাগজ প্রস্তুত হতো। সে সময়ে হাতে তৈরি কাগজ শিল্পে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম একটি বিরাট কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত সহজলভ্যতাই এর সহজ প্রধান কারণ। এখানে নদ-নদী ও জলাভূমি প্রচুর থাকার কারণে শামুক, ঝিনুক ও পাট পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হতো ও পাওয়া যেত যা হাতে তৈরি কাগজ তৈরির প্রধান উপকরণ ছিল। এ শিল্প এখানে এখন বিলুপ্ত। অথচ চালু হলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।

১৪. পাটিশিল্প

পাটির ব্যবহার গ্রাম বাংলার সর্বত্র রয়েছে। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় পাটির ব্যবহার ব্যাপক হারে লক্ষণীয়। কারণ বাঁশ বেতের পাটি এবং মুক্তার বেতের নক্‌শি বা শীতল পাটি এক সময়ে কিশোরগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো। এগুলো এত সূক্ষ্ম

www.pathagar.com

কারুকাজ মণ্ডিত ছিল যে প্রাচীন আমলে কলকাতা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল বলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গেজেটিয়ারে মি. সাক্সির বইয়ে উল্লেখ আছে। নক্শি পাটি, শীতল পাটি, মুত্তারার পাটি, জায়নামায পাটি, আসন পাটি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দোকান ঘরের পাটি, চাটি, চাটাই, বিছানার পাটি, কাতিয়া, কাইত্যা, কিশোরগঞ্জের প্রতি উপজেলা অঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পাটি আর পাখার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। নল-বাঁশ-বেত হলো পাটি তৈরির উপকরণ। এতে সুতার ব্যবহার নেই।

গাছপালা, ঘর-বাড়ি, লতাপাতা, জ্যামেতিক বিচিত্র নকশা মসজিদ-মন্দির-চূঁড়া-হাতি-ঘোড়া-মক্কা শরিফ-মদিনা শরিফ ছাড়াও নানান রঙের তৈরি পাটি পাওয়া যায়। স্থানীয় কারখানা বলতে তেমন কিছু নেই। তবে গ্রামীণ সৌখিন কারিগর শিল্পীরা এসব শিল্পের সাথে জড়িত। এককালের 'ছাপবরণ' শ্রেণির কারিগরগণ অনেকেই এ পেশায় জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। কিশোরগঞ্জ জেলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় বিয়ের আসরে পান-চিনির সাথে শীতল পাটি বা নক্শি পাটি অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার রীতির প্রচলন রয়েছে। বিয়েতে বর-কনের আসন পাতা হয় নক্শি পাটি বা শীতল পাটি দিয়ে। যদিও যৌতুক প্রথা এখন অনেকটাই কমে এসেছে তবুও প্রাচীন কাল থেকেই বর-কনের ব্যবহৃত উপহার গুলোর সাথে নক্শি পাটি দেওয়ার রেওয়াজ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ে রয়েছে। নকশি পাটি বা শীতল পাটি বর্তমানকালে সিলেট এলাকা থেকে আমদানি করা হয়। কিশোরগঞ্জে এককালে মুত্তারার বেতে যে পাটি তৈরি হতো তাকে 'শীতল পাটি' বলা হতো। আজকাল কিশোরগঞ্জে প্রচুর বাঁশ-বেতের 'চাটি-পাটি বা চাটাই' তৈরি হয়। বিশেষ করে সরারচর ও কুলিয়ারচর এলাকায় তৈরি চাটি-পাটি-চাটাইগুলো রেল ষ্টেশন থেকে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জে একটি জনপদের নাম 'কাতিয়ারচর' এখানে এককালে প্রচুর পরিমাণে 'চাটি-পাটি তৈরি হতো। চাটিয়াকে স্থানীয় ভাষায়' কাতিয়া বা কাত্যা বলে। আজও এ অঞ্চলে অনেক বাঁশের ঝাড় চোখে পড়ে। বাংলাদেশে যে কয়টি জেলায় শীতল পাটি তৈরি হতো তার মধ্যে কিশোরগঞ্জ অন্যতম।

১৫. শোলাশিল্প

শোলা এক প্রকার উদ্ভিদ। এর জন্ম জলাভূমিতে। কিশোরগঞ্জ জেলা দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি উজান-অন্যটি নিম্নজলা ভূমি হাওর বা ভাটি নামে পরিচিত। ভাটি কিশোরগঞ্জের নিম্নজলাভূমিতে এককালে প্রচুর শোলা জন্মাতো। স্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মালাকারেরা এ কাজে পারদর্শী ছিলেন। শোলার উপরের ছাল ফেলে দিয়ে ভিতরের সাদা অংশ বের করে নিয়ে বিভিন্ন আকারের টুকরো করে নানা জীব জন্তুর আকৃতি তৈরি করত। এগুলোর মধ্যে ময়ুর, তোতা পাখি ও কুমির। এছাড়া হাতপাখা, হাতী, ঘোড়া, দেব-দেবীর মূর্তি, অলংকার, বিয়ের বর ও কনের জন্য টোপর, মটুক ইত্যাদি। শোলার কাজ মালাকারদের একটি বংশগত পেশা। প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব ও লোকমেলায় মালাকারগণ নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ভাটি কিশোরগঞ্জের হিন্দু ব্রাহ্মণেরা শোলার দ্বারা করণ্ডী চিত্র তৈরি করেন। করণ্ডী চিত্র হিন্দু অধ্যুষিত উজান-ভাটি-হাওর এলাকায় সর্বত্র প্রচলিত।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ সদর শহরাঞ্চলে মালাকার কারিগরগণ এ কাজ করে থাকেন। শোলার মাঝখান দিয়ে ফেঁড়ে পাতি করে বর্গাকৃতি মন্দিরের ফ্রেম তৈরি করা হয়। তার সম্মুখভাগের উপর সাদা কাগজ লাগিয়ে চুঁড়া ও নিচে দেয়াল করা হয়। চুঁড়ায় থাকে সর্পবেষ্টিত অবস্থায় পদ্ম ও মনসা দেবীর মূর্তি চিত্র। বেহুলা-লক্ষিন্দর ছাড়াও তপস্যারত মুনি, চাঁদ সওদাগর অঙ্কিত চিত্র থাকে। ভাটি কিশোরগঞ্জের সর্বত্র শ্রাবণ সংক্রান্তিতে করণ্ডী পূজা হয়। পূজা শেষে জলাভূমি নদীতে তা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নিকলী উপজেলার স্থানীয় ব্রাহ্মণ আচার্য শ্রেণির লোকেরা এ পেশায় বংশানুক্রমে করে থাকে। নরেন্দ্র মোহন আচার্য, ধীরেন্দ্র মোহন আচার্য করণ্ডী চিত্র তৈরির পাশাপাশি শীত মৌসুমে 'আকাশ প্রদীপ' দুর্গা মূর্তি, শীতলী মূর্তি, মনসা মূর্তি সহ বাড়ি ঘরে ও নৌকার সামনে রঙের কাজ করে। শোলা এখনও হাওর অঞ্চলের আশে পাশের জলাভূমিতে জন্মায়। অনেক কারিগরকে স্থানীয় লোকেরা 'করণ্ডী' ঠাকুর বলে।

১৬. কাঁসাশিল্প

কিশোরগঞ্জে একসময়ে প্রচুর পরিমাণে পিতল-তামা-কাঁসা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হতো। এতে যেমন রয়েছে প্রয়োজনীয় বস্তু অপর দিকে রয়েছে প্রচুর সৌখিন জিনিস। যেমন- সের, কলস, থালা, বাটি, ঘটি, বদনা, কাঠা, গাড়ু, পানপাত্র, ডাবুর, ছেলা, হুক্কা, হুক্কার স্ট্যান্ড, পুষ্প থালা, চারি, ঢাল, তলোয়ার, ঝাঁঝর, চালনী, কুলা, চামচা, হাতা, অলংকার, টুপি, ঘন্টা, করতাল, মন্দিরা, সরতা, পাঞ্জা, ফুলদানী, আতরদানি, সুরমাদাবি, গহনার বাকস, পুতুল, দেব-দেবীর মূর্তি, জীব-জন্তুর নকশা পুতুল, বুতাম, চিরুনি, হাতের বালা, পায়ের খারু প্রভৃতি। এসব ধাতব দ্রব্য তৈরি ও কারুকাজের সাথে কার্মকার সম্প্রদায়ের ভূমিকা বেশি। এক সময়ে কিশোরগঞ্জে কর্মকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বসতি ছিল। এখনও সমাজে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু সমাজে পিতল-কাসা-তামার তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয় বেশি। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এককালে এখানে মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল-থালা-বাসন-বাটি-গ্লাস-কুপি বাতি জ্বালানোর গাছা, হাতা প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। দ্রব্য মূল্যে পিতল-কাঁসা-তামার দ্রব্যাদি এখন অনেকটা ব্যবহার কমে এসেছে। তবে হিন্দু সমাজের বিয়ে-শাদী, পুজা-পার্বণে এবং ব্যক্তিগত সংসারে এর ব্যবহার এখনও টিকে আছে।

১৭. লৌহশিল্প

লোহার তৈরি দ্রব্য সামগ্রীর প্রায় সবগুলি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহার তৈরি দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া গ্রাম-বাংলার জীবন নির্বাহ দুরূহ। লৌহজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী সম্প্রদায়কে 'কামার' বলা হয়। প্রবাদ আছে-

পথ অ পাইলাম কামার
দা' ধারাইয়া দাও আমার।

দা, বটি, কাঁচি, খন্তি, কুঁড়াল, কাস্তে, কোদাল, ছেনী, কাটারি, নারিকেল কুড়ানি, সরতা বা যাতি, বর্শা, বল্লম, ছুরি, রামদা, খড়গ, শাখের করাত, তলোয়ার, তারকাটা, পেরেক, পাতি প্রভৃতি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আদিকাল থেকে কর্মকাররাই এ সমাজের মানুষের সংসারের নিত্য প্রয়োজন মিটিয়েছে। এটাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা।

www.pathagar.com

তবে লৌহশিল্পে কিশোরগঞ্জ সমগ্র বাংলাদেশে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। কিছুদিন আগেও কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার অর্ন্তগত কঁরগাও ও বাজিতপুরের লৌহ সামগ্রী সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে খ্যাত ছিল। বিশেষ করে করগাঁও এর খড়গ ও দা-বটি, বাজিতপুরের দা-বটি-যাতির খ্যাতি সারা বাংলাদেশে এর খ্যাতি বিস্তৃত ছিল। অবশ্য বর্তমানে এ শিল্পের কালপ্রাপ্তিই ঘটেছে। তবে এখনও নিত্য প্রয়োজনীয় লৌহ সামগ্রী কমবেশি করগাঁও ও বাজিতপুর ছাড়াও কিশোরগঞ্জ জেলার সর্বত্র তৈরি হয়। হোসেনপুরের কাঁচি সমগ্র বাংলাদেশে রপ্তানীসহ এর খ্যাতি রয়েছে। ঘর বাড়ি নির্মাণ ও নৌশিল্পে কিশোরগঞ্জের কর্মকারদের লৌহ সামগ্রীর চাহিদা রয়েছে। বর্তমানকালে মুসলমান কারিগর লৌহ সামগ্রী নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে। অনেক হিন্দু কর্মকার শিক্ষা দীক্ষায় পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত। ফলে মুসলিম কারিগর শ্রেণি এ সুযোগে স্থান করে নিয়েছে। মুসলিম সমাজে জনসংখ্যার আধিক্য এটি ও একটি কারণ। যে কোন পেশার তাগিদেই এখন পেশা পরিবর্তন হচ্ছে। তাতে জাতি ধর্ম গোত্র বর্ণের আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব লাজ ভয় নেই। হিন্দু কর্মকার শ্রেণি সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকেই এখন নামের শেষে কর্মকার ব্যবহার করেন না, করেন 'দাস'।

১৮. স্বর্ণ ও শঙ্খশিল্প

অলংকার বা গহনা ব্যবহারের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। স্বর্ণ সকল জাতি ধর্ম গোত্র বর্ণের পুরুষ কিংবা নারী ব্যবহার করেন। কিন্তু শঙ্খ বা শাখা সামগ্রীর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কার-কুসংস্কার জড়িত। নববিবাহিত হিন্দু সম্প্রদায়ের কনেরা বিবাহ উত্তর দুটি প্রতীক হচ্ছে 'সিথির সিঁদুর এবং হাতের শঙ্খ শাখা বা বালা। এই শাখা বালা শ্বেত পবিত্র এবং হিন্দু ধর্মীয় বিবাহের বন্ধনের প্রমাণ প্রতীক চিহ্ন। প্রাকৃতিক বা সামদ্রিক শঙ্খ থেকে স্বর্ণকার বা শাখাড়ি-শাখারু সম্প্রদায় আঙ্গুরীয়, ব্রোস, হেয়ার কিল্প, মঙ্গল ধ্বনি ইত্যাদি তৈরি করেন। ঢাকার বর্তমান শাখারি পট্টির শাখারিয়া কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি ও সদর উপজেলার বয়লা নামক এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীকালে তারা স্থান পরিবর্তন করেন। দেওয়ান ঈশা খার আমলে অনেক স্বর্ণকার ও শাখারি এ অঞ্চলে শরণার্থী হয়ে এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের পেশার স্থায়িত্বকরণে আবারও স্থান পরিবর্তন করে ঢাকায় গিয়ে বসতি নির্মাণ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যে এখন তারা বিখ্যাত। কিন্তু যখনই ঢাকার কোন শাখারিকে বলবেন তখনই তারা তাদের পৈতৃক ভিটে মাটি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ি একং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বয়লা নামক এলাকার কথা গর্ব করে বলে থাকে।

১৯. অলংকার শিল্প

অলংকার দ্বারা দেহ সাজিয়ে রূপ চর্চা করা পৃথিবীর প্রতিটি সমাজেই বিদ্যমান। আধুনিক অলংকার দ্বারা সজ্জাকরণ মানুষ প্রথমেই শিখেনি। প্রাচীনকালে মাটি পুড়িয়ে, তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক, ফলের বীচি এমনকি জীব জন্তুর হাড় দিয়েও সুন্দরীদের লাবণ্য বৃদ্ধি করা হতো। আমাদেরও অলংকারের ইতিহাস প্রাচীন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু কিছু প্রাচীন অলংকারের নমুনা এখনও বিদ্যমান। এদিক থেকে

www.pathagar.com

উপজাতীয় এলাকায় লোক অলংকার এখনও অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। অবশ্য এতে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসই কাজ করে বেশি। কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে হাওর জনপদে আজও লোক অলংকার ব্যবহার এর প্রচলন রয়েছে। নিম্ন আয়ের নারী সমাজের রূপচর্চার এ সমস্ত অলংকার শরীরের অংগ ভেদে নানা নামে পরিচিত যেমন-

মাথার–টিকলী, সিঁথি, শিরবন্দী, সিঁথি পাটি, খোপার কাঁটা, টায়রা, ঝাপটা ইত্যাদি।

নাকের–নোলক, নথ, নাকছাবি, নাকফুল, নাক মাছি, নাক ঠাসা ইত্যাদি।

কর্ণে–মাকড়ী, দোল, টপ, কানবালা, কানপাশা, কানফুল, কড়ি, মদন কড়ি, চক্রবালী, বালি, ঝুমকা, ঢেড়ি প্রভৃতি। কানের উপর অংশ থেকে নিম্নাংশ পর্যন্ত অলংকার পরার রেওয়াজ ছিল।

গলায়–ব্যবহার হতো হাসুলী, চিক, কণ্ঠি, মাদুলী, তাবিজ, দানা তাবিজ, সাতনরী হার, পাঁচলরী হার, চন্দ্রহার, চ্যাম্বেল, নক্ষত্র মাল্লা, চিকদানা প্রভৃতি।

বাহুতে– তাগা, বাজুবন্দ, বোল বাজু, কাঁটা বাজু, অনন্ত, বাক, মাদুলী, ধান তাবিজ, কালসী, পঞ্চকা জাতীয় অলংকার।

হাতের–(বিশেষ করে কব্জিতে) চূড়, বালা, বয়লা, চুড়ি, পৈঁছি, পাটরি, রুলি, কাঁকন, জোড় বালা, অনন্ত প্রভৃতির মধ্যে এখনো অনেকগুলির প্রচলন রয়েছে।

কোমর/নিতম্ব–চন্দ্রহার, কোমরঘিছা, সূর্যহার, গোট, কাঞ্চী, মেখলা, কাঞ্চীদাস, চেইন প্রভৃতি।

পায়ে– ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যে পঞ্চম, খাড়ু বেকঁখাড়ু, মল, ঘুংগুর, নূপুর, মল্লা, তোরা, ঝুমকা, ঝুমকা মল. ঝুমকা, কিংকিনী, পাহুরা ইত্যাদি।

এছাড়া পায়ের এবং হাতের অঙ্গুলিতে বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুটি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। আধুনিক সমাজে নারীদের হাতে-পায়ের অঙ্গুলিতে বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুটি ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। এগুলো কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত। সধবা নারীর নাকফুল ব্যবহারে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি পায় বিধবার অলংকার নিষিদ্ধ। স্ত্রীর নিশ্বাসে যে দূষিত বায়ু থাকে নাকফুল ব্যবহারে তা দূর হয়। তাই বাঙালি সমাজে নাকফুলবিহীন বিবাহ কল্পনাও করা যায় না। স্বামীর দেওয়া নাকফুলে স্ত্রীর উপর অধিকার জন্মে। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে তৎক্ষণাৎ নাকফুল খুলে ফেলা হয়। 'শরীরের আটটি অঙ্গ- মাথা, নাক, কান, গলা, বাহু, হাতের কব্জি, কোমর ও পায়ে আট অলংকার পরার রীতি ছিল এদেশে।' নববিবাহিত বধূর চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বেনি সদৃশ, সিঁথিপাটি, টিকলী, টায়রা, মাপা প্রভৃতি নামে আটাশ রকমের মাথার অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। কানের সৌন্দর্য চর্চার মণিমুক্তাখচিত কুন্তন, মাকড়ি, ঝুমকা, কানপাশা, হীরামঙ্গল কড়ি, বালি, কর্ণফুল, লর্টকন, নবরত্ন প্রভৃতি ত্রিশ রকমের অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। মাঝে মধ্যে যৌগিক গহনা 'চক্রবালি' পুরো কান জুড়ে রাখে। নাকনথ, বোলাক, ত্রোলক, বেশর নথ, নাকফুল, ফুরফুরি প্রভৃতি। গলায় হাঁসুলি, সাতনরী, টাকার ছড়া, মোহনমালা, রত্নহার, পুষ্পহার, গ্রীবাপত্র, সীতাহার, চম্পাকলি, নওরত্ন, বাগানহার, মুক্তার মালা প্রভৃতি। হাতের বাজুতে পরিধেয় অঙ্গদ, তাগা, কেয়ূর, মাদুলি, বাজুবন্দ, মৌলান, তাবিজ প্রভৃতি। হাতের কব্জিতে পরিধেয় বলয় বা বালা, বাহুতি, কঙ্কন, চুড়ি, পাত্রী, কড়া,

www.pathagar.com

মান্তাশা, পাঁইচি, রত্নচূড়, গাহিয়া হস্তপদু প্রভৃতি। হাতের আঙ্গুলে আরশী, ছল্লা, আঙ্গুষ্ঠার, শাহলামী, আনওয়াজ এবং গনরত্নের আংটি প্রভৃতি। কোমরে বিছা, চন্দ্রহার, কিঙ্কিনী, মেখলা। পায়ে ঝাঁঝর, নুপূর, খাড়ু, ঝাঁক খাড়ু, পায়েল, পায়জোড়, আংটি, তোড়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীর দেহ থেকে সকল প্রকার অলংকার পরিধান নিষিদ্ধ।

মুসলিম সমাজেও তাই তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিপরীতও লক্ষ্য করা যায়। তবে হিন্দু রমনীদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিধবা না সধবা তা দেখার প্রতীক বা চিহ্ন হলো শাখা-সিঁদুর। এক কথায় বলা যায় অলংকার ব্যবহারের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকে কালে কালে এখনও প্রচলিত।

২০. কুষ্ঠীচিত্র

নবজাতকের জীবন সর্ম্পকিত ভবিষ্যৎবাণী, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব প্রভৃতি লিখিত ও অঙ্কিত হয় কুষ্ঠীচিত্রে। কিশোরগঞ্জে কুষ্ঠীচিত্রকে 'কুষ্ঠি' বা 'কুর্শীনামা' বলা হয়। সাধারণত নয় ইঞ্চি পাশ এবং পাঁচ-ছয় থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা কাগজে কুষ্ঠী তৈরি করা হয়। কুষ্ঠীতে সংকলিত ছক, পদ্ম ও মানুষের ছবি থাকে। কখনো উপরে ও নিচে দোলন লতা লাল, নীল ও হলুদ রঙে আঁকা হয়। ফরিদপুরে হিন্দু সমাজে কুষ্ঠী গণনার প্রথা প্রচলিত। পূর্বে মুসলমান সমাজেও প্রচলিত ছিল। কুষ্ঠীর মালিক মারা গেলে কুষ্ঠী চিত্রটি পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

২১. পিঁড়িচিত্র

অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও পূজা-পার্বণে হিন্দু সমাজে পিঁড়ি চিত্রিত করার প্রথা রয়েছে। পিঁড়িচিত্র মূলত আলপনাধর্মী। পিঁড়ির চারপাশে দোলানো লতার মাঝে পদ্ম, প্রজাপতি, একবৃন্তে দুইটি ফুল ; অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে দুধের গ্লাস, বাটি চিত্রিত দেখা যায়। কিশোরগঞ্জের হিন্দু সমাজে সাধারণত পিঠালি দিয়ে পিঁড়িতে চিত্র আঁকা হয়। হালে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে পিঁড়িতে আল্পনা আঁকতে দেখা যায়।

২২. কুলাচিত্র

ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্রিত কুলা ব্যবহার রয়েছে। হিন্দুসমাজে বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠান, লক্ষ্মীপুজা, বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলা অঙ্কন করা হয়। কুলাচিত্রে সাধারণত ফুল-লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা থাকে। চিত্রিত কুলা ছাড়া বিবাহের অনুষ্ঠান কল্পনাও করা যায় না। বধূবরণের প্রধান উপকরণই চিত্রিত কুলা। মুসলিম সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান ও পহেলা বৈশাখে কুলা চিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

২৩. পূজায় চিত্র

কিশোরগঞ্জে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে বাড়ির আঙ্গিনা চিত্রিত করা হয়। মাঘমণ্ডল ব্রত, তারা ব্রত, সূর্যপুজা, হ্যাচড়া পূজা প্রভৃতি পুজায় আলামাটি দিয়ে বাড়ির আঙ্গিনা লেপে পিঠালি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করা হয়। মাঘমণ্ডল ব্রত ও তারাব্রতে, নক্ষত্রগুলি চিত্রিত হয়। এছাড়া যেকোন পূজায় কিশোরগঞ্জে আবহমান বাংলার শিল্পী মনের আবেগ অনুভূতির কোমল নারীর হাতের স্পর্শে লোকসংস্কৃতির চিত্র শিল্পের প্রতিফলন ঘটে।

www.pathagar.com

২৪. ট্রাঙ্ক শিল্প

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে এককালে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরিতে স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র কারখানা ছিল। এসব কারখানা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য এক সময় উল্লেখযোগ্য হারে এর ব্যবহার ও বিক্রি ছিল। কিশোরগঞ্জ জেলার সকল অঞ্চলের মানুষদের বিয়েশাদি ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বর্তমান গৌরাঙ্গ বাজার এলাকার বিভিন্ন দোকানে পাইকারি ও খুচরা মূল্যে বিক্রি হতো। বিশেষ করে রঙিন বা আল্পনা আঁকা ট্রাঙ্কগুলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য এখনো অনেকের মনে পড়ে নজর কাড়ে। ট্রাঙ্কের ব্যবহার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অনেকের বাসা বাড়িতে আজও সেই আমলের জিনিস যত্নের সাথেই রক্ষিত আছে। ট্রাঙ্কের দোকান গুলোতেই বর্তমানে ব্যাগ-স্যুটকেস এবং বিভিন্ন রকমারি দ্রব্যের মিলন ঘটেছে। সুগন্ধা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এক সময়ে কিশোরগঞ্জ শহরে প্রথম দিকে ট্রাঙ্কের দোকান ছিল।

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ব্রিটিশ আমলে কিশোরগঞ্জের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষ ধুতি জাতীয় পোশাক পরিধান করতেন। বর্তমানে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু সামান্যতর এই পোশাক চোখে পড়ে। এ যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, শার্ট পড়ে। মহিলা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ পরিধান করে। তবে মুসলমান মেয়ে বা মহিলারা শাড়ি বা সালোয়ার কামিজের উপর বোরকা পড়ে। সকলেই জুতা, সেন্ডেল পায়ে দেয়। এককালে সকলেই বৌলাওয়ালা খড়ম পায়ে দিত। মুসলমান পুরুষ কেউ কেউ মাথায় নানান রঙের টুপি, পাগড়ি পরিধান করে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক গামছা, তোয়ালে, চাঁদর, রুমাল, স্যুয়েটার, মাফলার, জ্যাকেট, কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি ব্যবহার করে। মহিলারাও চাদর, জ্যাকেট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ধরনের পোশাক ছাড়াও টি-শার্ট পরিধান করে। আর্থিক সামর্থের উপর স্বর্ণালংকার, রৌপ্যলংকার, নকল গয়না, প্লাস্টিক, কাঁচের চুড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে।

গ্রামের মেয়েদের মাঝে এখনও নাকের নথ, নোলক, কানের দুল, কড়ি, ঝুমকামারি, কানপাশা, মাকড়ি, গলার হাঁসুলি, তাবিজ, কবজ, পুতি, পুতির মালা, হাতের বাওটি, বয়লা, চুড়ি, বাজু, হিন্দু মহিলারা শুধু বিবাহিত হলে হাতে শাখা অন্যারা কোমরের বিছা, গলার হার, পায়ের খাড়ু, নুপুর, খাড়ু, মল ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিয়ে অর্থাৎ বিবাহ সাদী বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মহিলারা সজ্জিত হয়ে বেড়াতে বের হয় ও ঘরে সাজ করে। বিছা হার মেয়েদের প্রিয় অলংকার। সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্বারা এটি তৈরি হয়। এটা সবসময় মেয়েদের কোমরের নিচে কাপড়ের উপরে থাকে। তাই প্রণয়ী পুরুষ বন্ধুকে বিছার হারের সঙ্গে তুলনা করে তার প্রেম নিবেদনের গান গায় ও রঙ্গিলা বন্ধুরে, তুমি কেন কোমরের বিছা হইলা না।

বিয়ের কনে সাজানোর মধ্যে বেশ জাঁক-জমক আছে। বর্তমানে কনেকে অলঙ্কার-মণ্ডিত করার সামর্থ অনেকের নেই। যাদের অর্থপাচুর্য আছে তারা মেয়েকে অন্তত গলার হার, হাতের চুরি, বালা, কানের দুল, মাথার টিকলি প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। প্রাচীন কালে মেয়েরা যে নানারকম অলঙ্কার পরত তার প্রমাণও মধ্যযুগের ময়মনসিংহের সাহিত্যে রয়েছে। মাথায় টিকলি বা সিঁথিপাট; নাকে নোলক, নাকছাবি, নাকমাছি, বেশর, বোলাক; কানে ঝুমকা, কুণ্ডল, কানফুল, কানাত, বালি; কণ্ঠে মালা, হাঁসুলি, হার, হারের এক, দুই, তিন বা সাত লহরি, টাকার ছড়া, তাবিজ; বাহুতে বাজু, বাজুবন্ধ, অনন্ত, তাড়, বাউটি, কেয়ুর; হাতে চুড়ি, খারু, পৈঁচি, বালা, তাড়, কঙ্কন; হাতের আঙ্গুলে আংটি, অঙ্গুরি, অঙ্গুরীয়ক; হাতের পাতায় রতনচূড় (আঙ্গুলে আটকানো); কোমরে চন্দ্র-হার, কিঙ্কিনী, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ; পায়ে নূপুর, ঘুঙ্গুর, মল, বাঁকখাড়ু, মকরখাড়ু বঙ্করাজ প্রভৃতি বিচিত্র আকার ও গড়নের অলঙ্কার নারীর ভূষণ ছিল। এসব অলঙ্কার প্রধানত

www.pathagar.com

সোনা ও রূপা দিয়ে তৈরি হতো। কোন কোন অলঙ্কারে হীরা, মণি, মুক্তা, কাঁচ বা পাথর-সংযুক্ত হতো। এছাড়াও দরিদ্ররা বা ফ্যাশন-প্রবণ অভিজাতরা তামা, পিতল, সীসা, পশুর শিং বা হাতীর দাঁত দিয়েও অলঙ্কার তৈরি করত। চুলের কাঁটা সাধারণত সোনা, রূপা বা লোহা দিয়ে তৈরি হতো।

এ প্রসঙ্গে চুলের প্রসাধন সম্পর্কে বলা যেতে পারে। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলেই চুলের প্রসাধন করত। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই বাবরী চুল রাখত। তারা পরিপাটি করে চুল আচাড়াত এবং চুলে নানা রকম গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। চুলের প্রসাধন এবং চুল বাঁধার কারুকাজেও বৈচিত্র্য ছিল। মেয়েদের চুলে বেণী বাঁধাতে অনেক কুশলতা ছিল। নানারকম· ছাদে বেণী বা কবরী করে নারীদের চুল বাঁধার রেওয়াজ ছিল। এক থেকে সাত পর্যন্ত গুছি দিয়ে বেণী বাঁধা হতো। নানা রকম মনোহর খোপা তৈরি করে চুল বাঁধার রীতি ছিল। দুপুরের আহারাদি সমাপ্ত হওয়ার পর পাড়ার মহিলারা একত্র সমবেত হয়ে তাম্বুল চর্বণ ও গল্পগুজবের অবসরে চুল বাঁধত। কারও কারও চুল বাঁধা বিনুনি করা এবং কবরী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা ছিল। ফুল দিয়ে ফিতা জড়িয়ে যারা চুল বাঁধতে পারত, মেয়ে মহলে তাদের আদর ছিল খুব বেশি। বিয়ের প্রাক্কালে কনে সাজানোতে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

আবহমানকালের বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি কৃষি ও গ্রামকেন্দ্রিক বলে গ্রামের স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে গৃহনির্মাণশিল্পের যথেষ্ঠ বিকাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু বাংলার অগণিত নদ-নদীর সহজ-স্বাভাবিক ভাঙ্গাগড়ার খেলা আর উষ্ণ জলীয় আবহাওয়ায় ছন-বন, বাঁশ-কাঠ তো দূরের কথা, ইট-পাথরের গৃহও স্থায়ী এবং কালজয়ী হতে পারে না। আর এই পলিমাটির বাংলাদেশে বহুল পরিমাণ পাথর ব্যবহারের তো কোন সুযোগই নেই। ইট-কাঠ-পাথরের গৃহ বহুল পরিমাণে নির্মিত হয়ে থাকলেও তা কালের গ্রাস এড়িয়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি। তবে কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থ, রামপাল, মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি, ওয়ারীবটেশ্বর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ এবং মধ্যযুগের মসজিদ-মন্দির ইত্যাদির সাক্ষ্যে সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজা-বাদশাদের প্রাসাদ এবং নগরের গৃহগুলো প্রধানত ইটকাঠ দিয়েই নির্মিত হতো এবং সেগুলোর দরজায়, জানালায়, খিলানে, গম্বুজে কদাচিৎ প্রস্তরাদি ব্যবহৃত হতো।

তবে, লোকায়ত বাঙালি সাধারণ ঘর-বাড়ি কখনও ইট কাঠ নির্মিত গৃহে বাস করত, এমন প্রমাণ একান্তই বিরল। 'দরিদ্র নিম্নকুঠির লোকেরা তো বটেই, এমন কি সম্পন্ন মহত্তর কুটুম্ব গৃহস্থেরাও সাধারণত মাটি, খড়, বাঁশ, কাঠ, ইত্যাদির তৈরি বাড়িতে বাস করতেন। আর নিচুতলার প্রাকৃত বাঙালিরা তো চিরকালই বাস করতেন জোড়া-তাড়া দেওয়া কুঁড়ে ঘরে। আবহমানকালের প্রাকৃত বাঙালির গৃহের একটি বাস্তব এবং করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বঙ্গের প্রথম মহিলা কবি হিসেবে খ্যাত ময়মনসিংহের গৌরব কিশোরগঞ্জের কবি চন্দ্রাবতীর আত্মবংশ পরিচয়ের মধ্যে উল্লেখ আছে-

ঘরে নাই ধান-চাল চালে নাই ছানি।

আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।

আবার কালবৈশাখীর ঝড়ে বিধ্বস্ত পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাকৃত-জনেরা যখন আর্তনাদ করে, কিশোরগঞ্জের স্থানীয় ভাষায় উচ্চারণ করে বলে–

কচু পাতার ছানি, বেরণের ঠুনি। (বেরণ=ভেরেন্ডা)

এই ঘরে তোর ভাইগ্না বৌ, ছুইছুনা ছুইছ্না।।

তখন তার মধ্যেও সেই একই জীবনচিত্র প্রতিফলিত। সন্দেহ নেই আবহমান কালের প্রাকৃত বাঙালি জীবনের এ এক অতি করুন বাস্তব চিত্র; কিন্তু তবু এই প্রাকৃত বাঙালিরাই এমন সব ছাপরবনের (ঘরামির) জন্ম দিত যারা বাঁশ-বেত, ছন-বন, নল-খাগড়ার সামান্য উপকরণ দিয়েই গড়ে তুলত তাদের কল্পনার সৌধ। সেই সব সৌধে অবশ্য বাস করতেন রাজা-জমিদার, সাধু-সদাগর প্রভৃতি উচ্চবর্গের লোকেরা; আর

www.pathagar.com

তাদের জন্য যে বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল তার পরিচয় উপরেই বিধৃত। পূর্ব ময়মনসিংহের একটি প্রচলিত কথায় কিশোরগঞ্জের মানুষের মুখেমুখে এই অসঙ্গতি অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ভাষায় বিবৃত- 'ছাপরবনের টুই উদাম।' এ কথাটি এখনও কথায় কথায় নজির হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ-বেত, ছন-বনের সামান্য উপকরণে বাংলার ছাপরবনেরা যে সমস্ত গৃহ নির্মাণ করতেন, স্থায়িত্ব এবং শিল্পমূল্য, কোন দিক থেকেই এগুলো ন্যূনতম ছিল না; ব্যয়বহুলও ছিল যথেষ্ঠ। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো মনসামঙ্গল কাব্যে সায়বেনের স্ত্রী অমলার 'উদয়তারা' নামে যে কারুমণ্ডিত গৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার ঠুনিগুলো স্বর্ণময় এবং ঝালরগুলো মণিমুক্তাখচিত ছিল। আজকের দিনে এগুলো গল্পের মতই মনে হয়। লোকায়ত বাঙালির শিল্প প্রতিভার যে স্বাক্ষর বাঁশের খুঁটি, মাটির দেয়াল আর খড়ো চালের প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত হতো, আজকের দিনে তার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া রীতি মত গবেষণার ব্যাপার। তবে কিছু কিছু মৃৎফলকের সাক্ষ্য এবং সমসাময়িক বাংলার লৌকিক গৃহগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের অনুমান, 'সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পল্লিগ্রামে আজও বাঁশ বা কাঠের খুঁচির উপর চতুষ্কোণ নকসার ভিত্তিতে মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাচাড়ীর বেড়ায় যে ধরনের ধনুকাকৃতি দোচালা, আটচালা ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাংলা ঘর রচনাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা বাংলারীতি নাম খ্যাত এবং তাহাই পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্যে বাংলার দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল। এই গঠন ও আকৃতিই অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে 'বাংলোবাড়ী; নামে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরনের গৌড়ীয় রীতির আবাসগৃহই গরিবের কুটির হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরে বিস্তৃত ছিল, পার্থক্য যাহা ছিল তাহা শুধু সমৃদ্ধি ও অলংকরণে। দ্বিতল-ত্রিতলগৃহও এই রীতিতেই নির্মিত হইত; উপরের চাল বিন্যস্ত হইতে ক্রমহ্রাসমান ধনুকাকৃতি রেখায়।'

ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার এই গৃহনির্মাণ শিল্পের দ্রুত অপসৃয়মানতার প্রধান কারণ সম্ভবত বাঁশ, বেত, ছন, বন ইত্যাদির অপ্রতুলতা নয়, বরং 'টিন' নামক পণ্যের ব্যাপক ব্যবহারই এর প্রধান কারণ।

কিশোরগঞ্জের লৌকিক গৃহনির্মাণ শিল্পের চিরায়ত উপকরণ বাঁশ-বেত-কাঠ, ছন-বন-নল-খাগড়া, ইকর-পাটশলা, তালপাতা, তালগাছ, সুপারিগাছ ইত্যাদি। অবশ্যই বর্তমানকালে বৃটিশের কারখানাজাত পণ্য টিনের দ্বারা সে স্থান অনেকটা দখলীকৃত। গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার লৌকিক গৃহনির্মাণকলার নিপুণ কারুকার্যমণ্ডিত গৃহগুলোর নির্যাস অবশিষ্ট ছিল বলে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন। আবার বাংলার এই বিশিষ্ট কলায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা যে বিশিষ্টতম আচার্য সেন তাও উল্লেখ করেছেন– "পূর্বকালে মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের

www.pathagar.com

লোকেরা এই খড়ো ঘরগুলোর জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন।' লোকায়ত গৃহ নির্মাণ শিল্পে কিশোরগঞ্জের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর লোকসাহিত্য এবং লোকস্মৃতিতেও অপ্রতুল নয়। সে অনুযায়ী অত্যন্ত সাধারণভাবে কিশোরগঞ্জের একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ির একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করা যায়। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কিশোরগঞ্জের সর্বত্র বিশেষভাবে প্রচলিত একটি খনার বচন ও একটি প্রচলিত বচনের উল্লেখ প্রয়োজন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কিশোরগঞ্জের লোকায়ত গৃহ পরিকল্পনায় যাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মূলত লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে আমাদের বিপুল সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত। লোকসংগীতকে লোকগীতিও বলা হয়। এই সংগীতে মানব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির প্রকাশ পায়। লোকসংগীত বাঙালির লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতম সম্পদ।

১. মাজারের গান

গ্রাম-বাংলার সর্বত্র এক শ্রেণির মাজার আছে যেখানে সকাল সন্ধ্যা কিংবা ওরস উপলক্ষে গান করা হয়। এসব গান মাজারের গান নামে পরিচিত। জীবিত কিংবা মৃত পির-ফকিরের শিষ্য-প্রশিষ্য ওরা সকলেই গুরুর নির্দেশমতো অথবা নিজেদের মতো করে গান গায়। মাজারে দৈনন্দিন ফকিররা নৈমিত্তিক জিকির ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে নাচ-গান করে থাকে। বিশেষ করে ওরস উৎসবে ঐদিন রাত্রে ভক্তবৃন্দসহ শিষ্য সকলেই পিরের মাজারে জড়ো হয় সারারাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা করে। তারা মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে মাজার আলোকিত ও সুরভিত করে। পিরের উদ্দেশে তারা নাচে ও গান গায়। কারও পায়ে ঘুঙুর থাকে। মাজার কেন্দ্রিক গানের শেষ নেই। নিম্নে দুটি মাজারের গান দেওয়া হলো :

(১)

আলেফ লাম মিম
এই তিন হরফ কয় হরফের পরে
বসা আছে সারি সারি দ্যাখনা নজোরে।
অথবা, বিসমিল্লাতে আছে বীজ
না করলি তাহার উদ্দিশ
তার জন্ম হইল বিফল।

(২)

অবোধ মনরে সদা মনে সদা ফকিরান
হরদমে জপনা করে মাবুদেরী নাম।
আউয়ালেতে আল্লা ফকির
দুয়ামে রাসুল
তিন কুলেতে তরাইবেন
আছানে আকুল।
তিয়ামেতে হযরত আলী
চৌঠামে বরকত মান
পঞ্চমেতে ইমাম হোসেন
দেখাইলেন ফকিরি সান।

www.pathagar.com

২. উড়িগান

উড়িগান হলো এক ধরনের ধর্মীয় প্রার্থনামূলক গান। এ গান হোলি উৎসবে গীত হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চলের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় এ গানের প্রচলন ছিল। এখন অনেকটাই স্তিমিত। জানা যায়, প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হোলি খেলার আয়োজন হতো। হোলি উৎসবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নর-নারীগণ একে অন্যের গায়ে রঙখেলা বা আবির ছিটিয়ে আনন্দ করার সময় নেচে নেচে 'উরিগান' পরিবেশন করত। হোলি শব্দের উচ্চারণ বিবর্তন অথবা বিকৃত থেকে হোলি>হুলি> উলি>উড়ি এমনটি হয়েছে বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

দোল পূর্ণিমা, দোলযাত্রা বা দোলপূজা উপলক্ষ্যে যেসব 'উড়ি' গান পরিবেশন করা হয় তা অধিকাংশই 'রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা' বিষয়ক গান। রঙ খেলার সময় এ গানটি বিশেষভাবে কিশোরগঞ্জে গীত হয়ে থাকে। যেমন-

কথার পৃষ্ঠে কথা উঠে বলি পূর্ব কাহিনি
জল আনবে বলে রাধা গেল চলে লয়ে সব সঙ্গিনী।
পুলনে রাখিয়ে শাড়ি উলঙ্গিনী সব নাগরী
রঙের খেলা খেল সবে খেলাও যত ঝমুরী।
সব কুলমান লাজ শরম দিলে সবে বিসর্জন
বল ধ্বনি কোন রমণী করে খেলা গো এমন।
জলখেলা দেখিব বলে যমুনাতে যাই চলে
পেয়ে বসন নদীর কূলে রঙ্গ কৌতুক দেখব বলে।
লুকাইলাম কদম তলে চাইলে বসন দিতাম তারে
কিসে হইল বসন চুরি দেখ রাই স্মরণ করে।

৩. ঘাটুগান

কিশোরগঞ্জ জেলায় 'ঘাটু' স্থানীয় ভাষায় 'গাড়ু' গান নামে খ্যাত ও পরিচিত। নিকলী উপজেলা ঘাটু গানের জন্য বিখ্যাত।

ঘাটুগানের দল

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জের সবচেয়ে প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা 'কবিগান, ভাসানগান, ঘাটুগান'। ষোড়শ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে পরিচিত এই কিশোরগঞ্জের মাটি ও মানসে আজ থেকে পাঁচশত বছর আগেও এতদঞ্চলে কবিগান গীত হতো বলে প্রাচীন লোককাব্য পদ্মপুরাণে এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। কবিগান-ঘাটুগানও সেই আমলেরই একটি প্রাচীন সংগীত ধারা। যা আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। 'ঘাটু' গানে চিরন্তন বেদনার সুর লক্ষ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি ঘাটুগান দেওয়া হলো :

(১)

এখন আমায় চিনবে কেন
দেখিলে আড়ালে থাক,
মথুরাতে গিয়া রাঁধার
কথা কেন মনে রাখ।
বাঁশির সুরে মন উদাসী সঙ্গে নিয়ে গেলে বাঁশি,
বিরহে মরিব আমি
তুমি কানু সুখে থাক।
মানে না রে কালা
দিয়ে গেলি একি জ্বালা,
চোখের দেখা প্রাণের সখা
দিয়ে যারে নিঠুর কালা।
গোকুল আঁধার করি
মথুরাতে গেলে হরি,
প্রেমানলে জ্বলে মরি
কলঙ্ক মোর গলার মালা ॥

(২)

রূপ দেখিয়া
নয়নে রাখিয়া নয়ন
কলসিতে জল ভরিলাম তখন
ওগো, রূপ দেখিয়া।
আর নয়নে দেখলাম চাইয়া
জলের ঘাটে শ্যাম কালিয়া
সে যে তীরে বসিয়া বাজায় বাঁশি
হাসিয়া হাসিয়া
ওগো, রূপ দেখিয়া
উন্মাদিনী হইলাম যার লাগিয়া ॥

কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি বা হাওর অঞ্চলই এ গানের উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়। গান পরিবেশনের সময় ঘাটু গানের সমঝদার মহড়াদারদের মাথা ঝাঁকানী ও হেলে দুলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ এক রঙিন রঙমহলের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

অতীতে এমন এক সময় ছিল যখন গ্রাম-বাংলার সর্বত্র ঘাটু গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঘাটু গানের মধ্যে অশ্লীল বিষয় নিয়েও গান গাওয়া হয়। যেমন :

(৩)

আইস কালা রইস কাছে
হাত দিও না ডালিম গাছে
ডালিম কাঁচা রইয়াছে
পাকলে ডালিম হইবে লাল
হাতে ধর মুখে দিলে রসে ভরবে গাল।

(৪)

কে দিল পিরিতের বেড়া লেচুর বাগানে
লেচুর বাগানে সই গো লেচুর বাগানে।
ছোট ছোট লেচুগুলি, বঁধু তুলে আমি তুলি
বঁধু দেয় আমার মুখে, আমি দেই বঁধুর মুখে।

(৫)

চেংড়া বন্ধু তুই আমারে দেওয়ানা বানাইলে
দেওয়ানা বানাইলেরে বন্ধু পাগল অ করিলে।
গাছের পাকা শবরীরে কলা, গামছায় বাঁধা দই
খাইবার বইলে মনে হয় গো, আমার বন্ধু রইল কই।
বন্ধুরে আমারে দুইডা কমলা কিইন্যা দে
ছোড্ডু কমলার দাম দুই আনা
আর বড় কমলার দাম চাইর আনা
রসের কমলা বন্ধু আমায় চিনলো না।

(৬)

কালা যদি হইত গো লাল
খাইতো বাটার পান
বুকের সাথে বুক মিশাইয়া
যৌবন করদাম দান।
যৌবন করতাম দান গো আমি
যৌবন করতাম দান।
মা আমায় দেয় না বিয়া
সাধের যৌবন যায়
পাড়া-পড়শী আমায় দেইখ্যা
চোখ পাকায়া চায়
চোখ পাকায়া চায় গো আমায়
চোখ পাকায়া চায়।
বাপও ভাইয়ে হইয়া গো রাজী
দূর দেশে দিলো গো সাদী

www.pathagar.com

সুখ তো হইল না
আমি অহন কান্দি
আমি অহন কান্দি গো বন্ধু
আমি অহন কান্দি।

কোনো কোনো ঘাটু গানে 'বন্দনা বা বাউল' গানের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত আছে। অর্থাৎ দেহতত্ত্ব বা ভক্তিমূলক বিচ্ছেদ বেদনার সুর এ গানের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন-

দয়াল আল্লা ডাকি কাতরে
দয়ার সাগর তুমি দয়া কর আমারে।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মূলাধার
তুমি বিনেকে তড়াইবে ভব পারাবার।
রহিম-রহমান তুমি আল্লা তোমার মেহেরবানী
তুমি দরিয়া শুকাইতে পার পাহাড়ে নেও পানি ॥

৪. কর্মসংগীত

বিশেষ করে শ্রমিকদের সম্মিলিত কোরাস গানই হলো কর্মসংগীত। কাজের মাঝে কঠিন জীবনকে একটু রঙ্গরসে হালকা করা বা দেহ মনকে একটু বিনোদনমূলক করে শ্রম নিরসন করার গানই কর্মসংগীত। এ গানকে সমবেত সংগীত বা সারিগানও বলা যায়। নিম্নে কয়েকটি কর্মসংগীত দেওয়া হলো :

(১)

মুখে বল আল্লা, ঠুঠে বল আল্লা
মনে বল আল্লা, দিলে বল আল্লা।
আল্লার নামে হেঁইয়ো
নবীর নামে হেঁইয়ো
আলীর নামে হেঁইয়ো
জোরে বল হেঁইয়ো
আরও জোরে হেঁইয়ো।

(২)

জোয়ান বেটা পরোয়া নাই- হেঁইয়ো
জোরছে ঠেলো জোরছে ভাই- হেঁইয়ো
জোরের কামে আইলসা নাই- হেঁইয়ো
জোর জোয়ানী জুরি তাই- হেঁইয়ো
জোরের গলায় গান গাই- হেঁইয়ো
জোরের টেকা জোরে কামাই- হেঁইয়ো।

(৩)

শৈল্যে করছে দৈত্যের ভর- হেঁইয়ো
বিষ লাঙ্গিনীর কিসের ডর- হেঁইয়ো

www.pathagar.com

লাঙ্গের বাড়ি লাঙ্গের ঘর- হেঁইয়ো
মাগি পাইছে সুন্দর বর- হেঁইয়ো
কিসের আপন কিসের পর- হেঁইয়ো
ছুত মারানীর ছুইতের ডর- হেঁইয়ো।

(৪)

বুইর‍্যা রে বুইর‍্যা মাথা তোল- হেঁইয়ো
বুড়ি রানছে কৈয়ের ঝোল- হেঁইয়ো
বুড়ির মুখের সুন্দর হাসি- হেঁইয়ো
আমরা সবাই ভালোবাসি- হেঁইয়ো
প্রেম-পিরিতের লাগজে টান- হেঁইয়ো
বুইর‍্যা বুড়িরে ধইরা আন- হেঁইয়ো।

(৫)

জোরের কামে- হেঁইয়ো
ঠেলার কামে- হেঁইয়ো
বউয়ের কামে- হেঁইয়ো
মারো ঠেলা- হেঁইয়ো
আরো জোরে- হেঁইয়ো
ঠেলতে ঠেলতে- হেঁইয়ো
ঠেলার চোটে- হেঁইয়ো
পাহাড় ফাটে- হেঁইয়ো।

(৬)

রঙের নাও রঙের বৈঠা/রঙে রঙে বাইও
তোমরার বাড়িত রঙ না থাকিলে
আমরার বাড়িত আইও।
রঙের নাও রঙের বৈঠা/রঙে রঙে বাও
জারুই কাঠের নৌকাখানি/ উড়াল দিয়া যাও।
রঙে রঙে বাওরে বৈঠা/রঙের দোহার গাইয়া
ভাটি দ্যাশের নৌকাখানি শীঘ্র যাওরে বাইয়া।
রঙের নাও রঙের বৈঠা/বাইছালি খেলাই
বাইচালি খেলাইয়া আমরা/বাড়ি ফিরা যাই।
বাড়ি আমরার নিকলীর গাঁও/সোয়াইজনীর পাড়ে
কী আনন্দ নাও দৌড়ানীর/ উৎসব ঘরে ঘরে।
ঘরে ঘরে উৎসব দেখি/বাহার তাতে নাই
নৌকা বাইচের সারি গানে/পাগল হইয়া যাই।

www.pathagar.com

৫. গাইনের গীত

'গাইনের গীত'-এর বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে এককালে ব্যাপক প্রচলন ছিল। বর্তমান গাজীপুর, ঢাকা, নরসিংদী হয়ে ভৈরব, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা অঞ্চলে এটি উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। ময়মনসিংহের কোনো অঞ্চলে এখনও 'দানরী' ও 'সাপের ঝাড় ফুঁকে'র সাথে এ কালেও গাইনের গানের অংশ বিশেষ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। অধিকাংশ গাইনই গান গাইবার সময় লাল রঙের ঘাগরি (ছায়া) এবং ব্লাউজ পরিধান করে। প্রত্যেক গাইনের সঙ্গেই উপরে অর্ধচন্দ্র স্থাপিত একটি লৌহদণ্ড থাকে। এটিকে তারা 'আশা' বলে থাকে। গ্রামীণ লোকদের বিশ্বাস এটি গাজী জিন্দাপিরের 'আশা'রই প্রতিকৃতি। যা দিয়ে যুদ্ধ করে গাজী জিন্দাপির 'দক্ষিণা রায়কে' পরাস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এই 'আশা'টির অপূর্ব ক্ষমতা আছে বলেই তাদের বিশ্বাস।

এছাড়াও গাইনের হাতে থাকে প্রায় আধহাত লম্বা একটি কাষ্ঠদণ্ড যার মাথায় আবার এক গুচ্ছ কালো চুল ঝুলানো থাকে। গাইন গান গাইবার আগে তার আশাটি মাটিতে পুঁতে এবং কাষ্ঠদণ্ডের চুলগুলি পানিতে ভিজিয়ে নিজের গায়ে ও শ্রোতাদের গায়ে পানি ছিটা দিয়ে ভেজা চুলসমেত কাষ্ঠটি আশার ওপর স্থাপন করে আশাটিকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে গান শুরু করে। শুরু হয় বন্দনা। বন্দনাতে আল্লা-রসুলের প্রশস্তি গেয়ে গাজী জিন্দাপিরের প্রশস্তি গাওয়া হয়। বন্দনায় কোনো পুথির হামদ-নাতের প্রথমাংশ গাওয়া হয়। যেমন :

'আল্লা আল্লা বল ভাইগো নবি কর সার।
নবির কলিমা পড় হৈয়া যাবে পাড়॥
আল্লা আল্লা বল ভাই গো যত মমিনগণ।
গাজী জিন্দাপিরের কথা শোন দিয়া মন॥
সোয়া লাখ নবি বন্দি আশি হাজার পির
সুন্দর বন মোকামে বন্দি গাজী জিন্দাপির॥

তৎপর গাইনের দল নিজ পরিচয় দেয়, সালাম আদাব জানায় :

সভা করে বইছুন যত হিন্দু মুসলমান।
সবারই চরণে আমি অধমের সালাম॥
আমি অতি মূর্খমতি বিদ্যা বুদ্ধি নাই।
গীত গাইয়া শান্তি দিবার আমার সাধ্য নাই॥
বাড়ি মোর ভোলার চর নাম উমেদ আলী।
আপনাদের এইখানে আইয়া বিরক্ত করবাম খালি॥

এরপর শুরু হয় মূল পালা। গাজী কালুর বিভিন্ন কারামতী, যুদ্ধ ও চম্পাবতী কন্যার কিচ্ছা বর্ণনা করা হয়। গাজী কালু চম্পাবতী পুথি থেকেই মুখস্থ করে তা গীত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে রঙ্গ-রস :

গাজী বলে কালু ভাইগো আমার শল্যা লও।
আলের দুইডা বলদ বেইচ্যা মুরগী কিন্যা লও॥
মুরগি নাচে মুরগি নাচে চলে দুই ঠ্যাং থুইয়া।
হউড়ী বউ এ কাইজ্যা লাগজে চেপা ভত্তা লইয়া॥

www.pathagar.com

গ্রাম বা পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ গানের শ্রোতা। তবে নারীগণের প্রতি থাকে গাইনের বিশেষ নজর। কারণ নারীদের মানসিক করার কারণেই তারা এ গান গাইতে এখানে এসেছে। নারীদের প্রতি গাইনের কেমন নজর তা নিম্নে উদ্ধৃত একটি গাইনের গীত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নারী হাসি নারী খুশী নারী লক্ষ্মীর মূল।
নারী দুইন্যাই নারী আখের নারী ভেস্তের ফুল॥
মুখ আন্ধাইর‍্যা বেজায় নারী-নারী মহাপাপ।
দুষী নারী গলায় ফাঁসি দুজনেরই তাপ॥
পদ্মিনী নারীর সইল্লে পদ্মের ঘেরান।
আপনি পতি বির্দুমানে নাইকা পরের টান॥
শঙ্খনীয়া নারী ভাইরে উড়া-উড়া মন।

দিবানিশি তার খালি সাজন আর পিন্ধন॥
হস্তিনীয়া নারী ভাইরে পায়ের গোছা মোটা।
সেইনা নারী রাইখ্যা যায় বংশের লাগি খোঁটা॥
নাগিনী যে নারী আছে গেলে তার পাশে।
ছয়না মাসের আয়ু কমে আইশ্চলের বাতাসে॥
চিন্তনীয়া নারী ভালা চিন্তায় থাকে মন।
দিবানিশি করে কেবল সোয়ামীর ভজন॥
থুম-থুমায়া হাঁটে নারী চোখ পাকায় চায়।
রাক্ষসিনী সেই নারী খসম আগে খায়॥

উচকাপালী চিরল দাঁতী পিংলা মাথার কেশ।
সেই নারী করলে বিয়া ভরমে নানান দেশ॥
এক জাত্যা নারী আছে পাড়ায় পাড়ায় যায়।
এর কথা ওরে কইয়া পান সুবারী খায়॥
ঝেংড়া দিয়া কয় কথা দপদপায়া চলে।
সেই নারীর খসমের সংসার যায় রসাতলে॥
লাম্বা কাঁইকে চলে নারী, কথা ভাংগা সুরে।
সেই নারী করলে বিয়া অসুখ যায় না দূরে॥
ঢেসা মাইরা কথা কয় মিছা ঠমক নারে।

সেই নারী করলে বিয়া লক্ষ্মী পালায় দূরে॥
চিক্কন পায়ের গোছা ভাইরে মাথায় পাতলা চুল।
সেই নারী করলে বিয়া রয় না জাতি-কুল॥
আরেক জাত্যা নারী সদায় গাল ফুলায়া রয়।
ঘরের শান্তি নষ্ট করে খসমের দুখ অয়॥
হরিণ চৌখ্যিয়া জুড়া ভুরু সদায় হাসি মুখ।

www.pathagar.com

সেই নারী করলে বিয়া সংসারে অয় সুখ॥
সইন্দ্যা বেলা যেবা নারী হলদি বিলায়।

হানজু বছর বেওয়া অইয়া বাপের বাড়ি যায়॥
সইন্ধ্যা বেলা যে নারী গিরহে দেয় না বাত্তি।
লক্ষ্মী তারে উইঠ্যা কয় এর কপালে লাত্তি॥
উডান ফুইর‍্যা যেবা নারী দক্ষিণে যায় ঝারা।
লক্ষ্মী আইবার চাইলে থাকে সীমানায় খাড়া॥
উগারে না উইঠ্যা নারী জোরে রাও করে।
লক্ষ্মী কয় ছেল মারছে আমার অন্তরে॥
দুপুর বেলা যেই নারী জুইড়া দেয় বারা।
লক্ষ্মী কয় হায় হায়রে ছাইড়া দিলাম পাড়া॥
সইন্দ্যা বেলা যেই নারী ঢেকিত ধান ভানে।
ষাইট দিনের রুজি তার কমে একদিনে॥

যেই নারী সইন্দ্যা বেলায় আছড়ায় মাথার চুল।
তার সংসারে ঝগড়া বিবাদ সদায় গণ্ডগোল॥
চুল ছাইড়্যা পাও মেলাইয়া যে বয় বিছানায়।
লক্ষ্মী তো ভাই দূরের কথা অলক্ষ্মীও ভয় পায়॥
রান্দিয়া-বাড়িয়া নারী সোয়ামীর আগে খায়।
তার স্বামী বাইরে গেলে জুতার বারি খায়॥
গোছুল কইর‍্যা যেইবা নারী কাপড় চিপে পায়।
হাতে দইর‍্যা চৌদ্দ পুরুষ দোযকে ডুবায়॥
গোছুল কইর‍্যা যেবা নারী মুখে দেয় পান।
লক্ষ্মী-মায়ে উইঠ্যা কয় সে আমারই সমান॥
সতী নারীর পতি ভাইরে মজিদেরই চূড়া।
অসতী নারীর সোয়ামী ভাঙ্গা নায়ের গোড়া॥
(অথবা) অসতী নারীর স্বামী ভাইরে শয়তানের ঘোড়া।

কোন জাতি পুরুষের সাথে কোন জাতি রমণীর মিল বা বিয়ে হওয়া বাঞ্চণীয় তা নিয়ে একটি গাইনের গীতের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো :

পুরুষ ও রমণীতে চারি জাতি জানি।
হস্তিনী শংকিনী নারী চিত্রানী ও পদ্মিনী॥
অশ্ব বৃষ পুরুষ জাতি, শশক আর মৃগয়া।
ভিন্ন জাতের চারি রঙের পুরুষ গেল হইয়া।
কোন জাতি পুরুষের সনে মিলে কোনবা রমণী॥
হস্তিনী শংকিনী...॥
অশ্ব জাতি পুরুষের সনে মিলে নারী হস্তিনী।
বৃষ জাতি পুরুষের সনে মিলে নারী শংকিনী।

www.pathagar.com

শশকে চিত্রানী মিলে মৃগয়াতে পদ্মিনী॥
হস্তিনী শংকিনী... ।
কি বলবো ভাই নারীর কথা পদ্মিনী নারীর লক্ষণ,
রাজকুলে জন্মে নারী বিদ্যা বুদ্ধি সদায় মন।
রূপেতে যে লক্ষ্মী বটে গুণেতে বীনাপাণি...ঐ॥
চিত্রানী ও সেইরূপ চটে রূপ ধরে না অঙ্গেতে,
হাঁটে নারী হংসির মত মুখ ভরা ভঙ্গিতে।

চিরল দাঁত নাক খাড়া কাল তার মাথার বেণী॥...ঐ॥
কি বলব ভাই নারীর কথা শংকিনী নারীর লক্ষণ,
দেখিতে সে কৃষকায়া টেরা তার চৌক্ষের গঠন।
যে হইয়াছে এমন নারী সে জগতে কলংকিনী॥
কি বলবো ভাই নারীর কথা নামে সে যে হস্তিনী,
বুক উঁচা পাছা মোটা দেখিতে হস্তির মতন।
মতি তার রতি কর্মে বাঁকা চোখের চাহনি॥...ঐ॥

নেচে নেচে বাজনার তালে অপূর্ব শারীরিক ভঙ্গিতে গাইন গেয়ে চলে তার কিচ্ছা। তার বর্ণনার রকম-সকম বড় মজাদার, উপাদেয়। মজাকে আরও মজাদার করতে হয়তো সে গেয়ে উঠবে একটি অপ্রাসঙ্গিক গান। যেমন :

পিন্ধনে পাটের গো শাড়ি, অঙ্গ দেখা যায়।
শাহজাদা উইট্যা বলে যৈবন দেখা যায় গো...
যৈবন দেখা যায়
এখানে পাইল তখন দিশা ধরবে। যেমন :
ওরে আমার মন-চোর, চুরি কইর‍্যা নিলে আমার মনডারে
কিংবা
ঘুরিয়া বেড়াই দুনিয়ার মাঝে, মনের মানুষ পাইলাম না॥
শ্রোতামণ্ডলির মধ্যে কোন বুড়িকে দেখে গাইন গায় :
ওগো আদরের নানী, কিশোরগঞ্জের ভাইছাব আইছে
নাইওর যাইবানি॥

যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্য করে গাইনের গান :
ওলো ভিন দেশী ছেরি তুমি বড়ই সুন্দরী
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া লো॥
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া।
মাজা চিকন বাঁকা নয়ন সোনার নূপুর পায়।
সন্দ্যা বেলা ঘাটে আইলে জলের ছলনায়
জ্বালা কি দিয়া নিভাই ও ছেড়ি বল কোথায় যাই
পাগল করলে তোমার রূপ দেখাইয়া লো॥
পাগল হইলাম তোমার রূপ দেখিয়া।

www.pathagar.com

গাইনের গীত 'পাইল' বড়ই রসিক হয়। তার ভূমিকাও বড় আনন্দদায়ক। সে মাঝে মাঝে এমন মজার কৌতুকময় গান পরিবেশন করে তাতে সকল শ্রোতার মনোরঞ্জন হয়। এতে প্রচুর রঙ্গরস ও হাস্য-কৌতুক থাকে। যেমন গাইন বাইরে হয়তো বা তামাক-বিড়ি খেতে গেছে এই সুযোগে পাইল শুরু করলো রঙ্গরসের গান :

গাইন গেছে উক্কা খাইত, আমি কিছু কই
হিয়ালে যে বড়ই খাইছল্, লবণ পাইছিল্ কই?
কথার নাই মাথা বেঙে চিড়া খায়
বাপে বিয়া করবার আগে পুত হওর বাইত যায়॥
ছাগল পালে পাগলে নিত্যি ছিড়ে দড়ি।
হাজার টেহার বাগান খাইয়া লেদায় বড়ি বড়ি॥
মইন্যার মায় গইন্যা খাইল সাত কাডলের কুশ।
নানার দাঁড়িত কষ লাগছে আমার কিবা দুষ॥
ছুইত্যার বউ হুইত্যা রইছে খেতা মুড়ি দিয়া।
উইল্যা বিলাই চাইয়া রইছে ভাঙ্গা বেড়া দিয়া॥

উত্মা কয় উতমীরে রাইত পোয়াইয়া গেল।
তাড়াতাড়ি লইয়া আইও কেরাসিনের তেল॥
সারা-রাইত গীত গাইলাম মড়ল সায়বের বাড়িত।
খালি মুখ তুইল্যা দিল ভাঙ্গা গরুর গাড়িত॥

এরই মধ্যে গাইন এসে হাজির হয় আবার আসরে। শুরু হয় নতুন দিশা :

পান দিলে সুবারী লাগে আরও লাগে চুন।
নাইলে–ঘুষিয়া ঘুষিয়া জ্বলে পিরিতের আগুন॥
পানেতো মুখ লাল না অয়, লাল অয় চুনে।
রূপ দেইখ্যা না পাগল অইছি, পাগল অইছি গুণে॥

এবার গাইনের গীত শেষ। দলের বিদায় নেয়ার পালা। শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে গাইন গাইছে :

ভুল তিরুডি মাপ করবাইন সভার গুণীজন।
বিদ্যা-বুদ্ধি নাইগ্যা আমরার মূর্খ অভাজন॥
ভালা-মন্দ যাই গাইলাম বাড়ি-অলা ভাই।
পান-সুবারী দেউহাইন আমরা বিদায় অইয়া যাই॥
বাড়ি-অলা গাইনের দলের লউহাইন ছেলাম।
পান-তামুক না খাওয়াইলে করিবাম বদনাম॥

কিশোরগঞ্জ জেলায় গাইনের গীত একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনও কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে এর কম-বেশি প্রচলন দেখা যায়। কোনো কোনো সময় নেত্রকোণা-কিশোরগঞ্জ থেকে গাইন ও পাইল এসে বর্তমান ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল জেলায় পল্লিঅঞ্চলে গাইনের গীত গেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

৬. মেয়েলিগীত

মেয়েলিগীত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকসংগীতে এক বিশিষ্ট স্থানের দাবিদার। বিশেষত পল্লিবাসীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনের রূপরেখাই অংকিত রয়েছে মেয়েলি গানে। কিশোরগঞ্জে রয়েছে মেয়েলি গীতের এক বিরাট ভাণ্ডার।

নিম্নে কিছু মেয়েলিগীত দেওয়া হলো :

(১)

আরো না পরাইল শাড়ি-শাড়ির নাম ইয়া
সেই না শাড়ি পিন্ধা অইছিল চল্লিশ কইন্যার বিয়া।
মুষ্টিতে রাখিলে শাড়ি মুষ্টিতে মিলায়
মাডিতে রাখিলে শাড়ি পিপড়ায় লইয়া যায়।
এমন বাছিয়া পরাইল শাড়ি রং ধব ধবে রূপ
সেই শাড়ি কইন্যার মনে পছন হইল খুব।
সাজিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়
চান-সুরুজ লজ্যা পায় দেখ আবেতে লুকায়।
কইন্যার রূপে দুইন্যাই পসর আন্ধাইর গেল দূরে
মাতুয়ারা মন ভমরা গুন গুন করে ফুলে ফুলে উড়ে।

(২)

জামাই আইয়া দিল ধুমাধুম
চল্যা যা বাপের বাড়ি
কেমুন কইর‍্যা ছিড়লে তুই
একশ্ টেহার শাড়ি।
ঘরের পাশে বাঁশঝাড়
ঘন ঘন গিরা
আইতে যাইতে উষ্টা খায়া
শাড়ি গেছে ছিরা।

মিছা কথা কইছ না আর
গালে দিল টুক্না
হউরি আয়া ঘর দিখালে
জুইর‍্যা দিল বক্না।
বেয়ান বেলা রান্তে যায়
আছর বেলা খায়
হউরি বউয়ের কত কাম
তবুও না ফুরায়।
খাইতে পিন্তে টানাটানি
হারাদিন ঘ্যানঘ্যানানি

www.pathagar.com

পান চুনের দেহা নাই
মুখে মুখে তুই তাই।
এর উপরে মাইর ধর
কেমনে করি হাই'র ঘর
কি আর কইগো সোনা
মুছকাইয়া ভাংছে আমার গরদানা।

বিয়ের বাড়ির শিলুক বা শ্লোক একটি উল্লেখযোগ্য আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান। কনের বাড়িতে বর পক্ষের আগমন ঘটার পর সময় করে কাজী বিয়ের কাজ সমাধানের জন্য মুরুব্বিদের নিয়ে কনের কাছ থেকে 'এজিন' অর্থাৎ তার সম্মতি বা সমর্থন আনতে অন্দরমহলে যেতে হয়। এভাবে বিয়ের কাজ সু-সম্পন্ন হলে বর-কনের দু'পক্ষের আত্মীয়-স্বজন-সুজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব-বান্ধবীগণ সবাই একত্রিত হয়ে এই প্রশ্নবাণের আসর বসে। এ সকল শিলুকের যথাযথ উত্তর দিতে না পারলে বর এবং তার বন্ধু বান্ধবকে 'বেককল-বেকুব-বোকা বা আহম্মক' ইত্যাদি অভিধায় জর্জরিত করা হয়। সেই প্রশ্নবান শিলুক বা শ্লোক যা দু'পক্ষের মধ্যে বিনিময় হয় তা দেওয়া হলো :

কনেপক্ষ : জামাই আইছে বিয়া করত
আপনেরা আইছুইন কেন?
বরপক্ষ : ওয়ালাইকুম সালাম উবা
জামাই আইছে বিয়া করত
আমরা আইছি শুভা।
কনেপক্ষ : শুভার চেহারা তো গুলগুইল্লা
আপনেরা আইছুইন কি বুইল্লা?
বরপক্ষ : গুলগুইল্লার বইন বুলবুইল্লা
আমরা আইছি বউ বুইল্লা।
কনেপক্ষ : জামাইর মাথাত পাগড়ি যেন পাতলা
জামাইর লগে আইছে কট্টি দাঁতলা।
বরপক্ষ : জামাইর মাথার উপরে চাঙ
জামাইর লগে যারা আইছে
সব হালিরার লাঙ।
কনেপক্ষ : চেহারার নাই আও
কথার নাই বাও
জামাইর লগে আইছে কট্টি
হিয়াল-কুত্তার ছাও।
বরপক্ষ : আচ্ছা-কইনছেন দেহি?
আইছি মেমান খাইছি জাও
কথা কইবার পাই না বাও
বউয়ের লগে বইছে কট্টি বিলাইয়ের ছাও।
কনেপক্ষ : কি খাইছুইন কী না

www.pathagar.com

আইছুইন কত্রি অন্ধ কানা
খানা যে খাইছুইন
হাত ধইবাইন কই?
বরপক্ষ : পাতিল অ-আছে দইয়ের পানি
ডেগ অ-আছে ডাইলের পানি
এমন খাওয়া খাইছি
ঝরে চক্ষের পানি।
কনেপক্ষ : পান পানি খাইয়া শুভা
বইয়া থাহুইন উবা উবা
নামাযের অক্ত অইছে
ওজু কইর‍্যা লই।

হিন্দু সমাজে যেসব সংস্কার-কুসংস্কার বা বিশ্বাস রয়েছে তা বিয়ের দিনে কন্যা বা বধূর বিবরণ সম্পর্কে বর পুরুষের বাড়িতে এসব কথা গীত করে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। নিম্নে এ রকম কিছু গীত দেওয়া হলো :

তিন পুত হইয়া হয় ঝি, ছিক্‌কা বাইয়া পড়ে ঘি
তিন ঝি হইয়া হয় পুত, ঘরে আইয়ে যতদূত।
রান্দিয়া বাড়িয়া যে স্ত্রী স্বামীর আগে খায়
ভরা ঠিল্লার পানি যেন তিরাসে শুকায়।
যে নারী ঘরের মধ্যে বড় শ্বাস ফালায়
ছয় মাসের আয়ু থাকতে স্বামী মারা যায়।
সন্ধ্যা বেলা যে নারী ঘরে দেয় না বাত্যি
লক্ষ্মী বলে তারে ছাড়ি কপালে মারি লাথ্যি।
সন্ধ্যা বেলা যে নারী কেলাই ভাজা খায়
অলক্ষীরে ঘরে দিয়া লক্ষ্মী চইলা যায়।

(২)
মন্দ ভালো এসব কথা দিলাম সমাপন
চারিজাতি নারীর কথা করি আলাপন।
হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্তামনি আর শঙ্খিনী
এই চারি জাতি নারীর মধ্যে যাদের আমরা জানি।
হস্তিনী নারীর গমন গঠন হস্তির মতন
লাফে লাফে পাও ফেলে যেন ভীষণ ওজন।
হস্তিনী নারী যে গৃহে প্রবেশ করে
তিন সন্ধ্যার খোরাক মা এক সন্ধ্যায় হরে।

হস্তিনী নারীর কথা দিলাম সমাপন
পদ্মিনী নারীর কথা করি আলাপন।
পদ্মিনীর পায়ে পদ্ম কুমণ্ডল

www.pathagar.com

হাতি ঘোড়া গরু বাছুর পালে মহিষের পাল।
আসন ছাড়িয়া নারী মাটিতে বসি খায়
আকর্ষণীয় নারী বলে আকাশে বলয়।
পদ্মিমী নারীর কতা দিলাম সমাপন
শঙ্খিনী নারীর কথা করি আলাপন।
শঙ্খিনী দিবানিশি গুঞ্জেরই গুঞ্জন
পর পুরুষে না দেখিলে উপাসে ভক্ষণ।
আউলিয়া মাথার কেশ ঘোড়ে পাড়াপাড়
নিশ্চয় করি জানিবে মা লক্ষ্মী ছাড়া তার।
শঙ্খিনী নারীর কথা দিলাম সমাপন
চিন্তামনি নারীর কথা করি আলাপন।
চিন্তামনি চিন্তা করে সংসারের কারণ
কি ভাবেতে যায় দিবা ভাবে মনে মন।
ঐ পাড়ে বদনজর ঐ পাড়ে বদমতি
সন্ধ্যাকালে ঐ নারী ঘরে জ্বালে বাতি।
স্বামী-চিন্তা, স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান
স্বামী গুরু-স্বামীপতি, স্বামী নারায়ণ
সংসারে সুখের হয় ঐ জাত নারীর কারণ।

(৩)
সতী নারীর পতি মাগো মস্তকের চূড়া
অসতী নারীর পতি মাগো ভাঙ্গা নায়ের গুড়া।
ভাঙ্গা নায়ের গুড়া যেমন নড়বড় করে
অসতী নারীর পতি মাগো রাস্তা ঘাটে মরে।

(৪)
এই জন্মে যেবা নারী স্বামীর নিন্দা করে
আয়ু থাকিতে নারী স্বামীর আগে মরে।
শ্বশুর-শাশুড়ীকে যেবা নারী প্রণাম জানাবে
সেই শ্রেণীর নারী সারা জীবন সুখেতে কাটাবে।

(৫)
এসো মাগো লক্ষ্মী দেবী জগৎ জননী
ত্রিজগতে খুঁজে মাগো তুমি নারায়ণী।
ও গো কমলা দেবী তুমি সোহাগিনী
এসো মাগো বিষ্ণু প্রিয়া আরও সচিরানী।

অনুরূপ মুসলিম সমাজেও নারী বিষয়ক গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমন :

(১)

চিক্কন পায়ের গোছা ভাইরে মাথায় পাতলা চুল
সেই নারী করলে বিয়া রয়না জাতি কুল।

www.pathagar.com

আরেক জাত্যা নারী সদায় গাল ফুলাইয়া রয়
ঘরের শান্তি নষ্ট করে খসমের দুঃখ হয়।
হরিণ চউখ্যিয়া জুড়া ভুরু সদায় হাসি মুখ
সেই নারী ঘরে আসিলে সংসারেতে সুখ।

যেই নারী চুল ছাইড়্যা পাও মেলায়া বয় বিছানায়
সুখে তো ভাই দুরের কথা অসুখও ভয় পায়।
যেবা নারী স্বামীর সংসারে আগে ভাগে খায়
হাতে ধইর‍্যা চৈদ্দপুরুষ দুজখে ডুবায়।
সকাল-সন্ধ্যা যেবা নারী হেলায় সময় বিলায়
হানজু বছর বেওয়া হইয়া বাপের বাড়িত যায়।

(২)

যখন গৌরী জন্ম নিল
হিমালয়ের ঘরে গো
তখন বিধি লেইখ্যা দিল
গৌরী নিবো ঘরে গো

শুন নারদমনি
গৌরীর মায়ে ক্রন্দন করে
গৌরী কুলে লইয়্যা
এতো বড় করছি গৌরী
হৃদয়ের স্তন খাওয়াইয়া গো

গৌরীর বাপে ক্রন্দন করে
গৌরী কুলে লইয়্যা
এতো বড় করছি গৌরী
হাউর লাড়ু খাওয়াইয়া
গৌরী বলে শুন মাগো

জেডী কুড়ি স্বরের
ঝি গো তারা দিবো কইয়া
জেড়া বুড়া আসন গো

মা গো রাখিবো শাসাইয়া
গৌরীর ভাইয়ে ক্রন্দন করে
গৌরী কুলে লইয়্যা

www.pathagar.com

এতো বড় করছি গৌরী
কেইলের শানে দিয়া
হিমালয়ে উইট্যা বলে মেনকা সুন্দরী
বিলম্বনার কাইজ্যা নাই গো
যাত্রা করাও গৌরী গো

শুন নারদমনি
উভম্ কুবলি গিরি দুয়ারে বিসাইয়া
উভম্ মঙ্গলঘটে সরমুখে বসাইয়া
যাত্রা করাউ স্নানের গৌরী
বেইল্যা সূত্র দিয়া

তিনমুষ্টি ধান গৌরী
কালাইল ছিডাইয়া
গৌরীরে তুলিয়া দিলো
সুবর্ণের দুলাই
শিবেরে তুলিয়া ছিল
আপনার এই রথে

কিছু দূর গিয়া গৌরী
পিছের দিকে চায়
বাপের বাড়ির জুড়া মন্দির
শূন্য দেখ্যা যায়

থাক থাক জোড়া মন্দির বাপ
ভাইরে শাগিয়া
ভাইয়ের যদি দয় অয়
বইনও নিবো আইয়া ॥

(৩)

অল্প না বয়সের গৌরী শিব
পূজা করে গৌরী
করে পূজা বেইল্যা বিত্তের তলে
ধুতরার কুলে গঙ্গার জলে

শিব পূজা করে গৌরী
শিব মূর্তি বানাইয়া

www.pathagar.com

শিব আরাধনা করে
করে পূজা বেইল্যা বিত্তের তলে

গৌরীর মায়ে বলে গৌরী
শিব পূজা না করিও
শিব কেমন জন জান না গৌরী
শ্মশানে শ্মশানে থাকে
ভূতের সঙ্গে নাচে
পিছে শিব কেমন জান না গো গৌরী

গৌরী বলে শুন মাগো
শিবনিন্দা না করিও
শিব নিন্দা প্রাণে সহে না
শিব হইছে পরম ভক্ত
তুমরা তো জানো না ॥

(৪)

বাড়ির কাছে পুষ্কনী
স্নান করে গো সুন্দরী
বত্রিশ ডালে লাইগ্যা
শুকায় কেশ গো সুন্দরী।

বাড়ির কাছে সুন্দর থইয়া
বাপে তো না করায় বিয়া
যায়তাম আমি দেমান্তরী
অইগো গো সুন্দরী।

বেচবাম বাপের জমিদারি
বেচবাম বাপের তালুকদারি
তবে করবাম সুন্দরী রে বিয়া।

কি পান কাওয়াইয়া ছিলি বালি
পানের মধ্যে লং-এলাচি
তারো পানে নাগর করলো পাগল।

(৫)

শুন রে বালিক্যমুনি
শুন দুঃখের কাহিনী

www.pathagar.com

এমন জনম দুঃখী
জনকের কুমারী রে।

শুন রে বালিক্যমুনি
দয়া পাইবার আশে
গেছলাম বটবৃক্ষের তলে
পত্র দেইখ্যা রৌদ্র লাগে
আপন করম দোষে রে ॥

(৬)

জলের ও না শেভলা অনয়া
ফিরি ঘাটে ঘাটে
এমন দরদী নাই রে
ডাক দিয়া জিজ্ঞেস করে

সকলের বিয়ার মদ্যে
বাদ্যগানো বাজে
আমার না বিয়ার কালে
ধেনুভঙ্গ সাজে ॥

(৭)

বাড়ির সামনে সাগর দিঘি
নানান রঙের উড়ে পাখি
উড়ে পাখি মদু খাইবার লোভে গো সুন্দরী

গিয়াছিলাম পূর্বদ্যাশ
কইন্যা দেখি বন্দিনীর বেশ
সেই কইন্যায় করাও বিয়া
রামে রে গো রামের মা ॥

গিয়াছিলাম উভরদ্যাশ
কইন্যা দেখি রমণীর বেশ
সেই কইন্যায় করাও বিয়া
রামে রে গো রামের মা

গিয়াছিল পশ্চিমদ্যাশ
কইন্যা দেখি কমলার বেশ
সেই কইন্যায় করাও বিয়া
রামে রে গো রামের মা ॥

www.pathagar.com

(৮)

বাপের বাড়ির সামনে
গভীর নদীর সাগর
তার মইদ্যে বাইন্দা থাইছে
ফুলটঙ্গীর ঘর

ফুলটঙ্গীর ঘরে মইদ্যে
ঘিরতের পঞ্চবাতি
তারো মইদ্যে সুন্দর কইন্যা
গাতে পুষ্পের মালা

মালা গাইত্যা সুন্দর কইন্যা
ভাবে মনে মনে
কেমন পরাবে মালা

রামচন্দ্রের গলে
বাপে বলে ঝি গো তুমি
না ভাবিও মনে
নিঃসন্দেহে গলে মালা

রামচন্দ্রের গলে
মায়ে বরে ঝি গো তুমি
বড়ই লক্ষ্মীমতী
আসনে বসিয়া ভাইব্য
রামচন্দ্র পতি গো

ভাইয়ে বলে বইন গো
বড়ই জানো গাই
মাকরের আঁশ দিয়া
নাগর করলো বন্দি ॥

(৯)

ছিদ্র কুম্ভীর জল আনিতে
ব্রজবাসী স্নান করায়
অনুমতি লইয়্যা কৃষ্ণের আমরা
জল ভরিতে যাই

বস্ত্র থইয়া কলসী লইয়্যা
নামলো গঙ্গার জলে তে

www.pathagar.com

বস্ত্র নিল চিকন কালায়
কলসী নিল স্রোতে রে

বস্ত্রচোরা বংশীধারী
উটলো কদম ডালেতে
বস্ত্র দে রে বংশীধারী
পইরা যাইতাম বাড়িতে

তুই না দিলে রাধার বস্ত্র
নিলো ক্যামন জনেতে
শাশুড়ি ননদীর গৃহে
করি আমি বসতি
আমি কি গো রাখতে পারি
তুই কালার পিরীতি ॥

(১০)

রাধার বন্ধু গো
আমি ক্যামনে ভরবো
ছিদ্র কলসীর জল

কলংকিনী যাই গো জলে
দয়া রাইখো মনে গো
আমি ক্যামনে ভরবো
ছিদ্র কলসির জল ॥

কলসি ডুবাইয়া পাড়ে
নিরাশ হইয়া চাইয়্যা দেখে গো
কলসির মাঝারে কৃষ্ণমুরলী
বাঁশি বাজায় গো
কৃষ্ণ যারো বন্ধু আছে গো
কিসের ভাবনা তার গো ॥

তথ্যসহায়ক : উল্লিখিত ২নং থেকে ১০নং গীতগুলোর কথক –

১. অনীতা রানী বিশ্বাস, বয়স : ৩৫, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ
২. শেফালী রানী, বয়স : ৩৩, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ
৩. ঊষা রানী বিশ্বাস, বয়স : ৪০, পেশা : গৃহিণী, ঠিকানা : বাগাদিয়া, কিশোরগঞ্জ
৪. সৈকত সরকার, বয়স : ২২, পেশা : শিক্ষার্থী, ঠিকানা : বাংলা বিভাগ, গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

৭. ভাটিয়ালি

কিশোরগঞ্জ জেলার প্রাচীন সংগীত হলো ভাটিয়ালি। ভাটিয়ালি এ অঞ্চলের জনপ্রিয় সংগীত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাটিয়ালি গানে। কারণ ভাটিয়ালি গান এই অঞ্চলেরই নিজস্ব সম্পদ। ভাটি কিশোরগঞ্জের বিশাল নিম্নজলাভূমি এ গানের উৎপত্তিস্থল। তাই বলা হয়ে থাকে :

মামার বাড়ি চাতলপাড়
বাপের বাড়ি বাউনবাইরা
নিজের বাড়ি নাই আমার।

সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী ভূ-প্রকৃতি এক নয় কোথাও পাহাড় পর্বত, কোথাও বনাঞ্চল কোথাও নদীবিধৌত পলি মাটির সমতল ভূমি। এই ভিন্নতার কারণে সমাজ-সংস্কৃতি অর্থাৎ জীবনাচারেও অখণ্ড ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব নয় বা হয়নি। তাই এ কারণেই বিষয় বৈচিত্র্য বাংলার লোকগীতি বা লোকসংগীত অঞ্চল ভিত্তিক অনন্য।

নিম্নে কিছু সংগৃহীত ভাটিয়ালি গান দেওয়া হলো :

(১)

নাইয়ারে নায়ের বাদাম তুইলা
কোন দূরে যাও চইলা
নাইয়ারে–
ভাটি দ্যাশে যাও যদি তুমি
হিজল তলির হাঠে
সেথায় আমার ভাইজান থাকে
আমার কথা কইও তাকে
ধিকি ধিকি জ্বইলা।

(২)

আরে ও ভাইট্যাল গাঙ্গের নাইয়া
তুমি কোনবা কইন্যার দ্যাশে যাওরে
ঘোড়াউত্রা গাঙ বাইয়া।

(৩)

উজান দ্যাশের মাঝি ভাইধন
ভাটির দ্যাশে যাও
বাজানেরে কইও খবর
দেখা যদি পাও।

(৪)

উজান দ্যাশে থাকরে বন্ধু
ভাটি দ্যাশে ঘর
আইতে যাইতে আপন হইছে
চোখে দেখার পর।

www.pathagar.com

(৫)

ও নদীরে তুই আমার কতকাল খেলবি নিঠুর খেলা
তর বুকেতে কত মাঝি ডুবলো অবেলা।

(৬)

ওরে রঙিলা নাইয়া তুমি রঙের পানসী বাইয়া
কোন ঘাটেতে করলা নোঙ্গর তুমার পানসী লইয়া।

(৭)

ভাটি কিশোরগঞ্জের কত পানিরে
ভাড়ি-ঘর ভাঙ্গে ঢেউ বাতাসে
ঘায়েল দেইখ্যা চাইয়্যা থাকি
আমারে বাঁচাইতে নি কেউ আসে-রে।

(৮)

এইলা কেলা যাও গো, বাইর গাঙ দিয়া
ভাইছাবরে কইও তুমি, নাইওর নিতো আইয়া।
থাহ্ থাহ্ বইন গো, কিল মুড়া খাইয়া
আষাঢ় মাসঅ নিতে আইবাম, জলিধান দাইয়া
জলি ধানের কিড়ি মিড়ি, মাওয়া পক্ষী খায়
আমার অভাগী বইনেরে, কাইর‍্যা নিতো চায়।

(৯)

বাপের বাড়ি ছাড়ি কইন্যা শ্বশুর বাড়ি যায়
নাওগলুয়ের পিছন দিয়া ফিরা ফিরা চায়।

(১০)

বাপের বাড়ির পানসী রে কোথায় চল্যা যাও
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও।

(১১)

ঘাটে লাগাইয়্যা ডিঙ্গা পান খাইয়া যাও
ঘাটে লাগাইয়্যা ডিঙ্গা তামাক খাইয়া যাও
পান খাইয়া যাওরে বন্ধু, তামাক খাইয়া যাও।

(১২)

ভাটি গাঙের ভাইটাল সুরে
বাঁশি কে বাজাইয়্যা যাও ওরে বন্ধু
একবার চাও ফিরে।

(১৩)

তোমার বাঁশির ভাইটাল সুরে
পরান আমার রয় না ঘরে।

www.pathagar.com

(১৪)

নাও বাইয়া যাও রঙিলা নাইয়া
নীল বাদাম উড়াইয়া
ওতোর ঢেউয়ের তালে নৌকা দোলে
হেলিয়া দুলিয়া।

(১৫)

কোন বা দ্যাশের মাঝি তুমি
কোন বা দ্যাশে ঘর
কি নাম ধইর‍্যা ডাকবো তোমায়
নৌকারও উপর।

৮. পল্লিগীতি

পল্লিগীতিকে লোকগীতিও বলা হয়। লোকগীতি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। লোকগীতি বাংলার মানুষের প্রাণ। নিম্নে একটি পল্লিগীতির কিছু অংশ দেওয়া হলো :

এসো নিরলে–
কইও দুঃখ বন্ধুয়ার লাগ পাইলে
আমার বন্ধু রঙ্গি চঙ্গি
হাওরে বান্ধিয়াছে টঙ্গি
তবুও পরান না জুড়ায়
বাতাসে গো নিরলে–।

৯. গোরক্ষনাথের গান

প্রাচীনকাল থেকে কিশোরগঞ্জে গো-রক্ষক হিসেবে গোরক্ষ নাথের পূজা-শিরনি-গান ইত্যাদি প্রচলন রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের এ আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। গোরক্ষনাথ নাথধর্ম শাস্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তবে আদিগুরু মীননাথ। রাখাল বালকেরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে চাল সংগ্রহ করে। এ যেন পিরের দোহাই, পির দেবতার দোহাই হিসেবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে মান্য করে। নিম্নে গোরক্ষনাথের গানের অংশবিশেষ দেওয়া হলো :

অক্ষি লো মেনা গাই
গোরক্ষের নামে সিন্নি চাই।
সিন্নি চাই-সিন্নি চাই
গোরক্ষেরে আমরা বুঝাই।
আমরা যে রাখুয়াল ভাই
গোরক্ষের সিন্নি চাই।
গোরক্ষের সিন্নি লাই
পাইলে কিছু আমরা খাই।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জে গোয়াল ঘরের ভেতরে বা বাইরে দরজায় ভাঙ্গা হাঁড়ির গলা ঝুলিয়ে রাখার প্রথা কৃষকদের মধ্যে আছে। কোনো কোনো কৃষকের বাড়ির বাইরে অথবা ঘরে গরু-মহিষের শিং বা মাথা ঝুলিয়ে রাখার প্রথা প্রচলন রয়েছে। এর অর্থ হলো গরু-মহিষের ক্ষতিকারক কোনো প্রেতাত্মা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে মাগনের একটি গান নিম্নরূপ :

আইলাম রে ভাই অরনে-লক্ষ্মী দেবীর চরণে
লক্ষ্মীদেবী দিল বর-ধান কড়ি বাইর কর।
ধান না দিয়া দিলে কড়ি-তারে করমু লড়িছড়ি
লড়িছড়ি সামরে-সোনার মুকুট বান্ধরে।
সোনা না রূপা ভাল-এই ঘর খান দেখতে ভাল
ছিক্কাই লড়ে ছিক্কাই লড়ে- ঝুমুর ঝুমুর পয়সা পড়ে।
ওগলা পয়সা পাইলাম রে- বাইন্যা বাড়ি গেলাম রে
বাইন্যা বাড়ি বাঘের ছাও- হুঙ্কার দিয়া করে রাও।
বড় বড় ঘরণী- মশা বড় চাড়ুনী
বল মশা তোমার মন- আমরারে দিবা কত ধন।
ধান দেন তো বাড়ি যাই- শীতে বড় কষ্ট পাই
আমরা তো মাগন চাই-লক্ষ্মীর চরণ গাই।

গোরক্ষনাথের বন্দনা গানটি নিম্নরূপ

একদিন নারায়ণ গোলোক ভবনে
লক্ষ্মীসহ বসিয়া আছেন রত্ন সিংহাসনে।
লক্ষ্মী বনে শোন প্রভু আমার বচন
দুধ না হইলে ভোগ হইবে কেমন।
একথা শুনিয়া প্রভু চিন্তিতে লাগিল
দক্ষিণ কোণেতে কপালির জন্ম হইল।

সেই হতে কপালি স্বর্গ পুরে রয়
গোয়াল না হইলে দুধ কে আনিয়া দেয়।
সেই কারণে গোয়াল জাতি করিলেন সৃজন
প্রথম সিজাইলেন গোঁসাই মথুরা ভবন।
তাহাতে বসতি হইল গোয়াল আশি ঘর
নন্দ গোষ গোয়ালের নারী কৌশল্যা সুন্দর।
তামার বাটায় ছেকা খর রূপার বাটায় তৈল
তাহাক লইয়া শচীকন্যা গঙ্গা স্নানে গেইল।
হাঁটু জলে নামিয়া কন্যা হাঁটু করিলে সুদ
গঙ্গাজলে নামিয়া কন্যা দিলে পঞ্চ ডুব।
পঞ্চ ডুবে গোয়াল কন্যা হইয়া গেল সুদ।
গোয়াইলে গরু বাড়ে ভাণ্ডারেতে ধান
মনের আশা পূরণ করে লক্ষ্মী নারায়ণ।

www.pathagar.com

১০. কাপালীসংগীত

কিশোরগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন আদিবাসী জাতি গোত্র গোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। তাদের বসতি থেকে এ জেলায় বোরগাঁও, জঙ্গলবাড়ি, সাঁওতালী ভিটা, মনিপুরীঘাট, রাখুয়াইল, বনগ্রাম, ভূনা, কটিয়াদী, মান্দারকান্দি, খাসাল, ভাটুরা, ভাটিয়া নাগেরগাঁও প্রভৃতি জনপদের নামকরণের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম সমাজের মধ্যে নানা সম্প্রদায় গোত্র ও মতাদর্শী শ্রেণি পেশার লোকজন বসবাস করছেন। যেমন–গাইন, বৈদ, মাইমল, মলং, কারার, মল্লিক, মিলকী, কাহার, কাপালী বা কপালী ইত্যাদি তাদের নামেও জনপদ গড়ে উঠেছে। যেমন- কপালীপাড়া, কপালীহাটি প্রভৃতি।

কপালী সংগীত এককালে কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত ছিল। সংগীত যে শুধু সুর ও কথা মন্ত্র সমন্বিত বাণী ঝংকারই নয়, সামাজিক সাংসারিক ইতিহাস ঐতিহ্যের মূল্যবান আকর বিশেষ এই কপালী সংগীত তার অনন্য দৃষ্টান্ত। নিচে এ বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা পুরাতন কোর্টের রেকর্ড রুমে অনেক জোতদার হিন্দু কৃষি ও মৎস্যজীবী কপালীদের নামে সি.এস.আর. ও আর.এস. রেকর্ডভুক্ত মানুষের নামের তালিকা রয়েছে। বর্তমানে বর্ণবাদী হিন্দু-সমাজের দৃষ্টিতে এই উপেক্ষিত সম্প্রদায় তারা। অনেকে শিক্ষাদীক্ষায় নামের শেষে পদবি যুক্ত করেছে ‘সরকার’সহ বিভিন্ন পদবি নামে। তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভূমিকায় সংগীত চর্চায়। এসব কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিশোরগঞ্জের কপালী সম্প্রদায়দের একটি প্রাচীন সংগীত বর্ণনা করা হলো :

শিবের ঘরণী সতী
হীন কপালী জাতি।
কপাল মোচন কৈল মনিকর্ণিকায়
তেঁহি কপালি নাম সর্বলোকে কয়।
গোহালেতে গরু বাড়ে ভাণ্ডারেতে ধান
মনের আশা ভূঞ্জে যেন লক্ষ্মীনারায়ণ।

নিচে এ রকম আরও একটি গান তুলে ধরা হলো :

গাই-বাছুরে সল্লাকরে
গাইয়ের কানে কানে
এক ফোঁটা দুধ রাইখ্যো মাগো
তোমার চারিটি বানে।
কি কইলারে বাছুর ছাওয়াল
কি শুনাইলা কানে
এমন গিরছ দুয়ায় দুধ
কইলজ্যা অস্থি টানে।
ভালো গিরছ দোয়ায় পুতরে
কিছু রাহে বানে
গোয়াল যে দোয়ায় পুতরে
ভিতর থেইক্যা টানে।

www.pathagar.com

টানাটানির কপাল হায়রে
আল্লা কুদরতে তোমার
গাভী হইয়া জন্ম লইলাম
অপরাধ কি আমার।

১১. ভাসানগান

'ভাসানগান' মূলত বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকদেবী 'মনসা বা পদ্মপুরাণ' গানের একটি নৃত্য প্রধান পরিবেশনা আঙ্গিক। কিশোরগঞ্জে ভাসান গানের প্রবর্তক ছিলেন মধ্যযুগের মনসা মঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস। পরবর্তী সময়ে এ জেলা থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ গান ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণের নিকট মনসার ভাসান গান খুবই জনপ্রিয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিজবংশীদাস কন্যা কবি চন্দ্রাবতী রচিত দস্যু কেনারাম নামক পালাকাব্যে। তিনি লিখেছেন :

খোল বাজে করতাল বাজে বাজে একতারা
পিতার সহিত গায় শিষ্য সঙ্গে ছিল যারা।
শ্রী অঙ্গেতে নামাবলি সন্ন্যাসীর বেশ
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ।
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়
আগে আগে যায় পিতা পাছে শিষ্য রয়।

দ্বিজবংশীদাস মঙ্গল গান বা ভাসান গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। চন্দ্রাবতী রচিত 'দস্যু কেনারাম' পালা কাব্য পাঠে আমরা জানতে পারি একদা কবি দ্বিজবংশী দাসের কণ্ঠে ভাসান গান শুনে ভাটি কিশোরগঞ্জে তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ডাকাত সর্দার কেনারাম পরবর্তী সময়ে ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সমাজের আর দশ জনের মতো হয়ে উঠেছিলেন একজন ভালো মানুষ। কিন্তু গায়েন কবি দ্বিজবংশী দাসের অবস্থা কি ছিল সে কথাও কন্যা চন্দ্রাবতী তার কাব্যে উল্লেখ করেছেন :

ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি
আকর ভেদিয়া পড়ে উছিলার পানি।
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে
চাল করি যাহা পান আনি দেন ঘরে।
বাড়িতে দারিদ্র্য জ্বালা কষ্টের কাহিনি
তার ঘরে জন্ম নিল চন্দ্রা অভাগিনী।

১২. রামায়ণগান

কিশোরগঞ্জে রামায়ণ গানের কীর্তনাঙ্গিকের পরিবেশনা রীতিকে 'রামমঙ্গল' কীর্তন গান বলে। সাধারণত মুখে মুখে 'রামায়ণগান বা রাময়ন কীর্তন' এ দুটোও বলা হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলার সর্বত্র গ্রামের মানুষের মাঝে এই রামায়ণ গানের আসর বা অনুষ্ঠান অত্যন্ত জনপ্রিয়। সমগ্র বাংলাদেশে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর পরিবেশনা সর্বাধিক জনপ্রিয়। একই সঙ্গে এও বলা যায় যে, কিশোরগঞ্জে অন্যতম বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাস রচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর আখ্যান পরিবেশনাও এককালে

www.pathagar.com

জনপ্রিয় ছিল। তবে কিশোরগঞ্জে ষোড়শ শতাব্দী থেকে কবি চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ গানই বেশি জনপ্রিয় এবং প্রচলিত। নিম্নে রামায়ণের রামচন্দ্রের বন্দনাটি দেওয়া হলো :

রামের দক্ষিণে লক্ষ্মণ হে
রামেতে জানকি বন্দিরাম।
আহা রাম রাম রাম ...।
রাম হে ...। ঐ

প্রথমেতে বন্দনা করি মাতা-পিতা চরণে
যাদের কৃপায় দেখেছি আমি এ তৃণ ভুবন হে
রামেতে যা ...ঐ
থত পরে বন্দনা করি শ্রী গুরুর চরণে হে
যিনি আমার কর্ণমূলে দিলেন অমূল্য রতন
আদিখণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সিতার
অজুদ্দাতে রাম বনবাস তেজিরাজ্য ভার হে
অরুন্য খণ্ডে হলো সিতারও হরণ
কৃষ্ণকিন্দা খণ্ডে হইলো শুক গৃহের মিলন হে
সুন্দরার খণ্ডে হইলো সাগর বন্দন
লক্ষ্মী খণ্ডে হইলো রাবন নিধন হে
উত্তরা খণ্ডে হইলো খণ্ডের ও বিভীষণ
সিতা বিবি করেছিলেন পাতালে প্রবেশ হে
মাতা বান্দি পিতা বান্দি ওস্তাদের চরণ
যিনি আমার শিক্ষা দিলেন গীত রামায়ণ
লক্ষ্মী স্বরসথি বন্ধি যত দেব দেবিগণ।

পর্বতে পর্বতে করি বন্দি, ৬০ হাজার মনি দেব চরণ
আসরেতে আছেন যত গৌর ভক্তগণ
একে একে বান্দি আমি সবারও চরণ।
মতো বাচা হনুমান ও পবনের নন্দন
তুমি বিনে রামের কার্য কে করবে সাধন
সভার মধ্যে আছেন যত মুসলমানও ভাই
একে একে সকলেরই আদাবও জানাই
গোপাল মোদক নামটি আমার
জঙ্গল বাড়িতে বাড়ি।

বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমি দেশ বিদেশে ঘুরি
সপ্তখণ্ডে রামায়ণ ও করিলাম বন্দন
কৃপা করে দাও হে বন্ধু জোগল ও চরণ
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতেরেও অমৃতল হরি
জয় রাগব রাম চন্দ্র দশরত নন্দন
তারকা নাসন সাগর শোষণ

www.pathagar.com

কৌশল্লা কুলে শোভন জয় বাগর রাম চন্দ্র। ঐ
জয়, জয়, জয় রঘু কুলপতি হর ধনুভেঙ্গে
আনলেন সিতা সতি।
জনকের মনে জন্মায় প্রীতি
পষুরাম দর্পণ বঞ্জন ও জয়রাগব রামচন্দ্র। ঐ
জয়, জয়, জয় অজুদ্দা ভুবন
কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পরশে চরণ
জলেরি উপরে ভাসালে পাথর
অহল্যা উদ্ধার ও কারণও।
জয় রাগব রাম চন্দ্র দশরত নন্দন।

১৩. বাউলগান

কিশোরগঞ্জে বাউলগানকে বলা হয় 'বাউলা' গান। প্রবাদ আছে–বাউলা গানের আউলা বাও বোঝা বড় কঠিন। 'বাউল'–আধ্যাত্মিক চেতনাপুষ্ট সর্বধর্ম মতবাদে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায় বিশেষ লোক। যারা লোকধর্মের অনুসারী তত্ত্বজ্ঞানী ও আত্মসন্ধানী।

'বাউল' শব্দের আকুল-আউল থেকে 'আউলিয়া' শব্দের উদ্ভব। তবে বাউল ধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক মুসলিম পির ফকিরগণ। তারাই বাউল শব্দ ও সম্প্রদায়ের প্রচার প্রসার ঘটান। পরবর্তী সময়ে হিন্দু বৈষ্ণব-বৌদ্ধ মতবাদ একত্রিত বা মিশ্রিত হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ 'বাউল' মতবাদের উদ্ভব হয়। এ কারণেই বাউল গানে হিন্দু-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব ও মুসলিম সুফি মতবাদের সমন্বয় ঘটেছে। যেমন :

নানা বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম, একই মায়ের পুত।

কিশোরগঞ্জ জেলার আদি বাউলগণ সংসার বিবাগী ছিলেন। তারা তাদের গানে জীবন ধর্ম ও স্রষ্টার সঙ্গে ভাবে সম্পর্ক নিয়ে নানা সংগীত রচনা করেছেন। কিশোরগঞ্জ জেলার এমনই একজন আদি বাউল মামুদজান ফকির। সপ্তদশ শতক তার সময়কাল। নিকলী উপজেলা কারপাশা ইউনিয়নের মজলিশপুর বাজার সংলগ্ন হাওরে তার মাজার রয়েছে। মামুদজান ফকির অসংখ্য বাউল সংগীত রচনা করে গেছেন। তার একটি গানের অংশবিশেষ :

ওরে মানিক চিনে রে
মানিক চিনে দু'এক জনে
গুরু যারে দয়া করে
চিনতে কয়জন পারে–ভবে।

তার আরেকটি গানের অংশবিশেষ :

চিন্যাল তর মনের গো মানুষ
মানুষ কেমনে আইসা যায় ওরে
মানুষ চিনিয়া ল।

www.pathagar.com

তার আরও একটি গানের অংশবিশেষ :

আমার মনের এই না ভুল
আমি বিছারিয়া
না পাইলাম কুল।

বাউল গান কখনো কখনো আসরে প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসামূলক একটি বাউল গান নিচে দেওয়া হলো :

কইনছেন দেহি বাউল ভাইরে
কইনছেন দেহি অতি
কোন শহরে নদী তার
থেমে গেছে গতি।
শহরের নাম কী?
উত্তর : কিশোরগঞ্জ
নদীর নাম নরসুন্দা।
এই শহরের বাউল আমি মাথায় লম্বা চুল
মূর্খ অতি জানাই শ্রদ্ধা ভক্তি
গানে হতে পারে ভুল।
নিজগুণে অধমেরে
করিবেন মার্জন।
কইনছেন দেহি বাউল ভাইরে
করি জিজ্ঞাসন
সুন্দর কইর‍্যা
দেও বুঝাইয়া
সৃষ্টির বিবরণ।
বাজাও বাজাও ভাইরে
যন্ত্রী ওয়ালাগণ
পয়ার পদ ছাইরা দিয়া
ত্রিপদীতে দাও বাজাইয়্যা
করি একটু রসের আলাপন।
ওগো লক্ষ্মী গুণধন
করি একটু রসের আলাপন।
সভা করে বসলেন যত
শ্রোতা বন্ধুগণ
সবার নিকট জানাই আমি
করি নিবেদন।

আসলেন যত ভাই বন্ধুগণ
হিন্দু-মুসলমান
আদাব-ছেলাম জানাই আমি

www.pathagar.com

গেয়ে বাউল গান।
প্রথমেতে প্রশ্ন করি
আউলা বাউলা সুরে
বাড়ি আমার কোথায় বল?
কাছে নাকি দূরে।
কাছের মানুষ দূরে থাকি
গাই বাউলা গান
বাউলা গানের পাগল আমি
খোদার সেরাদান।
এই পর্যন্ত ছিল জিজ্ঞাসা
করে দিলাম সব খোলাসা
বল-বল-বল ভাইরে
বাউল গুণধন।

এই সমস্ত ছেড়ে দিয়ে
শুনেন শ্রোতা বন্ধুগণ
প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আমি
করি জিজ্ঞাসন।
ইয়া মালেকুল মুলকে খোদা
রাব্‌বুল আল্‌-আমিন
তোমার কুদরতে পয়দা
আস্‌মান আর জমিন।
অন্তরে অন্তরে দেখ
সবার কাছে প্রশ্ন কর
কলবের ভিতর কে কথা কয়
তারে তুমি ধর।
ইতি দিলাম, ইতি দিলাম
আদাব-ছালাম পৌঁছে দিলাম
ভুল-ত্রুটি আইলে পড়ে
করিবেন মার্জন।

বাউল ভাইয়ের কথা শুনে
ভয় হইল আমার মনে
কেমন করে উত্তর দিব
ওরে গুণধন।
প্রভু এই বিশ্বভুবন
সৃজিয়াছেন সকল
তবু তোমার আমার পরিচয়

www.pathagar.com

বেক্‌কল আর আক্‌কল
ওরে গুণধন।
প্রশ্ন শুনে চমকিয়া
ওঠে আমার মন
দেহতত্ত্ব ছেড়ে দিয়া
সৃষ্টি তত্ত্ব চাইলেন যখন
উত্তর শুনেন এখন
ওরে গুণধন।

১৪. বিচারগান

বিচারগান হচ্ছে গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া গান। এ গান গুরু-শিষ্যের আসরে পরিবেশন করা হয়। গুরু বড় না শিষ্য বড়? গাছ বড় না গাছের বীজ বড়? ডিম আগে না মুরগি আগে? এ সব প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে তাদের গানের মাধ্যমে তর্ক-বির্তক হয়। অনেক সময় তর্কে গুরুকে হারও মানতে হয় শিষ্যের কাছে। এমন জটিল তত্ত্ব আছে যা গুরু ভাঙিয়ে বলতে চান না। শিষ্যও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। চলে গুরু-শিষ্য প্রতিযোগিতা– বিচার করবে কে? তাই তার নাম বিচারগান। যেমন :

হাওরার ঘরে আছে হাওয়া
মানুষ যেথায় আসে যাওয়া
দমের ঘরে দমের সাধন
সেই মানুষে করে ভজন।
মানুষ যাইয়া মানুষে মিশে
মানুষেরই সোনার দেশে
পরম মানুষ থাকবে কিসে
যদি তারে কর যতন।
দিন গেল যার রঙ্গ রসে
ফলবে কি ফল কিসের আসে
প্রেম কর তাই ভালোবেসে
করিয়া মনেরও মতন।

১৫. মুর্শিদিগান

মুর্শিদ অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু। যিনি আদেশ বা নির্দেশ করেন। মুর্শিদিগান আধ্যাত্মিক ভিত্তিক গান। ভারতীয় উপমহাদেশে হযরত খাজা মাইনুদ্দীন চিশতি (র.) এ গানের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমান্বয়ে এ দেশের পির-ফকির-বাউল-সাধক-সন্নাসীদের কাছে নানাভাবে মুর্শিদি গান খুবই জনপ্রিয়। বাংলাদেশে মুর্শিদি গানের উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম। মুর্শিদিগানে গুরুতত্ত্ব, রাসুলতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিবেশন করা হয়। কিশোরগঞ্জে মুর্শিদিগান সাধারণত রাত্রিকালে পির-মুর্শিদ-শিষ্যদের নিয়ে একত্রিত হয়ে সকলে গান পরিবেশন করে থাকে। এতে তেমন কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গুরু-শিষ্য উপস্থিত থাকেন।

www.pathagar.com

বৈঠকে প্রথমে বন্দনা করে গান গাওয়া হয়। পরে পয়গম্বর এবং দেব-দেবীর চরণ বন্দনা করে গান আরম্ভ হয়। এ জেলায় মুর্শিদি গানের ব্যাপক ভাণ্ডার রয়েছে। নিম্নে মুর্শিদি গানের বর্ণনা দেওয়া হলো :

(১)

আপন দিল কর সাদা
কেন ভাবো পর আলাদা
যথা মুর্শিদ তথা খোদা
সেই রূপেই ডুবে থাক।
মনের গোপন দরজাকে খুলিবে
মুর্শিদ ছাড়া আর কে জানিবে
মুর্শিদ প্রেমের গৌরব কর
সর্বক্ষণ ইস্কে ভাবে থাক।
ধ্যানের ঘরে লক্ষ কর
মুর্শিদ রূপের সুরাত ধর
সাধন ভজন সিদ্ধি হবে
নির্জনেতে বসে থাক।

(২)

সোনার আসর বান্দিলাম গো
উপস্থিত বন্ধু-ভ্রাতা সবার চরণে জানাই সালাম।
দয়াল নাম স্মরণ করি দাও আমারে চরণতরী
কুদরতিময় কুদরত করে রয়েছ মোকাম।
আর খানায় আলে আল্লা করেছে আসন
সেই আসনে ভক্তি শ্রদ্ধা রেখে আলি করি নিবেদন।

(৩)

মুর্শিদের প্রেম মুর্শিদ জানে
বলে কথা শিষ্যের কানে কানে গো
মুর্শিদ যথা খোদা তথা
সেই তত্ত্বটি কেবা মানে।
দেখবে যদি সাঁইর কুদরতি শান
ইস্কে রূপে করগে ধিয়ান গো
চার তরিকার খবর জানে
সেই সত্যটি কেবা মানে।
জিজ্ঞাসা সাঁই তোমার কাছে
সে খুশি হয় কোন কাজে গো
বল তাই প্রকাশ করে

www.pathagar.com

সেই কথাটি কেবা জানে।
বলি বলি মালিক আছে
রোজা-নামাজ-হজ্ব-যাকাত যাচ্ছে গো
কোন খান্দানে মুরিদ তুমি
মুর্শিদ প্রেমের ভক্তি গুণে।

(৪)
বেদ বিধি বড় নিগুম
ঘরে বসে আছে সাঁই
কেমন করে ধরব তারে
কোথায় গেলে মুর্শিদ পাই।
মুর্শিদের নাম ভুল করিলে
পড়বিরে ভীষণ ফ্যারে
ভুল করিলে যাবি মারা
মুর্শিদ নামের সন্ধান চাই।
মুর্শিদ আমার মনতো অবোধ
তোমায় ছাড়া হয় না সুবোধ
পাপী আমি পার পাবো না
মুর্শিদ নামে সঙ্গ চাই।
মুর্শিদ ধরবি কেমন করে
সাধ্য আছে কার ধরতে পারে
যোগ্য শিষ্য হতে চাইলে
মুর্শিদ ছাড়া উপায় নাই।

১৬. নৌকাবাইচের গান

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভাটি বা হাওরের দেশ কিশোরগঞ্জ। ভাটি কিশোরগঞ্জের হাওর জনপদের মাঝি-মাল্লারা তাদের জীবন জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদী-নালা-খাল-বিলে নৌকা বেয়ে থাকে। জলদাস-জেলে-কৈবর্ত জাতি সম্প্রদায় নদী-নৌকাতেই তাদের জীবন-জীবিকা সেই আদিকাল থেকে। এই নদ-নদীর প্রেরণাই নৌকা বাইবার কালে গান গাইতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নিকলী নৌকাবাইচের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় পাঁচশত বছরের প্রাচীন বলে জানা যায়। নতুন নৌকা নদীতে ভাসিয়ে বাইচাল মাঝি-মাল্লারা প্রথম যে গান গায় সে তো তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর আনন্দ উল্লাসের কথা। নিম্নে নৌকাবাইচের গান দেওয়া হলো :

(১)
আমরার নাওয়ের গডন মন্দনা
বাইচ খেলাইতে অন্য নৌকা
আর কেউ তো পারে না।

www.pathagar.com

লোকে বলে চলে মন্দনা
কোন ছুতারে বানাইছে নাও
বাইচ ধরলে কেউ তো পারে না।
আমরা আইলাম বাইচ খেলাইতে
মনের মত জোড়া পাইলাম না
হায়রে কেউতো পারে না।
বৈঠা ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
বিধি যেন মনের আশা পূর্ণ করে
আমরার সাথে কেউ তো পারে না।
নাওরে চল্ চল্ উড়াল দিয়া চল্
মুখে বল বদর বদর বল
আর কেউতো পারে না।

নদীতে নৌকাবাইচের উৎসব কেন্দ্রে আসার পর শুরু হয় মালিকদের পরিচিতিমূলক গান। যেমন :

(২)

ধন্য জানাই নৌকাখানি
ধন্য তার মালিক।
ধন্য জানাই ছুতার মিস্ত্রি
ধন্য রংয়ের ঝিলিক।
ধন্য জানাই বাইচাল ভাই
গেরাম নিকলী বাড়ি।
দৌড়ের নাও দৌড়ের বৈঠা
নাম করলাম জারি।

নৌকাবাইচের একটি জনপ্রিয় গান, যা উভয় সম্প্রদায় মনের আনন্দে তা ঘাটে ঘাটে কিংবা নদীতে নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় তারা সম্মিলিতভাবে গেয়ে থাকে। যেমন :

(৩)

ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না গো
প্রাণ সজনী-আর জলে ঢেউ দিও না।
পুষ্কনীর ও চাইর ও পারে, তুতা ময়নার বাসা
ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে, কি আজব তামাসা গো
প্রাণ সজনী-আর জলে ঢেউ দিও না।
পুষ্কনীতে নাইরে পানি, কি করব তার সোতে
যে-বানারীর পুরুষ নাই, কি করব তার রূপে গো
প্রাণ সজনী-আর জলে ঢেউ দিও না।
আম গাছে নাইরে আম, কুডা কেলে লাড়

www.pathagar.com

তোমার আমার নাই পিরীতি আঁখি কেনে ঠার গো
প্রাণ সজনী আর জলে ঢেউ দিও না।

অগণিত জনতা নদীর দুই তীরে সারি সারি নৌকার উপর দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে ও নির্মল আনন্দ উপভোগ করে। এই নৌকাবাইচের দৃশ্যটি এত আনন্দ আর উল্লাস উৎসবমুখর যে শুধু প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কেউ এর কথা শুনে রূপ-রস-গন্ধ ও স্বাদ উপভোগ করা যাবে না। নদীর উপর তার বেগে ছুটে আসা নৌকায় উপবিষ্ট লোকেরা যে গান গায় তাতে ভাবে বিভোর না হয়ে পারা যায় না। নৌকাবাইচের প্রধান আকর্ষণীয় ও আনন্দের বিষয়বস্তু হচ্ছে গান আর গান। যেমন :

(৪)

মাঝি বাওরে বাও, মন পবনের নৌকা বাইয়া যাও
পবন কাঠের নাও, নাওরে শূন্য ভরে উড়া দিয়া যাও।
মন পবনের নৌকাখানি, মধ্যে মধ্যে কাঠের গোড়া
ছুবের মদ্যে গিয়া নৌকা, হঠাৎ শূন্যে মারে উড়া।
মাঝি বাওরে বাও, ভালা কইরা বৈঠা টাইন্যা যাও
মন পবনের নৌকা খানি, বাইচের গান গাও।
পবন কাঠের নাও, নাওরে কোন দেশেতে যাও
জয়ের নিশান দেখা যায়, বাড়ি ফিরা যাও।
মাঝি বাওরে বাও, লিলুয়া বাতাসে নৌকা বাইয়া যাও
মন পবনের নাও, নাওরে ছলছলিয়ে তীর হাওরে যাও।
ছুবের মধ্যে জিত্যা আইছি, বাইচের গান গাওরে গাও
খাসি, মুরগি ভালা কইরা, পেট ভইরা খাওরে খাও।

ফাইনাল বাইচের দিন বিভিন্ন স্থানের বাইচালেরা বাইচ মেলার নিমিত্ত নির্দিষ্ট দিনের সকাল থেকে দুপুর নাগাদ নৌকার গায়ে আলকাতরা, গাব, কলা ও ময়দা মেঘে পিচ্ছিল করে নেয়। এতে এত পিচ্ছিল হয় যে, পানিতে নৌকা নেমে দেয়ার সাথে সাথে পবন বেগেই যেন নৌকা ছুটতে থাকে তীরের মত। কী অপূর্ব, কি সুন্দর বাইচলদের গায়ে থাকে লাল, সাদা সবুজ কিংবা হলুদ রঙের গেঞ্জি। হাতে রঙিন রুমাল, মাথায় রঙিন কাপড়। এমনিভাবে বাইচের খেলা চলে। নৌকাবাইচ শুরু হয় সাধারণত প্রতি শ্রাবণ সংক্রান্তি ও পরদিন পহেলা ভাদ্র মাসে। এসব উৎসব ছাড়াও ব্যক্তিগত বা কোনো কমিটির উদ্যোগে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নৌকাবাইচ হলেই দূরদূরান্ত থেকে যে ধ্বনি শোনা যায় তা হলো গান। ঢোল-ঢোলক-দুতারা, খঞ্জরী, করতাল, মন্দিরা, পায়ে নূপুর ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রযোগে এ গান পরিবেশন করা হয়। যেমন :

(৫)

তাইরিয়া নাইরিয়া নাইরে, তাইরে নাইরে নার
তাইরিয়া নাইরিয়া নাইরে, তাইরে নাইরে নার।
আরে ও-ও-দৌড়ের নাও, দৌড়াইয়া যাও।
জারুই কাঠের নৌকাখানি, রঙ্গি কাঠের বৈঠা

www.pathagar.com

আরে ও-ও-দৌড়ের নাও, দৌড়াইয়া যাও।
বাইচাল বসি জোড়া জোড়া, রাতা কাঠের গোরা
ময়ূরপঙ্খী নৌকাখানি, ধরতে চায় আসমানের ঐ চূঁড়া
আরে ও-ও-দৌড়ের নাও, দৌড়াইয়া যাও।

(৬)

সাবাস সাবাস সুন্দর আলীর সখের নৌকা ভাই
ওরে বিছমিল্লা বইলা নায়ের খোল দড়ি তাই
হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-ভাই।
ব্যাটা ছেলের জোড় শোভা, নইলে মাগী ভাই
হেঁইয়ো বইলা টান মারো রে, আগে যাওয়া চাই
হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-হেঁইয়ো-ভাই।

ভাটি কিশোরগঞ্জে নৌকাবাইচের গান একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকসংগীত। এ সংগীতে নদী-নৌকা-নাইয়া ছাড়াও নানাবিধ প্রসঙ্গে গান গাওয়া হয়। যেমন :

পুবের থনে আইলো বাতাস নদী হইল তল
দ্যাশ পিরথিমী সাগর ভইর‍্যা হাওরে নামল জল
এই জলেতে নৌকা বাইচ, নদী নৌকা করে টলমল।

১৭. বারোমাসি গান

বারোমাসি গান বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও কিশোরগঞ্জে 'বারোমাসি' নামেই খ্যাত। বারোমাসি গানে বছরের বারো মাসের সামাজিক-সাংসারিক সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্না-আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ গান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বা লম্বা ধরনের গান। নিম্নে কিশোরগঞ্জের বারোমাসির গানের কিছু অংশের বর্ণনা দেওয়া হলো :

আইলানা আইলানা গো পতি, আইলানা গো দেশে।
বৈশাখে কাঁড়ল মিডা, জইষ্ঠে গো মিডা আম
আষাঢ় মাসে ফুরায়া গো গেল, লেচু আর জাম।
শাওন মাসে শশা গো মিডা, ভাদ্দর মাসে তালের পিডা।
আশ্বিন মাসে জলপই অইল, কাতি মাসে উল
আমি ত না রান্ধি বন্ধু, মাগুর মাছের ঝুল।

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সগরা নামক গ্রামের করম আলী ফকির রচিত একটি বারোমাসি গানে ধর্মীয় এমাম হোসেনের শাহাদতের পর পুত্রশোকাতুর মা-ফাতেমার সারাটি বছর ধরে কত যে বেদনার কথা, সেই বেদনার প্রতিটি মাস যাপনের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ গানটি কয়েকটি বিশেষ কারণে বাংলা সাহিত্যে লোকসংগীতের ধারায় একটি অনবদ্য সংযোজন। নিম্নে গানটির অংশবিশেষ দেওয়া হলো :

হায় হায় মা-ফাতেমা কান্দে আরলে ধরিয়া
ইমাম উছেন শহীদ অইছে কারবালে গিয়া।
ফাতেমার বলন্ত ইমাম দুইন্যাই ছাইড়াছে

www.pathagar.com

চান্দ মুখে জোয়াব নাই মা বলিব কে?
আল্লাহ্ পরথম কার্তিক গো মাসে যাদু যায় গো রনে
আসিব কিনা আসিব অরসিত মনে।
সোনার পালঙ জোড় মন্দির খালি রইল পড়িয়া
কোথায় গেল ইমাম উছেন জননী ছাড়িয়া।
আয় হায়রে—আগুন মাসে ফাতেমা গো সবে খায় ন'য়া
দৈ-দুধ সর-লনী সবে খায় মেওয়া।
বান্ধিয়া বাড়িয়া অনাথ কারবা পাতে ঢালি
কে বলিব মা বলিয়া এই না দুঃখে মরি।

আয় হায়রে—পৌষ মাসে ফাতেমা গো ইন্নছ স্থানের ভাও
কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোন স্থানে যাও।
কোল ছাড়িয়া কোলের যাদু কোলের লইল মনি
দেখিলে প্রাণ জোরাজুরি না দেখিলে মরি।
আয় হায়রে—মাঘ মাসে ফাতেমা গো জারে কম্পমান
অন্তরে আগুন গো জ্বলে তলে বড়টান।
সুতার কাপড় তুলার বালিশ তুইল্যা লইল কোলে
দারুণ শিমুলের বালিশ মুখে রাওনা করে।
আয় হায়রে—ফাগুন মাসে কোকিল বলে দুলা মিয়া কই
চলিলাইন গো ফাতেমা সিন্নি লইয়া অই।
মদিনা বিছড়াইয়া মাগো শা মুর্তজা আলী
মালখানা ঘরেতে দেখে জোরে পালং খালি।
আয় হায়রে—চৈইত মাসে ফাতেমা গো মক্কা হইল ছাড়া
সারা দুইন্যাই খুঁইজ্যা মাগো অইয়া গেল সারা।
হোসেন-শা মুর্তুজা আলী যদি অইত আমরার বাপ
তে কেনে এজিদার পালে দিত এত তাপ।
বরকত আলী যদি অইত আমার মা
তে কেনে মরণ কালে পানি পাইলাম না।

আয় হায়রে—বৈশাখ মাসে ফাতেমা গো কি করুইন বসিয়া
তোমার যাদু কান্দন করে কাড়া শির লইয়া।
ডাইন হাতে কঙ্কেনা বান্ধা বাম হাতে কপাল
আড়াই দিনে আছলাইন মাগো ইল্লাল্লার দরবার।
আয় হায়রে—ফাতেমা যে বলে জিবরিল তুমি আমার ভাই
আজকা আস্তে ইমাম উছেন রইল কোন ঠাঁই।
আইন্যা দেও আইন্যা দেও ভাইরে বলি যে তোমারে
নয়নের পুতলী আমার আইন্যা দেও আমারে।
আয় হায়রে—জৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল গাছে নাই যে পাকে

www.pathagar.com

গাছের ফল পরিধন ডাইলে পাইকা থাকে।
গাছের ফল গাছে রইল না অইল ভক্ষণ
মৃগ শিগারে গেল তাই দুনুজন।
আয় হায়রে—আষঢ় মাসে ফাতেমা গো করুইন বড় আশা
দুই পুত দিয়াছে আল্লাহ্ খেলি তাইন পাশা।
দিন ত গেল অবশেষে বেইল ত বেশি নাই
আজকা অস্তি ইমাম উছেন কোথায় রইল দুই ভাই।

আয় হায়রে—আয়রে ও আয়রে উছেন আয় আয় মায়েরই কোলে
আইজরে আঙ্গিনার মাইঝে তুইল্যা লইব কোলে।
তোর মা ফইরাদী আইল অই আল্লার দরবারে।
আয় হায়রে—শাউন মাসে ফাতেমা গো ফজরে জাগিলাইন
ইলাইদার ইলাইদার পানি দেও মাগো অজু করি বাইন।
অজু করিয়া মাগো ডাইনে বাঁয়ে চায়।
আগুনের ধুঁয়া জ্বলে ফাতেমারই গায়।
আয় হায়রে—ভাদ্দর মাসে সকলে যে তালের পিডা খাইল
সেই মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখাইল।
ছাওয়াল ছাওয়াল বইলা মাগো স্বপনে জাগিল
কোথায় রইলে বুকের ছাওয়াল বুকে দুঃখ দিল।
আয় হায়রে—আশ্বিন মাসে ফাতেমা গো স্বপনে দেখিয়া
কান্দিয়া উঠিল মাগো দুই পুতেরও লাগিয়া।
শিশুকালে পুতের শোগ দিলা যে আমারে
সেই শোগ বাইট্যা দিলাম সবার ঘরে ঘরে।

কিশোরগঞ্জের দুটি বারোমাসি গান এখানে তুলে ধরা হলো। এ গানগুলোর রচয়িতা কে তা জানা যায়নি।

(১)

আইলা না, আইলা না গো পতি—আইলা না
আইলা না গো দেশে
পতি প্রেমে পাগলিনী আমি
থাকি আউলা বাউলা বেশে।
কত মাইনষের আনিগুনি
আমার পতির মত কেউরে দেহি না
আইলা না, আইলা না গো পতি
আমারে দেখতে তুমি আইলা না।
বৈশাখে কাঁডল মিডা জইষ্ঠে মিডা আম
আষাঢ় মাসে ফুরায়া গেল, লেচু আর জাম।

www.pathagar.com

শাউন মাসে শশা মিডা, ভাদ্দর মাসে তালের পিডা
আশ্বিন মাসে জলপাই অইল, কাতি মাসে জিগায় কেডা।
আগুন মাসে আগুন জ্বলে মনে মনে
পুষ-মাঘ আইল ঘুরে আমি থাকি বনে বনে।
ফাল্‌গুন মাসে কত ফুল ফুইট্যা রইছে দেখলানা
চৈতে আমার জীবন গেল যৌবন গেল আইলা না পতি আইলা না।

(২)

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গেলো
আষাঢ়-শ্রাবণ আইলো
ভাদ্র মাসে হইলো বর্ষা ভারী।
আশ্বিন-কার্তিক আসে
বন্ধুয়া রয় বৈদেশে
মনপুড়া যায় গড়গড়ি।
দেখিতে দেখিতে আগুন-পৌষ
আমার কপালের সব দোষ
মাঘ-ফাল্গুনে ও দিল আড়ি।
চৈত্রের অভাব শেষে
জীবন গেল হায় হুতাশে
বন্ধু কেন গেল আমায় ছাড়ি।
বারো মাসে করি আনচান
বাতাসে জুড়ায় না প্রাণ
আমি এখন উপায় কি করি।

১৮. বদরপিরের গান

বদরপির সাধারণত বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় অধিপতি হিসেবে খ্যাত হলেও ভাটি বাংলার সব নদী-নালা-খাল-বিল-হাওর-বাওর এলাকার মাঝি-মাল্লারা পানি পথে ব্যবসা-বাণিজ্যে যাত্রাকালে সেই আদিকাল থেকে পাঁচ পির কোথাও বদরপির ইত্যাদির নাম উচ্চারণ করে থাকে। তাদের বিশ্বাস নদী বা সাগর জল পথে ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র বদরপিরের নাম উচ্চারণ করিলে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাই মাঝি-মাল্লারা বদরপিরের পাঁচালি বা গান গেয়ে থাকে। নিচে একটি বদরপিরের গান দেওয়া হলো :

আমরা আছি পোলাপাইন
গাজী আছে নেগাবান
আল্লাহ্ নবী পাঁচ পির।
ঝড়-তুফানে মাঝি-মাল্লারা
মুখে বদর বদর বলিও
বিপদে হইও না অস্থির।

www.pathagar.com

নৌকার আগাপাছা ঠিক রাখিয়া
মাঝি সাবধানে চল
মাঝ দরিয়ায় উঠলে তুফান
বদর বদর বল।

১৯. বৈষ্ণবগান

বৈষ্ণবগান আসলে পদাবলি কীর্তন। পদাবলি কথাটির মধ্যে 'পদ' কথাটি গান বা গীতি হিসেবে বোঝায়। শ্রীচৈতন্যদেব-এর সমসাময়িক কিশোরগঞ্জের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাস, কবি কবিরাজ কৃষ্ণদাস, কবি রঘুদাস, কবি রূপনারায়ণ গোস্বামী, কবি চুঁড়ামনি, শ্রীশ্রী বংশীদাস বাবাজী প্রমুখ বৈষ্ণব কবি ও সাধকদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে এ গান বা গীত কীর্তনের প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কবি নিত্যানন্দ দাস রচনা করেছেন 'প্রেম বিলাস' নামক কাব্য ও অদ্ভূত রামায়ণ। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেছেন 'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বাঁশির মাহাত্ম্য ও অপরাপর তত্ত্বমূলক ভক্তিরস বৈষ্ণবগানে পরিবেশন করা হয়। নিম্নে এরূপ দুটি গান প্রদত্ত হলো :

(১)

বল বল মরি মরি
বল কৃষ্ণ বল হরি
কোথা হইতে পাইলে এমন
আকুল করা মোহন বাঁশরি।
কোন দেশে কোন বাঁশের ঝাড়ে
কাহার পাশে ছিল পড়ে
কোন নিঠুর আনল কেটে
বল কথা প্রকাশ করি ॥
কে করিল বুকে ছেঁদা
কোন বেদনায় বলে রাধা
কোন ছেঁদাতে কোন সুর উঠে
আকাশ বাতাস ভরি।

(২)

আমি রব না রব না গৃহে
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না।
ওগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
না-না-না-গো
বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না।
দে-দে-কানাইয়া লাল
বসন আমার হাতে দে
কুলনারী মরি লাজেতে।

www.pathagar.com

আমরা যত গুপী নারী
চান করিতে যাই
বসন লইয়া চিকন কালা
উঠল কদম গাছের আগায়।
আমি তোমার মামী ওগো
তুমি আমার ভাগেনা
কোন লাজেতে বসন লইয়া
উঠলা গাছের ডালেতে।

২০. পালাগান

কিশোরগঞ্জ-প্রাচীন পালাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল। কারণ এই কিশোরগঞ্জেই রচিত ও সৃষ্টি হয়েছে 'মৈমনসিংহ গীতিকার' অধিকাংশ পালাগান। এই পালাগুলো ৪/৫ জন দোহার নিয়ে পালা বা কিস্‌সা গাইতে হয়। বাদ্যযন্ত্র কেউ কেউ ব্যবহার করেন, অনেকে করেন না। কিশোরগঞ্জে গ্রাম্য বা গ্রামের আপামর জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের এক চমকপ্রদ উপাদান ছিল এ পালাগান। কিশোরগঞ্জে এই পালাগানকে আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষায় 'কিস্‌সা বা কিচ্ছা' বলে। ষোড়শ শতকের কবি দ্বিজবংশী দাস, তার কন্যা কবি চন্দ্রাবতী, লোকগায়ক কবি নয়ন চাঁদ, মনসুর বয়াতী এরা এ অঞ্চলে প্রাচীন পালাগানের প্রবর্তক।

মৈমনসিংহ গীতিকার ১২টি পালা কাব্যের মধ্যে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজলরেখা, দস্যু কেনারাম–এসব পালাকাব্যে বর্ণিত জনপদ বা গ্রামসমূহসহ বিল-নদী-হাওর কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে পড়েছে। তাছাড়া দেওয়ান মদিনার পালা কাব্যের উৎপত্তিস্থল কিশোরগঞ্জ-সিলেট জেলার বিস্তীর্ণ হাওর এলাকার সীমান্তবর্তী হলেও পালার ভাষা কিশোরগঞ্জের এবং কিশোরগঞ্জে ইটনা উপজেলার প্রধান নদী ধনু নদীর কথা স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। লোকসাহিত্যের সুতিকাগার আজকের কিশোরগঞ্জ সমগ্র বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের মধ্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান। তাই বিভিন্ন সময়ে প্রথিতযথা লোকসাহিত্যের লেখক-গবেষকগণ ছুটে এসেছেন এ এলাকার লোকসাহিত্যের রত্ন কুড়াতে। এ এলাকার পালাকাব্য সাহিত্যের মাঝে কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, পুষ্পমালা, মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, জয়চন্দ্র ও কমলা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, ঈশাখাঁ দেওয়ান, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, মাছুম খাঁ দেওয়ান, আদম খাঁ, বিরাম খাঁ, দেওয়ান মনোয়ার খাঁ, দেওয়ান পৈলন খাঁ, দেওয়ান ভাবনা, চুরত জামাল, অধুয়া সুন্দরী, বাদ্যানীর গান, জিরালনী, কাজলরেখা, অসমা, ভেলুয়া সুন্দরী, মদন কুমার, চান্দু সদাগর, মধুমালা, দেওয়ানা মদীনা, লাউয়াবুড়ি, রামায়ণ, গাজী কালু চম্পাবতী, আশকনামা, কাজীনামা, পোংগানামা, নছিহতে হুক্কা, গজবনামা, লাংগাতলোয়ার ইত্যাদি প্রধান পালা।

এসব পালা কাব্য বা লোককাহিনিগুলো যেসব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের ঠাকুর মা'র ঝুলি, ঠাকুর দাদার থলে, রওশন ইয়াজদানীর মোমেনশাহী গীতিকা, ড. আশরাফ সিদ্দিকী'র কিশোরগঞ্জের লোককাহিনি, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের উচ্ছ্বাস এবং দ্যুসান জাবাতিল-এর Bengali Folk-ballads from Mymensingh and the Problems of Their Authenticity উল্লেখযোগ্য। এ এলাকায় এসে যারা এখানকার স্থানীয় লোকসাহিত্যের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে ড. দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, কবি জসীমউদ্‌দীন, ড. স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. আলী নওয়াজ, সিরাজ উদ্দিন কাশেমপুরী, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, সুরেশ চন্দ্র ধর, মুন্সী আবদুর রহিম, মুন্সী আজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ সাইদুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জের পালাগানই আজকের যুগে কিস্‌সা গান নামে দেশ জুড়ে পরিচিতি পেয়েছে। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশে অজপাড়া গায়ে যারা 'কিচ্ছা' পরিবেশন করে তাদের পরনে ধুতি গায়ে হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি, হাতে রঙিন রুমাল ব্যবহার করেন। অনেকে গফুর বাদশার কিচ্ছা, জমিলার কিচ্ছা, সোনা ভানের কিচ্ছা, জরিনা সুন্দরীর কিচ্ছা, হীরামতির কিচ্ছা, আলোমতির কিচ্ছা আজও এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে হৃদয়ে গেঁথে আছে। আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পালা গান যারা গাইতেন তাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার বিলবরুল্যার আবদুর জব্বার ও নদারের কড়ুর বাপের নাম উল্লেখযোগ্য। আলোমতি, ভানুমতি ইত্যাদির পালাগান যারা গাইতেন তাদের মধ্যে নিকলী সদর এলাকার আমির উদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। নিম্নে একটি পালাগানের আংশিক প্রদত্ত হলো :

পালাগানের দল

আলোমতি, আমি আলো একা থাকি গো ঘরে
আমার মাতা-পিতা চাকরি গো করে
ওই মহারাজের বাড়িতে।
আমার যৌবন বয়সে কত আনন্দ আসে
আমার বন্ধু নাই গো আশেপাশে
ওই মহারাজার বাড়িতে।
প্রাণ কুমার, জল খাইতে গিয়াছিলাম

www.pathagar.com

দীন ভিখারীর বাড়ি
কে যেন জল এনে দিল গো
মানুষ কি না পরি
প্রাণ কান্দে তার লাগিরে।

প্রাণ কুমারের গাওয়া গানের খণ্ডিত অংশটুকু এককালে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, হাটে-ঘাটে-মাঠে-রাস্তায় সে সময়ের মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হতো। সে রকম গুনাই বিবির পালা গানটিও জনপ্রিয় ছিল।

ভাইজান-আর যাব না ঐ স্কুলে পড়তে
ঐ স্কুলে পড়তে গেলে ভাইজান গো
লাল মিয়ার পুত্র তোতা মিয়া পথে দেয় বাধা
পড়াইবার যদি সখ থাকে ভাইজান গো
ও ভাইজান বাড়িত মাস্টার রাইখ্যো।

২১. কবিগান

কিশোরগঞ্জ জেলায় কবিগান যে প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পদ্মপুরাণ বা ভাসানগান রচনার গায়ক কবি নারায়ণ দেবের গ্রন্থে। তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–এ অঞ্চলে ১৪ অথবা ১৫ শতক থেকে এ গানের প্রচলন শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়–বিগত বাংলা ১৩২৩ সনের আষাঢ় মাসের সৌরভ পত্রিকায় ময়মনসিংহের বিশিষ্ট কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য লিখেছেন–কিশারগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার বোরগ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কবি নারায়ণদেব রচিত 'পুদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান' রচনার কিছুকাল পূর্ব হতেই এ স্থানে কবিগানের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবিয়াল রামু-রামগতি-রামকানাই। এই তিনজনই ছিলেন কবির সাঁনাই। এসব কথার প্রবাদ রয়েছে এ জেলার সর্বত্র। সাধারণত দুর্গাপূজা, কালীপূজা, হালখাতা, পুণ্যাহ কিংবা অন্যান্য কোনো আনন্দ উৎসব পালনে কিশোরগঞ্জের পল্লিগ্রামের সে সময়কার তালুকদার, জোতদার বা কোনো মহাজন শ্রেণির কৃষক-জেলে-তাঁতি-ব্যবসায়ী হিন্দু শ্রেণির অবস্থাপন্ন লোকেরাই কবিয়ালদের বায়না করে এনে বাড়ির উঠানে কিংবা কোনো মণ্ডপে কবিগানের আসর বসাতেন। কখনো কখনো পুরুষ ও মহিলা কবিয়ালদের লড়াই হতো।

কিশোরগঞ্জের কবিয়াল রামু-রামগতি-রামকানাইদের পূর্বসূরি কবিয়ালদের মধ্যে পাকুন্দিয়া উপজেলার দগদগা গ্রামের কবিয়াল ছিলেন কবিয়াল কানাইনাথ ও কবিয়াল বলাইনাথ অন্যতম। কবিয়াল রামুমালীর বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার আউটপাড়া, রামকানাইর বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাইটাল এলাকায় আর রামগতির বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার গাঙ্গাইল নামক গ্রামে। একদিন নেত্রকোণার বায়রা-উড়াগ্রামে কবিয়াল বিজয় আচার্য আর পরান কর্মকার নামে এক কবিয়াল যখন কোনো এক আসরে কবিগান করেছিলেন তখন হঠাৎ সে আসরে কিশোরগঞ্জের কবিয়াল রামগতি দিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। শ্রোতারা রামগতির নাম শুনে খুব আনন্দিত হয়ে কবিকে আসরে ওঠার জন্য অনুরোধ জানান।

www.pathagar.com

রামগতি আসরে উঠে বসার পর এতে বিরক্ত হয়ে নেত্রকোণার কবিয়াল বিজয় আচার্য তার গানে বলেন–আমি আর পরান রামগতির চেয়ে অযোগ্য হলেও বায়না পেয়ে এসেছি। কিন্তু আপনি রামগতি যদি ভালো ও যোগ্য কবিয়ালই হতেন, তবে তো আপনি বায়না পেয়েই আসতেন। আজ আপনার বায়না নাই কেন? কিশোরগঞ্জের কবিয়াল রামগতি ওঠে দাঁড়িয়ে উত্তরে গাইলেন–

তুমি বল্লে নাকি বিজয় ঠাকুর
আমার বায়না নাই
তুমি বিজয় ঠাকুর গুণবান
করতে পার কবিগান
স্বীকার পাইলাম ধর্মসভার ঠাঁই।
উকিল মোক্তার বায়না করে
ব্যারিস্টার বসে খায়
বিজয় ঠাকুর সেই জন্য কি
ব্যারিস্টারের মান্য যায়?
দ্বন্দ্ব করে দুই ভেড়ী
ঘৃণা করে কেশরী, বসে রঙ্গ চায়
লজ্জা করে মানের ডরে
সাধু যায় না চোরের নায়।

কিশোরগঞ্জের আরও যারা বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন তাদের মধ্যে ত্রিরাম, ভজা কপালী, কাতিয়ারচরের কাসু ঠাকুর, সগরার নিবারণ ঠাকুর, চৌদ্দশত গ্রামের শাহ আবদুল আজিজ ফকির, পাকুন্দিয়ার অনিল সরকার, মঠখলার সুকি বেগম, তাড়াইলের হরিচরন ও ভাটগাঁওয়ের ঈশাননাথ উল্লেখযোগ্য।

২২. জারিগান

বিয়োগান্তক ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনামূলক গীত সংগীত হলো জারি। একজন বয়াতী গায়ক কয়েকজন সহযোগী নিয়ে নানা দৃষ্টান্ত ও ঘটনা পরম্পরায় মূল কাহিনির সাংগীতিক বর্ণনা দিয়ে যান। সহযোগীরা মূল গায়ক বয়াতির গানের কথা ফাঁকে ফাঁকে পুনরাবৃত্তিমূলক ধুয়া গাইতে থাকেন। ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের ও রক্তপাত, বিশেষ করে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের জারিগানের উদ্ভব। তাতে বীররস ও করুণরসের সংমিশ্রণ ঘটে সে প্রথম দিকে নবি জীবনী, মা ফাতেমার কাহিনি, কুলসুম বিবির কাহিনি, হযরত বেলাল, হাসান-হোসেন, শহিদ কারবালার কাহিনি, আইয়ুব নবি, ইসলামের কুরবানি, হানিফার লড়াই, বড়পির, ওয়াজকরনী, শেখ ফরিদ, ইউসুফ জুলেখা ইত্যাদির জারি কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তী সময়ে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনাও জারিগানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন–আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধক ও নানা ঘটনা ইত্যাদি ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন গণমুখী প্রচার কাজে ও জারি গানের প্রচলন রয়েছে। জারিগানে একজন বয়াতীর সাথে ৭/৮ জন দোহারের ঢং দেখার মতো দৃশ্য। তারা অনেকে

www.pathagar.com

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে মাথায় লাল শালু কাপড় অথবা সাদা কাপড় কিংবা হলুদ কাপড় বেঁধে নেচে নেচে ঘুরতে থাকে। হাতে থাকে রঙিন রুমাল। পায়ে থাকে ঘুঙুর।

মর্সিয়া পরিবেশনের সময় কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে অথবা কখনো হেঁটে হেঁটে মিছিলে জারিগান গায়। জারি আসলে শোক বিষয়ক গান। জারিগানে অনেক সময় যন্ত্রীও থাকে। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নৃত্য গীতে ধূয়া তোলেন। কিশোরগঞ্জ জেলার বেশ কয়েকজন জারিগানের বয়াতী হলেন–হোসেনপুর উপজেলার ক্ষরুয়া গ্রামের রহমত আলী বয়াতী ও তার দল, সদর উপজেলার কয়ারখালী গ্রামের শুক্কুর মামুদ ও তারদল, গোয়ালকান্দা গ্রামের মৃত কালু মিয়া ও তার দল, আউলিয়া পাড়ার শামছু মিয়া ও তার দল ভাল গায়ক হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলেন।

জারিগানের দল

জারিগানে সাধারণত এমাম হাসান হোসেন-এর শাহাদত বরণ অংশটুকু অবশ্যই অতি করুণ:

(১)

হায় হাসান হায় হোসেন
হায়-হায়-হায়-হায়-রে
মায়ের আদুরের দুলাল
শহীদ কারবালায় রে।

এর আরও একটি অংশ বেশ বেদনার এবং করুণ রাগে সর্বত্র গাওয়া হয়, সেটি গলো :

(২)

মা গো রাঁড়ী, ঝি গো রাঁড়ী, রাঁড়ী বিবি সকিনা
একই ঘরে তিনজর রাঁড়ী, খালি সোনার মদিনা।

আখেরি রসুল নবি মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) পেয়ারের দৌহিত্র এবং তার পরিবারের এই মর্মন্তদ ঘটনার সঙ্গে কিছুটা 'এলাহীর কুদরত' যুক্ত না হয়েই পারে না। এমাম হোসেনের শাহাদাতবরণের পর এমাম পরিবার এজিদ কর্তৃক বন্দী হন। বালক জয়নাল আবেদীনও হলেন তাদের সাথের সঙ্গী। এই খবর হানিফাকে জানানোর জন্যে

www.pathagar.com

জয়নাল পত্র লিখে কাসেদ বা দূতের হাতে দেয়। এর উপর রচিত জারিগানের অংশবিশেষ দেয়া হলো :

(৩)

পত্র লেখে জয়নাল হায় গো আঁখি ঝুরে পানি
পত্র ভইর‍্যা লেখ যত দুঃখেরও কাহিনি।
পত্র লইয়্যা যাওরে কাছিদ মেওয়াজানির শ'র
হানিফারে জানাও গিয়্যা দুঃখের খবর।

বিছমিল্লা বলিয়া কাছিদ পন্থে মেলা দিল
হরলা জঙ্গলার বাঘে মুড়িয়ে ধরিল।
আমারে খাইবারে বাঘ, ও বাঘ ডরাই না যে তায়
জয়নালের পত্র সাথে কি অইব উপায়।
খাইতা চাও খাওরে বাঘ আমারে ধরিয়া
জয়নালের পত্রখানি তারে আইসো দিয়া।
এই কথা শুনিয়া বাঘে কান্দে জারে জার
জয়নালের উরদিশে ছেলাম জানায় বারে বার।

এলাহীর কুদরতে বাঘের জবান ছুইট্যা গেল
বারে বারে কাছিদের ঠাঁই মাফ কছুরি চাইল।
দৌড়িতে দৌড়িতে কাছিদ পন্থে মেলা দিল
এমন সময় আল্লাহর কুদরত কোন বা কাম হইল।
পার কর গো আল্লা-রাসুল পার কর আমারে
তা-না হইলে কেমনে পত্র দিবাম হানিফারে।

আল্লাহ কুদরত ভাইরে কোন বা কাম হইল
আচম্বিতে নাও একখান পারেতে লাগিল।
বাতাসে ইলায়া নাওরে পার করিয়া দিল
এই মতে কাছিদ ভাইরে রওয়ানা হইল।

জারিগানের বিষয়বস্তু কখনো কখনো প্রশ্ন আকারে বয়াতী পাল্টা উত্তরে নিজেই বলে থাকে। যেমন :

(৪)

দোজখ হাঁটা দোজখ মিছা দোজখ নৈরাকার
এই দোজখে পুইড়্যা মরব বান্দা গোনাগার
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।
ভাই বল বন্ধু বল পথের পরিচয়
মইলে নি কেউ সঙ্গে যাইব, কেউ কারও নয়
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।

আল্লা আমির বল যত ও মমিন ভাই

www.pathagar.com

আল্লা-নবীর নাম ছাড়া কোনো গতি নাই
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।
নবী আতাব নবী মাতার নবী বেহেস্তের ফুল
নবী নামে পাড়ি দিবা পুলসেরাতের পুল
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।

হাতে আসা গলায় এসব সবুজ পিরান গায়
এই ব্যক্তি কোন সে জনা বল তো সবায়
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।

হাতে আসা গলায় তসবি সবুজ পিরান গায়
জয়নবের স্বামী আব্দুল জব্বার বলি যে তোমায়
হায় আল্লা তুই সোবাহান হায়াতের মালিক।

সংগৃহীত জারিগান

উত্তরে বন্দনা করলাম
হিমালয় পর্বত
দক্ষিণে বন্দনা করলাম
বঙ্গপোসাগর

পূর্বে বন্দনা করলাম
পূর্বের বানুশ্বর
পশ্চিমে বন্দনা করলাম
আমার এ আসর

ভাইজান গো আমি
মুরশিদ না চিনিলাম

জীবনে কি ভুল করলাম তো আমি
ভাইজান গো আমি মুর্শিদ না চিনিয়া
ইছার লাখি হায়া গো আত্তি
মরিলো পরাণে

পান খাইতে সুপারি গো লাগে
আরো লাগে চুন
ঘষিয়া ঘষিয়া গো জ্বলে আগুন
(গই ও লোকজন)
পিরীতের আগুন

পানিতে কান্দে পানি গো হাউরি
ফুটপাত কান্দে টিয়া

www.pathagar.com

ঘরের কুনাত বইয়্যা কান্দে
(গই ও লোকজন)
অর না হইছে বিয়া রে
ভাইজন গো আমি মুরশিদ না চিনিয়া

হেই কতা কতা নয় গো
আর কতা আছে
মামাহউরের ঢোলোকে বাজায়
বাগনা বউয়ে নাচে

কানা বেডা পুথি পড়ে
ধুন্দা বেড়ায় হুনে
হাত নাই ব্যাডা ঢোলোক বাজায়
(গই ও লোকজন)
পাও নাই ব্যাডা নাচে
ভাইজান গো আমি মুরশিদ না চিনিয়া

ওস্তাদ নামে গো আমি
জারি করলাম শেষ
ওস্তাদের পায়ে বান্দি
হাজার দরবেশ॥
(গই ও লোকজন)

তথ্যসূত্র : সেলিম পারভেজ, বয়স : ৪৫, পেশা : সমাজকর্মী, ঠিকানা : নগুয়া, কিশোরগঞ্জ

২৩. বৃষ্টির গান

কিশোরগঞ্জে বৃষ্টির গান বেশ প্রচলিত। এর মধ্যে মেঘ রাজার গান, বদনা বিয়ের গান ও ব্যাঙ বিয়ের গান এখানে উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জে বৃষ্টিকে 'মেঘ' বলে। স্বভাবত বৃষ্টির গান এখানে মেঘ রাজার গান, মেঘের গান ও ব্যাঙ বিয়ের গান নামে পরিচিত। এ গানগুলির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এ অঞ্চল যে এককালে কামরূপ কামাক্ষার অন্তর্গত ছিল অথবা এ অঞ্চলে যে এককালে বিভিন্ন ধর্মের আদিবাসী তান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ বা উদাহরণ লক্ষ করা যায় এসব সংস্কার-কুসংস্কার থেকে। আসলে এগুলি লোকসংস্কারমূলক সংগীত অনুষ্ঠান বা যাদু বিদ্যাগত। কিশোরগঞ্জ জেলা ভৌগোলিকভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি উজান অঞ্চল অন্যটি ভাটি বা হাওর অঞ্চল নামে পরিচিত। উজান-ভাটির হাওর জনপদে প্রায় প্রতি বছর হয় বন্যা না হয় খরা-অনাবৃষ্টি শুরু হলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রাম অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা একত্রে মাথায় কুলা, আমপাতা ইত্যাদি নিয়ে বাড়িতে

www.pathagar.com

বাড়িতে নেচে নেচে বৃষ্টির গান গেয়ে থাকে। একে অপরকে লক্ষ করে পানি ঢেলে ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয় গান গায়। নিম্নে কয়েকটি বৃষ্টির গান প্রদত্ত হলো :

(১)

ব্যাঙের পুতের বিয়া গো
সাত কুলা সাজায়া গো
ও ব্যাঙ মেঘ দেও গিয়া।
ব্যাঙির ঝিয়ের বিয়া গো
আবের পাঙ্খা দিয়া গো
ও ব্যাঙি মেঘ দেও গিয়া।

ব্যাঙ-ব্যাঙির বিয়া গো
ঘুল্লু মাদল বাজায়া গো
ও ব্যাঙা-ব্যাঙি মেঘ দাও গিয়া।

(২)

বেঙা বেঙীর বিয়া
কুলা মাথায় দিয়া
আয় মেঘ আয়
ঝুম ঝুমাইয়া আয়।
বেঙা বেঙীর বিয়া
ধান-দূর্বা দিয়া
আয় মেঘ আয়
ঝুম ঝুমাইয়া আয়।

(৩)

মেঘে আইছে নতুন পানি
ব্যাঙে করে কানাকানি
লাফালাফি করে ব্যাঙ
মেঘ আইলে মেলে ঠ্যাং।
পাতি ব্যাঙের কান্দে ছাতি
কোলা ব্যাঙে মারছে লাথি
গতা ব্যাঙের গোঁফে তা
এক লাফে পাগারে যা।

(৪)

আম পাতা দিয়াদিলাম ছানি
তবু পড়ে মেঘের পানি
জাম পাতা দিয়াদিলাম ছানি
তবু পড়ে মেঘের পানি
ব্যাঙির ঝিয়ের বিয়া।

www.pathagar.com

উত্তর দিকে চাইয়া দেহি
মেঘের ঝুরি পড়ে
দক্ষিণ দিকে চাইয়া দেহি
মেঘের ঝুরি পড়ে।
পুবের দিকে চাইয়া দেহি
মেঘের ঝুরি পড়ে
পশ্চিম দিকে চাইয়া দেহি
মেঘের ঝুরি পড়ে।

ব্যাঙ বিয়ের আয়োজন হয় ব্যাঙ দিয়ে। দুটি ব্যাঙ আশপাশের ডোবা নালা থেকে ছেলেমেয়েরা ধরে নিয়ে আসে। স্ত্রী-পুরুষ চেনার প্রয়োজন হয় না। দুটি ব্যাঙ হলেই হলো। এরপর কারও ঘর থেকে একটি কুলা, কয়েকটি আমপাতা, লাউয়ের ডগা, বুনো ফুল, এক মুঠো ধান-দূর্বা ইত্যাদি কুলার মধ্যে সাজিয়ে বিয়ার অনুষ্ঠান হয়। পরে এক মায়ের এক ঝি অথবা পুত্র সন্তান ঐ কুলা মাথায় চড়িয়ে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সঙ্গীরা শিননি মাগন আর গীত গেয়ে বেড়ায়। গেরস্থের আঙিনায় যখন তারা নৃত্যগীত করে তখন ঘরের বউ ঝিয়েরা ছেলে-মেয়েদের উপর কলসি ঢেলে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেয়। ভেজা কাদামাটির বুকে ছেলেমেয়েরা তখন লুটোপুটি খায়। আর সম্মিলিতভাবে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ব্যাঙ বিয়ে ও বৃষ্টির গান গায়।

২৪. ভিক্ষুকগান

পঙ্গু, অসহায়, অন্ধ, নারীপুরুষ-শিশু ভিক্ষুকেরা কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদ, শহীদী মসজিদ, ঐতিহ্যবাহী শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ, শহরের বিভিন্ন মোড়, আদালত প্রাঙ্গণ, রেল স্টেশন ও রেলগাড়িতে দলবদ্ধভাবে এ সংগীত পরিবেশন করে পথচারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়। এ সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো দলবদ্ধ সকল ভিক্ষুক সমস্বরে জোর আওয়াজ করে গান গেয়ে সুমধুর কণ্ঠ সুরের মূর্ছনায় পথচারীর মনকে দয়াশীল ও দানশীল করে তোলে। নিম্নে তিনটি ভিক্ষুকগান প্রদত্ত হলো :

(১)

বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম
করল টাকা দান
পরকালে আল্লাহ তারে করিও আসান
হায় আল্লাহ তুই সোবাহান।
হায়াতের মালিক
তোমার দয়ায় চলছে আল্লাহ
দুনিয়া সঠিক।
হায় আল্লাহ তুই সোবাহান।

আল্লাহ কেউরে হাসাও কেউরে কাদাও
তোমার দুনিয়ায়
কেউরে রাখ দালানকোঠায়

www.pathagar.com

কেউরে গাছ তলায়।
হায় আল্লাহ তুই সোবাহান।

(২)
আমার আল্লাহ নবীজির নাম
দ্বীনের নবী মোস্তফায়
রাস্তা দিয়া হাইট্টা যায়
হরিণ একটা বান্ধা ছিল
গাছেরও তলায় গো–
আমার আল্লাহ নবীজির নাম।

কত কত টেকা পয়সা
কত ভাবে যায়
অন্ধের হাতে দিলে পয়সা
আখেরাতে পায়
আমার আল্লাহ নবীজির নাম।

(৩)
হবে রসুল উম্মতের জামিন
ওরে ভাই মমিন
হবে রসুল উম্মতের জামিন।

আমি অন্ধ কপাল মন্দ
নাইরে আমার ঠাঁই
এ দুনিয়ায় বাঁইচ্যা আছি
আপনাদের দয়ায়
ওরে মমিন ভাই
হবে রসুল উম্মতের জামিন।

এসব গান কখনো এককভাবে কখনো দলগতভাবে তাদের নিজস্ব মৌখিক সৃষ্টি। উল্লেখ্য, এগুলোর কোনো লিখিত রূপ নেই। এসব গানের রচয়িতা অধিকাংশই নিরক্ষর প্রতিবন্ধী অন্ধ ভিক্ষুক।

২৫. আঞ্চলিক গান

এক সময় যে গান মানুষের মুখে মুখে মনে মনে বাড়িতে বাড়িতে ক্ষেতেখামারে গেয়ে ফিরত। সময়ের বিবর্তনে আঞ্চলিক গান কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কিশোরগঞ্জের লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারে এ জেলার অঞ্চলভিত্তিক আঞ্চলিক গান একটি বৃহৎ অবস্থান দখল করে আছে। লুপ্তপ্রায় সে সকল আঞ্চলিক গানের কিছু কিছু সুর শব্দ ধ্বনি এখনো গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে গীত হতে শোনা যায়। এ রকম কিছু আঞ্চলিক গান নিচে তুলে ধরা হলো।

www.pathagar.com

(১)

আগে আমি শ্বশুর বাড়ি গেলে পরে ভাই
ইষ্টি আইছে মেসি আইছে দৌড়াইত সবাই ॥
উত্তর পাড়ার হাঁস আনিত পূর্ব পাড়ার ডিম
পশ্চিম পাড়ার দুধ আনিত দক্ষিণ পাড়ার সীম ॥
ফুলজুরি ছিক্কা সাজাইয়া রাখতো ঢেপের খৈ
গামছায় বাইন্দা মাচায় থুইয়া চিনি পাতা দৈ ॥
আজকে আমার শ্বশুর বাড়ি পুরান হইয়া গেছে
ঘর জামাইর আদর ঘর হইতে বাইরে নামিছে ॥
শ্বশুর বাড়ি মধুর হাঁড়ি শোন জামাই ভাই
তিন দিন পর ঝাটার বারি শুন হে সবাই ॥

(২)

আগে দু-না কইছিলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে ভাও অইচ দাঁড়ি মুছ কামায়া ॥
আগে দু-না কইছিলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে পাউডার লাগাও আয়নার পায় চায়া ॥
আগে দু-না কইতা কতা মুহেরে কুচকায়া
মুচকি মুচকি আস অহন বিয়ার না বাস পাইয়া ॥

আগে দু-না কইতা কত মুরব্বি মুরব্বি ভাব
অহন দেহি ফিটফাট বউয়ের লগে জামাই সাব ॥
আগে দু-না হাঁটতে পথে চলতা ফিরতা সোজা
অহন দেহি পোশাক পইর‍্যা পায়ে দাও জুতা মোজা ॥
আগে দু-না কইছিলা সাধু মায়া লোক ভালো লাগে না
অহন কেরে বইয়া থাক বউয়ের ঘরে বাহির হও না ॥

(৩)

মরলাম গো মরলাম মায়া
দারুণ মাথা বিষে
সর্বনাশা কপাল পোড়া
মাথায় বাড়ি দিছে।
কিয়ের লাইগ্যা মারছে?

আদা পয়সার কেছকি মাছ
বিলাইয়ে যে খাইছে
ঘাড়অ বাড়ি দিছে।
কি দিয়্যা মারছে?
বউরা বাঁশের গুড়ি দিয়্যা
কমোড় ভাইঙ্গা ফালছে
পিডঅ বাড়ি দিছে।

www.pathagar.com

(৪)
ফজর আলী বাজার থেইক্যা
আনলো ঘুইঙ্গা মাছ
ঘুইঙ্গা মাছ খাইয়্যা বৌয়ের
ঘটলো সর্বনাশ।

পেটনামে ওশুদ আনো
ভেদাইল্যার মুখা
লাথি মাইর‍্যা ভাইঙ্গা ফাল্লো
ফজর আলীর থুতা।
মজা মারছে ফজা ভাই
বগল বাজাইয়্যা দিন কাডাই
ফজর আলী ডাইক্যা কয়
এই দুক্কু কি প্রাণে সয়।

(৫)
উইচ দিয়্যা মারে পনা
চালুন দিয়্যা ধয়
কড়াইত ফালাইয়া পনা
লাইর‍্যা চাইর‍্যা লয়।
পুলার বাপ খাইতে আইছে
পনা নাই কড়াইত
হাতখান ঝাইর‍্যা দিল
পুলার বাপের ভাতের পাত।

উম্মু রাইয়্যা মারে কিল
গুম্মুরাইয়্যা উডে
পাড়াপড়শি জাইগ্যা কয়
হাঙ্গার চিড়া কুডে।
মারছ মারছ পুলার বাপ
যাইয়াম বাপের বাড়ি
আননের বালা বোঝা যাইব
পায়ে ধরাধরি।

(৬)
এই কথা কথা নাগো
আরো কথা আছে
মামা হউরে ঢোল বাজায়
ভাইগ্না বউয়ে নাচে।
হগগল মাইনষে কথা কয়
কথা একখান ভুল

www.pathagar.com

পাছে থাইক্যা মাইগ্যা বেডা
বাজায় একখান ঢোল।
ঢোল খোল করতালে
বাজনা বাজে না
মনের মতো মন অইলে
কিছুই লাগে না।

(৭)

অন্নরা দুয়ার টানছে, সাধু সাবধান
প্রসাদ লইয়া টানাটানি যত পুলাপান।
হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ
সুক্তো খাইলাম ডাইল খাইলাম
আরও খাইলাম ভাজি
মহাপ্রভুর প্রসাদ খাইয়া
মন করলাম রাজি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ
খেসারি ডাল এসে ভক্তগণের পাতে বসে
বলে ডালের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ
ত্রিজগতে আছে ব্যক্ত
গন্ধে তুষ্ট যত আছে ভক্ত।
হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ
কচুশাক কয় কানে কানে
আমার তত্ত্ব কে না জানে
দেশে দেশে আমার নাম প্রচার
এসে বলে মিষ্টান্ন, আমি কিন্তু অগ্রগণ্য
মহোৎসবে আমার আছে অধিকার।

(৮)

কইলে কইবাইন গফ্‌করি
কইবার কতানা
কইবাম বান কী?
ক্ষেত আছিন একশ কানি
ধান লইয়া টানাটানি।

শহরে বউ করে তাইরে নারে
নসিবে আছিন লড়াদশা।
হুনছি বেডার গফ্
এক ঘরে দুই গীত
হুনতে লাগে অচম্বিত।
আচার গাঁও বিচার নাই

www.pathagar.com

আবাদী গাঁও হমন্দ নাই।
কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কতানা
কইবাম বান কী?
বউয়ের বাড়ি ভৈরব
আজাইর‍্যা করে গৈরব
কিন্যা দিছি গাড়ী
আইতে যাইতে তাড়াতাড়ি।

হুনছি বেডার গফ্
ভাত নাই পাতে
সোনার আংগুট আতে
ভাত দেইখ্যা খাইবাইন ঘি
জামাই দেইখ্যা দিবাইন ঝি।
কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কথা না
কইবাম বান কী?
গেছলাম আমি ঢাকা
কিনতে গাড়ির চাকা
কিনলাম একটা ফ্লাট
যেমন শোলাকিয়া মাঠ।
হুনছি বেডার গফ্
ফ্যান দিয়া ভাত খাইয়া
গপ্প মারে দৈ
মাইট্টা উক্কার তামুক খাইয়া
বলে গড় গড়াডা কই?

কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কথা না
কইবাম বান কী?
বাপ দাদা আছিন জমিদার
চলত ফিরত রাস্তায় হাতি
মাথায় ধরতো সোনার ছাতি।

হুনছি বেডার গফ্
কত বেডা বাঘ মাইরা
না করে রাও
আর বেক্কলে চিহা মাইরা
মাডিত দেয় না পাও
হে আবার গফ্ করে।

www.pathagar.com

কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কতা না
কইবাম বান কী?

২৬. ভাইব্রত ও সূর্যব্রতের গান

হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় বোন ছোট ভাইয়ের মঙ্গলার্থে তার কপালে চন্দন ফোঁটা দেয়। এই ভাই ফোঁটার আয়োজনে ভাই-বোনের স্নেহ মধুর সম্পর্কের প্রমাণ মিলে গানের মাধ্যমে। এ অনুষ্ঠানে যে গীত পরিবেশন করা হয় তা নিম্নরূপ :

ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যম দুয়ারে দিলাম কাঁটা
ফাঁটা যেন সরে না
ভাই যেন মরে না।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মতে সূর্য জীবনের প্রতীক। তাই ভাটি কিশোরগঞ্জের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন ধান ওঠার আনন্দে সূর্যপূজার প্রথা প্রচলিত আছে। এ উপলক্ষে গান গাওয়া হয়। তাতে হিন্দু কুমারী মেয়েরা স্নান মেষে আকাশের সূর্যকে উদ্দেশ্য করে সূর্য পূজার গান গায়। সূর্যের মত শৌর্যবীর্যের অধিকারী বর পাওয়ার কামনাও এ পূজা বা ব্রতের অন্য রকম উদ্দেশ্য। নিম্নে একটি সূর্যব্রতের গান প্রদত্ত হলো :

উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধূপ প্রদীপ নিয়া।
উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধান দুর্বা নিয়া।
উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর আবির মাইখা গায়
সাজি ভইরা রক্ত জবা দিবো তোমার পায়।
আইসো আইসো সূর্য ঠাকুর সোনার রথে চইড়া
সপ্তবর্ণ সপ্তঘোড়া চালাও আকাশ জুইড়া।
সূর্য উঠল ঝিকিমিকি আঁধার গেল দূরে
সূর্য ঠাকুর দেখা দিল সোনার রথে চড়ে।

২৭. ত্রিনাথের গান

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রি-দেবতাকে নিয়ে কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ত্রিনাথের গান প্রচলিত আছে। ত্রিনাথ হিন্দু সম্প্রদায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পূজা। ষাঁড়ের পিঠে উপবিষ্ট শিবের প্রতিকৃতি এ পূজার প্রদান আর্কষণ এবং প্রধান উপকরণ। এই পূজা হিন্দু সমাজে প্রতিবন্ধীদের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। একটি গানে এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

ওকে যাবি রে ত্রিনাথের পূজায়
দেখবি যদি আয়
কত অন্ধ আতর লুলা ল্যাংড়া
চলে গেল ত্রিনাথের মেলায়।

www.pathagar.com

কত কানা বোবা বলে কথা
চলে ফিরে যথা তথা
ত্রিনাথ ত্রিনাথ বলে তোরা
মেলায় চলে আয়।

ত্রিনাথের পূজার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ও মেলার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার এই পূজার এবং মেলার নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ। উক্ত পূজা আর মেলা যে কোনো ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে বসে থাকে। বাধ্যতামূলকভাবে এক পয়সার পান-সুপারি, এক পয়সার গাঁজা-কলকি ও এক পয়সার সরিষার তেলের প্রয়োজন হয়। এই এক পয়সার পান-সুপারি, গাঁজা কলকি আর তেল দিয়ে তিন দেবতার নামে ভাগ করে তিনটি পান তৈরি করে। তিনটি গাঁজার কলকি, তিনটি তেলের বাতি সাজিয়ে পূজা শুরু করে। কেউ যদি উক্ত পূজায় বেশি ব্যয় করে তাতে কোনো বাধা নেই। তবে সর্বনিম্ন এক পয়সা মানতকারীর ইচ্ছানুযায়ী তা করতে পারেন। গানের সাথে খোল, করতাল, একতারা, দোতারা, মন্দিরা, খঞ্জরি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। পরে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে সংগীতানুষ্ঠান শেষ হয়। নিচে ত্রিনাথের গান তুলে ধরা হলো :

(১)

তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
তারেই বলি ত্রিনাথের মেলা
এক পয়সার তেল, এক পয়সার পান
এক পয়সার গাঁজা খেয়ে পূজা সাজা
বসে আছে তার সব চ্যালা ল্যালা
গানে গানে বলরে সব ত্রিনাথের মেলা।

(২)

কি সুন্দর বানাইল কল্কী
নাম তার গাঁজা।
এক সুলুমে যেমন তেমন
দুই সুলুমে মজা।
তিন সুলুমে ত্রিনাথ ঠাকুর
চার সুলুমে রাজা।
কি সুন্দর বানাইল কল্কী
নাম তার গাঁজা।

(৩)

সিদ্দি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে
গাঁজা খাইলে পাঞ্জা বাড়ে।
খাইলে সিদ্ধি বাড়ে বুদ্দি
ত্রিনাথ ঠাকুরের প্রতি ভক্তি।

www.pathagar.com

(৪)

ত্রিনাথ তোমার নাম রাজা কিংবা প্রজা
জাতি বর্ণ নির্বিশেষে করিবেন পূজা
কলিতে তিন নাথের মেলা
খোড়ায় নাচে কানায় দেখে
বোবায় বলে বোম ভোলা।
তিন নাথেরে যে করিবে হেলা
হাত-পা-ভেঙ্গে চোখ দিয়া বেরুবে ঢেলা।

২৮. লক্ষ্মীপূজার গান

হিন্দু-সম্প্রদায়ের কাছে লক্ষ্মী হচ্ছে ধন ও ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সে হিসেবে প্রায় প্রতি হিন্দু ঘরে লক্ষ্মীসরা বা লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে। গৃহে প্রতিদিন সম্ভব না হলে প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি মাসে অন্তত লক্ষ্মীর পূজা করা হয়ে থাকে। এ পূজার উদ্যোগ আয়োজক গৃহকর্তী মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোনো গীত গাওয়া হয় না। গীত গাওয়া হয় আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার রাতে। সেদিন ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয়োজক হিন্দু সমাজের প্রায় সকলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। সে রাতেই ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সারারাত জেগে লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে নাচ গান পরিবেশন করা হয়। এ গানই লক্ষ্মীপূজার গান নামে প্রচলিত। এ গানে কাঁসি, করতাল, ঝান, মন্দিরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নিচে লক্ষ্মীপূজার একটি গান উপস্থাপন করা হলো :

লক্ষ্মী গো মা গঙ্গার জলে
কইরাছি মোরা পূজা
পদে দেহি রক্ত চন্দন
পদে লক্ষ জবা ॥
গঙ্গার জলে বেলে পনে
কইরাছি গো পূজা
কত রঙ্গে সাজাইয়াছি
মাকে আরও তোরা সাজা ॥

লক্ষ্মীপূজার মহোৎসবে কিশোরগঞ্জে আরও একটি গান বেশ জনপ্রিয়। গানটি বিবৃত হলো :

অন্নরা দুয়ার টানছে, সাধু সাবধান
হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ
মুক্তো খাইলাম, ডাল খাইলাম আরও খাইলাম ভাজি
মা লক্ষ্মীর প্রসাদ খাইয়া মন করলাম রাজি।
হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ
খেসারি ডাল এসে ভক্তগণের পাতে বসে
বলে ডালের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ
ত্রিজগতে আছে ব্যক্ত
গন্ধে তুষ্ট যত ভক্তগণ।

www.pathagar.com

কচু শাক কয় কানে কানে, আমার তত্ত্ব কে না জানে
দেশে দেশে আমার নাম প্রচার
এসে বলে মিষ্টান্ন, আমি কিন্তু অগ্রগণ্য
মা লক্ষ্মীর উৎসবে আমার আছে অধিকার।

২৯. গণসংগীত

কিশোরগঞ্জে গণসংগীতের সূচনা মূলত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। মধ্যযুগেও কিশোরগঞ্জে গণসংগীতের প্রচলন ছিল। এই গান কিশোরগঞ্জে নতুন আঙ্গিকে নতুন যাত্রা শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে গণশিল্পী নিবারণ পণ্ডিতের কণ্ঠে। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কৃতী-সন্তান নিবারণ পণ্ডিত বহু সংগীত রচনা করেছেন। তিনি নিজেই গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। 'নিবারণ পণ্ডিতের গান' নামে তার একটি গ্রন্থ রয়েছে। মধ্যযুগে যেসব গণকবি, গণশিল্পী, গণকবিতা প্রচলিত ছিল সেগুলো যতটুকু না জনসাধারণকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন নিবারণ পণ্ডিত। এছাড়া যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অখিল ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ নীলচাষের অত্যাচার-নির্যাতন ও শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে দেশাত্মবোধের এক শাশ্বত বাণী বিশেষ এই গণসংগীত। গণসংগীত ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ সংগীত চর্চার জগতে এনেছিল গণচেতনা নবচেতনা। কিশারগঞ্জে নীলকরদের জুলুমের মাত্রা যখন ক্রমাগত বেড়ে উঠতে উঠতে দরিদ্র নীল চাষীদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়া যায় ঠিক তখনই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার সগড়া গ্রামের কৃতী-সন্তান গণসংগীত শিল্পী কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত গেয়ে উঠেন গণসংগীত। তার একটি গানে উল্লেখ আছে নীল বিদ্রোহের ইতিহাস।

শুন কথা বলছি ভাইরে শুন দিয়া মন
বহুদিনের কথা এটা অতি পুরাতন।
প্রাচীনকাল হইতে বাংলায় চলত নীলচাষ
নীলচাষ করিয়া চাষীর চলত বারোমাস।
অত্যাচারের ফলে চাষী ক্ষেপিয়া উঠিল
জেলায় জেলায় চাষীরা সব জমায়েত হইল।
লক্ষ চাষী মিলে করল অঙ্গীকার
স্মরণীয় সেই দিনটি ভাই ছিল শনিবার।
ময়মনসিংহ, রংপুর, নাটোর, যশোহর
দিনাজপুর, নদীয়া, মালদা হইল অগ্রসর।
লোকে হইল লোকারণ্য মুখে মুখে মারমার
একদিনে সব নীলের কুঠি করিল চুরমার।

তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা শহর ছিল কিশোরগঞ্জ। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন মহকুমা শহর ছাড়াও একসময় গ্রামীণ জনপদেও এ গানটি ব্যাপকভাবে গীত হতো। কিশোরগঞ্জ জেলায় তখন প্রবাদ ছিল– 'নীরকরদের পৌষ

www.pathagar.com

মাস নীল চাষীদের সর্বনাশ'। প্রবাদ– 'আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন' ইত্যাদি। নিবারণ পণ্ডিত রচিত আরও একটি গণসংগীত তৎকালীন এ জেলার জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গীত হতো। গানটি নিম্নরূপ :

মোদের দুঃখের কথা কাহারে জানাই
সারা বছর খাট্যা মরি প্যাটের ক্ষুধায় ভাই।
শুনরে ভাই কৃষক যত হিন্দু মুসলমান
অন্নদাতা হইয়া আমরা কি পাই প্রতিদান।
ম্যাঘে ভিজ্যা রইদে পুইড়্যা ফলাইলাম ফসল
সেই ফসলে পরের গোলা ভরিল কেবল।
ধনী বনিক জমিদার আর বিদেশী সরকার
চাইর ভুতে লুইট্যা খাইল মোদের সোনার সইংসার।

৩০. হিরালীর গান

ভাটি কিশোরগঞ্জে বৈশাখি ফসল চাষাবাদ ও উৎপাদনে খরার দিনে ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কবল থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য যে লোকাচার রয়েছে তাকে 'শিলারীর আচার' বলে। কিশোরগঞ্জে স-শ-ষ শব্দের স্থানীয় উচ্চারণ 'হ' শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন– সাপ-হাপ, শিলারী-হিরালী, ষাঁড়-হাড় ইত্যাদি। হিন্দুযুগী অথবা নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সমাজে 'শিলারী' উচ্চারণ বিকৃতি বা বিবর্তনে 'হিরালী' নাম আখ্যা পায়। কিশোরগঞ্জে মুসলমান হিরালীদের সংখ্যা কম নয়। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে শিলা বৃষ্টিসহ বজ্রপাত থেকে ফসল-ঘরবাড়ি ও মানুষজন রক্ষার জন্য তাদের ভূমিকা রয়েছে। হিরালীরা তাদের মন্ত্রোচ্চারণে মাধ্যমে গান গায়।

কিশোরগঞ্জে 'শিল' কে 'হিল' বলে 'শিলা' কে 'হিলা'। অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি শব্দটি উচ্চারিত হয় 'হিলাবৃষ্টি'। এভাবে ভাটি কিশোরগঞ্জে শিলারী-হিরালী বা হিলারী একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হিসেবেও পরিচিত। এদের কাজ হলো হাওর অঞ্চলে কৃষকদের এক ফসলি বোরো-ইরি ফসলের জমি ও ঘরবাড়ি তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা রক্ষা করা। কালবৈশাখির তাণ্ডব যখন শুরু হয় হিরালীরা তখন হাওরের ধানী ক্ষেতের মাঠে যায়। দাঁড়ায় সেই ধানী জমির মাঝখানটাতে উলঙ্গ হয়ে। তারা হুঙ্কার দেয় মন্ত্র পড়ে কানফাটা চিৎকারে গর্জন করে। যেমন :

ওই লঙ্গের চে ওই লঙ্গে যাও
শ্রী গুরু সিদ্ধিগুরু শ্রী রামের
আজ্ঞাকালীর দোহাই সরে যাও
মেঘ কালো কালীর বরে যাও
যাও যাও মা চণ্ডীর বরে যাও
হিল পাথর ঝড় তুফান সরে যাও।
পাথর ভাঙ্গিয়া পানি হও
যদি মন্ত্র লরে, ঈশ্বর মহাদেবের
জটা ছিড়িয়া ভূমিতে পড়ে।

www.pathagar.com

জমির চতুর্দিকে এমনকি বাড়ি ঘরের কোণায় কোণায় তাবিজ কবজ ছাড়াও কি যেন কি তারা পুঁতে রাখে। এতে নাকি জমি জমা ছাড়াও বাড়ি ঘরে তুফান লাগে না শিলা বৃষ্টি পড়ে না। অবশ্য হিরালীরা চুক্তি করা জমি বা বাড়িঘর ছাড়া তারা অন্যজনের জমি বা বাড়ির উপর ঝড়-তুফানের আঘাত সড়ানো কাজে যায় না। এটাই তাদের জীবিকা। কখনো কখনো শিল বা শিলার আঘাতে অনেকের মৃত্যুও হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার একটি হাওরের নাম রয়েছে গণেশের হাওর। এ হাওরের জমি রক্ষা করতে গিয়ে গণেশ নামের হিরালী এককালে শিলাবৃষ্টির আঘাতে তার জীবন দিয়ে অন্যদের জমির ফসল রক্ষা করেছিল। তার মৃত্যুর পর এই হাওরের নামকরণ হয়েছে 'হিরালী গণেশের হাওর'। আরেকটি হাওরের নাম রয়েছে 'হাড় গুড়ের হাওর'। এই হাওরে জনৈক হিরালীর উপর শিলাবৃষ্টি পড়ে তার হাওগুড় হয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান যুগে হিরালীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবুও কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত ভাটি অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে তাদের বংশধরগণ এখনও রয়েছে। হিরালীরা পহেলা চৈত্র থেকে ৩০শে বৈশাখ পর্যন্ত বিভিন্ন নিয়মনীতি ধর্মপালন করে। এর মধ্যে ১৫ই চৈত্র থেকে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত নিরামিশ দিয়ে ভাত খাওয়া সহ স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে দেখা এবং কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। গেরুয়া পোশাকে হাতে শিঙা ও ত্রিশূল নিয়ে কেউ কেউ লাল পোশাকে কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে হাওরের কৃষকদের কাছে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তি ছাড়া কোনো কাজ করে না। এভাবেই দৈবশক্তিতে ভর করে হিরালীরা মাথা তোলে বেঁচে আছে সমাজে। কৃষকের ধান কাটা শেষ হলেই হিরালীদের শুরু হয় নিজ বাড়ি যাওয়া। কৃষকদের কাছে চাওয়ার পূর্বেই তাদের জন্য সকল কৃষকের রেখে দেওয়া ধান খুবই যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে তাকে দেওয়া হয়। জানা যায়নি কে বা কারা রচনা করেছিলেন হিরালীদের মন্ত্র গান। গানগুলো ছন্দাকারে ছড়ায় চমৎকার। কবিতার ঢঙে ভাবরসে সমৃদ্ধ। এসব নিরক্ষর অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককবিদের পাণ্ডিত্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো প্রাচীন শিলারী বা হিরালী জ্যোতিষী কবি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাদের মন্ত্র, ছড়া কবিতা, গান খুবই উচ্চমানের ছিল। নিম্নে হিরালী গান প্রদত্ত হলো :

(১)

ভাটি দ্যাশের নানান গায় হিরালিদের ঘর
কেহ কেহ শিখতে চায় কেউ মন্ত্রধর।
নমঃশূদ্র যুগীনাথ গুরুমন্ত্র লইয়া
হিরালীর পেশা করে সাধনা করিয়া।
পাড়ায় পাড়ায় হিরালীরা গুণমন্ত্র জানে
ওস্তাদের বাড়িতে গিয়া শিক্ষা দীক্ষা আনে।
মাথা ও মানসিক চুল, নিয়ম সেবা খায়
দাঁড়ি চুল নৌখ রাইখ্যা গুরুর বাড়িত যায়।
মন্ত্র দিয়া গাঁও বান্দে, শিখে মন্ত্রের গান
মন্ত্রের রাগিণী শিখে, নানান গুণজ্ঞান।
আসমান চিনে, জমিন চিনে, চিনে সকল দিক

www.pathagar.com

তারা চিনে, চাঁন চিনে, বাতাস চিনে ঠিক।
কি রকমের দেওয়ার সাজ কি ধরনের বাতাস
কিবা বার কিবা তিথি, কোন বাইরা মাস।
কোন তিথিতে মাসের পরথম কিবা বার হয়
জলেতে চান্দের রেখা কোন দিন ক্ষণে কয়।

(২)

জটার উপর কঙ্কন থুইয়া
হরগৌরী নাচে পর্বত লইয়া।
লোহার লাঙ্গল, লোহার মই
ওরে দেওয়ানা যাইবে কই?
চণ্ডী বলে যার নাগাল পাই
ঘাড় ভাইঙ্গা তার রক্ত খাই।
আমার মন্ত্র লড়ে চড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের মস্তক
ছিঁড়া ছিঁড়া ভূমিতে পড়ে।

৩১. বিয়ের গীত

১

হাইট্যা যাইতে পন্থের ধুলা রইদে পেরেশান হইল কি
চিকন চাম্পা রেণুরে
ঝইরকা ঝইরকা পড়ে রে
সেই পানি ঝরিয়া পড়ে
সের মন্দিরের পানি পড়ে রে

আসি মাসি বলুন গো
মাছ নিয়াছুন ঘরে গো
বাইর হইয়া দেখি গো
চিকন চম্পা ঘুরে গো
পাগলিনীর বেশে গো

বাইন্যার বাড়িতে বাইয়া পড়ে
গলার হারও বানাইয়া দেও রে
এমনভাবে লাগাইব গলায়
গলায় মিশাইয়া থাকত রে ॥

২

বাপের দেশেতে খবরিয়া না পাই
পঙ্খি হইয়া আমি উড়িয়া যাই
উড়িয়া গিয়া পড়ি দয়ার বাপের কুলে

www.pathagar.com

বাপজান আমার কী কারণ টেকো লইয়া
জুড়ে দিলা দিয়ার গো কবুল ॥

বাপের দেশের খবর না পাই
ভাইয়ের দেশত আমি কেমন যাই
বাপের দেশত আমি কেমনে যাই
চাচী আমার নিদারুণ
টেকা লইতুন চাচী কি কারণ
টেকা লইয়া চাচী জুড়িয়া দিলেন
বিয়ার গো কবুল।

শুন হাত শুন হান চাচীজী
আপনি না দেন আমায় পানি
পানি খাইয়া গো চাচী
জীবন করিগো শেষ ॥

৩

মেন্দি তুমার জনম কুনুজ থানে
আমার জনম হতে মার বাগানে

মেন্দি তুমি কুন কুন কাজে লাগ
আমি লাগি নয়া সাধুর হাতে
হলদি তুমার জনম কুনুজ থানে

আমার জন্ম খেইলে খেইলে
হলদি তুমি কুন কুন কাজে লাগে।
আমি লাগি নয়া সাধুর গায়ে।

৪

বালা কইরা কামাইলা নাপিতা
পাইবে ডাইলি চাইলে রে

নাপিত দেশের নাগর
সকল নাপিতা আইতাছে
বালা কইরা কামাইলা নাপিতা
পাইবি ডাইলি রে

বুড়া কইরা কামাইলা নাপিতা রে
পাইবি জুতার বাড়ি রে ॥

www.pathagar.com

৫

ঘরের জ্বালা কাল না ননদি
বাইরে জ্বালা কৃষ্ণ আর গোপরানো সই

নন্দের ঘরের হীরার কলসি
রনঢন করে
ঘরে আসিন কালো না ননদি
বাইরের জ্বালা কৃষ্ণ আর গোপরানো সই ॥

৬

পান পান করি আমি
দিস না কেন পান,

যত লাল বরণের পান
যত নীল বর্ণের পান,

ঘরে জামাইয়ের মা
চুলডা ধরিয়া আন,

যত লাল বরণের পান
যত নীল বরণের পান,

যদি পানডা না দেস তবে
কানডা ধরিয়া আন।
(উল্লেখ্য যে, বিয়ের গীতগুলো আব্বাস আলীর গাওয়া)

৩২. জুলার কিচ্ছাগান

জুলার কথা তোমারা মিয়া শুনছনিগো ভাই
নতুন বিয়া কইরা জুলা শ্বশুর বাড়ি যায় গো,
ও ... জুলার কথা ...
হায়রে শ্বশুর বাড়ি যায় গো জুলা
পাইবো নানান কিছু
কচুক্ষেত গিয়া তুলছে এক পাঞ্জা কচু
কচুনা লইয়া জুলা করেন ভাবনা
আউস কইরা করলাম কচু খায়াতো দেখলাম না।
এই কথা কইয়া জুলা কোন কাম করিল
কামরাইতে কামরাইতে জুলা তিন কচু খাইল

www.pathagar.com

কচু খাইল ভাই শুনেন তাহার বাণী
বাড়ির ধারে পাগার আছিন খাইয়া বইছে পানি
ঐ ...
চাপার মাইজে গিয়া কচু উঠছে চুলচুলকানি
চুলকানির চুটে জুলা করে হায়রে হায়
সইতে না পারে জুলা দুই হাতে চুলকায়।
চুলকাইতে চুলকাইতে জুলা কোন কাম করিল
চুলকানির চুড়ে জুলার গলা যে ফুলিল,
গলাফুলা লইয়া জুলা রওয়ানা হইল
কতদূরে গিয়া এক ঠগে লাগাল পাইল
ঠগ বলে জুলা ভাই তোমারে জানাই
ভাল একটা ঔষধ আছে চল বাড়ি যাই।

জুলারে লইয়া ঠগে কোন কাম করিল
ঘরে আছিন লালির ঠিন গরত ডাইল্লা দিল
জাবার ভরা লুই আছিন জাগা কইরা দিল
সারা রাইত জাবারেতে কইরা উরা বেরা
বেইন্নাবেলা বাইর অইছে বুইত্তা একটা ভেরা গো
ও ... জুলার কথা
মেরা রূপ অইয়া জুলা শ্বশুর বাড়ি যায়
কত দূরা গিয়া কয়ড়া মেরা পাওয়া যায়।

শুনেন মমিন ভাই শুনেন হে সকলে
জুলার হোরি মেরা বানছিন বার বাড়ির তলে গো
ও ... জুলার কথা ...
তিন মেরা দেইক্কা জুলা কোন কাম করিল
তিন মেরার ভিতরে গিয়ে লুকায়া রইল,
সইন্দার পরে জুলার হোউরি কোন কাম করিল
মেরা নিবার জইন্য বেডি বার বাইত আইল
বার বাইত অইয়া বেডি নজর কইরা চায়
থইয়া গেছি তিন মেরা চাইট্যা দেহা যায়।
এই সব দেহিয়া বেডি ডাহা ডাহি লইছে
আমরার বাড়ির মেরার গর আগের মেরা অইছে গো
ও ... জুলার কথা ...
চাইর মেরা নিয়া বেডি কোন কাম করিল
আনন্দের সহিত বেডি গইল গর বান্দিল
গইলগর বাইন্দা বেডির ঘুমের গুর

www.pathagar.com

আচম্বিতা গইল গর হান্দাইল চুর
চোর গিয়া গইলগর মহা আনন্দিত।
কোনার মাইজে জুলা আছিল লইয়া বইছে কান্দে
কান্দে না লইয়া চুরা কত দূরা যায়
কত দূরা দিয়া একটা নদী পাওয়া যায়,
নাও নাই কিস্তি নাই কেমনে অইব পার
কান্দে না থাইক্কা জুলা মারিল চিক্কার।
এই সব না দেইক্কা জুলা কোন কাম করে
জুলারে থইয়া তারা আন্তজিজে দৌড়ে গো
ও ... জুলার কথা
জুলার কথা তোমরা মিয়া শুনছ নিগো ভাই
নতুন বিয়া কইরা জুলা ঘর জামাই
যায় গো জুলার কথা ...।
কুলিয়ার চর উপজেলার

(উল্লেখ্য যে, জুলার কিচ্ছার গানটি কুলিয়ারচর উপজেলার বাগপাড়া নামক গ্রামের লোককবি ও গায়ক আব্দুল মালেক পুথিকারের রচিত)

৩৩. গ্রাম-বাংলার আনন্দ সংগীত

শোনেন শোনেন ভাই বন্ধুগণ
কিশোরগঞ্জ জেলার কথা
করি বর্ণনা। ও ভাইরে ভাই,
প্রথমে স্মরণ করি আল্লাহ নবীর নাম
জন্মদাতা মাতা পিতার চরণ বান্দিলাম
কিশোরগঞ্জ জেলার কথা বলছি বর্তমান
জঙ্গলবাড়ী আছে ভাইরে ঈশা খাঁ দেওয়ান। ঐ

কিশোরগঞ্জ পাকুন্দিয়া হয় যে ভাল কচু
কালিয়াচাপড়া উঠেরে ভাই মঙ্গলবাড়িয়া লিচু
কিশোরগঞ্জ কিছু দূরে কটিয়াদির বাজারে
লাফা বেগুন খাইলে জামাই
তেলুম তেলুম করে। ঐ ভাইরে ভাই।

কিশোরগঞ্জের বনগ্রামে থাকে আমার চাচী।
সেখানেতে ভাল পাবে কলস আর কাচি
মির্জাপুরে মুড়ি ডাল কুলিয়ারচরে মাডা
কিশোরগঞ্জ ডাল, ভাল পাবেন। এক নম্বর আডা। ঐ
কিশোরগঞ্জ গুণের কথা বলব কি তোমারে।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জের রূপের কথা গুণেরও মাধুরী
নীলগঞ্জে আছে ভাইরে চন্দ্রাবতীর বাড়ি।
ঐ কিশোরগঞ্জ করিমগঞ্জ আশুতিয়া পাড়া গ্রাম
বাংলাদেশের চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন নাম
কিশোরগঞ্জের রূপ গুন ভাই রাখবে সবাই মনে
গোপালের ঐ বাসনা কণ্ঠে এ জীবনে। ঐ

৩৪. নরসুন্দা নদীর গান

ও নদীরে তোমাকে জানাই গো সালাম
প্রাণ ভরে গাইতেছি আজ তোমার জয়গান
নরসুন্দা নদীর পাড়ে থাকি হিন্দু মুসলমান
সুখে দুঃখে আছি মোরা জাগাইয়া প্রাণ।
নদীর দুইকূলে দুই হাট জমেছে কত সুন্দর করি
কিছু দূরে আছেরে ভাই ঈশা খার বাড়ি
সঙ্গে তাহার স্কুলেতে পড়ে পুলাপান।

সুখে দুঃখে আছিরে ভাই জুড়াইয়া প্রাণ। ঐ
বর্ষাকালে নদীর জলে ভাসাই কত ভেলা
পূবালী হাওয়াতে মন হয়ছে উথলা
ভাটিয়ালি সুরে মাঝি গেয়ে যায় রে গান
সুখে দুঃখে আছি ভাইরে জুড়াইয়া প্রাণ। ঐ
দেওয়ান সাবের দেওয়ানগঞ্জে আজিমগঞ্জ
করিমগঞ্জ মোর থানা কিশোরগঞ্জ জেলা
আমার জানাই যে ঠিকানা–
নয়াপাড়া গ্রামে ভাই আমার জন্মস্থান
সুখে দুঃখে আছিরে ভাই জুড়াইয়া প্রাণ।

৩৫. গিয়াসউদ্দিন ফকিরের গান

গান নং ১

হে অন্তর্যামী তুমি বিচার দিনের স্বামী
তাই ডাকি আমি প্রভু তোমায়
শুনাইলা মধুর বাণী এ বিশ্ব জুড়ে
হে অন্তর্যামী...ঐ

অনন্ত অসীম প্রেমময়ী নিরঞ্জন
শূন্য এ বসুন্ধরায় পাতিয়াছ তেমার আসন
দাও প্রভু দরশন উদাসী বাউলের মন
দেখিতে তোমার নয়ন ভরে...ঐ

কাননে কুহু ডাকে সঙ্গিনী হারিয়ে

www.pathagar.com

তুমি ডাক অন্তঃপুরে মায়াজালে পাতিয়া
একবার আসিয়া যাও মোরে দেখিয়া
তাই ডাকি (প্রভু) তোমায় বেহালার সুরে ঐ
কেনবা আসিলাম সংসারে সংগীতে
গাইতে হইল কত তোমার নামের ভঙ্গিতে
কয় গিয়াস উদ্দিন ইঙ্গিতে থাক যদি মোর সাথে
ডরাই কি আমি আসর হাশরে...ঐ

গান নং ২

আমার দয়াল গুরুজি তুমি অকূলের মাঝি
কূলহারা কইরোনা মুর্শিদ আমারে
আমি ঘর বাঁধিলাম মায় নদীর তীরে...ঐ

সে পারে মতুরার বাজার বিনা মূলে চলছে কারবার
আসল দিয়া হইলাম লোজার মায়ার বাঁধনে
(আমার) মায়ার প্রেম রশি দিয়া বাঁধিল কষি
কেমনে যাব মনপুরের বাজারের..ঐ

উঠিয়াছে ভীষণ ঢেউ সাথের সাথী নাইরে কেউ
জীবন রাখা দায় হলো ভব নদীর পাড়ে
আমায় কেউ না ভালোবাসে দরদী নাই দেশে
চরণ তরী কর আমারে গো মুর্শিদ ঘর..ঐ

সাথের সাথী ছিল যারা নদী পার হইল তারা
আমার দুঃখ জনম ভরা বুঝবে কি পরে
ফকির গিয়াস উদ্দিন বলে মুর্শিদ তোমার দয়া হইলে
লাইয়া যাও যাইতাম নদীর সে পারে ..ঐ

গান নং ৩

বিশ্বাসেই জগতের শ্রেষ্ঠ লিখা আছে বেদপুরাণ আর কুরানে
ফল হইবে না মসজিদ, মন্দির কাশী বৃন্দাবনে
বিশ্বাসের জগতের শ্রেষ্ঠ...ঐ
এই কর্ম একেই জন্ম খায় না অন্ন ভিন্ন স্থানে
একেই স্রষ্টার একেই বিধান, হস্ত, পদ, দেহ, তনে...ঐ

বিশ্বাসে পাবে তার অবিশ্বাসে অনেক দূরে
বিশ্বাস নাই যার অন্তরে ঘুরায় তারে শয়তানে...ঐ

www.pathagar.com

বিশ্বাসে মনসুর গাঁথা শরীয়াতে ভাঙছে মাথা
দিলে জপে গুরুর কথা, আমিত্ব তার রইল ধ্যানে...ঐ

বিশ্বাস রাখ স্রষ্টার প্রতি যেজন তোমার স্বরূপ সাথী
দেখিতে সেই নূরের জ্যোতি খুঁজে বেড়ায় গিয়াস উদ্দিনে
বিশ্বাসে জগতের...ঐ

গান নং ৪

একের মাঝে তিন বিরাজে তালাশ করে দেখরে মন
ত্রিসংসারে ত্রিকুট ঘরে নিকুঞ্জে করেছে আসন
একের মাঝে... ঐ

ব্রহ্মা, পদ্ম, রয় বরাহ তিনে কল্লে মায়া মোহ
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেষ তিনে তিনে মিলে এক আসন...ঐ

সত্যে হরি নামটি ধরি ত্রেতায় রাম ধনুক ধারী
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ দৌপায়ণ তিনি আকর্ষণ...ঐ

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, শাস্ত্রে আছে এই তিনটি নাম
যেজন জপে অবিরাম দূর হইল ভব জ্বালাতন...ঐ

দমের কুঞ্জি কর পুঞ্জি পরামাত্মা হয় নারায়ণ
জীবাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণ সেই হইল জীবরে জীবন...ঐ

আছে আত্মা রামেশ্বর তার ভিতর ঢাকা শহর
ফকির গিয়াস উদ্দিন তাহার ভিতর ভূতাত্মার করে বেষ্টন
একের মাঝে...ঐ

গান নং ৫

হৃদমহলে লাগলে তালা কে গাইবে এ ভাবেরী গান
হবে সেই দিন খেলার অবসান রে মনা...ঐ

মায়ার বাঁধন কেটে দিয় (আমি) অচিনপুরে যাব চলিয়া
নাইয়রিয়া গাওরে বিয়ার গান,
দুয়ারেতে পালকি খাড়া, দেরী আর করিস না তোরারে
শীঘ্রই তারে কর সমাধান...ঐ

www.pathagar.com

রঙমহলের নিভিল ভাতি, কেই হইল না সাথের সাথী
এই কি ছিল বিধির বিধান
আদরের মনাই পাখি কোথায় গিয়া দিল লুকি
খালি পিঞ্জিরার আছে কি সেই মান...ঐ

থাকবে না কেউ পরবাসে যাইতে হইব আপন দেশে
আগে পাছে রাখিও স্মরণ
যখন তখন আসবে সমন কেটে নিবে মায়ার বাঁধন
(সে দিন) কাটিবে না কোন সাধন দমের কোঠায় পড়িলে টান
একে মাঝে...ঐ

গিয়াস উদ্দিনের পথের দেখা আমি ভুলি নাই গো প্রাণসখা
মধুমাখা রূপের কিরণ গো তোমার রূপেরী কিরণ
বিধি যদি দয়া করে আবার ফিরে আসব ঘরে রে
শেষ বিচারে যেদিন হবে পূর্ণ উত্থান...ঐ

৩৬. বাউল হাবিবুর রহমানের গান

গান নং ১

আমার মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
কি দিয়া নিবাই
(আমার) বন্দু দেশে নাই।

এসো বন্দু কাছে বস
পরাণ জুড়াই
আরেকবার বুকেতে লইয়া
লোকেতে দেকাই
আমার বন্দু দ্যাশে নাই।

পাখি তো না হলেম আমি
তুমার কাছে যাই
ওরে বন্দু তুমার কাছে যাই
তুমার দেকা না পাইয়া
কান্দিয়া বুক ভাসাই
আমার বন্দু দ্যাশে নাই।

হাবিব মিয়া কয় রে বন্দু
ওরে বন্দু তোর দয়ামায়া নাই

www.pathagar.com

তুমার দেকা না পাইয়া
কলসীখান কান্দিয়া বেড়াই
আমার বন্দু দ্যাশে নাই ॥

গান নং ২

কে বুঝে তুমার লীলা
ও সাঁই পরোয়ার
কে বুঝে তুমার কারবার
এমন সুন্দর কৌশল করে
জমাইলে আনন্দের বাজার
ও সাঁই পরোয়ার।

কে বুজে মহিমা তুমার
আব আতশ খাক বাতে
মিশাইয়া জাতেরে জাত
পিঞ্জা একটা করিলা তৈয়ার
তার ভিতরে নিজে গিয়া
লুকাইয়া গো সাঁই পরোয়ার।

কে বুঝে মহিমা তুমার
নয় দরোজা রাকছো খোলা
তুমায় নিয়া উলামেলা
খেলছো খেলা সাজিয়া নৈরাকার
ও সাঁই পরোয়ার।

কে বুঝে মহিমা তুমার
যে দিন পাখি উড়ে যবে
হাবিব মিয়া কয়
সোনার দেহ মাটিতে পড়ে থাকবে
সোনার দেহ কিড়ায় করবে গো আহার
গো সাঁই পরোয়ার,
কে বুঝে মহিমা তোমার ॥

৩৭. অমর শীলের গান

গান নং ১

ও প্রাণ কানাই ও
তৈলের বাটি গামচা হাতে

www.pathagar.com

চল যাই যমুনার ঘাটে
কলসি ভাসাইয়া নিল স্রোতে রে,
ও প্রাণ কানাই ও
ও প্রাণ কানাই ও।

বন্ধু যদি আপন হইতো
মুখের গাম মুছিয়া দিতো রে
সোনামুখে তুইলা দিত পান রে
ও প্রাণ কানাই ও।

শুনিয়া বাঁশের বাঁশি
মনপ্রাণ হয় উদাসী রে
আমি কুলবধূ রইতে নারি ঘরে রে
ও প্রাণ কানাই ও।

গান নং ২

পিরিতের মরম বুঝলাম না
কি জ্বালা জ্বালা গো,
আমি যার তারেই চিনলাম না
আমার মনে জ্বালে প্রাণের ব্যথা গো
(আমার) মন মানে প্রাণ মানে না।

(আমি) নয়নে দেখলাম যারে
পিরিত করলাম ক্যামন করে
ক্যামন আমার বিপরীতের নমুন
একদিন যদি পাইতম দেখা গো
আমার ফুরাইত বাসনা।

ও সখি গো পিরিত করলাম যে অবধি
ভাসাইলাম কত নদী
কে আমারে করিবে সান্ত্বনা।

সখি গো, আমায় পাড়ার লোকে মন্দ বলে
কেউ হাসে কেউ পাগল বলে
আমারে কেউ ভাল তো বাসে না
অমরের বিফল জনম গো
জনম কোনো কাজেই লাগল না ॥

www.pathagar.com

গান নং ৩

নিদয় বন্ধু তুই বিনে আমার
দিনরজনী আগুন জ্বলে মনে
ও বন্ধু রে।

তুমি সুখের বাসায় বইস্যা আছ
বুঝিবে ক্যামনে
(আমার) নয়নের জল হইলো রে সম্বল
কেবল রাত্রে দিনে রে।

রাইতে ছাইড়্যা যাওয়া রে পঙ্খী
যেমন ডাইক্যা মরে
তুমি আমায় ছাইড়া গেলা
ডাকি কেমন করে।

যেমন ডাইক্যা মরে
পিরিত তোমার বিষম খেলা
(আমার) শুখাইল ফুলের মালা
আমায় জ্বালার উপর দিলে জ্বালা
অমরের পরাণেতো॥

গান নং ৪

আমার যারে ভাল লাগে গো
তারে কোথায় পাব গো,

আমার মন কান্দো যার লাগিয়া
আমার মনে রয় দুনিয়া জুড়ে
দেখিতাম খুঁজিয়া গো।

(আমার) মন কান্দে প্রাণ কান্দে
আমি যার তার লাগিয়া
আমার মন দিলাম প্রাণ দিলাম
যাচিয়া যাচিয়া গো।

আমি একদিনও দেখলাম না গো তারে
দুই নয়ন ভরিয়া,
আস তো বন্ধু বসোত কাছে
সাধ মিটাইতাম দেখিয়া গো।

www.pathagar.com

নাম শুনেই প্রাণ সঁপে দিলাম
না দেখলাম ভাবিয়া
আমার বন্ধুর শোগে ধরলো রোগে
অমর কোন্‌দিন যায় মরিয়া গো ॥

গান নং ৫

সাবধানে সাবধানে বাও
মাজি তোর রঙিলা নাউ
বান ডেকেছে গহীন দরিয়ায়

মাঝি তুমার বৈঠার ফাঁকে
পরান আমার কাঁপে
নাও নি তোমার ডুবে মাঝি
এই দরিয়ার বুকে
তরঙ্গে পরিল মাঝি
ঠেকবে বিষম দায়।

আজ আসবে কাল আসবে বলে
বন্ধু গেল কইয়া
আসলো না পরাণের বন্ধু
কিসের লাগিয়া
মন দুঃখে কান্দে অমর
বসে নিরালায় ॥

৩৮. মজনু বয়াতির গান

১

গানের কলি হারাইয়া ফেলেছি
আমি তুমি যদি বল আল্লা
আমি তোর আছি,

তুমাকে হারাইয়া আমি
কত ডাকাডাকি
তুমাকে পাইলে আমি
হইতাম চির সুকি।
বেলার শেষে বুর (ভোর) প্রবাতে
পাগলা সেইজেসি,

কত জনা তুমায় পাইয়া
হইয়া গেল ওলি

www.pathagar.com

আমি তুমার প্রেম আগুনে
পুড়ে তুমার প্রেম আগুনে
পুড়ে হইলাম ছালি
মজনু রে রাইখো না কালী
তুমার রঙ মেকেছি ॥

২

সময় থাকতে মালিক
ছিনল না (মন রে)
এত কিছু পাইয়াও তাহার
কাজ না দিলি না।

কারে কয় গানও আশেকান
বেবে দেকলা না
নিলাম যেদিন হইয়া যাবে
কেহই রাকবে না।

সেদিন থাকবে সেই জনা
যার নাই তুলনা
আশার রেখে ওগো দয়াল
করি প্রার্থনা
মাপ করিয়া দাও যত
আশেকের গুণা।

মজনু বলে তুমি বিনা
নাই আপনা,

বলবে ইয়া নাপছি
ইয়া নাপছি
কারো কেহই না
তুমার আপন যেজন হইবে
সেই জন মদীনা কেনো রো মন তালবাহানা
মুছে ফেল না।

৩

সাদন বজন নাই যে আমার কেমনে পাব দরশন
তুমি বিনে বলো কেউ নাই
প্রাণের বান্দব রে,
বল তুমি বিনে নাই কেউ আপন
তুমি যদি হইতা আমার

www.pathagar.com

আমি বন্দু হইতাম তুমার গো
বয় থাক তো না।

এপার ওপার গো
পাইতাম নামের ডিবিশন
আমি যেই দিন যাবো মরিয়া
আত্মীয়স্বজন আসবে
দেখিবার লাগিয়া
শেষোদে কান্দে কিয়া রে
যাবে বন্দু-বান্দব-স্বজন।

মজনু যাবে একা হইয়া
সঙ্গে যাব কি দন নিয়া
চোখের পানি গায় মাখিয়া
দিবো বন্দুর দুই চরণ
তুমি বিনে নাই কেহ আপন ॥

৪

আমার বলতে নাই কিছু আর
সব দিয়েছি তুমারে
জ্বালাইয়া পুড়াইয়া
মার তুমি আমারে (মুর্শিদ)

তুমার যদি লাগে ভাল
আমি পুড়ে ছাই হইলে আর ভাল
তবু তুমার মনের আশা
পূরণ করো একবার
আমার আশা তুমার যদি পাই
এইভাবে আমার আর কিছু দরকার নাই

সর্বস্ব তার হইয়াছে যার
কেউ কি করতে পারে মজনু চায়ে তুমার দয়া
তুমি যদি যাও গো মুর্শিদ আমার হইয়া
প্রেমের কেলা কেলবো গিয়া
সেই দিন পরপারে ॥

৫

বন্ধু দুনামণি রে
আমার বন্ধু মনে চায় রে

www.pathagar.com

হৃদএতে রাকি রে আমার
বন্ধু গুণমনি

সাজানো ফুলের বাগান
নয়নে যা দেখি
দিন রজনী সদাই শুনি রে
বন্ধু নামের ধ্বনি রে আমার
শুইলে না আসে রে নিদ্রা
জরে ছইখের পানি

কিনা মদুর লাগে মনে রে
শুনলে বন্ধুর বাণী রে আমার
পাগল সাজিলাম রে আমি
বন্ধুয়ার লাগিয়া
দেখা হইলে কইও তুমরা গো
পাইলে ছরণদুলি রে আমার ॥

৩৯. নবী হোসেন বয়াতির গান

১

তোমার গড়া সংগীত সেরা।
সুরা আল-ফাতিহা ॥
প্রশংসা দিয়ে শুরু ॥
স্মরণীয় দেয় দেখাইয়া ॥

নিত্য পঠিত সহস্র কোটিবার।
কেও বলেনি স্বাদ লাগেনি আর।
পড়ছে না অভাগা বেহায় ॥

রাসুলের হিয়া
দিলেন আলাহ লিখিয়া
শিনা মোবারক, সাফ করিয়া ॥

পরম নামে পাথর, নাইরে দুনিয়ায়
পরশ হলো সেই কুরআন।
ছোঁয়ায় মানুষ ভাগ্যবান।
ধন্য হতে চাই, নবী হোসেন পড়িয় ॥

২

এই জোছনা রাত করে।
পাইলাম পুকুর পাড়ে।
সালাম দিলাম তোমারে ॥

www.pathagar.com

মঞ্জু বাসিনী।
চাঁদেরই আলোতে, দেখিলাম নয়নে।
রূপের বাহার তোমার বদনে।
এত রূপ গায়ে তোর।
দেখিলাম রূপের পসর।
গিয়েছিলে কই বল মোরে ॥

জানি আস না বাহিরে।
নবীস বলে দাঁড়াও।
প্রাণ জোরায়ে যাও।
কলি চেহারা তোর।
দেখাও আমারে ॥

৩

বঙ্গের মা তুই কপাসী।
সদা নপ্তা করে পাঞ্জলী
জান্নাত মায়ের পদতলে।
এই কথা বলে সকলে।

মায়ের পরশের ছোঁয়ায়।
মাটে চালাই হলী।
আনাজে ভরা দেশ, তোমার হাতে পড়া।
ফলমূল ঔষধে মা, আছে এদেশ ভরা।
সাজায় রেখছে গৃহস্থালী।

কনক ছায়াদে পান্না এই দেশ।
সারা বিশ্বে গুণ গাহিয়াছে বেশ।

শস্য শ্যামল ফসল ভরা কদলী।
এই মাটিরেই জন্ম আমার।
আবার মিশে যাব।
চির দিনেই তর উদরে আমি পরে রবো।
কেও আগে পরে যাব চলি।

৪

দুনিয়াটা মিষ্টি পাথর।
পূর্ব পুরুষ চাটিয়া গেল।
নপ্তারাও চাটিয়া খাইল।

www.pathagar.com

মোর চাটিয়া জীবন গেল
অক্ষয় রইল জনম ভর ॥

নিত্য নতুন স্বাদ বাহির হয়।
ঐ স্বাদের পাথরে।
ভোলায়ে রাখার যন্ত্র।
আছে তার ভিতরে।
নিজের পূজা নিজে কর ॥

পাথরে চাটিয়া স্বাদ।
করো মিটে না।
মনে করে চিরদিন।
এটা করে ঠিকানা।
মূলত সবি পর ॥

হক কথা শোনে না।
মৃত্যুর কথা ভাব না।
বনের পাখির মত
সাজিয়াছে বনচর ॥

৫

চোখ হলো মরুভূমি।
অন্তরটা জাম।

এইভাবে ইবাদতে।
হবে না তোর-কাম, বান্দা।
সর্বসময় কাঁদে যারা।
পড়িয়া আলার প্রেমে।
মূল্য নাই মানুষটারে।
কিনে খোদা দামে।
এমনি দয়া আছে হাম ॥

হৃদয়টারে অজু করাও।
নয়নের পানি দিয়া।
তুমি যে অসহায়।
বোঝাও কাঁদিয়া
তাসবিহ পড় অবিরাম ॥

তথ্যসূত্র : উপরের ৫টি গানের গীতিকার মো. নবী হোসেন, বয়স ৪০, ঠিকানা : উত্তরকুড়ের পাড়, বৌলাই, কিশোরগঞ্জ। গানগুলো তাঁর শিষ্যস্থানীয় মজনু বয়াতির কাছ থেকে সংগৃহীত। মজনু বয়াতি এই গানগুলোকে 'বিচ্ছেদ গান' বলে অভিহিত করেছেন।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

লোকসংগীত ও লোকনাট্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লোকবাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি লোকবাদ্যযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো :

১. একতারা

একতারার বস বেল বা নারিকেলের মালা দিয়ে তৈরি। মালার অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে খোলার দিকে চামড়ার ছাউনি দিতে হয়। তেলের ওড়ং-এর মত কাঠের একখানা লাঠি মালার সাথে বেঁধে দেওয়া হয় লাঠির নীচে থেকে একটি তার চামড়ার মাঝ দিয়ে উপরে লাঠির মাথায় কানের সাথে বাঁধা থাকে। কিশোরগঞ্জে এর প্রচলন রয়েছে। একতারাকে কিশোরগঞ্জে একতারাই বলে।

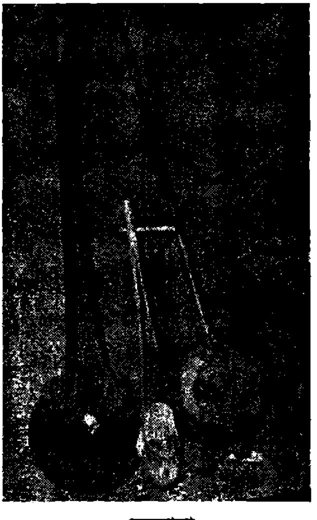

একতারা

একতারা বাজিয়ে বাউল তার মরমীর গান গেয়ে পল্লির মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাটে, ঘুরে বেড়ায়।

একটি তারের কম্পনেই সুরধ্বনি উঠে একতারার। লাউ, বেল, নারিকেলের 'বস' বা কাটের খোল, বাঁশের ডাঁটি, তার বা সুতা এবং চামড়া একতারায় ব্যবহৃত হয়। উপকরণ ও আকৃতি ভেদে চার রকমের একতারা দেখা যায়। এগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা : লাউ, একতারা, গোপীযন্ত্র ও থুনথুনে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

২. লাউ

লাউ-এর বস কিশোরগঞ্জে বহুল প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। গোলাকার শুকনা লাউ-এর অর্ধেকের কিছু অধিক অংশ নিয়ে বস তৈরি হয়। দু'হাত মত লম্বা এক খণ্ড ফাঁপা সরু বাঁশ মাথার গিট রেখে সমান চার ভাগে চিরে মুখোমুখি দু'ভাগ করে কেটে বাদ দিয়ে বাকি দু'টি বাতা বসের দু'পাশে বেঁধে দেওয়া হয়। লাউ-এর তলা সামান্য ছিদ্র করে লোহার চাকতির সাথে তার বা সুতা এঁটে দেওয়া হয়। বসের উপরের অংশ খোলা থাকে। খোলা অংশ দিয়ে তার উপরে বাঁশের মাথায় 'কানে'র সহিত বাঁধা হয়। কান ঘুরিয়ে তার টান-ঢিল করতে হয়। ডান হাতে বাতার মাঝামাঝি অংশ ধরে তর্জনীর ডগায় টোকা দিয়ে একতারা বাজান হয়। বাজানর সময় বাতা দুটিতে চাপ দিয়ে প্রয়োজন মত সুরের খাদ কমান-বাড়ান যায়। লাউ-এর খোলের প্রাধান্য থেকে কিশোরগঞ্জে এটি 'লাউ' নামেই পরিচিত। এ জেলায় লাউ বাজিয়ে গান করে বলে বৈষ্ণব ভিখারীকে 'লাউয়া বৈরাগী' ও মুসলমান ফকিরকে 'লাউয়া পির' বলা হয়। লাউ-এর বসের তৈরি বলে কিশোরগঞ্জ জেলায় এটি একতারা নাম ছাড়াও 'লাউয়া' বাজানা বলে। কিশোরগঞ্জে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ লাউ থেকে লাউয়া বাজনা।

৩. থুনথুনে

চোঙাকৃতি খোলের একপাশে একটি সরু বাঁশ বাঁধা হয়। বাঁশটি ফাড়া হয় না। নীচের চামড়ার ছাউনি থেকে পিতলের তার খোলের ভেতর দিয়ে উপরে বেরিয়ে এসে বাঁশের কানের সাথে আঁট করে বাঁধা থাকে। পল্লির ভিক্ষুকরা এটি ব্যবহার করে। কিশোরগঞ্জে এর প্রচলন রয়েছে।

৪. বেনা

'বেনা' বীণার বিকৃত উচ্চারণ। কিন্তু বীণার সঙ্গে বেনার কোন সামঞ্জস্য নেই। বরং গঠনপ্রণালী ও বাদ্যরীতির দিক থেকে বেহালার সঙ্গে কিছু মিল আছে। তার ও ছড়ের ঘর্ষণে বেনার সুর উঠে। এর গঠনপ্রণালী অনেকটা একতারার মত। একটা গোলাকার নারিকেলের মালার একপার্শে আছে চামড়ার ছাউনি। মালাটি ছিদ্র করে একটা বাঁশের ডাঁটি লাগান হয়। ডাঁটির নীচ থেকে তার চামড়ার উপর দিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। এখানে ঘোড়ার লেজের চুল বা 'ফিকে' তারের কাজ করে। চামড়ার উপরে থাকে কাঠের ঘোড়া। বাঁশের 'কাবারী'র সহিত ঘোড়ার ফিকে বেঁধে ছড় তৈরি করা হয়। বেনা কিশোরগঞ্জে কেচ্ছাগান, কুশানগান ও রামায়ণগানে বাজান হয়।

৫. দোতারা

দোতারা একতারার মতই বাদ্যযন্ত্র। তারের কম্পনে সুরধ্বনি উঠে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাঁশির পর দোতারার স্থান। 'ডই'-এর মত দেখতে কাঠের মূল কাঠামর সহিত তার ও চামড়া জুড়ে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়। তার ও চামড়া ছাড়া এর অন্যান্য অংশ কান, ঘোড়া, ফেসি ও কটি। কাঠের ফ্রেমের প্রশস্ত অংশ বা 'তলা' ছাগলের বা গুঁই সাপের চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। যন্ত্রের মাথায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাঠি যুক্ত থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় এগুলিকে কান, পাখরা বা কেড়কি বলে। কান ঘুরিয়ে সুরের লয় ঠিক করতে হয়। তার বাঁধা থাকে তলার শেষ প্রান্তে ফেসি নামে একটা লোহা বা

www.pathagar.com

পিতলের চাকতির সাথে। চামড়ার ছাউনির উপরে মাঝামাঝি জায়গা অর্ধচাপের আকৃতির এক টুকরা কাঠ বা হাড় থাকে। এর নাম ঘোড়া। ফেসি থেকে তারগুলি ঘোড়ার উপর দিয়ে কাঠামোর মাঝ বরাবর গিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। দোতারার অপর একটি অংশ কটি। এটি গরু-মহিষের শিং, হাড় বা কাঠের একটা চ্যাপটা টুকরা। দেশীয় দোতারার মোটামুটি একটাই গঠনপ্রণালী। আনুমানিক দু'হাত লম্বা হালকা এ বাদ্যযন্ত্রটি বাম হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে ডান হাতে কটির ঘর্ষণ দিয়ে বাজানো হয়।

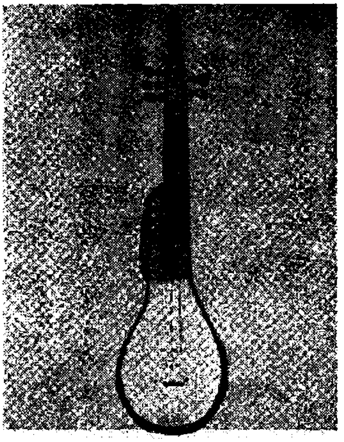

দোতারা

নামানুসারে দোতারার তারের সংখ্যা দুটি হয়, কিন্তু আসলে তার কোথাও চারটি, কোথাও ছ'টি। এগুলি স্টিল বা পিতলের তৈরি হতে পারে আবার রেশমের পাকান সূতাও হতে পারে। এসব তার থেকে 'ওদারা', 'মুদারা', ও 'তারা' সুর ধ্বনিত হয়। দোতারার চারটি তারের নাম দিয়েছেন বম, টন, টিল ও সরুয়ালী। সাধারণত ভাওয়াইয়া গানের সাথে দোতারা বাজান হয়। এর সঙ্গে বাঁশি এবং জুড়িও থাকে। ভাওয়াইয়া ছাড়া জারি, মুর্শিদি ও কবিগানে দোতারা ব্যবহৃত হয়।

৬. সারিন্দা

দোতারার মত সারিন্দার একটি কাঠের কাঠামো থাকে। তার, চামড়া, কান, ঘোড়া, ফেসি প্রভৃতি এর উপকরণ। কটির দ্বারা আঘাত করে যেমন দোতারা বাজান হয়, তেমনি ছড়ের দ্বারা ঘর্ষণ করে সারিন্দা বাজানো হয়। বাজানোর সময় মাঝে মাঝে 'রজন' দিয়ে ছড় মেজে নিতে হয়।

সারিন্দার মূল কাঠামোর তলার দুপাশে বেশ চাপা। এর উপরে চামড়ার ছাউনি। নীচ থেকে ফেসির সাহায্যে তার এঁটে চামড়ার উপর ঘোড়ার পিঠ দিয়ে গিয়ে মাথার কানের সাথে বাঁধা থাকে।

সারিন্দার মোট তার তিনটি — বম, সুর ও জিল। সাধারণত বিচারগান, কেচ্ছাগান ও কবিগানে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সারিন্দা ব্যবহৃত হয়। মুর্শিদি গানেও

www.pathagar.com

সারিন্দা ব্যবহার করা হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ছাদ পিটান ও খেত নিড়ান সারিগানে সারিন্দা বাজান হয়।

৭. খমক

খমক পুরোপুরি লৌকিক বাদ্যযন্ত্র। খমক সুরসঙ্গতে আবার তালসঙ্গেতেও গান ও নাচে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার জনপ্রিয় গ্রাম্যবাদ্য।

খমক তৈরি করতে প্রয়োজন হয় একটি শূন্যগর্ভ কাঠের পাতলা খোল, ছাগলের চামড়া, পাট বা রেশমের সূতা, বাঁশের সুতা, বাঁশের চোঙা আর নারিকেলের মালা। দশ-বার ইঞ্চি লম্বা কাঠের খোল যন্ত্রের প্রধান অংশ। খোলটি শুকনা লাউ-এর হতে পারে। খোলের এক প্রান্তে চামড়ার ছাউনি। অপর প্রান্তের চারদিকে চামড়ার ঈষৎ ঘের, মাঝ অংশ খোলা। তলার ছাউনির মধ্যভাগ ছিদ্র করে সুতা টিনের চাকতির সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়। সুতার প্রান্তভাগ খোলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে বাঁশের চোঙা বা মুঠির সাথে বাঁধা থাকে। কিশোরগঞ্জে এর প্রচলন রয়েছে।

৮. আরশী

এটি লাটিমের আকার বিশিষ্ট একটি নারিকেলের মালা। এরই আঞ্চলিক নাম আরশী। কোথাও 'জাওয়া' নামেও এটি পরিচিত। কাঠের টুকরা অথবা মহিষের শিং দিয়েও আরশি তৈরি করা হয়। দোতারার কটির যে কাজ খমকের আরশীর সেই কাজ। বাম বগলে খোলটি চেপে এবং বাম হাতে মুঠি ধরে সূতা টান করে ডান হাতে আরশীর টোকা দিলে খমকের গমকযুক্ত ধ্বনি উঠে। এর ধ্বনি তালভেদে 'কোড়া টুবটুব', 'গাম-গুবা-গুব' অথবা 'দা গুড় গুড় গুড় তাগধিনি'। এই ধ্বনি বৈশিষ্ট্য থেকে খমকের একটি আঞ্চলিক নাম পাওয়া যায় 'গাব-গুবা-গুব', সংক্ষেপে 'গুবগুবি' নামেও এটি প্রচলিত। সংগীতশাস্ত্রে এর নাম 'আনন্দ লহরী'। কিশোরগঞ্জে এর প্রচলন রয়েছে।

৯. ঢাক

বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে ঢাক-ঢোলের ব্যবহার চলে আসছে। ঢাক বেশ বড় বাদ্যযন্ত্র। কাঠের খোলের দুই মুখে পুরু চামড়া দিয়ে ঢাক তৈরি হয়। খোল আনুমানিক দু হাত লম্বা, এর ব্যাসের পরিমাণ অনধিক এক হাত। সুতার কিংবা দড়ি, রশির সাহায্যে বাম কাঁধে তুলে বাম কোল বরাবর ঝুলিয়ে রেখে দু হাতে দু রকমের কাঠি দিয়ে ঢাকের এক্ দিকে আঘাত করে বাজাতে হয়। ডান হাতের কাঠিটি বাঁশের তৈরি — মোটা ও শক্ত, বাম হাতের কাঠিটি বেতের তৈরি— পাতলা ও চ্যাপ্টা।

সাধারণত হিন্দুর পুজার মণ্ডপে ঢাক বাজে। সঙ্গে কাঁসি থাকে। কোন শোভাযাত্রা কিংবা উৎসবেও ঢাক বাজান হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কিশোরগঞ্জে একটি জনপদের নামকরণ রয়েছে 'ঢাকী' নামে।

১০. ঢোল

প্রয়োজনের দিক থেকে বাঁশি অপেক্ষা ঢোলের ব্যবহার বেশি। সুরের সুমিষ্টতা বাঁশির জনপ্রিয়তার কারণ। ঢোল তালবাদ্য, সুতরাং ইন্দ্রিয়তৃপ্ত সুরের মোহজাল তা সৃষ্টি করতে পারে না। ঢোল তাল ও ছন্দ সৃষ্টি করে। গানের আসরে ঢোল ও বাঁশি, নাচের মঞ্চে

www.pathagar.com

ঢোল ও ঘুঙুর, বিবাহোৎসবে ঢোল ও সাঁনাই, শোভাযাত্রা যুদ্ধযাত্রায় ঢাক ও ঢো-ল। হিন্দু পূজামণ্ডপে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে ঢোল বাজান হয়।

ঢোল বাদক কালা চান্দ

ঢাকের মত ঢোলও কাঠের খোলের তৈরি, উভয় প্রান্ত চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত। কিন্তু আকারে ঢোল ছোট। এর উভয় দিকে কাঠির আঘাত দিয়ে বাজান হয়। জারিগান, ঘাটুগান, পালাগান, কবিগান, টপ্পাগান, আলকাপগান প্রভৃতি লোকসংগীতে এবং লাঠিনাচ ও ছোকরা নাচে ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে, বিশেষ করে নৌকাবাইচের গানে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১১. ডুগডুগি

ডুগডুগির কাঠের খোলের দুপাশে ছাগলের চামড়ার ছাউনি আছে। মাঝের সরু অংশে শক্ত সুতা বাঁধা। সুতার মাথায় সীসা বা লোহার ছোট গুলি জড়ান। যন্ত্রটি ধরে নাড়া দিলে সুতার গুলি উভয় পাশের চামড়ায় পর্যায়ক্রমে আঘাত খেয়ে 'ডুগডুগ' ধ্বনি তোলে। ধ্বনি বৈশিষ্ট্য থেকেই এর আঞ্চলিক নাম ডুগডুগি। এর প্রাচীন নাম ডমরু বা ডম্বরু। ডমরু শিবের বাদ্য। তিনি মূলে লৌকিক দেবতা। পাহাড়পুরের চিত্রে ডমরু বাদ্যরত মানুষের ছবি আছে। সেখানে কাঠির আঘাত দিয়ে তা বাজাতে দেখা যায়। কাঠি ছেড়ে সুতা বেঁধে বাজানোর রীতি কখন প্রচলিত হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। ডুগডুগি তালবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেদে ও বাজিকর সাপ, বানর ও ভালুকের খেলায় ডুগডুগি বাজায়। হিন্দুর গাজনগানে ডুগডুগি বাজান হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার এর প্রচলন দেখা যায়।

১২. খঞ্জরি

খঞ্জরি তালবাদ্য। হাতের আঙুলে বা তালের আঘাতে খঞ্জরি বাজিয়ে গানের ও নাচের তালসঙ্গত করা হয়। ঘাটুগান ও ঘাটুগানের আসরে ঢোলকের সাথে খঞ্জরি বাজান হয়। জারিগান ও জারিনাচেও খঞ্জরির ব্যবহার আছে। খঞ্জরির গঠনপ্রণালী খুব সহজ। নিম বা কাঁঠাল কাঠের পাঁচ-সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটি চাকতি। এর এক দিকে চামড়ার ছাউনি, অন্যদিকে খোলা। চাকতির গায়ে সমান দূরত্বে মুখোমুখি চারটি চারকোণাবিশিষ্ট

www.pathagar.com

ছিদ্রে লোহার শিকের সাথে টিনের ছোট ছোট পাত জড়ান থাকে। বাজানর সময় এগুলি ঝুন ঝুন শব্দ করে। চামড়ার ঠপ ঠপ ও ধাতুর পাতের ঝুন ঝুন এক মিশ্র ধ্বনির সৃষ্টি করে। এটি খঞ্জরি নামেও সুপরিচিত। কিশোরগঞ্জ এর প্রচলন রয়েছে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র।

খঞ্জরি

১৩. ডফ

খঞ্জরি ও ডফ অভিন্নপ্রায় বাদ্যযন্ত্র। ডফের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট খঞ্জরির কাঠের ফ্রেম বাটির মত, ডফের ফ্রেম চালুনের মতো। পাতলা কাঠের চাকতির একদিকে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডফ তৈরি হয়। চাকতির গায়ে মাঝে মাঝে পিতলের পাত বসানো থাকে। বাজনোর সময় পাতগুলি একটা সুমিষ্ট ধাতব অনুরণন তোলে। সাধারণত গানের আসরে দোতারার সাথে ডফ বাজানো হয়। বেদেরা বাজিখেলায় ঢোলের সাথে ডফ বাজায়।

ফরিদপুরে বাদ্যযন্ত্রটি ডোমফা বা সিলেটে ডপকি নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এটির নাম বিষম ঢাকী। কিশোরগঞ্জে এটি ডফ নামে পরিচিত।

১৪. কাঁসি

কাঁসি কাঁসার তৈরি ঘন বাদ্যযন্ত্র। এটি দেখতে চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট পানের বাটার মতো। কাঁসির গায়ে ছিদ্র করে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। বাম হাতে দড়ি ধরে ডান হাতে কাঠি দিয়ে তা বাজানো হয়। হিন্দুদের পূজার মণ্ডপে ঢোলকের সাথে কাঁসি বাজাতে দেখা যায়। কাঁসি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। মন্দির এর পূজাকর্মে এবং গৃহস্থ ঘরে লৌকিক অনুষ্ঠানে কাঁসর বাজানো হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

১৫. জুড়ি

জুড়ি বা মন্দিরা ঘনবাদ্য। কাঁসার নির্মিত দু'টি বাটি দু'হাতে ধরে পরস্পরের কাণায় মৃদু টোকা দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। বাটি দু'টির তলায় মোটা সুতা বাঁধা থাকে। বাটির গা স্পর্শ না করে শুধু সুতা ধরেই বাজাতে হয়, হাতের স্পর্শ লাগলে ধ্বনি অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নিরূপণে জুড়ি সাহায্য করে। বৈষ্ণব বৈরাগীরা জুড়ি বাজিয়ে ও গান গেয়ে ভিক্ষা করে। জারিগানে ঢোলকের সাথে জুড়ি বাজান হয়। এছাড়া বিচারগানে ও মারফতিগানে মুসলমান ফকিররাও জুড়ি বাজায়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

১৬. করতাল

জুড়ির চেয়ে করতাল আকারে বড়। আকৃতি সামান্য ভিন্ন, কিন্তু বাজানোর পদ্ধতি অভিন্ন। খোল এবং করতাল সহগ বাদ্যযন্ত্র। বিশেষত বৈষ্ণবকীর্তনে খোল ও করতাল অত্যাবশ্যক। পল্লির গাইনের গীতে মৃদঙ্গের সঙ্গে করতাল বাজান হয়। করতাল পিতলের তৈরি। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

১৭. চটি

চটি বা চইট্টা লৌকিক তালবাদ্য। কাঠের দুফালি টুকরা একই হাতের আঙুলে ধরে পরস্পরের গায়ে আঘাত দিলে খট-খট বা চট-চট শব্দ ধ্বনি উঠে। কিশোরগঞ্জে ফকিরালি গান, জিকির, কিস্‌সা ইত্যাদিতে চটি ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলায় চটির আঞ্চলিক নাম খুনজুড়ি। এটি প্রেমজুড়ি নামেও পরিচিত। প্রেমজুড়ি দেখতে তাঁতির মাকুর আকৃতির মতো। কাঠের দু'টি ফ্রেমের সহিত টিনের পাত লাগিয়ে তার ভেতর ছোট ছোট লোহার গুটি ভরা থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

১৮. খড়তাল

প্রেমজুড়ি দুটি আলাদা কাঠের ফ্রেম, খড়তাল দুটি কাঠের জোড়া ধরা চাড়। অনেকটা ছুতর মিস্ত্রীর রেঁদার মত দেখতে। পল্লিগানের তালসঙ্গতে খড়তাল ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ভজনগানে এটি ব্যবহার করে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

১৯. পাইল্যা

পাইল্যা বা পাতিল মৃতভাণ্ড বিশেষ। নিত্য ব্যবহার্য ছোট কলসির মত এর গড়ন। বিভিন্ন লোকসংগীতের আসরে তালবাদ্য হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। উপযোগিতার দিক থেকে এটিকে তবলা-বাঁয়ার লৌকিক সংস্করণ বলা যায়। পাইল্যার মুখ বাঁধার ও পেট তবলার কাজ করে। পাইল্যার মুখের বাতাসে হাতের কৌশলে আঘাত দিয়ে বাঁয়ার প্রায় অনুরূপ ধ্বনি তোলা হয়। দক্ষ বাদক ছাড়া এরূপ ধ্বনি তুলতে পারে না। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

২০. বাঁশি

বাঁশি বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্য। সব সম্প্রদায়ের ছোট বড় সব শ্রেণির লোক বাঁশি বাজিয়ে থাকে। বাঁশি বাজানর জন্য উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। অবসর সময়ে অথবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকে আনন্দের টানেই বাঁশিতে ফুঁ দেয়, তার সুমিষ্ট সুরে সংগীত পিপাসা নিবৃত্ত করে। সাধারণত রাখাল বালকেরা বাঁশির খুব ভক্ত। তারা ধেনু চরায় আর বেণু বাজায়। নানা প্রকার লোকসংগীতে পেশাদার অপেশাদার গায়কেরা বাঁশি ব্যবহার করে। ভাওয়াইয়া গানে দোতারার সঙ্গে এবং সারিগানে সারিন্দার সঙ্গে বাঁশি বাজানো হয়। যাত্রাগানে ঢোলকের সঙ্গে এবং বিষহরী গানে খোলের সঙ্গেও বাঁশি বাজে। ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত একটি সারিগানে 'আষ্ট আঙ্গুল' পরিমিত বাঁশির উল্লেখ পাওয়া যায। খুলনা জেলার পশ্চিম অঞ্চলে লাঠির মতো দেখতে এক প্রকার লম্বা বাঁশির কথা বলেছেন আবদুল করিম সাহেব। তাঁর মতে, এর ঠিক মাঝখান ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। সাঁওতালদের বাঁশিও বেশ লম্বা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

বাংলার গ্রামাঞ্চলে কয়েক প্রকার বাঁশি প্রচলিত আছে, যথা আড়বাঁশি, কদবাঁশি, টিপরাবাঁশি ও হরিণাবাঁশি। বাঁশের বাঁশি ছাড়া নলের বাঁশি, পাতার বাঁশি প্রভৃতির ব্যবহার লোকসংগীতে দেখা যায়। ভাওয়াইয়া গানে দোতারার সঙ্গে লেবুপাতা বাজানোর রেওয়াজ আছে। একটি পাতা দু'হাত ধরে অংশবিশেষ মুখের মধ্যে পুরে বাজানো হয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

২১. আড়বাঁশি

বাঁশের বাঁশির মধ্যে আড়বাঁশি অধিক জনপ্রিয়। এটি দেশের সর্বত্র প্রচলিত। মাথায় গিট রেখে বাঁশ কাটতে হয় যাতে তা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত খোলা। খোলা দিকে একই রেখায় কাছাকাছি ছয়টি গোল ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রগুলিতে উপরে নীচে ডান ও বাম হাতের তিনটি করে ছয়টি আঙুল রাখা হয়। বাজানোর সময় আঙুলে ছিদ্রগুলি চেপে বন্ধ করে অথবা ছেড়ে দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি তোলা হয়। মাথার ঈষৎ নীচে ঐ ছিদ্রের বরাবর রেখায় অপর একটি ছিদ্র করা হয়। আড়াআড়িভাবে ধরে এতেই ঠোঁট রেখে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। আড়াআড়িভাবে ধরে বাজানোর জন্য এর নাম আড়বাঁশি হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ বাঁশির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

২২. কদবাঁশি

আড়বাঁশির মত কদবাঁশিতেও নীচের দিকে ছয়টি গোল ছিদ্র থাকে। মাথার কাছে কোন ছিদ্র থাকে না। গিট সমেত মাথা তেরচাভাবে কেটে ঈষৎ ছিদ্রে বাঁশের পাতলা খিল দেওয়া হয়। খিলের নীচে চার কোণাবিশিষ্ট একটি ছিদ্র করা হয়। প্রয়োজন মতো বাতাস ছেড়ে বা রোধ করে এর সাহায্যে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তেরচা অংশটুকু মুখে পুরে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। কদবাঁশির মুখের গঠন প্রণালী থেকে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। মুখ কলমের মত দেখতে বলে এর অপর নাম 'কলমবাঁশি'। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন আছে।

২৩. টিপরাবাঁশি

টিপরাবাঁশির উভয় প্রান্তই খোলা। কদবাঁশির মত মাথার ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে বাজাতে হয়। এর গায়ে আটটি ছিদ্র থাকে। উভয় প্রান্ত খোলা বলে কেবল ফুঁ দিলেই বাজে না, অভিজ্ঞ বাদক ছাড়া টিপরাবাঁশি বাজানো কঠিন কাজ। কিশোরগঞ্জ জেলায় এর প্রচলন রয়েছে।

২৪. হরিণাবাঁশি

হরিণাবাঁশি বাঁশের কঞ্চি দ্বারা তৈয়ার করা হয়। বাঁশিটি প্রায় ৯" দীর্ঘ। নীচের গিরা পর্যন্ত দুইভাবে বিভক্ত থাকে। কোন ছিদ্র থাকে না। ইহাতে ফুৎকার দিলে হরিণের বাচ্চার ডাকের মতো এক প্রকার আওয়াজ হয়। বস্তুত হরিণ শিকারের কৌশল হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ বাঁশিটির প্রচলন আছে।

২৫. পাতবাঁশি

তালপাতা বা নারিকেল পাতা দিয়ে এ বাঁশি তৈরি করা হয়। এটি একান্তভাবে লৌকিক বাদ্য। পল্লির বালক-বালিকাদের বাজনার উপযোগী করে এটি তৈরি করা হয়। এর দ্বারা সূক্ষ্ম ও মধুর সুর সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ বাঁশিটির প্রচলন আছে। গ্রামের ছেলে-মেয়েদের হাতে প্রায়ই দেখা যায়।

www.pathagar.com

২৬. ভেঁপু বাঁশি

আমের আঁটির অঙ্কুর গজিয়েছে অথবা চারা সামান্য বড় হয়েছে এমন অবস্থায় আঁটিটি মাটি থেকে তুলে বাইরের শক্ত খোল ছড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর আঁটির একদিক তেরচাভাবে মাটি বা ইটের দেওয়ালে ঘরে কদবাঁশির মত মুখ তৈরি করা হয়। তেরচা অংশ মুখে পুরে ফুঁ দিল পুঁ... পুঁ... শব্দ হয়। বাংলার পল্লির ছেলেমেয়েদের এটাই প্রিয় ভেঁপু বাদ্য। এতেই তাদের সুরপিপাসা নিবৃত্ত হয়। এ কেবল খেলার অঙ্গ হিসেবেই সুরের আনন্দে বাজান হয়, এর সঙ্গে গান, নাচ বা অন্যবিধ সুর-তালের সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই। সুর খুবই স্থূল। বয়স্করা তা ব্যবহার করেন না। কেবল শিশুর মনোরঞ্জনে ভেঁপু কাজে লাগে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ বাঁশিটির প্রচলন আছে।

২৭. তুবড়ি

তুবড়ি শুষির শ্রেণির বাদ্য। সাধারণত সাপের খেলায় তুবড়ি বাজান হয়। এর সুমিষ্ট সুরে সাপ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নাচে ও খেলা দেখায়। তুবড়ির আঞ্চলিক নাম ‘বীণ’। কোথাও ‘তিক্তিরী’ ও ‘পুঙ্গী’ নামেও পরিচিত। একটি ছোট লাউ-এর খোলের ভিতর এক জোড়া বাঁশি লাগিয়ে তুবড়ি তৈরি করা হয়। বাঁশির ছিদ্র আঙুল দিয়ে বাতাস চেপে সুর নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাতাস লাউ-এর খোলের ভেতর দিয়ে যায়। সাধারণ বাঁশি থেকে তুবড়ির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো, শ্বাস নেওয়ার সময় ধ্বনি থেমে যায় না, জিহ্বা দিয়ে মুখ বন্ধ করে সুরের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা হয়। খোলের মধ্যে যে বায়ু সঞ্চিত থাকে, তা-ই কিছুক্ষণ বাঁশিকে ধ্বনিত করতে পারে। ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে তুবড়ির জনপ্রিয়তা বেশি। বাংলার বেদে সাপুড়ে ছাড়া অন্যরা সচরাচর এটি ব্যবহার করে না। তবে কিশোরগঞ্জে বৈদ, গাইন প্রভৃতি সম্প্রদায় তুবড়ি বাজিয়ে অর্থ উপার্জন করত।

২৮. শিঙ্গা

শিঙ্গা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। মহিষের শিং দিয়ে তৈরি। ঈষৎ বাঁকান শিং-এর সরু প্রান্তে জোড়ে ফুৎকার দিয়ে শিঙ্গা বাজানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নায়ক শিঙ্গাধ্বনি করে স্বীয় দলের সৈনিকদের সঙ্কেত জ্ঞাপন করেন। শিঙ্গা এক সময় কিশোরগঞ্জের হিরালী সম্প্রদায়ে প্রচুর প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অপ্রচলিত তবে শিক্ষিত সমাজে বিউগল বাজানো হয়। বড় আকারে শিঙ্গাকে ‘রামশিঙ্গা’ বলে। ছোট আকারে শিঙ্গা বেদে সম্প্রদায়ে আজও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ আকারে শিঙ্গা এখনও কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে হিরালী সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবহার করেন।

২৯. শঙ্খ

প্রাচীন কাল থেকেই শঙ্খের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের পূজা পার্বণে এটি মঙ্গলজনক ধ্বনি ও বাদ্য বলে বিবেচিত হয়। হিন্দুদের প্রায় শুভ অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজিয়ে অভিনন্দন জানান হয়। মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা শঙ্খ ধ্বনি শোনা যায়। শঙ্খ সামদ্রিক শামুকের খোলস দিয়ে তৈরি করা হয়। সব শঙ্খ বাদ্য উপযোগী হয় না। বিশেষ ও বিশিষ্ট আকারের শঙ্খ বাদ্য যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয়। কিশোরগঞ্জের মানব সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খ বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দুদের ঘরে ঘরে ও মন্দিরে শঙ্খ ব্যবহৃত হয়বেশি।

www.pathagar.com

৩০. ঘন্টা

ঘন্টা বাদ্য যন্ত্রটিও বেশ প্রাচীন। বিশেষ করে মন্দিরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কিশোরগঞ্জেও প্রাচীন কাল থেকে বাদ্য যন্ত্রটির ব্যবহারও প্রচলন রয়েছে। ঘন্টা কয়েক ধরনের ও প্রকারের রয়েছে। তবুও ঘন্টা বাদ্য বেশ পুরানো এবং এর ব্যবহার বা প্রচলন কিশোরগঞ্জে প্রাচীন। লাঠিখেলায় ঘন্টা বাজানোর প্রচলন রয়েছে। নৌকাবাইচে ভাটি কিশোরগঞ্জে ঘন্টা বাজানোর প্রচলন রয়েছে।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লোকউৎসব পালন করা হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো লোকউৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। নববর্ষ, বিজয় উৎসব, ঈদ উৎসব, দুর্গা উৎসব ইত্যাদি বাঙালির অন্যতম লোকউৎসব।

১. নববর্ষ

বাংলাদেশকে বলা হয় বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ। এ দেশের বাঙালি এক উৎসব প্রিয় জাতি। বাংলার বর্ষ তালিকায় প্রথম স্থান বৈশাখ মাস। এটিই বাঙালির নববর্ষ। ১লা বৈশাখ তাই বাঙালির নববর্ষ উৎসব। বাংলা নববর্ষ শুরু হয় ৯৬৩ হিজরির ২রা রবিউস-সানি রোজ শুক্রবার ইংরেজি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল থেকে।

এই উদ্যোগ তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট মহামতি আকবরের সময়ে দায়িত্ব অর্পিত হয় তার নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন রাজ-জ্যোতিষী আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর উপর। সে সময়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রথম মাস মুহররমের 'নওরোজ' উৎসবের মত সকল ভারতীয়দের হিন্দু মুসলিম বাঙালিসহ সৌরবর্ষের প্রথম মাস বৈশাখী উৎসব পালনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেন। এর পূর্বে বাংলা বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধার্য হয় অগ্রহায়ণ মাস। বাংলায় এককালে অগ্রহায়ণ মাসেই বছরের প্রথম নবান্ন হতো। মুর্শিদ কুলী খা যখন বাংলার শাসক তখন খাজনা আদায়ের জন্য ধার্য হয় বৈশাখ মাস। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে নববর্ষ উৎসব ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে জমিদার, তালুকদার, অভিজাত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীদের পুণ্যাহ, হালখাতা প্রভৃতি উৎসবকে কেন্দ্র করে।

সে সময়ে পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো ছাড়াও যাত্রা, বাউল, টপ্পা, মারফতি, মুর্শিদি প্রভৃতি গান বাজনার সাথে গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হতো। রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদারদের বাড়ির আঙিনা কিংবা কোনো নদীর তীরবর্তী বটবৃক্ষের নীচে বসত এসব মেলা। চিড়া, মুড়ি, মিষ্টিসহ নানান জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। গ্রাম বাংলায় বিসিকের এক জরিপ থেকে সারা বাংলাদেশে প্রায় দু'শ বৈশাখী নববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলার কথা জানা যায়। সরকার আমাদের বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষকে জাতীয় জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে নববর্ষ জাতীয় দিবসের মর্যাদায় স্বীকৃতি পেয়েছে। আগের দিনে নববর্ষ বলতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতা নবায়ন করে আনন্দ উৎসব হতো সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে এবং শহরতলীতে। এক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে নববর্ষ যেন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। নববর্ষ এখনো গ্রাম বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের হালখাতায় মিষ্টি দ্রব্য পরিবেশন করে থাকে। নববর্ষ উৎসব উদযাপন গ্রাম থেকে শহরমুখী হতে শুরু করেছে। বাংলা নববর্ষ পালনে বাঙালি এক গৌরব দীপ্তি জাতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

২. অষ্টগ্রামের চৌদ্দমাদল উৎসব

হাওর অঞ্চলের অষ্টগ্রাম উপজেলার বাঙালপাড়ায় প্রতিবছর মাঘ মাসে উদযাপিত হয় সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী চৌদ্দমাদল উৎসব ও বর্ণাঢ্য গ্রামীণ মেলা। মেঘনার তীরে অবস্থিত বাঙ্গালপাড়া গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সুবৃহৎ এই উৎসব ৭০ বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে। যে কারণে দিনে দিনে চৌদ্দমাদল উৎসব হাওরের সর্বস্তরের মানুষের প্রধান বাৎসরিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। চৌদ্দমাদল হচ্ছে ১৪টি মৃদুল বা খোল নামক বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলন। উৎসবে আসা কীর্তনীয়া দলসমূহ ১৪টি খোল ও ১৪ জোড়া কর্তাল বাজিয়ে এক সঙ্গে কীর্তন পরিবেশন করে।

এ উৎসব কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট এডভোকেট বিমল চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে জানা যায়, বাঙ্গালপাড়ার চারজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপে চৌদ্দমাদল উৎসবে অংশ নেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ১৩৭৭ সালের ৪ঠা মাঘ বাঙ্গালপাড়ায় চৌদ্দমাদল উৎসবের গোড়াপত্তন করেন। মাঘের প্রথম দিন উদ্বোধনের পর টানা তিনদিন চলে পাঠ ও অধিবাস কীর্তন। দুদিন শ্রীমতভগবত গীতা পাঠের পর অনুষ্ঠিত হয় অধিবাস কীর্তন। ৪ঠা মাঘ উদযাপিত হয় উৎসবের মূল অনুষ্ঠান। এ দিন সকাল থেকে রাত অবধি পূজা, ভোগ, নগর কীর্তন, হরিলুট ও আরতী অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাঙ্গালপাড়ার ৪টি স্থায়ী সম্প্রদায় প্রায় প্রতিবছর নগর কীর্তনে অংশ নেয়। এগুলো হচ্ছে নাথ হাটির গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়, ওসমানপুরের অদ্বৈত সম্প্রদায়, মনোহরপুরের শ্রীনিবাস সম্প্রদায় ও হরিদাস সম্প্রদায়। ১৪টি খোল ও ১৪ জোড়ার কর্তাল সমেত চারটি কীর্তনীয় দলের লীলা কীর্তন পরিবেশনের সময় ধর্মপ্রাণ ভক্তদের আকুল করা কান্নায় চৌদ্দমাদল উৎসবে ভিন্নরূপ ধারণ করে। ৫ই মাঘ দিন রাত একনাম কীর্তনে হাজার হাজার ভক্ত অংশ নেন। ৬ই মাঘ অগণিত মানুষের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৭ই মাঘ চৌদ্দমাদল উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। স্থানীয় চারটি দল ছাড়াও অন্যান্য স্থান থেকেও কীর্তনীয় দল উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে।

অন্যদিকে উৎসব প্রাঙ্গণ জুড়ে বসে বর্ণাঢ্য গ্রামীণ মেলা। ১০ই মাঘ পর্যন্ত এ মেলা অব্যাহত থাকে। মেলায় প্রচুর বিক্রি হতে দেখা যায় কাঠের যাবতীয় ফার্নিচার, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা, মিষ্টান্ন দ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অসংখ্য রকমের দ্রব্যাদি; যেমন প্রাচীন নকশি পালঙ্ক, খাট, সোফা, ড্রেসিং টেবিল, শোকেস, কৃষি উপকরণ- লাঙ্গল, জোয়াল, খন্তে, কান্তে, কোদাল; মিষ্টান্নদ্রব্য, কদমা, তিলা, বাতাসা, বিন্নি ও ভ্যাটের খই; শিশুদের বিভিন্ন রকম খেলনা যেমন- মাটির পুতুল, ক্ষুদে গিন্নিদের ঠুলি-মুচি, বাঁশের বাঁশি, কাঠের ঘোড়া, কাগজের কুমির, রং বেরঙের বেলুন, গ্রামের কিশোরীদের সস্তা প্রসাধনী লাল-নীল ফিতা, পুথিঁর মালা, কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি সহস্র আইটেম। চৌদ্দমাদল উৎসব ও মেলার পর্ব এলে কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার হাওরের ১০/১২টি থানায় সাজ রব পড়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েরা বাপের বাড়ি নাইয়র আসে। ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক বানানো হয়। বাড়ি বাড়ি পিঠা-পুলি তৈরি হয়। মেলা করতে বাচ্চা-কাচ্চারা বছরব্যাপী জমানো খুচরো পয়সার মাটির ব্যাংক ভাঙে। একদা এই মেলায় সার্কাস, পুতুল নাচ, যাত্রা পালার দল এসে এগুলো প্রদর্শন করত। বসত নাগরদোলা। নিরাপত্তাহীনতা সহ নানাবিধ প্রতিকূলতায় তাদের মেলায় আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও হাওরবাসীর বিনোদনহীন একঘেয়ে জীবনে চৌদ্দমাদল উৎসব ও মেলা সার্বজনীন আনন্দোউৎসব হিসেবে ফিরে ফিসে আসে।

www.pathagar.com

৩. ঈদ উৎসব

ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা মুসলমানদের দু'টি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। ঈদুল ফেতরে রমজান মাস মুসলমানদের জন্য সংযম, সাধনা, ত্যাগ ও কঠোর ঈমানি পরীক্ষার বাণী বহন করে আনে। ঈদ-আনন্দ-খুশির সাথে উৎসব অর্থযোজন ঘটেছে। নবি হযরত মুহম্মদ (স.) মুসলমানদের জন্য ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা উৎসব প্রবর্তন করেন। তবে ইসলামের নবি মুসলমানদের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে মহান আল্লাহ তায়ালা কঠিন পরীক্ষার জন্য তার প্রিয় পুত্র ঈসমাইলকে কুরবানি দেওয়ার আদেশ পালন থেকে ঈদুল আজহায় কুরবানি পদ্ধতি চালু হয়েছে।

ইসলামে ঈদ মুসলমানদের মধ্যে এক মহামিলন। আমিরের সঙ্গে ফকিরের মিলন, শত্রুর সঙ্গে শত্রুর মিলন, মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মিলন, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মিলন, পিতার সঙ্গে পুত্রের মিলন, মাতার সঙ্গে কন্যার মিলন, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মিলন, ধনীর সঙ্গে ভিখারীর মিলন, বৃদ্ধের সঙ্গে শিশু-যুবক-যুবতীর মিলন সে এক মহামিলন কাহিনি। ঈদুল ফিতরের পূর্বে দীর্ঘ একমাস রোজা পালন করতে হয়। এই রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল মহান আল্লাহ তায়ালার ঐশী বাণী কুরআন শরিফ। এই মাসের লাইলাতুল কদর রজনিতে পৃথিবীতে প্রথম নাজেল হয়েছিল পবিত্র কুরআন। মুসলমানগণ ঈদুল ফিতরে সেমাই, সিরনি, মিষ্টিদ্রব্য খাবার খেয়ে ঈদগাহ্ মাঠে নামাজ পড়তে যায়। ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করার পর সাধ্য অনুযায়ী মুসলমানগণ গরু, ছাগল, দুম্বা, ভেড়া, উট, মহিষ ইত্যাদি কুরবানি দিয়ে থাকে। ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা এই দুটি ঈদের নামাজ শেষে ছোট-বড় সবাই বুকে বুকে কোলাকুলি করে ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মত্যাগের এক নির্দশন সৃষ্টি করে। কিশোরগঞ্জ শহরস্ত পূর্বপ্রান্তের বিস্তীর্ণ এলাকার নাম শোলাকিয়া। এই শোলাকিয়ার প্রধান আকর্ষণ সারা বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদগাহ্ মাঠ এবং ঈদের জামাত। এই ঈদগাহে ঈদুল ফিতর এর যে জামাত হয়ে থাকে, তা বাংলাদেশের শুধু নয় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জামাত।

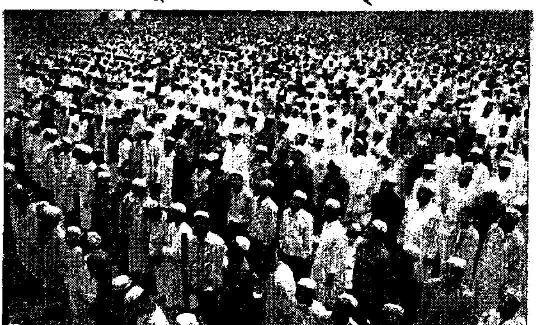

শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ

প্রমাণ রয়েছে এখানে এককালে সোয়া লাখ মুসল্লি এক সাথে নামাজ আদায় থেকে এই ঈদগাহের নামকরণ করা হয়েছিল সোয়ালাখিয়া থেকে শোলাকিয়া। ঈদুল ফিতর ও

www.pathagar.com

ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে শোলাকিয়া ঈদগাহ্ মাঠের পাশে এক বিরাট লোকমেলা অনুষ্টিত হয়। বানানো হয় হাতে তৈরি সেমাই, চাউলের রুটি ও পিঠা। এছাড়া মিষ্টি কুমড়ার মোরব্বা। নতুন জামা কাপড় পড়ে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ানো হলো শিশু-কিশোরদের ঈদের আনন্দ। বড়দের কাছ থেকে এক থেকে একশত টাকা সালামি নেওয়া সে আরেক বিচিত্র প্রথা চালু রয়েছে কিশোরগঞ্জে। ঈদ আসলে এককালে কাঁসা, পিতলের বাসন ছিল এরপরে আসে চীনা মাটির বাসন কোসন এগুলো ব্যবহার করা হতো। ঈদ উৎসব শেষ হলে আবার পরের ঈদের জন্য তুলে রাখা হয়। এভাবেই এক ঈদ উৎসব থেকে আরেক ঈদ উৎসব পর্যন্ত চলে আনন্দের অপেক্ষা।

৪. দুর্গা উৎসব

বাঙালি হিন্দু সমাজে যতগুলো পূজা পার্বণ আছে তার মধ্যে দুর্গাপূজা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। দুর্গাপূজা শরৎকালে হয়ে থাকে এজন্য এ পূজাকে শারদীয় পূজা বলা হয়ে থাকে। সাধারণত আশ্বিন মাসেই এ পূজা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় কার্তিক মাসেও এ পূজা হয়। বসন্ত ঋতুতে যে দুর্গাপূজা হয় তাকে বাসন্তী পূজা বলে। শরৎকালের কার্তিক মাসে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের গ্রামাঞ্চলে এ পূজা উৎসব খুব আনন্দের সাথে উপভোগ্য হয়। বিশেষ করে হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের লোক এ পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করে। পল্লির গ্রাম বাংলা তখন পূজার আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কিশোরগঞ্জের ১৩টি থানার প্রায় প্রতিটি গ্রামাঞ্চলের পূজামণ্ডপে দুর্গাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাদেবীর মূর্তির সামনে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের মুর্তি সাজানো হয়। দুর্গাদেবী সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে এ পূজা শুরু হয়ে দশমীতে শেষ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এ তিনদিনের পূজাই প্রধান। ষষ্ঠী তিথিতে দুর্গাদেবীর বোধন ও দশমী তিথিতে দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয়। এ কয়দিন পূজা বাড়িতে নানাবিধ ফলমূলসহ মিষ্টি সন্দেশ ইত্যাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ তিনদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষ হিন্দু-মুসলিম পূজা বাড়ি বাড়িতে বহু সমাগম হয়। আড়ম্বর করে খিচুরি খাওয়ানো হয়। সাধারণত ধনী শ্রেণির হিন্দুরা এই পূজা তারা একাই করে থাকেন। বর্তমান যুগে সমাজের সকল শ্রেণির হিন্দু সদস্যগণ সম্মিলিত চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে দুর্গাপূজা করে থাকেন। আজকাল ধনী-দরিদ্র সকলে মিলে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন আখড়া মন্দিরে সার্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করেন এবং সকলে পূজায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করেন। পূজায় পাঠা বলী দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। দুর্গা পূজার সময় স্কুল-কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। প্রবাসী আত্মীয় স্বজন দেশ-বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে দুর্গাপূজায় বাড়িতে এসে দেবীর আরাধনার সাথে আনন্দ উপভোগ করেন। এ উৎসবে হিন্দু সমাজে ছেলে-মেয়ে-স্বামী-স্ত্রী-মা-বাবা সকলেই সাধ্য অনুযায়ী নতুন জামা কাপড় পরিধান করে আনন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠে। দশমীর দিন দুর্গা দেবীর জন্য সকলেই কান্নাকাটি আর প্রার্থনা করে বিসর্জনের পর কোলাকুলি করে। যারা ছোট তারা বয়সে বড় পূজনীয়দের নিকট থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে এই আশীর্বাদকে বিজয়ার আশীর্বাদ বলে। দুর্গাপূজায় ঢাক ঢোলের বাদ্য বাজনায় এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। দুর্গাপূজার

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির বিভিন্ন মালসি গানসহ রামায়ণ গানেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোর ছাড়াও সকল শ্রেণির সদস্যদের মাঝে আনন্দের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। তিনদিন ব্যাপী ব্যাপক সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শঙ্খধ্বনি ছাড়াও ঘণ্টাধ্বনি ও উলুধ্বনি পরিবেশকে আরও গুরুগম্ভীর করে তোলে। বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ।

৫. গোপীনাথের রথযাত্রা

শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগোপীনাথ। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় ভোগবেতাল গ্রামে অবস্থিত ঈশা খাঁ ও রাজা নবরঙ্গের ঐতিহাসিক হিন্দুধর্মীয় তীর্থস্থান শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দির জেলার অন্যতম প্রত্নসম্পদ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামন্ত রাজা নবরঙ্গ রায় এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কোটামন দিঘি ও বাউলসাগর নামের নদীতীর থেকে কৃষ্ণ বর্ণের দুটি নিম কাঠের খণ্ড দিয়ে গোপীনাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি তৈরি করে মন্দিরে স্থাপন করেন। এর সংস্কার করেন ঈশা খাঁ। এই জায়গাটির নাম ভোগবেতাল। এখানে প্রতিবছর রথযাত্রা, বার্ষিক উৎসব, দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, ঝুলনযাত্রা, বাসন্তীপূজাসহ নিত্য পূজা-পার্বণ হয়ে আসছে। গোপীনাথ মন্দিরে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান রথযাত্রা।

১৫৮৫ সালে সামন্ত রাজা নবরঙ্গ রায় এই মন্দিরে প্রথম শুরু করেন এই রথযাত্রা। প্রাচীন বাংলার সর্ববৃহৎ রথযাত্রা ছিল গোপীনাথের রথযাত্রা। এককালে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এর স্থায়ীত্ব ছিল ১৫ দিনব্যাপী মেলা। ভাটি এলাকা ও হাওরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসত নৌকা ও বজরার বহর। জড়ো হতো বাউলসাগর নদীতে। এককালে ১০৫ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন ৩২ চাকার রথ স্থানীয় জমিদারদের পোষা হাতি দিয়ে গোপীনাথ মন্দির থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ বিশাল সড়কপথ দিয়ে ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যায় গুণ্ডিচাবাড়িতে (শ্বশুরবাড়ি)। আবার আট দিন পর ফিরে আসে নিজ বাড়িতে। রথ ছিল তিনটি- একটি পিতলের, অন্য দুটি কাঠের তৈরি। আজও বাংলাদেশের মধ্যে এটিই দূরপাল্লার রথযাত্রা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির ২৫ একর ৮ শতাংশ জমি রয়েছে। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে রথটি ঝড়ে পতিত হলে এর সংস্কার করা হয়। ৩২ চাকার রথটি কালক্রমে ২৪ ও ১৬ চাকা হয়ে বর্তমানে ৯ চাকায় এসে ঠেকেছে। বর্তমানে রথ অতীত কারুকার্যের কিছু স্মৃতি বহন করছে। আজ পর্যন্ত প্রতিবছরই রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ওই মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির পাখির হাট বসে। যে কেউ নানা ধরনের পাখি দেখার জন্য এখানে চলে আসতে পারেন। রথ উপলক্ষ্যে পাঁচ গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। তাঁরা তাঁদের মেয়েজামাইসহ কুটুম্বদের দাওয়াত করে থাকেন। এটা এই এলাকার একটি পার্বণ। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হিন্দুদের মধ্যে দুটি সংস্কার প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস, এদিন কলাগাছ রোপণ করলে তাতে বেশি কলা ধরে এবং দিনের পূর্বভাগে মেঘ ডাকলে অগ্রিম বর্ষা আর পরভাগে ডাকলে বর্ষার আগমন বিলম্বিত হয়।

www.pathagar.com

৬. বেড়া ভাসান উৎসব

নদীমাতৃক এই দেশে পানির বা জলের দেবতা ও দেবী হিসেবে খোয়াজ-খিজির আর মা গঙ্গা লোকসমাজে পূজিত হন। তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন জানিয়ে কোনো কোনো স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই উৎসবটি পালন করে থাকে।

এই উৎসবে, হাওর-নদী-বিল-পুকুরে খোয়াজ-খিঁজিরের আর গঙ্গাদেবীর প্রতি মনোষ্কামনা জানিয়ে কলার তৈরি ভেলা দিয়ে 'বেড়া' তৈরি করে নানা উপচারসহ যোগে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জলদেবতার বা জলদেবীর পাশাপাশি স্ব স্ব সমাজের পির-ফকিরের নামে 'বেড়া' উৎসর্গ করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

লোকমেলা

কিশোরগঞ্জ জেলার নানা স্থানে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় খেলাধুলা, নাচগান, অভিনয় এবং বিভিন্ন পণ্য কেনাবেচা হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত লোকমেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. চিলপূজা বনাম বৈশাখী মেলা

আজকের প্রজন্ম জানে না চিলপূজা কী? অথচ গোটা পঞ্চাশ বছর আগে চিলপূজাই ছিল এতদ অঞ্চলের বৈশাখী মেলা। যুগের পরিবর্তনে শুধু নামেরই পরিবর্তন হয় না। হয় সমাজ জীবন, সৃষ্টি, কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠানেরও পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের হাওয়ায় হারিয়ে গেছে বহু যুগ যুগান্তরের পরিচিত নাম 'চিলপূজা'। এখন চিলপূজার পরিবর্তে- সকলের কাছে পরিচিত বৈশাখী মেলা। কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার গাগলাইল, পাকুন্দিয়া থানার চিলাকাড়া ও পূড়াবাড়িয়া গ্রামে তখনকার বৈশাখী মেলার নাম ছিল 'চিলপূজা'। প্রবীণ তাদের কাছে চিলপূজাই ছিল সারা বছরের কেনাকাটা, আনন্দ উৎসবের একটি মাধ্যম।

এ মেলার প্রধান আকর্ষণ যা একদিন এতৎ অঞ্চলে চিলপূজা নামে পরিচিত ছিল। সারা বছরের একটি মাত্র লৌকিক উৎসব এই চিলপূজার গুরুত্ব ছিল বর্ণনাতীত। প্রত্যন্ত গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ সারাটি বছর ধরে উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন গুনত সে দিনটির জন্য। সার বছরের কেনাকাটার জন্য যে নির্দিষ্ট দিনটি ছিল যেমন আকাঙ্খিত, তেমনি ছিল নুতন পরিবেশে নুতনত্বের আঙ্গিকে পরিপুষ্ট। যাতে গ্রামের আপামর জনতা পরম আনন্দে বরণ করত। চিলপূজা নামের সে মেলাটিকে। যদিও চিলপূজা শব্দটি হারিয়ে আজ বৈশাখী মেলা নামে পরিচিত, তবু এর দিনক্ষণ এখনো আগের মতই আছে। তবে সেদিনের মত আজ আর এ মেলার তেমন কদর নেই। সেদিনের মত বাধভাঙ্গা জলের মত মানুষ আর এখন তেমন আগ্রহ উদ্দিপনা নিয়ে মেলায় যায় না। এখনকার মেলা অনেকটা নীরবে আসে, নীরবে চলে যায়। কিন্তু সেদিনের চিলপূজা গরবে সরবে আসত, সরবে চলে যেত। সেই প্রথম প্রভাব থেকেই সেদিনের চিলপূজার আগমন বার্তা চতুর্দিকের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠত। আজ তার ভাটা পড়েছে।

এ মেলায় বাঁশ, কাঠ, বেতের জিনিসপত্র মাটির হাড়িপাতিল, বাঘ ভাল্লুক, হাতিঘোড়া, গাছ-গাছালী, গেরস্থালীর, সরঞ্জাম বিক্রি হতো। চিলপূজার উটতি বয়সের কিশোরদের আকর্ষণ ছিল ঘুড়ি। মেয়েদের জন্য ছিল নানা রকম রকমারী, চুড়ি নথ, দুল আলতা, ফিতা, আরও অনেক প্রসাধনি। নানা রকম বাঁশিতে বিচিত্র ছন্দ দোলায়ত হয়ে উঠতো গ্রাম গ্রামান্তর। কাগজের ফুল, ভেপু এসবের ছিল ছড়াছড়ি চরক গাছ, ঘোড়া দৌড়, আতশবাজী, হাডুডুডু, গোল্লাছুট, যাদুখেলা, ছিল চিলপূজার আকর্ষণ। ছিল নানারকম মিষ্টি মিটাই জিলাপী, সন্দেশ, মোঘলাই, চিড়ামুড়ি, কত কিছুই না ছিল।

www.pathagar.com

বৈশাখী মেলা

আজ এসব জিনিষের ভাটা পড়েছে। যদিও নতুন জিনিস এসেছে নতুন পরিবেশে আজকের মেলায়, কিন্তু সেদিনের চিলপূজায় জীবন বাদ্যের সঙ্গে আজকের জীবন বাদ্য অনেকটাই ভিন্ন।

২. অষ্টমীস্নান ও মেলা

চৈত্র মাসের তিথি বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়। সাধারণত ১৫ চৈত্র থেকে ১/৩ দিন এ মেলা স্থায়ী হয়। এ উপলক্ষ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব হয় হোসেনপুরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে। তাছাড়া পাকুন্দিয়ার মঠখলা, ভৈরব, কটিয়াদী, বাজিতপুর, তাড়াইল, কুলিয়ারচর, অষ্টগ্রাম, ইটনা, নিকলী ও করিমগঞ্জেও উৎসব হয়। ইটনার সুভদ্রাপুরে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে বাসন্তী দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে একদিন স্থায়ী অনুষ্ঠিত হয় অষ্টমী স্নান মেলা। মেলায় দেবতার উদ্দেশে মহিষ, পাঠা বলি দেওয়া হয়। এছাড়া মৃৎশিল্পের দ্রব্য সামগ্রী বেচা-কেনা হয় এবং গরুর দৌড় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐদিন ধনু নদীতে হিন্দু ধর্মের লোকেরা স্নান করেন। হোসেনপুরের উল্লেখযোগ্য মেলা এই অষ্টমী মেলা। হিন্দু সম্প্রদায়ের অষ্টমী উপলক্ষ্যে একদিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মেলার বৈশিষ্ট্য হলো দূর-দূরান্ত থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এসে আদি ব্রহ্মপুত্রের নদে স্নান করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় বিভিন্ন খেলনা, পুতুল, মাটি, চিনামাটি ও কাসার বাসনপত্র, কাঠের আসবাবপত্র ও মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্যাদী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

৩. হোসেনপুরের অষ্টমী মেলা

সূর্য উঠার আগেই হাজারো মানুষের ভিড়ে কে আগে স্নান করবে এ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। স্নান করার সময় ভেলায় ভাসানো হয় পাঁঠা, কবুতর এবং অন্যান্য প্রাণী। ভাসানো প্রাণী গুলোকে যে আগে ধরতে পারবে সে হবে ঐটির মালিক। যে বেশি ধরতে পারে সে নিজেকে পুণ্যার্থী হিসেবে বিবেচিত করে। নর নারী সর্বস্তরের পুণ্যার্থী স্নানে অংশ নেয়। স্নান শেষে হোসেনপুরের সদর বাজারে আঠারবাড়ী কাচারি, কুলেশ্বর বাড়ি মন্দির, উপজেলা পরিষদ চত্বর, বাজারের বিভিন্ন খালি জায়গায়, রাস্তার পাশে বসে বিভিন্ন খেলনা, পুতুল, মাটি-চিনামাটি কাসার বাসন পত্র, কাঠের আসবাবপত্র ও মিষ্টান্ন জাতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হয়। উল্লেখ্য, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ মেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। অষ্টমীমেলা উপলক্ষ্যে এ এলাকায় আত্মীয় স্বজন বেড়াতে

www.pathagar.com

আসে। জামাইকে দেওয়া হয় অষ্টমী 'পার্বণ'। জামাই শালা-শালী এবং ছোটদের দিয়ে থাকে 'পারবী'। মেলা হতে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বছরের পারিবারিক প্রয়োজনীয় রসুন, পেঁয়াজ, ডাল, গরম মসলা, মরিচ ইত্যাদি এককালীন ক্রয় করে থাকে। অষ্টমী মেলা উপলক্ষ্যে হোসেনপুরে থাকে সাজ সাজ রব। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারায়ণডহর বাজার, রামপুর বাজার, চরপুমদী বাজারে। দিনব্যাপী উল্লিখিত বাজারে অষ্টমী মেলা বসে। মেলা উপলক্ষ্যে যাত্রা, পালাগান, সার্কাস দেখানো হয়। চড়ক গাছে উঠে ছেলে মেয়েরা দিনভর আনন্দে মেতে উঠে।

৪. রথযাত্রা ও রথমেলা

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় রথের মেলা। কিশোরগঞ্জ শহরের রথখলায় প্রতিবছর ২১শে আষাঢ় থেকে ৭ দিন ব্যাপী এ মেলা বসে। মেলায় মহিলাদের অলংকার, মাটি ও কাসার তৈরি জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন, শিশুদের খেলনা প্রভৃতি পাওয়া যায়। এ রথমেলা তাড়াইল, বাজিতপুর, ইটনা, নিকলী ও কটিয়াদীর আচমিতায় হয়ে থাকে।

জগন্নাথ মূর্তি, নিকলী

৫. নিকলীর রথমেলা

এছাড়াও নিকলী উপজেলা সদরে রথযাত্রা মেলা একটি আষাঢ় মাসে আয়োজিত অন্যতম প্রধান সনাতন ধর্মীয় লোকমেলা উৎসব। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। নিকলী উপজেলা সদরে এ রথযাত্রা উৎসব মেলা প্রাচীন কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কাঠ দ্বারা নির্মিত বড় ধরনের একটি রথ রয়েছে নিকলী যা কটিয়াদী ভোগবেতাল নির্মিত প্রাচীন রথের স্থান নিকলী রথের মেলা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শ্রী কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব পালন হয়ে থাকে। নিকলী একটি কাঠে তৈরি জগন্নাথের মূর্তি রয়েছে। অনুরূপ আরও একটি মূর্তির সন্ধান রয়েছে কটিয়াদী ভোগবেতাল রথ যাত্রার উৎসবে। আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠান শুরু করে শুক্লা একাদশীর দিন পুণ্যযাত্রা বা উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠান নিকলীতে খুবই জাকজমকভাবে হয়ে থাকে। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জে রথযাত্রা, রথখলা

www.pathagar.com

মাঠ রথখলা রোড, রথখলা স্থানের নাম ইত্যাদি সব কিছুই স্থানীয় ভূ-স্বামী বিরাজ মোহন রায় মহাশয়ের বাড়ির স্মৃতি কীর্তি ও পূজা পার্বনের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে এখারে রথের যাবতীয় উৎসব পালন করে থাকে। কিশোরগঞ্জে রথখলা একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল যার নামেই পরিচিতর স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

৬. মেলাবাজার

সপ্তদশ শতকে বর্তমান কিশোরগঞ্জ পৌর সভাধীন বত্রিশ থেকে শুরু করে প্রামাণিক বাড়ির দক্ষিণাংশের আমলীতলা পর্যন্ত এলাকাটি মেলাবাজার নামে খ্যাত ও পরিচিত। দোলপূর্ণিমার ঝুলন উপলক্ষ্যে এ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো বলে এটিকে স্থানীয়ভাবে ঝুলন মেলাও বলে। তবে স্থানটির নাম 'মেলাবাজার' নামেই পরিচিত। বত্রিশ প্রাচীন প্রামাণিক পরিবারের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের সময়ে 'একুশ রত্ন' মন্দির নির্মাণ ও রাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকল্পে পুত্র ব্রজ কিশোর মতান্তরে নন্দ কিশোর প্রামাণিক যে বিপুল লোকউৎসবের আয়োজন করেছিলেন তা থেকেই বত্রিশ প্রামাণিক পরিবারের আয়োজনে অতীতকালে এ মেলাটি শ্রাবণের ঝুলনমেলা থেকে শুরু করে এক নাগারে কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমা দিন পর্যন্ত প্রায় চার মাস কাল এ মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। সমগ্র জেলায় কিংবা সমগ্র বাংলাদেশে তখন এত দীর্ঘ ৪ মাস ব্যাপী একাধারে কোন মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস আমাদের জানা নেই। এই মেলা উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পাশাপাশি দোকান পাট বসত। এ মেলাটিই এককালে হয়ে উঠে ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জের লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রধান বিপনন কেন্দ্র। অধুনা এ মেলার জৌলুশ স্তিমিত হয়ে পড়ছে।

৭. কুড়িখাই মেলা

কুড়িখাইয়ের মেলা প্রায় চারশ' বছরের পুরনো। প্রতিবছর বসে এই মেলা। বাংলাদেশে এত পুরনো মেলা রয়েছে কিনা সন্দেহ। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার কুড়িখাই গ্রামে প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ সোমবার থেকে এই মেলা শুরু হয়, চলে দশ দিন। হযরত শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার বার্ষিক উরস উপলক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে দেশ–দেশান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ উরস ও মেলায় অংশ নেয়। এ সময় কুড়িখাই গ্রামসহ আশপাশের প্রায় কুড়ি মাইল এলাকার গ্রাম-গ্রামান্তর হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ঐ সময় কর্মরত লোকজন ফিরে আসে গ্রামের বাড়ি। দূর-দূরান্ত থেকে আসে আত্মীয়স্বজন। দূর অঞ্চলে বিয়ে হওয়া এলাকার মেয়েরা বাবার বাড়িতে মেলা উপলক্ষ্যে 'নাইওরে' আসে। শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার মাজার শরীফকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় একর এলাকা জুড়ে বসে বহু দোকান। মৃৎশিল্প থেকে শুরু করে পোশাকআশাক, আসবাবপত্র, খেলনা, তৈজসপত্র, বিলাসসামগ্রী, হেন জিনিস নেই- যা কুড়িখাইয়ের মেলায় মেলে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেলা শুরুর সপ্তাহকাল আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা দোকান বরাদ্দ নিয়ে পণ্যসহ মেলায় আসতে শুরু করে। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও আজমীর শরীফ থেকে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ভক্ত এবং আশেকানগণ উরস ও মেলায় অংশ নিতে আসেন।

www.pathagar.com

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, বুখারা থেকে আগত কামেল শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়া মোগল আমলে এই এলাকায় এসে তাঁর আস্তানা গাড়েন এবং সুফিবাদ প্রচার করেন। সম্রাট আকবরের সময় এই আস্তানার আশপাশ এলাকা 'লাখেরাজ' ঘোষণা করা হয়। জনশ্রুতি হচ্ছে, তদানীন্তন সময়ে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ভক্ত বুখারার এক সুলতান 'কুড়ি খাঁ' এ অঞ্চলে আসেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর নাম কুড়ি খাঁ থেকে কুড়িখাই নামের উৎপত্তি। হিজরী ১০০৩ সালে শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার ইন্তেকালের পূর্বাহ্নে তাঁর তিন সাগরেদ শাহ কবীর, শাহ নসীর ও শাহ কলন্দর খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং ফার্সি ভাষায় শাহ শামছুদ্দীন তাঁদেরকে স্বহস্তে অসিয়তনামা লিখে দিয়ে যান। লিপিটি এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। এর বাংলা অনুবাদ থেকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। শাহ শামছুদ্দীন আউলিয়ার অসিয়ত প্রাপ্ত সাগরেদ শাহ কবীর, শাহ নসীর ও শাহ কলন্দরের অধঃস্তন বংশধরগণই পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত মাজার শরিফের মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হয়ে আসছেন এবং মূলগতভাবে উরস ও মেলা পরিচালনা করছেন। এই আউলিয়ার মাজার, উরস মোবারক ও মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কিংবদন্তি এবং সংস্কার প্রচলিত রয়েছে।

৮. ঝুলন মেলা

কিশোরগঞ্জ পৌরসভাধীন বত্রিশ থেকে শুরু করে প্রামাণিক বাড়ির দক্ষিণাংশের আমলীতলা পর্যন্ত এলাকাটি মেলাবাজার বা ঝুলন বাজার নামে খ্যাত। প্রামাণিক পরিবারের কীর্তি "একুশ রত্ন" ও তাদের আরাধ্য দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপনকালে নন্দকিশোর প্রামাণিক পক্ষকালব্যাপী আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জমিদারদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কথিত আছে, জমিদারদের আগমন উপলক্ষ্যে শহরের বড় বাজার মাছ মহাল সংলগ্ন নরসুন্দা নদী থেকে সূতি নদী পর্যন্ত একটি খাল কাটা হয়। সে থেকে এ খালটি কাটাখাল হিসেবে পরিচিত। এ উৎসবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ নর-নারীর সমাগম হয়েছিল। নর-নারীর এ বিপুল সমাগম "একুশ রত্ন" ও প্রামাণিক পরিবার দোল ও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর এলাকাটিতে বিরাটি দু'টি মেলার আয়োজন করতেন। পরবর্তীকালে এ দু'টি মেলাই শ্রাবণের দোল পূর্ণিমা থেকে কার্তিকের রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত একটি স্থায়ী মেলায় রূপ নেয়। সেকালে এ মেলাটি ক্রমান্বয়ে দেশি-বিদেশি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এই এলাকা ছাড়িয়েও সিলেট, কলকাতা, মোম্বাই, দিল্লীর ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব এলাকার পণ্যসামগ্রী নিয়ে এ মেলায় উপস্থিত হতেন এবং ফেরার পথে স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ও রপ্তানী পণ্য হিসেবে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন। নরসুন্দা নদীতে ও কাটাখালের উভয় তীরে শতসহস্র নৌকা সারিবদ্ধভাবে ভিড়ানো থাকত। এই সমাবেশ এতই জমজমাই ছিল যে, এক নৌকা থেকে আর এক নৌকার মাঝে কোন জায়গা থাকত না। মেলাটি এই এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী একটি বিরাট অঞ্চলে লোকশিল্প ও কারুপণ্যের প্রধান বিপণন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তী সময়ে প্রামাণিক বাড়ির জৌলুষ কমে গেলে এই মেলার জমজমাট অবস্থাও কমে আসে। তথাপি মেলাটি অতীত গৌরবের ধারা রক্ষা করে এখনো নিয়মিত বসে থাকে। প্রতি বছর বাংলা ১৪ শ্রাবণ শুরু হয়ে ৭ দিন মেলাটি স্থায়ী হয়। মেলায় মাটি, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি সামগ্রী ছাড়াও প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

www.pathagar.com

৯. পোড়াবাড়ীয়া মেলা

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ও জমজমাট মেলার নাম পোড়াবাড়ীয়া মেলা। পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের পোড়াবাড়ীয়া নামক স্থানে এ মেলার আয়োজন করা হয় বলে এ মেলাটি 'পোড়াবাড়ীয়া মেলা' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়ে তিনদিন এ মেলা চলে। পোড়াবাড়ীয়া গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টার ৮৩ বছর বয়স্ক মো. আব্দুল মজিদ জানান, তিনি তার দাদার নিকট থেকে জেনেছেন, এলাকার পাল বংশের লোকজন ছিল পূজা উপলক্ষ্যে এ মেলার গোড়াপত্তন করেন। বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে এ মেলা উদযাপিত হয়। শত বছরের এক হিন্দু মহিলা জানান, এক সময় কাপড় বয়নকারী তাঁতি ও বসাক বাড়ির মেয়েরা বৈশাখে ঘরে ঘরে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত পালন করত। হয়ত এ ব্রত উপলক্ষ্যে এক সময় গ্রামে গ্রামে উৎসবের আমেজে নারীপুরুষের ঢল নামত। আর সে গ্রামের পুরনো বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে যেত হরেক রকমের সামগ্রীর মেলা। ব্রত কথা বলে অন্য আর দশটি ব্রত কথার মত এর উদ্যোগ আয়োজনে থাকবেন একজন ব্রতিনী। তিনি মূল অনুষ্ঠানের আগের রাত থেকেই বিশেষ নীতি-নিষ্ঠা ও সংযমের মধ্য দিয়ে ব্রতের উপকরণ যেমন- লাটাই, চরকী, সুতা, আলপনা আঁকার আতপ চালের গুঁড়ি, খৈ-মুড়ি-মুড়কি-চিড়ে-বাতাসা ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখবেন। পরদিন সকালে উপবাস থেকে স্নান করে নিকানো উঠানো আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে একটি আলপনা আঁকবেন। আলপনা চিত্রে ঘর-গেরস্থালির প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের চিত্রতো আঁকবেনই, এর পাশে বড় করে আঁকবেন একটি চিল পাখি। এবার পড়ন্ত বিকেলে ব্রতিনী আলপনার সামনে নিজ ব্যবহৃত চড়কী– লাটাই সুতা নিয়ে বসে পূর্বে সংগৃহীত নৈবেদ্য আলপনার পাশে সাজিয়ে রেখে সমবেত বিভিন্ন বয়সী নারী, শিশু-কিশোরের সামনে একটি কাহিনি শুনাবেন। কাহিনি শেষ হলে ব্রতের নৈবেদ্য উপস্থিত সবার মাঝে বিতরণ করে ব্রতী তার ব্রত শেষ করবেন। এই ব্রতের নাম চিল ব্রত।

অতীতে মেলা উপলক্ষ্যে ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, সার্কাস, কবিগান, যাত্রাপালা, ঘুড়ি উড়ানো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি হতো। মেলায় প্রচুর কাঠের সামগ্রী পাওয়া যায়। মেলা কমিটির সদস্য সিরাজুল ইসলাম ভূঞা জানান, জায়গার অভাব, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে মেলার আকর্ষণ দিন দিন কমে আসছে।

১০. চরপলাশ মেলা

রইছ উদ্দিন ফকিরের বার্ষিক ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়। পাকুন্দিয়া উপজেলার চরপলাশ এলাকায় প্রতি বছর পৌষ মাসের শেষ শুক্রবার থেকে শুরু হয়ে তিন থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী এ মেলা চলে। এ মেলার ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। জানা যায়, প্রায় ৭০/৮০ বছর পূর্বে এ এলাকায় রইছ উদ্দিন ফকির নামে এক কামেল ব্যক্তি ছিলেন। তার বাড়ির সামনে রয়েছে একটি পুকুর। কথিত আছে, রইছ উদ্দিন ফকিরের ফুঁক দেওয়া এই পুকুরের পানি করলে যে কোন রোগ বালাই ভাল হয়ে যেত। এ বিশ্বাস থেকেই প্রতিদিন উক্ত এলাকাসহ দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ তার বাড়িতে ভিড় করত। তারা পুকুরের পানি তুলে ফকিরের ফুক নিয়ে ফিরে যেত। এভাবে অসংখ্যবার ফুঁক দেয়ার ঝামেলা এড়াতে রইছ উদ্দিন ফকির পুকুরের পানি ফুঁক দিয়ে

www.pathagar.com

দেন। দেখা গেল অল্পদিনেই পুকুরের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে তার কথা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন এলাকায়। রইছ উদ্দিন ফকিরের মৃত্যুর পর তার শিষ্য সাগরেদরা এখানে মাজার তৈরি করে প্রতি বছর ওরসের আয়োজন করে। ওরস উপলক্ষ্যে এখানে বসে বিরাট মেলা। মেলায় কাঠের তৈরি জিনিসপত্র, খেলনা, মাটি ও বাঁশ বেতের সামগ্রী প্রভৃতি বেচা কেনা হয়। অনেকেই মানত করতেও তার দরগায় আসেন।

১১. বারুণী পূজা মেলা

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে করিমগঞ্জ, তাড়াইল, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, নিকলী, ইটনা, মিঠামইন, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, সরারচর, বাজিতপুর, ভৈরব ও অষ্টগ্রামে চৈত্রের তিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ১৫ই চৈত্র থেকে চারদিন ব্যাপী এ মেলা চলে। এ মেলা সম্পর্কে অনেক আচার অনুষ্ঠান ও কল্প কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুদের বহু দেবতার মধ্যে মেঘের দেবতা হলো বরুণ। এই বরুণ থেকেই বারুণী কথাটি এসেছে। চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদে যখন সর্বত্র হাহাকার করে তখন বরুণ দেবতার পূজা করা হয়। এ ব্যাপারে একটি কল্প কাহিনি শোনা যায়। কথিত আছে, কোন এক রাজ্যের রাজার দুই রানি ছিল। বড় রানি ছিল নিঃসন্তান। ছোট রানি সন্তান সম্ভবা হলে বড় বাণী কুমন্ত্রণা আটতে থাকে। আতুর ঘরে ছোট রানি সন্তান প্রসব করলে বড় রানি সন্তানের মাথায় এক ধরণের ঔষধ ছিটিয়ে দিলে সন্তানটি ব্যাঙে পরিণত হয়। এ অবস্থায় রাজা অগ্নিরূপ ধারণ করে ছোট রাণীকে বনবাস দেন। ছোট রানি কাঁদতে কাঁদতে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে আরেক রাজ্যে এসে উপস্থিত হন। এ রাজ্যে তখন অনাবৃষ্টিতে চারদিকে চলছিল হাহাকার। ফসলের মাঠ পুরে ছাই। রাজ্য জুড়ে নেমে এল দুর্ভিক্ষ। এ অবস্থায় রাজা ঘোষণা দিলেন, যে মেঘ নামাতে পারবে তার কাছ রাজার সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে দেবেন। অনেকেই বৃথাই চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এমন সময় ব্যাঙ এসে রাজ দরবারে ঘোষণা দিল যে বৃষ্টি নামিয়ে দেবে। রাজা সভাসদের সামনে ঘোষণা দিলেন যে, বৃষ্টি নামাতে পারলে রাজা তার কন্যাকে বিয়ে দেবেন। বৃষ্টির আরাধনা করে ব্যাঙ অবশেষে বৃষ্টি নামিয়ে দিল।

রাজ্য জুড়ে এল অনাবিল সুখ আনন্দ। শর্ত অনুযায়ী রাজা ব্যাঙের কাছেই কন্যাকে বিয়ে দিলেন। এদিকে ব্যাঙের কাছে বিয়ে হওয়ায় রাজ কন্যার চোখে নেমে এল অঝোর ধারার পানি। সে কি কান্না! বাসর ঘরে রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে যেই না চোখের পানি ব্যাঙের মাথায় পড়ল, তখন ব্যাঙ রূপ নিল এক সুদর্শন রাজ কুমারে। রাজকনার আনন্দ আর ধরে না। রাজা পরদিন ব্যাঙ রাজার জন্য উৎসবের আয়োজন করলেন। এ উৎসবে ব্যাঙ রাজার পিতাও এলেন। পরিচয় পর্বে সকলের মিলন হলো। ব্যাঙ রাজার পিতার ছোট রাণীকে সসম্মানে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বড় রাণীকে শাস্তি দিলেন। এ কল্প কাহিনির মত এখনো গ্রামে গঞ্জে ব্যাঙের বিয়ের প্রচলন চলে আসছে। গ্রামের মেয়েরা এ সময়ে ব্যাঙের গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আর মেঘ প্রার্থনা করে :

“ব্যাঙাজির বে
সোনার মুকুট দে
কি-রে ব্যাঙা
মেঘ দেস না কে।

www.pathagar.com

আবার "আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লা মেঘ দে।"

চৈত্রের এ সময়টিতে গ্রাম গঞ্জে অনেক মেলা বসে। এসব মেলায় পুতুল নাচ, গান ছাড়াও মাটি, বাঁশ, বেত ও কাঠের আসবাবপত্র, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১২. অষ্টগ্রামের মহররম মেলা

হাওর বেষ্টিত ঐতিহাসিক জনপদ অষ্টগ্রামের মহররম অনুষ্ঠানটি চরিত্রগতভাবে লোকজীবন ভিত্তিক বলে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রতি বছর ১লা মহররম থেকে ১২ই মহররম পর্যন্ত অষ্টগ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপকভাবে যেসব আচার অনুষ্ঠান ও শোক পালন করা হয় তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত মহররম অনুষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। অনুষ্ঠানটি যদিও শিয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথাপি যারা অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত তারা সবাই সুন্নী মুসলমান। তাছাড়া স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নর-নারীও এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অষ্টগ্রামের দেওয়ান বাড়ি যা আঞ্চলিক উচ্চারণে 'হাবেলী বাড়ি' নামে খ্যাত তাকে কেন্দ্র করেই মহররম অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়।

জানা যায়, জমিদার বাড়ির শেষ জমিদার চান বিবির কোন পুত্র সন্তান না থাকায় নকোষা জমিদারির উত্তরাধিকারী একমাত্র কন্যা জিন্নত চানবিবিকে তৎকালীন সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার সুলতানসির বিখ্যাত নাসির উদ্দিন সিপাহশালার বংশের জনৈক সৈয়দজাদার সাথে বিবাহ দিয়ে জামাতাকে অষ্টগ্রাম নিয়ে আসেন। এই জিন্নত চানবিবির গর্ভে সৈয়দ আব্দুল করিম (আলাই মিয়া), সৈয়দ আব্দুল রহিম (মলাই মিয়া) ও সৈয়দ আব্দুল আজিম (জলাই মিয়া) এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ আব্দুল করিম ওরফে আলাই মিয়ার সময়েই (১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) অষ্টগ্রামের নকোষা জমিদারিটি বাকি খাজনার দায়ে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। এ সময়েই জমিদারি বাজেয়াপ্ত হওয়া ও অন্যান্য কারণে আলাই মিয়া সংসার বিবাগী হয়ে ঐশ্বরিক ধ্যানে মগ্ন হন এবং সাধক পুরুষ হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সাধক পুরুষ আলাই মিয়া অষ্টগ্রামে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে মহররম পালনের সূচনা করেন এবং জমিদার বাড়ির আঙ্গিনায় একটি 'ইমামবাড়ি' তৈরি করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ইমামবাড়ির পাশেই সর্বদা অবস্থান করতেন এবং সাধনায় মগ্ন থাকতেন। মৃত্যুর পর ইমামবাড়ির পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর কবর স্থানটির উপর একটি সুদৃশ্য দালান তৈরি করে মাজারে রূপান্তরিত করা হয়। তখন থেকে পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির বা অংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানই মাজার দেখাশুনা এবং প্রতিবছর অষ্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সমগ্র মহররম অনুষ্ঠান পরিচালনার উত্তরাধিকারী বা পির নির্বাচিত হন। চাঁদ দেখার পূর্ব রাত থেকেই ইমামবাড়িটিকে রং বেরঙের কাগজ ও কাপড়ের ছোট বড় অসংখ্য পতাকায় সজ্জিত করা হয়। একই সাথে সজ্জিত করা হয় আলাই মিয়ার সমাধিকেও। চাঁদ দেখার পরদিন থেকে আশুরার পূর্বদিন পর্যন্ত সারা অষ্টগ্রামে চলে জারিগান, সিরনি তৈরি ও বিতরণ, দরগায় 'তাবুত' তৈরি, বাড়ি বাড়ি 'তাজিয়া' তৈরি আর বাদ্য বাজনা সহযোগে মাতম জারি পরিবেশন।

www.pathagar.com

অপরদিকে পাল ও মালাকার সম্প্রদায় মানতের ফরমায়েসি মাটির ঘোড়া ও কাগজের বোরাক ইত্যাদি তৈরিতে ব্যস্ত থাকে। এভাবে ৯ই মহররম পর্যন্ত সমগ্র অষ্টগ্রামে চলতে থাকে প্রস্তুতি পর্ব ও মহররম অনুষ্ঠান। তবে ১০ই মহররমই হয়ে থাকে মূল অনুষ্ঠানটি। 'তাজিয়া' হচ্ছে ইমাম-হোসেনের মাজারের অনুকৃতি। 'বোরাক' অর্ধনারী ও অর্ধনারী ঘোড়া বিশিষ্ট পৌরাণিক জীব। 'দুলদুল' ইমাম হোসেনের প্রিয় বাহন ঘোড়ার নাম। 'তাবুত' হচ্ছে বাঁশ, বেত, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শবধার বহন করার খাটিয়া বিশেষ। অষ্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই একটি করে মহররমের স্থায়ী দরগা দেখা যায়। দরগাগুলো সাধারণত উঁচু স্থানে আরও মাটি ভরাট করে অনেকটা বেদীর মতো তৈরি করা হয়। অষ্টগ্রামের পূর্ব প্রান্তে উঁচু একটি মাঠ।

এ মাঠটিই কারবালা আঞ্চলিক উচ্চারণে 'করবালা' নামে পরিচিত। আশুরার রাত থেকে পরদিন রাত ৮টা পর্যন্ত অষ্টগ্রামের প্রতিটি দরগার সামনে চলে শোক ও মাতমজারি। প্রতিটি পরিবারেই তৈরি করা হয় মহররমের বিশেষ সিরনি। জারিয়াল দলগুলো বড় বড় দা, লাঠি, বল্লম, নেজা, তরবারী, বর্শা, ঢাল ও বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঢাক, ঢোল, কাঁসি, সাঁনাই ইত্যাদি বাদ্য বাজনা সহযোগে শোক ও মাতম জারি গাইতে গাইতে মহল্লা প্রদক্ষিণ করে। রাত ৮ টা থেকে মহল্লা প্রধানের নেতৃত্বে এ দলগুলো মিছিল সহকারে রওনা হয়ে যায় হাওলী বাড়ি। প্রতিটি দল ইমামবাড়ি ও মাজারটি একবার প্রদক্ষিণ করে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে জারি শুরু করে এবং সারারাত অনুষ্ঠান চলে। পরদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মহল্লায় মহল্লায় শোক, মাতম ও জারি গান হয়। দুপুরের পর থেকে শুরু হয় 'তাবুত' ও 'দুলদুল' মিছিল-লক্ষ্য 'কারবালা ময়দান'। সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে সকলে সেখানে জমায়েত হয় এবং রাত ৮ টা পর্যন্ত চলে তাবুত, দুলদুল, তাজিয়া উৎসর্গ ও মাতম জারিগান। ১০ই মহররমের পরে ১১ই মহররম সকাল ৯টা থেকে মহিলা জারিয়াল দল ও গ্রামের সাধারণ মহিলাদের সমাবেশে কারবালা ময়দানটি জমজমাট হয়ে ওঠে। ১২ই মহররমের সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে সম্মিলিত মাতম ও জারি।

অষ্টগ্রামের এ মেলায় বা মহররম উৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসে পণ্য সামগ্রী নিয়ে। মেলায় দা, বাঁশের লাঠি, কুটির শিল্প সামগ্রী, মাটির তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১৩. কাইমার বাউলী মেলা

কিশোরগঞ্জের একটি পুরনো মেলা হিসেবে পরিচিত কাইমার বাউলী মেলা। বাজিতপুর উপজেলার পূর্বাঞ্চলে হাওর এলাকায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাটি স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত। প্রায় চারশ বছর আগে থেকে এ মেলার প্রচলন বলে জানা গেছে। বর্তমানে কালীপূজা উপলক্ষ্যে ১লা পৌষ থেকে ৩দিন ব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় পুতুল নাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ছাড়াও আসবাবপত্র ও খেলনা সামগ্রী বিক্রয় হয়ে থাকে। জানা যায়, কোন এক সময় জেলেরা নদীতে কাটাল (মাছের আশ্রয়স্থল) ভাঙ্গার সময় এখানে মহিষ জবাই করত। মহিষের রক্ত নদীতে ছিটিয়ে দিত। যদি নদীতে কুমির থাকত তবে রক্ত খেতে আসত এবং

www.pathagar.com

জেলেরা সাবধান হত। কুমির না থাকলে জেলেরা সহজেই কাটাল ভেঙ্গে মাছ ধরত। এ উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক জেলে নর-নারী ও শিশু কিশোর আসত। কথিত আছে, জেলেদের এই সমাবেশ থেকেই কাইমার বাউলী মেলার উৎপত্তি।

১৪. গোসাই বাড়ি মেলা

করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রাম বর্তমানে 'গোসাই বাড়ি' নামে পরিচিত। শ্রী শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মোহন গোস্বামী এর নামে সি এস রেকর্ড হিসেবে জানা যায় যে, আগর শংকর দেবালয় নামে এক হিন্দু ধর্মালম্বী গোসাই এসে এখানে আস্তানা করে এবং একটি মন্দির ও কীর্তন ঘর বর্তমানে স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে বিরাজ করছে। ইংরেজ শাসনের বিলুপ্তির পর জমিদারি প্রথা আমলে দেবোত্তর সম্পত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ৫.৪৭ একর জায়গার খাজনা বিহীন ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে এর অস্তিত্ব মাত্র ০.৩০ একর ৩০ শতাংশ ভূমি গোসাই বাড়ি আখড়া হিসেবে দখল আছে এবং বর্তমান সেবায়ত শ্রী অখিল চন্দ্র গোসাই।

১৯১৯ সালে সি এস রেকর্ড হলেও গোসাই বাড়ি মেলাটি কখন থেকে শুরু হয় তার সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। রামনগর গ্রামের সুজিত কুমার সরকার নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের কাছ থেকে জানা যায় যে, রামনগর গ্রামে নরসিংহ ও হরিদাস চক্রবর্তী নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। তাদের পূর্ব পুরুষগণ গোসাই বাড়ি আখড়া হিসেবে জমি দানসহ আখড়াটি স্থাপন করলেও নরসিংহ ও হরিদাস চক্রবর্তী জমিদার গণের আমলেই মেলাটি পরিচিতি পায় বেশি। প্রায় ১৫০ বছর যাবৎ মেলাটি অনুষ্টিত হয় বলে আনুমানিক ধারণা। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে শুরু করে ৭ দিন যাবৎ মেলাটি বর্তমানেও অনুষ্টিত হয়।

রামনগর গোসাইবাড়ি মেলাটি এক সময় করিমগঞ্জ থানার ইতিহাস ঐতিহ্যে সাক্ষ্য বহনের ঐতিহ্যবাহী মেলা।

১৫. ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইয়ের আখড়া ও চান্দখালি মেলা

প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গোসাই নামে এক হিন্দু সাধু চান্দখালি গ্রামে বসবাস করতেন এবং মন্দিরটি তৈরি করেন বলে জানা যায়। তার ঈশ্বরিত ক্ষমতা ছিল বলে এখনও জনশ্রুতি রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গোসাই এর স্ত্রী অনেক দূর পথযাত্রা করে 'অষ্টমী স্নান' করবে কষ্ট সাধ্য বিষয় বিবেচনা করে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আখড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নরসুন্দা নদীকে আরও খরস্রোতা করে আখড়া সংলগ্ন নদীর পাশে স্ত্রীর অষ্টমী স্নান করার উপযোগী করে তুলেন। আর সেখানেই তার স্ত্রী অষ্টমী স্নান করে বলে জানা যায়। চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টমী স্নান হিন্দু রীতি-নীতির কারণে অষ্টমী স্নান অনুষ্ঠিত মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রচুর লোক সমাগম করতে গিয়ে এই চান্দকালি মেলার শুরু বা সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইর মৃত্যুর পর তার অনুসারীগণ একে একে মৃত্যু হলেও ন্যামতপুর বাজার সংলগ্ন ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইর আখড়া ও চান্দকালি মেলাটি প্রতি বছর যথা সময়ে ঐ দিনই অনুষ্ঠিত হতো। ঈশ্বরচন্দ্র গোসাইর মৃত্যুর পর দীর্ঘ ১২২ বছর যাবৎ মূল

www.pathagar.com

আখড়ায় মেলাটি অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় মেলাটি বাণিজ্যিক স্বার্থে ১৯৮২ সালে মূল স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে ন্যামতপুর বাজার সংলগ্ন ন্যামতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রতি বৎসর অনুষ্টিত হয়। প্রতি বুধবার হাটবার থাকায় দেখা যায় যে, মেলার নির্ধারিত তারিখ চৈত্রমাসের ত্রয়োদশী তিথিতে বুধবার হলে তারিখ পিছিয়ে পরের দিন মেলার আয়োজন অনুষ্টিত হয়।

মূল আখড়া ভবন ও পতিত ভূমিসহ মোট প্রায় ৪ একর জায়গা ১৯১২ সালে সেটেলমেন্ট রেকর্ড ভুক্ত হলেও আখড়াটি সরকারি বা বেসরকারিভাবে উদ্যোগের অভাবে ঐতিহাসিক স্থান ঈশ্বরচন্দ্র গোসাই এর আখড়া আজ বিলীন হওয়ার পথে।

মেলার সামগ্রী হিসেবে মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের খেলনা কাঠের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র, সকল প্রকার মেলার সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেলায় পাওয়া যায়। খাবার জাতীয় জিনিসের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিক্রয় করা হয় লাল ও সাদা জিলাপী, বিন্নি খই, লাল ও সাদা চিনির খেলনা মিষ্টি। শত শত মন জিলাপী, খেলনা মিষ্টি ও বিন্নি খই বিক্রয় হয়।

১৬. প্রাচীন মেলাসমূহের বিবরণ

১. **ঝুলন মেলা-** কিশোরগঞ্জ বত্রিশ এলাকায় শ্রাবন মাসের দোল পূর্ণিমায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২. **বেড়া ভাসান উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা-** কিশোরগঞ্জ শহরস্থ শোলাকিয়া পণ্ডিতবাড়ি প্রাঙ্গণে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. **অষ্টমী মেলা-** এ জেলার হোসেনপুরে এ মেলাটি বৃহৎ আকারে এবং আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া জেলার ইটনা উপজেলা এলাকার সুভদ্রাপুরে এ মেলাটি জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. **কাইমার বাউলী মেলা-** জেলার বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় ইউনিয়নে এ মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

৫. **ভাগলপুর দেওয়ান বাড়ির মেলা-** ফালগুনের প্রথম মঙ্গলবার থেকে এ মেলা ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

৬. **ভাগলপুর ইমাম বাড়ির মেলা-** এ মেলা ১লা মহররম ভাগলপুর ইমাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. **সরারচর কামালপুর মেলা-** এ মেলা শাহ নিধী সাহেবের ওরস উপলক্ষ্যে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম মঙ্গলবার হতে ৩দিন অনুষ্ঠিত হয়।

৮. **সরারচর ভান্ডার মেলা-** ইসমাইল ফকিরের ওরস উপলক্ষ্যে ফালগুনের প্রথম সোমবার থেকে ৩দিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯. **আলীয়াবাদ শীতলা পুজার মেলা-** বাজিতপুর সদর পৌরসভা এলাকায় ফালগুন মাসের শেষ অষ্টমী দিনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০. **দিঘির পাড়ে মেলা-** কালীপূজা উপলক্ষ্যে এ মেলা বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় এলাকায় বিলিপাড়ায় ফালগুন মাসের অমাবস্যার দিন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১১. **হিলচিয়া মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার হিলচিয়া ভশনাথের মেলা অনষ্ঠিত হয়। মাঘ মাসের শেষ শুক্রবার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১২. **দিলালপুর মেলা-** বাজিতপুর এলাকার দিলালপুর উদারিয়া কান্দিতে ১লা বৈশাখ এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আম্বর টিলা এলাকায় দোলপূজা উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. **বাজিতপুর মেলা-** এ মেলা বাজিতপুর সদর উপজেলা অঞ্চলে বারনী পূজা উপলক্ষ্যে বারনী নামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. **সরারচর মেলা-** এ মেলাটিও বারনী পূজা উপলক্ষ্যে বাজিতপুর উপজেলায় সরারচরে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. **ভোগবেতাল মেলা-** অষ্টঘরিয়ায় মাঘমাসের প্রথম মঙ্গলবার থেকে ৭দিন ব্যাপী এ মেলা কটিয়াদী ভোগবেতাল গোপীনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. **বেতাল মেলা-** ফালগুন মাসের ১২ তারিখ হতে ৩দিন ব্যাপী এ মেলা বান্নী মেলা নামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. **চারিপাড়া মেলা-** কটিয়াদী উপজেলার চারিপাড়া নামক গ্রামে চৈত্র মাসের ১ম মঙ্গলবার দিন থেকে ২দিন ব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮. **দাসের গাঁও মেলা-** চৈত্র মাসের ১৭ তারিখ থেকে ২দিন ব্যাপী শীতলী পূজা উপলক্ষ্যে এ মেলা কটিয়াদীর দাসের গাঁও অনুষ্ঠিত হয়।

১৯. **বেথইর মেলা-** মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার দিন কটিয়াদীর বেথইর নামক স্থানে এ মেলা ২দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

২০. **কুড়িখাই মেলা-** মাঘ মাসের শেষ মঙ্গলবার থেকে প্রায় ১৫দিন ব্যাপী স্থায়ী এ মেলা শুধু কটিয়াদীর কুড়িখাই এলাকায় নয় সমগ্র জেলার একটি বিখ্যাত মেলা। এটি কুড়িখাই হযরত শাহ সামছুদ্দিন আউলিয়ার মাজার কেন্দ্রিক ওরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

২১. **হালুয়া পাড়ার মেলা-** পহেলা পৌষে এ মেলা কটিয়াদীর হালুয়া পাড়া এলাকায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২২. **মণ্ডল ভোগ মেলা-** কটিয়াদীর মন্ডলভোগ নামক এলাকায় পহেলা চৈত্র এ মেলা রহমান পাগলার ওরসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

২৩. **ছোরত আলীর মেলা-** মন্ডল ভোগ এলাকায় পহেলা চৈত্র এ মেলা মাজার কেন্দ্রিক ওরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

২৪. **মসুয়া মেলা-** কটিয়াদী মসুয়া নামক স্থানে এ মেলা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

২৫. **কটিয়াদী অষ্টমী মেলা-** কটিয়াদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬. **হোসেনপুর অষ্টমী মেলা-** এ মেলা কিশোরগঞ্জ জেলার একটি বিখ্যাত মেলা। এটি অষ্টমী উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহনে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

২৭. **তাড়াইল অষ্টমী মেলা-** এ মেলা অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৮. **পোড়া বাড়িয়া মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার পোড়াবাড়িয়া নামক স্থানে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯. **বন্দীগাই মেলা-** এ মেলা পাচল গোটায় হাজী রহমত উল্লাহ'র ওরস উপলক্ষ্যে পাকুন্দিয়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে প্রায় ৫/৭ দিন ব্যাপী হয়ে থাকে।

৩০. **চরপলাশ মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার চর পলাশ নামক এলাকায় এ মেলা পৌষ মাসের শেষ শুক্রবার হতে ৩দিন ব্যাপী খাজা বাবা রহিম উদ্দিনের ওরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৩১. **মঠখলার মেলা-** এ মেলা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৩২. **মজিদপুর মেলা -** এগারসিন্দুর মজিদপুর এলাকায় বাবাজী বংশীদাস চুড়ামনির আশ্রমে ২৬শে শ্রাবণ হতে ২৮শে শ্রাবণ পর্যন্ত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৩. **কোদালিয়ার মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার কোদালিয়া নামক এলাকায় এ মেলা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৩৪. **হর্ষি মেলা-** একই উপজেলার হর্ষি নামক স্থানে এ মেলা চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

৩৫. **পাকুন্দিয়া মেলা-** পহেলা বৈশাখে এ মেলা উপজেলা সদর পাকুন্দিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

৩৬. **নিকলী নৌকা বাইচ মেলা-** এ মেলা নিকলী নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে পহেলা ভাদ্রে অনুষ্ঠিত হয় নিকলী উপজেলা সদরে। এটি ঐতিহ্যবাহী একটি লোকমেলা।

৩৭. **সাইটধার মেলা-** নিকলী উপজেলা সাইটধার নামক স্থানে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ মাসের ৪/৫ দিন পর্যন্ত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি নিকলী পজেলার একটি প্রাচীন মেলা।

৩৮. **নিকলী অষ্টমী মেলা-** যুধিষ্ঠির দেবনাথ বাবুর কালীবাড়ি সোয়াইজনী নদীঘাটে অষ্টমী উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩৯. **নিকলী শীতলী মেলা-** শীতলী পূজা উপলক্ষ্যে নিকলী সদরে চৈত্র মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৪০. **দরগাহ্ বাড়ির মেলা-** নিকলী পূর্বগ্রাম জনৈক হাজী সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী চলে এটি একটি বিখ্যাত মেলা।

৪১. **মজলিশপুর ফকির ভিটার মেলা-** নিকলী উপজেলার কারপাশা ইউনিয়নের মজলিশপুর বাজার সংলগ্ন ফকির ভিটা নামক স্থানে মাহমুদ চান ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে এ মেলা ২/৩ দনি ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিরবার মেলাটি শুরু হয়। এটি একটি বিখ্যাত মেলা।

www.pathagar.com

৪২. **গুরুই মেলা-** নিকলী উপজেলার গুরুই নামক স্থানে প্রাচীন মসজিদ সংলগ্ন হযরত শাহ কামাল সাহেবের ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলা মাঘ মাসের শেষ বুধবার অনুষ্ঠিত হয়।

৪৩. **আদুরীনাথ গোসাইর বাড়ির মেলা-** এ মেলা নিকলী সাইটধার এলাকার মধ্যযুগীয় সাধক আদুরীনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোল পূর্নিমা তিথীতে অনুষ্ঠিত হয়।

৪৪. **চন্দ্রনাথ গোসাইর আখড়ার মেলা-** এ মেলা অত্যন্ত প্রাচীন মেলা। এটি নাথ ধর্মাবলম্বী সাধক চন্দ্র নাথ গোঁসাইর আখড়ায় দোল পূজা উপলক্ষ্যে ঝুলন মেলা নামে অনুষ্ঠিত হয়।

৪৫. **জারুই তলার মেলা-** নিকলী উপজেলার জারুই তলা ইউনিয়ন সদরে শীতলী পূজা উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৬. **সিংপুরের মেলা-** নিকলী উপজেলা সদর থেকে সিংপুর ইউনিয়নের ঘোড়াউত্রা নদীর তীরে এ মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

৪৭. **ঘোড়াদিখার মেলা-** এটি নিকলী উপজেলার সিংপুর ইউনিয়নের ঘোড়াদিখা নামক স্থানে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের গঙ্গা পুজা উপলক্ষ্যে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন অনুষ্ঠিত হয়। এটি কৈবর্ত সম্প্রদায়ের একটি বিখ্যাত মেলা বর্তমানে সিংপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮. **কুলিয়ারচর মেলা-** এখানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সদর এলাকা গ্রামে।

৪৯. **সালুয়ার মেলা-** কুলিয়ারচর উপজেলার সাসুয়া নামক গ্রামের পাশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫০. **চরকামালপুর মেলা-** এটি এ উপজেলার সাসুয়া ইউনিয়নে একটি প্রাচীন মাজারকে কেন্দ্র করে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।

৫১. **ফরিদপুর মেলা-** কুলিয়ারচর উপজেলার ফরিদপুর নামক গ্রামে প্রখ্যাত পিরে কামেল হযরত মওলানা আবু আলী আক্তার উদ্দিন শাহ কলন্দর গাউস পাক (র) এর মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে ওরস মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভাষায় এ মেলাকে 'কান্দুলিয়ার' পির সাহেবের মেলা বলা হয়। এছাড়াও এ উপজেলার রামদী, ছয়সুতী, উসমানপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫২. **ভৈরব মেলা-** ভৈরব উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত বৈশাখী মেলা। এ মেলা উপলক্ষ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হালখাতা নবায়নে যে উৎসব হয় তা এ জেলার আর কোথাও এরূপ জাঁকজমক হয় না। এটি এ জেলার বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের খালখাতা নবায়নের মেলাও বটে।

৫৩. **কালিকা প্রাসাদ মেলা-** ভৈরব উপজেলার কালিকা প্রাসাদে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

৫৪. **মানিকদী মেলা-** এটিও ভৈরব উপজেলার মানিকদী নামক গ্রামে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৫৫. **অষ্টগ্রাম মেলা-** অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৬. **বাঙ্গালপাড়া মেলা-** বাঙ্গালপাড়া অষ্টগ্রাম উপজেলার একটি বিখ্যাত গ্রাম। এ গ্রামে অন্যান্য মেলার মত চৌদ্দমাদল উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিখ্যাত মেলা। মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে ৭দিন ব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৭. **অষ্টগ্রাম মহররম মেলা-** পবিত্র মহররমের আশুরা উপলক্ষ্যে অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে একটি বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলা প্রথম মহররম থেকে ১২ মহররম পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

৫৮. **কাস্তল মেলা-** অষ্টগ্রাম উপজেলার কাস্তল নামক গ্রামে বৈশাখ মাসের ১ম দিন বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৯. **মিঠামইন মেলা-** কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬০. **ঘাগড়ার মেলা-** মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া একটি বিখ্যাত গ্রাম। এ গ্রামে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬১. **দিল্লীর আখড়ার মেলা-** মিঠামইন উপজেলার কাটখাল ইউনিয়নে এ জেলায় একটি বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। এ মন্দিরটি 'দিল্লীর আখড়া' নামে খ্যাত ও পরিচিত। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬২. **পাটধা কুড়ের পাড় মেলা-** কিশোরগঞ্জ উপজেলা সদর এলাকায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাটধা কুড়ের পাড় এলাকায় পৌষ মাসের শেষ দিন পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৩. **বৌলাই মেলা-** কিশোরগঞ্জ উপজেলার বৌলাই ইউনিয়নে পৌষ মাসে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৪. **গাগলাইল মেলা-** কিশোরগঞ্জ উপজেলার দানাপাটুলী ইউনিয়নের গাগলাইল নামক স্থানে চৈত্র মাসের শেষ দিনে বারনী পুজা নামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৫. **করিমগঞ্জ মেলা-** করিমগঞ্জ উপজেলা সদরে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৬. **জঙ্গলবাড়ি মেলা-** করিমগঞ্জ উপজেলার একটি বিখ্যাত গ্রামের নাম জঙ্গলবাড়ি। এখানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৭. **গোজাদিয়া মেলা-** করিমগঞ্জ উপজেলার গোজাদিয়া ইউনিয়নে রয়েছে বিখ্যাত নাগর নাথ গোসাইর আখড়া। এ আখড়াকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৬৮. **নেয়ামতপুর মেলা-** নেয়ামতপুর করিমগঞ্জ উপজেলার একটি বিখ্যাত অঞ্চল। এ গ্রামে রয়েছে একটি প্রাচীন আখড়া ও মন্দির। এ আখড়া ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

৬৯. **মরিচখালীর মেলা-** করিমগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী একটি বাজার কেন্দ্র মরিচখালী এলাকা। এ এলাকায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭০. **চিলাকারার মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার চিলাকারা নামক এলাকায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাকে স্থানীয় ভাষায় চিল পুজা উপলক্ষ্যে কেউ কেউ চিলপুজার মেলা বলে।

৭১. **মনিপুর ঘাট মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মনিপুর ঘাট নামক এলাকায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭২. **বৌলাই পির সাহেব বাড়ির মেলা-** কিশোরগঞ্জ উপজেলার বৌলাই নামক স্থানের এক জনৈক পির সাহেব বাড়িতে তার ওরস উপলক্ষ্যে ১৩ই জৈষ্ঠ্য থেকে ১৫ই জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৩. **মজিদপুর মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার মজিদপুর নামক স্থানে বাংলা ৭ই শ্রাবণ থেকে ২ দিন ব্যাপী এক মাজারকে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওরস উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৪. **আশুতিয়া মির্জাপুরী ফকিরের মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার আশুতিয়া নামক গ্রামে ১৮ কার্তিক এ মেলা ওরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৭৫. **ছয়নার মেলা-** কিশোরগঞ্জ উপজেলার ছয়না নামক এলাকায় পীতাম্বর সাধুর ওরস উপলক্ষ্যে ১০ই মাঘ এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৬. **কামালপুর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার কামালপুর নামক এলাকায় মাঘ মাসের শেষ ৭ দিন ব্যাপী এ মেলা ওরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

৭৭. **ভাগলপুর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুর ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার দিন ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৮. **মাঝির কোণা মেলা-** করিমগঞ্জ উপজেলার মাঝির কোনা নামক গ্রামে চৈত্র মাসের ৩ তারিখ থেকে ৩ দিন ব্যাপী এক ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৭৯. **পাটা বুকার মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার পাটা বুকা নামক গ্রামে মা দেওয়ানীর মাজারকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের শেষ রবিবার এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮০. **চৌদ্দশত মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার চৌদ্দশত নামক গ্রামে পিরে কামেল সুফি সাধক আলেক শাহ এর মাজারকে কেন্দ্র করে মহররম মাসের ২২ তারিখ ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮১. **দামপাড়া মেলা-** নিকলী উপজেলার দামপাড়া নামক গ্রামে পিরে কামেল হযরত গুন জালাল ইয়ামেনী সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে অগ্রহায়ন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ওরস উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮২. **জাওয়ার মেলা-** তাড়াইল উপজেলার জাওয়ার নামক গ্রামে সুফি সাধক সৈয়দ আবদুল্লাহ সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

৮৩. **অষ্টগ্রাম কুতুবশা'র মেলা-** অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরে হযরত কুতুব শাহ'র মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৪. **সেকান্দর নগর মেলা-** তাড়াইল উপজেলার সেকান্দর নগর নামে ঐতিহ্যবাহী গ্রামে পিরে কামেল আচালত ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে এখানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৫. **কালুমার মেলা-** একই উপজেলার কালুমা নামক গ্রামে পিরে কামেল নবী ফকির এর মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৬. **এগারসিন্দুর মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী এগারসিন্দুর নামক গ্রামে পিরে কামেল নিরগিন শাহ এর মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৭. **শাহ গরীবউল্লাহ'র মেলা-** একই উপজেলার এগারসিন্দুর গ্রামে পিরে কামেল শাহগরীবুল্লা'র মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৮. **জইনউদ্দিন শাহ'র মেলা-** ইটনা উপজেলা সদর গ্রামে পিরে কামেল হযরত জইনুউদ্দিন শাহ'র মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৮৯. **দিলালপুর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর নামক গ্রামে পিরে কামেল সৈয়দ মোহাম্মদ মোগল মিয়া সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯০. **আগরপুর মেলা-** কুলিয়ারচর উপজেলার আগরপুর নামক গ্রামে পিরে কামেল আবদুর রহমান সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯১. **মামুদপুর মেলা-** কটিয়াদী উপজেলার মামুদপুর নামক গ্রামে পিরে কামেল হযরত জাকির শাহ' র মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯২. **শোলাকিয়ার মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার শোলাকিয়া নামক ঐতিহাসিক ঈদগাহ্ মাঠের সংলগ্ন পিরে কামেল হযরত শাহ মুন্নু গৌউস রাজ সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৩. **তারাপাশা মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার তারাপাশা নামক এলাকায় পিরে কামেল আবদুল হেকিম মস্তান সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৪. **কাজলা মেলা-** তাড়াইল উপজেলার কাজলা নামক গ্রামে পিরে কামেল মানিক শাহ সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৫. **হারুয়া মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার হারুয়া নামক এলাকায় পিরে কামেল মানিক ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

৯৬. **পাহাড় খাঁর মেলা-** নিকলী উপজেলার মজলিশপুর নামক গ্রামে পাহাড় খাঁ নামক এক সাধক পুরুষের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৭. **কাতিয়ারচর মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কাতিয়ারচর নামক গ্রামে পিরে কামেল হযরত নিজাম উদ্দিন শাহ এর মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৮. **আলাইমিয়ার মেলা-** অষ্টগ্রাম উপজেলার সদর অঞ্চলে পিরে কামেল সৈয়দ আবদুল করিম আলাইমিয়া সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৯৯. **বড়হাটি মজলিশপুর মেলা-** নিকলী উপজেলার বড়হাটি মজলিশপুর নামক গ্রামে পিরে কামেল খলীল ফকিরের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০০. **ফকির ভিটার মেলা-** একই উপজেলায় মজলিশপুর ফকির ভিটা নামক গ্রামে পিরে কামেল শফর আলী ফকির সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে তার ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০১. **বনগ্রাম মেলা-** কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম নামক এলাকায় শ্রী শ্রী শিব শীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে ১৭ চৈত্র পূজা উপলক্ষ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও বনগ্রাম বটতলায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে লোক মেলা বসে।

১০২. **চান্দুপুর চুনের মেলা-** কটিয়াদী উপজেলার চান্দুপুর এলাকার প্রখ্যাত অলি হযরত মিয়া চান্দ শাহ এর মাজারকে স্থানীয় লোকজন চুনের মাজার বলে। এই চুনের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৩. **কটিয়াদী মন্দির মেলা-** কটিয়াদী লক্ষ্মী নারায়ণ জিওর মন্দির প্রাঙ্গনে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার দিন থেকে দীর্ঘ ৭দিন ব্যাপী ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি লোক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৪. **কটিয়াদী ঢাকের মেলা-** কটিয়াদী উপজেলা সদরে বাজার সংলগ্ন একটি স্থানে বাদ্যযন্ত্র ঢাক এর একটি হাট উপলক্ষ্যে লোক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে দূর্গা পূজা উপলক্ষ্যে এ মেলা প্রাচীন কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১০৫. **কটিয়াদী পশ্চিম পাড়ার মেলা-** কটিয়াদী পৌর এলাকার পশ্চিম পাড়ায় রয়েছে শ্রী শ্রী মহামায়া দেবালয়। দেবালয়ের পাশে রয়েছে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। এর নিচে পহেলা বৈশাখ মহামায়া পূজা, বলিদানসহ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৬. **হোসেন্দী মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের হোসেন্দী নামক স্থানে ঐতিহাসিক হোসেন শাহ নামক দরগাকে কেন্দ্র করে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১০৭. **পাটুয়াভাঙ্গা মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার পাটুয়া ভাঙ্গা ইউনিয়েনের বন্দিগাহ নামক স্থানে শাহ সূফী হাজী শামসুদ্দীন শাহের মাজারকে কেন্দ্র করে এখানে ওরস উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৮. **মলং শাহের মেলা-** পাকুন্দিয়া উপজেলার পাকুন্দিয়া ইউনিয়ান সদরে প্রখ্যাত পিরে কামেল ঐতিহাসিক মলং শাহের মাজারকে কেন্দ্র করে ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১০৯. **সরারচর মাদার দরগাহর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার সরারচর মাদার দরগাহে ওরস উপলক্ষ্যে এক লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১০. **দিলালপুর মোয়াজ্জেম শাহর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর নামক গ্রামে আধ্যাত্মিক পিরে কামেল সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন শাহর ওরস উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১১. **দিঘিরপাড় ঋষিপাড়ার মেলা-** বাজিতপুর দিঘিরপাড় এলাকার একটি গ্রামের নাম ঋষি পাড়া। এই ঋষিপড়ায় কালীপূজা উপলক্ষ্যে এক বিরাট লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১২. **উজানচর মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার উজান চর এলাকায় পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১৩. **খাগটিয়ার মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার খাগটিয়া নামক এলাকায় পাগল শংকর আখড়ায় রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাটি এককালে একটি বিখ্যাত লোক মেলা ছিল। একই স্থানে অষ্টমী তিথিতেও লোক মেলা বসে।

১১৪. **বলিয়াদী মেলা-** বাজিতপুর উপজেলার বলিয়াদী নামক এলাকায় কালী পূজা উপলক্ষ্যে ১লা পৌষ থেকে ৩ দিন ব্যাপী এক লোক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় কাঠের মাটির বাঁশ বেতের সকল প্রকার জিনিস পত্রসহ খেলনা ও মিষ্টিদ্রব্য কেনা বেচা হয়।

১১৫. **পুরাতণ কোর্ট প্রাঙ্গন মেলা-** কিশোরগঞ্জ জেলা সদর পুরাতণ কোর্ট প্রাঙ্গন এলাকায় প্রতি বছর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাঙ্গালি সংস্কৃতির পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় সকল প্রকার জিনিস পত্রের দোকান ছাড়াও লোক গান বাউল গান কবি গান ছাড়াও মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা কাব্যের গীতিনাট্য ও নৃত্যানুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

১১৬. **অষ্টমী মেলা-** সূর্য উঠার আগেই হাজারো মানুষের ভিড়ে কে আগে স্নান করবে এ নিয়ে প্রতিযোগীতা চলে। স্নান করার সময় ভেলায় ভাসানো হয় পাঁঠা, কবুতর এবং অন্যান্য প্রাণী। ভাসানো প্রাণী গুলোকে যে আগে ধরতে পারবে সে হবে ঐটির মালিক। যে বেশি ধরতে পারে সে নিজেকে পুণ্যার্থী হিসেবে বিবেচিত করে। নর নারী সর্বস্তরের পুণ্যার্থী স্নানে অংশ নেয়। স্নান শেষে হোসেনপুরের সদর বাজারে আঠারবাড়ী কাচারি, কুলেশ্বর বাড়ি মন্দির প্রভৃতি স্থানে রাত্রিযাপন করে।

www.pathagar.com

১১৭. **মালিকের দরগাহ্ মেলা-** মিঠামইন উপজেলার কাগড়া নামক স্থানে মালিকের দরগাহ্ উরস উপলক্ষ্যে লোক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১৮. **নারায়ন ডহর বাজার মেলা-** হোসেনপুর নারায়ন ডহর বাজারে লোক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১১৯. **বেরুয়াইল বান্নিমেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর বেরুয়াইল এলাকায় বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

১২০. **চিলাদারা মেলা-** কিশোরগঞ্জ সদর চিলাকারা এলাকায় বিরাট আকারে বৈশাখী মেলা হয়।

১২১. **নাগরদাসের মেলা-** কার্তিক মাসের দোল উৎসব উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ উপজেলায় এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

লোকাচার

মানুষের দৈব বিশ্বাস ও বৈষয়িক মঙ্গলচিন্তা থেকেই লোকায়ত সমাজে নানাবিধ আচার ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। এসব লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ধ্যানধারণাকে আশ্রয় করে নানা প্রথা-পার্বণ আচার-উৎসব গড়ে উঠেছে। মূলত লোকাচারগুলি এদেশের মানুষের আজন্মলব্ধ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলার কয়েকটি লোকাচারের পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১. খৎনা বা মুসলমানি

খাতনা বা খৎনা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজের আর একটা উৎসবমুখর অনুষ্ঠান। শিশ্নাগ্রের চর্মকর্তন করার মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে একরকম বাধ্যতামূলকভাবেই করতে হয়। তাই এই খাতনা বা খৎনা অনুষ্ঠান 'সুন্নত' নামে পরিচিত। সেকালে মুসলমানেরা শিশুর বয়স সাত বছর কালে এই অনুষ্ঠান পালন বা সম্পন্ন করা হতো। বর্তমানে বয়সের কোনো পার্থক্য নেই ১ (এক) থেকে যেকোন বয়সের শিশুর খৎনা করা হয়ে থাকে। গ্রামে খৎনা এত বড় অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে যে, তাতে লাঠিখেলার আয়োজন ছাড়া মাইক বাজিয়ে গান পরিবেশন করে গরু ও খাসি রান্না করে খাবারের আয়োজন করা হয়ে থাকে, আত্মীয় স্বজন শিশুকে উপঢৌকন দিয়ে থাকে। খৎনা মুসলিম সমাজে একটা উৎসবমুখর অনুষ্ঠান।

২. আকিকা

আকিকা মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে নবজাত শিশুর নামকরণের প্রথা প্রচলিত আছে। নামকরণে কুরআন-হাদিস দেখে আলেম-মুন্সি-মওলানার চয়েজ গ্রহণ করতে হয়। নিজেদের চয়েজ পালন করতে শিশুর নাম নির্বাচনের সময় 'ফালনামা' দেখে তা থেকে নাম রাখার প্রচলন রয়েছে। মূলত আকিকা শব্দের অর্থ নবজাতকের কেশ কর্তন অনুষ্ঠান। এতে ক্ষৌরকর্ম অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর নামকরণ অর্থে আকিকা শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আকিকা অনুষ্ঠানে মুসলিম রীতিনীতি অনুসারে শিশুর নামকরণের স্মৃতি রক্ষার্থে শিশুপুত্রের ক্ষেত্রে দুটো এবং কন্যার ক্ষেত্রে একটি গরু অথবা ছাগল জবেহ্ করা হয়। জবাই করা মাংস নিজেরা না খেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। বর্তমান যুগে আকিকার মাংস তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা রেখে দুই ভাগ বিতরণ করার প্রচলন শুরু হয়েছে। আকিকা মুসলিম সমাজে শিশুপুত্র বা কন্যার প্রতি প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই আদায় করার বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাই আকিকা মুসলিম সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব মুখর অনুষ্ঠান। যা সবাই পালন করে থাকে।

www.pathagar.com

৩. অন্নপ্রাশন

হিন্দুশাস্ত্র মতে, জন্মের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন করার নিয়ম। বৌদ্ধসমাজে পঞ্চম বা নবম মাসে ভাত ছোঁয়ানি বা অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রভাবে মুসলিম শিশুর অন্নপ্রাশন বা মুখে ভাত দেওয়া হয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে। তবে এই রীতি হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকাতেই দৃষ্ট হয়। অন্নপ্রাশনকে কিশোরগঞ্জে হিন্দু পরিবারে শিশুর মুখে 'দুধভাত দেওয়া' বলে। দশ/বারো/আঠারো মাসে শিশুর (সাধারণত পুত্রসন্তানের) অন্নপ্রাশন হয়ে থাকে। অন্নপ্রাশনের আগে শিশুকে অন্ন জাতীয় কোনো আহার্য দেওয়া হয় না। এইদিন শিশুর মাতা শিশুর আহার শেষে তার মুখ আঁচলে মুছিয়ে আঁচলের প্রান্তভাগ গ্রন্থি দিয়ে রাখে। মুখে ভাত দেওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন তাকে নানাপ্রকার উপহার দেয়।

কিশোরগঞ্জের অন্যত্র ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন হয়ে থাকে। এইদিন শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা হয়। পিঁড়ির উপর বসিয়ে তেল-হলুদে করিয়ে তাকে নতুন লাল গামছা, নতুন তাগা, চন্দন ও কাজল পরানো হয়। স্নানের দুইটি থালায় যাবতীয় উপকরণাদি রাখা হয়। একটি থালা দেওয়া হয় দাইকে। অপর থালায় রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যাদি থেকে একটু একটু করে শিশুর মুখে দেওয়া হয়। তার আগে পুরোহিত আসেন পূজোর কাজ সম্পন্ন করতে। বেলা শেষে একটি থালায় একখণ্ড মাটি, একটি টাকা, বই-খাতা, পেন্সিল, দোয়াত, কলম রাখা হয়। তারপর বাজনা বাজিয়ে শিশুকে বাড়ির চারিদিকে কিংবা বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে এনে থালার সামনে বসায়। সে থালায় রাখা যে দ্রব্যটি প্রথম হাতে দেয়– 'বিশ্বাস, তার ভবিষ্যৎ জীবনে সেই দিকেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।' পর্যায়ক্রমে মুসলিম সম্প্রদায় 'আকিকা', পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে সুন্নত খাতনা দেয়।

৪. সিমন্তন্য

হিন্দু শাস্ত্রমতে, সাত মাসের গর্ভবতী নারীকে 'সিমন্তন্য' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালো খাবার খাওয়ানো হয়। এ রীতি সর্বত্র চালু রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মীয় সনাতনী সমাজে গর্ভের সাত মাস কাল নব শিশুর পূর্ণতার সময়কালে এ অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এতে 'বিষ্ণু' পূজা পার্বণও করে থাকে। নারীর বাপের বাড়ি কিংবা বরের বাড়ি উভয় স্থানের যে কোন একটি স্থানে এ পূজাসহ সিমন্তন্য হতে পারে। অনুষ্ঠানে একত্রে বসে সবাই আনন্দ উল্লাস করে। তাতে বিশ্বাস গর্ভধারিণীর কোলে সুন্দর সবল দেহের অধিকারী সন্তান এসে সংসার সুখের হয়ে উঠবে।

অতীতকাল থেকে ছেলে সন্তান কামনায় হিন্দু সমাজে পূজা পার্বণ থেকে শুরু করে সব কিছুতেই এই বিশ্বাসের একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া পালন করে থাকে। সিমন্তন্য অনুষ্ঠানে গর্ভ ধারিণীকে নতুন কাপড় পড়ান হয়। বাপের বাড়ি অথবা বরের বাড়ি উভয় সংসার থেকে তার জন্য উপহার স্বরূপ নতুন কাপড়সহ অন্যান্য দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে সন্তানবতী নারীর ক্ষুধা নিবৃত্তিতে তার আত্মতৃপ্তি এবং ভ্রুনস্থ গর্ভ শিশুর জৈবিক ও মানসিক গঠনে ক্রিয়া করে। শরীর বিদ্যা অনুসারে গর্ভের সাত মাস কাল নব শিশুর পূর্ণতার তৃতীয় ও শেষ স্তর তাই এ সময়ে শিশুর মঙ্গল কামনার পাশাপাশি শারিরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির বিষয়ে সচেতনমূলক ও শিক্ষণীয় এ অনুষ্ঠান সর্বত্র চালু রয়েছে।

www.pathagar.com

হিন্দু সমাজে নব বিবাহিত দম্পতির জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হলো সিমন্তন্য। সিমন্তন্য অনুষ্ঠান পালনে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সিমন্তন্যের কার্ড ছাপিয়ে মন্ত্রণসহকারে সকলের সহযোগিতায় আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে ঘটা করে পালন করে থাকে। কিশোরগঞ্জে সাধারণত সাত মাসের সময়ই এই সিমন্তন্য অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে মেয়েলিগীত পরিবেশন করা হয়।

৫. সাধভক্ষণ

সাত মাসের গর্ভবতী নারীকে 'সাধ' খাওয়ানো হয়। এ রীতি সর্বত্র চালু রয়েছে। শরীরবিদ্যা অনুসারে গর্ভের সাত মাস কাল নব শিশুর পূর্ণতার তৃতীয় ও শেষ স্তর। তাই যে অনুষ্ঠানে সন্তানবতী নারীর সাধ বা ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হয় তাকে সাধভক্ষণ বলে। এ খাদ্যে সন্তানবতী নারীর ক্ষুধা নিবৃত্তিতে তার আত্মতৃপ্তি এবং ভ্রুনস্থ শিশুর জৈবিক ও মানসিক গঠনে ক্রিয়া করে। লোকবিশ্বাস রয়েছে-গর্ভবতী নারীর ইচ্ছা অনুযায়ী তার সাধভক্ষণ খাদ্য পূর্ণ না হলে সন্তান পুষ্ট হয় না। হিন্দু সমাজে সাত অথবা নয় মাসে সাধ দেওয়া হয়। সাত মাসের সাধকে কাঁচা সাধ ও নয় মাসের সাধকে পাকা সাধ বলে। কাঁচা সাধে সকল প্রকার 'ভৃষ্টদ্রব্য' ও পাকাসাধে 'ভোজ্যদ্রব্য' পরিবেশন করা হয়। সাধভক্ষণ কিশোরগঞ্জে সাধারণত সাত মাসের সময়ই বেশি দেওয়া হয়। গর্ভধারিণীকে নতুন শাড়ি কাপড় পড়ান হয়। তারপর একটি বড় থালায় নানা প্রকার ক্ষীর-পিঠা খাওয়ানোর সময় সুন্দর সুন্দর ছোট ছেলে মেয়েদের এনে গর্ভধারিনীকে চারদিক থেকে তারা জড়িয়ে ধরে একত্রে বসে আনন্দ উল্লাস করে। তাতে বিশ্বাস গর্ভধারিণীর কোলে আরও সুন্দর সবল দেহের অধিকারী সন্তান এসে সংসার সুখের হয়ে উঠবে।

এজন্যই আদিকাল থেকে সাধভক্ষণ বিশ্বাসের একটা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। যা স্থান কাল পাত্রে সকলেই করে থাকে। সাধভক্ষণে আজও কিশোরগঞ্জে তিন মাসের গর্ভকালে তেঁতুল, চার মাসের কালে পান্তা ভাত, ছয় ও সাত মাসের কালে মোরগ ও খাসির গোস্ত, নয় মাসের সময় দৈ ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন রয়েছে। গ্রামীণ পাড়া গাঁয়ে আজও গর্ভবতী মায়েরা মিষ্টান্ন খাওয়ার চেয়ে টক, চুলার পাড়ের পোড়া মাটি, ছিকর, সব্জী ইত্যাদি খাবার বেশি পছন্দ করে। কিশোরগঞ্জের কবি কন্যা চন্দ্রাবতীর দস্যু কেনারাম নামক পালাকাব্যে সাধভক্ষণের বিবরণ উল্লেখ আছে।

৬. ষষ্ঠি

রামায়ণ থেকে শুরু করে মনসামঙ্গল কাব্যে ও শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠিপূজা শেষে নিশি জাগরণের কথা উল্লেখ আছে। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে নাপিত অথবা পরিবারের কেউ নবজাতকের চুল, নখ কর্তন করে মাটিতে পুঁতে রাখে অথবা পানিতে ভাসিয়ে দেয়। নবজাতকের নামকরণে 'মাতুল' এর বিশেষ ভূমিকা থাকে। লোকবিশ্বাস সন্তান মাতুলের আদর পেলে সৌভাগ্যবান হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ষষ্ঠি তোলার দিন আম্রপল্লব, ফুল, দুর্বা, চন্দন ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রসূতির ঘরে ঘট পূজার আয়োজন করার প্রচলন রয়েছে। ঘরের ভিতরে কলাপাতা বিছিয়ে তাতে নবজাতকের নতুন জামাকাপড় রাখা হয়। এদিন নবজাতকের কোমরে ঘুমশি পড়িয়ে নবজাতকের নাম ও রাখা হয়

www.pathagar.com

এবং সামর্থ অনুযায়ী পাড়া প্রতিবেশি ও আত্মস্বজনকে মিষ্টি, বাতাসা, পান ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজে বিশ্বাস রাত্রে ষষ্ঠী দেবী এসে নবজাতকের ভাগ্যলিপি লিখে যান। তাই তার শিয়রে দোয়াত, কলম, খাতা, বই ইত্যাদি রাখা হয়।

৭. মানত

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে মানসিক বা মানত প্রচলিত আছে। মনে মনে কোনো লৌকিক দেবতাকে স্মরণ করে তার উদ্দেশ্যে অর্থকড়ি, জীব, খাদ্য সামগ্রী প্রদান করাকে 'মানত' বলে। যেমন- নতুন গাছে ফল ধরলে প্রথম ফলটি অমুক দেবতা বা তমুক মন্দির-মসজিদে দরগায় দেওয়া হবে। অথবা অসুস্থ কোন সন্তান যদি ভালো হয় তাহলে অমুক দেব-দেবীর নামে পাঠাবলি, তমুক দরগাহ, খানকায় গরু-খাসি-মহিষ-মোরগ-মুরগি ইত্যাদি দিব। কখনো কখনো স্থান কাল পাত্রে সাধ্য অনুযায়ী গুড়-বাতাসা-মোমবাতি-আগরবাতি ইত্যাদি মানত সামগ্রী হিসেবে দেওয়া হয়। মনোবাসনা পূরণার্থে এ ধরনের অগ্রিম প্রতিশ্রুতির বাস্তব নিদর্শন আজও হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন রোগ শোকে কাতর বা আহত মানুষ কোন বিশেষ পির-ফকির-সন্নাসী-সাধু কিংবা ওঝা কবিরাজ দেওয়া বিধি বিধান বা নিষেধ পালন করাকে মানসিক বলে। যেমন– অমুক কবিরাজ বলেছে– মৃগেল মাছ খেলে মৃগী রোগ হবে তাই মৃগেল মাছ সেবনে তার মানসিক আছে। কোন কোন ফকির বলে অমুক কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হলে তোমার অমুক বিষয়ে এতদিন বা এত বছর এই বিষয়ে 'মানসিক' পালন করতে হবে।

কিশোরগঞ্জ জেলায় এককালে ফইজকা সাধু বা ফকিরের মানসিক পালনে এক ধরনের পুরুষ মানুষের মাথার লম্বা চুল তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও খাওয়া দাওয়ায় বিশেষ করে কালো বাউশ মাছ তারা কিছুতেই না খেয়ে থাকতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের প্রায় প্রতিদিন ঐ কালো বাউস মাছ খেতেই হবে। ফলে বাজারে ঐ মাছের দাম এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেল যে, একটা কালো বাউস মাছের জন্য মানুষ পাগল হয়ে যেত। ফলে কালো বাউস মাছ যেমন দুর্মূল্য হয়ে পড়ে তেমনি দুস্প্রাপ্যে পরিণত হয়। এর কারণ ছিল মানুষের ব্যাপকভাবে এই ফইজকা সাধু বা ফকিরের আদেশে 'মানসিক' পালনের প্রতিফলন। মানসিক এটি একটি সংস্কার-কু-সংস্কারও বটে, তবু এটি আচার। মানসিক কামনা পূরণের বিশ্বাস। জটিল দুরারোগ্য রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার এক বিশেষ মন্ত্র।

৮. গরুন্নাতের সিরনি

গরুর নিরাপত্তার জন্য গোয়াইলার সিরনি আর গাভীর অধিক দুগ্ধ পাওয়ার জন্য গোরক্ষনাথের সিরনির প্রচলন রয়েছে। কিশোরগঞ্জে গাভীকে উপলক্ষ করে গাভীর প্রসবের ৭ দিন পর প্রথম দোহন করা কাচা দুধ স্থানীয় পাগলা মসজিদ কিংবা কোন মন্দিরে দেওয়ার বিশ্বাস প্রথা চালু রয়েছে। এছাড়া গোয়াল ঘরের ভিতরে চুলা তৈরি করে তাতে চাল ডালে খিচুড়ি পাক করা হয়। একটি মুরগি জবাই করে তার গোস্ত খিচুড়িতে দেওয়া হয়। রাত্রে এ খিচুড়ি গোয়াল ঘরে বসেই লোকজনকে খাওয়ান হয়। জবাই করা মুরগির পালক ও নাড়ি ভূঁড়ি চুলায় পুঁতে তা মাটি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়। পাকের পাতিলটি গোয়াল ঘরের চালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পরবর্তী বৎসরের অনুষ্ঠান পর্যন্ত তা সেখানে ঘরে ঝুলান থাকে। এতে মুরগি জবাই করার বিনিময়ে গরুর প্রাণ রক্ষার কামনা করার মাধ্যমে যাদু বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এটা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এই আচার প্রথা মান্য করে থাকে। গোয়াল ঘরে ভিতরে বা চালায় হাঁড়ি রাখার অর্থ হলো গরুর ক্ষতি করে এমন কোনো প্রেতাত্মা যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। একই উদ্দেশ্যে গোয়াল ঘরের দরজায় ভাঙ্গা হাঁড়ির গলা দড়ি বা রশিতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা কিশোরগঞ্জের উজান-ভাটি হাওর জনপদের হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে কৃষকদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে।

৯. চডি

সন্তান জন্ম লাভের ছয় দিন পর অর্থাৎ সাত দিনের দিন প্রসূতির গৃহ পরিষ্কার ও কাপড় ছোপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজনসহ ধর্মীয় পির ফকির বা মৌলভি মুন্সি সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে এনে নবজাতকের জন্য দোয়া দরুদ পড়ার পাশাপাশি নবজাতকের নাম রাখা হয়। এই বিশেষ দিবসটিকে 'চডি তোলা' বা 'হাইট্টারা' বলা হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জে চাটাই বিছানাকে 'চাটি' পাতা বলে। এই 'চাটি'র আঞ্চলিক উচ্চারণ 'চাডি'। ছ'দিন পর ঘর ধুয়ে মুছে প্রসুতির 'চাডি>চাটাই' তুলে ফেলার পদ্ধতি থেকে 'চডি' তোলা শব্দটি এসেছে বলে অনুমান করা যায়। অন্যদিকে হিন্দু সমাজে 'ষষ্ঠ থেকে ষষ্ঠী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন। তাই হিন্দু সমাজে ষষ্ঠ তোলা শব্দটির অপভ্রংশ হিসেবে চডি তোলা শব্দটির সৃষ্টি হওয়ার কথাও বলা হয়ে থাকে। যাই হোক চডি তোলা বা হাইট্টারা কিশোরগঞ্জের সর্বত্র আজও অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে।

১০. গায়েহলুদ

গায়েহলুদ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। 'অঞ্চলভেদে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। তেলাই, তেল হলুদ, তৈল-কাপড়, হলুদ-গোসল, গিলা-গোসল, কুলোই ভাঙ্গা, উঠ্না দেওয়া, কুড় দেওয়া, হলুদ কুটন, হলুদ ভাঙ্গা, খায়তাগা ইত্যাদি নামে এর পরিচিত। হিন্দুবিবাহে অধিবাসের পরিবর্তে হিসেবে গাত্রহরিদ্রা কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। কিশোরগঞ্জের অঞ্চলভেদে একে 'হলুদ কোটা' বা 'গায়েহলুদ' বলা হয়। 'মূলত এটি একটি দেহশুদ্ধি অনুষ্ঠান। এর দ্বারা দেহ কেবলমাত্র যে দুর্গন্ধমুক্ত হয় তাই নয়, দেহের ঔজ্জ্বল্যও বৃদ্ধি করে। এইজন্যে ভেষজ দ্রব্যাদির সঙ্গে দুধের সর মিশ্রিত করা হয়। সুগন্ধিযুক্ত করার জন্য এর সঙ্গে মেথি, আফসান, আমলা ও গিলার শাঁস মেশানো হয়। আবার কোথাও সুন্দা, গিলা, মেথি ও সরিষা একত্রে বেঁটে বর-কনের গায়ে মাখানো হয়।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের পর পাত্র-পাত্রীর সন্ধিকাল চলতে থাকে। ঐ সময় তাদের বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। কাউকে স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। লোকবিশ্বাস আছে যে, হলুদের গন্ধে ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরী প্রলুব্ধ হয়, তাই তাদের বেশ সতর্ক থাকতে হয়। অনেক সময় এদেরকে একাকী থাকতে দেওয়া হয় না। সঙ্গে অন্য কেউ থাকে। রক্ষাকবজ হিসেবে হাতের কাছে লৌহ নির্মিত কিছু রাখা হয়।

www.pathagar.com

এ অঞ্চলে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয় বিবাহের দুই-তিনদিন পূর্বে। বর এবং কন্যা উভয়ের বাড়িতে বেশ ঘটা করে এর আয়োজন করে। আগে কনের এবং পরে ছেলের গায়ে হলুদ হয়। দুইপক্ষে হলুদের ডালা সাজানোর রেওয়াজ আছে। নতুন কুলা ও ডালা হলুদ, সিঁদুর এবং আলতা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। এতে ধান, দুব্বা, হলুদ, মেহেদি পাতা, মেথি, গিলা, আফসান, আমলা প্রভৃতি থাকে। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে হলুদের ডালা পাঠায়। এছাড়া পান-সুপারি ও মিষ্টি এর সঙ্গে পাঠাতে হয়। পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রের বোন, ভাবী এবং প্রতিবেশী প্রমুখ হলুদের ডালা নিয়ে কনের বাড়ি যায়, একইভাবে কন্যাপক্ষ থেকে কন্যার নিকট আত্মীয়, বান্ধবী হলুদ ডালা নিয়ে পাত্রের বাড়িতে যায়। পাত্র এবং পাত্রীর মায়ের জন্য উভয়পক্ষ থেকে তেলাই শাড়ি পাঠানো হয়।

সর্বপ্রথম পাত্র-পাত্রীর মা দুধের সর মিশ্রিত হলুদ বাটা, গিলা কপাল স্পর্শ করেন। এরপর চাচি, ফুফু, খালা তা অনুসরণ করেন। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাদের শরীরের তাবিজ, গয়না-গাঁটি খুলে ফেলা হয়। মুসলিম বিবাহে পাত্র-পাত্রীকে পশ্চিমমুখী হয়ে একটি জলচৌকি অথবা পিঁড়ির উপর বসানো হয়। গায়েহলুদের দিন মা-বাবা রোজা রাখেন। ঢেঁকিবরণ করে হলুদ কোটার পর পাঁচ/সাতজন এয়ো সারিবদ্ধভাবে মাথায় আঁচলঢাকা কুলা নিয়ে গোসলের স্থানে যায়। সেখানে মা মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী মোছা? মা বলেন, 'সোহাগ মুছি।' এইভাবে মা তাকে সাতবার হলুদ মাখান এবং তা মুছে ফেলেন। এরপর মা মেয়ের মাথায় এক ঘটি পানি ঢেলে দিয়ে চলে যান। তারপর এয়োরা মিলে তার গায়ে হলুদ দিয়ে গোসল করায়। এই সময় হলুদ কোটার গান গায়। বরের বাড়িতেও অনুষ্ঠান হয়। গায়েহলুদের পর থেকে বর না-আসা পর্যন্ত কনে ঝাল-ভাত খেতে পারে না।

১১. সদরভাতা

মুসলিম বিয়ে উপলক্ষ্যে বর এবং কনেকে পৃথক পৃথকভাবে বৃহৎ থালা বা বাসনে বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট খাবার পরিবেশন করা হয়। বরের সাথে তার বন্ধু বান্ধব এবং কনের সাথে তার বিশেষ বান্ধবীরা একই থালা বা বাসন থেকে পরিবেশিত খাবার খেয়ে থাকে। এ ধরনের খাবারের সাথে সামর্থ অনুযায়ী আস্ত কচি খাসি অথবা আস্ত মোরগ বর-কনেসহ তার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন প্রত্যেককে একটি করে 'মোসল্লাম' পরিবেশন করা হয়। কখনো কখনো কোনো আনন্দঘন পরিবেশে এই 'মোসল্লাম' খাসি কিংবা মোরগ খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকে শুরু করে হুড়োহুড়ি হয়ে যায়। বর-কনের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত এই বিশেষ খাবারকে 'সদরভাতা' বলে। কিশোরগঞ্জের স্থানীয় ভাষায় সদর ভাতা খাবারকে 'হদরভাতা' খাবার বলে। সদরভাতা খাবার প্রাচীন কাল থেকে সামর্থ অনুসারে পরিবেশন করার রীতিনীতি আজও চালু রয়েছে। সদরভাতা অত্যন্ত মার্জিত ভদ্রভাবে পরিবেশন করা হতো বলে এককালে এ খাবারকে 'ভদ্রভাত' বলত। এই ভদ্রভাত কালের উচ্চারণ বিবর্তন আর বিকৃতিতে ভদ্রভাত>ভদ্দরভাত> থেকে হদ্দরভাত>হদরভাতা হয়ে গেছে বলে অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ জেলায় স>শ>ষ-এর শব্দ উচ্চারণ কখনো কখনো 'হ' শব্দ উচ্চারণে কথিত হয় যেমন সাপকে-হাপ, শশাকে-হশা, ষাড়কে-হাড় তেমনি 'সদর ভাতাকেও 'হ' শব্দ উচ্চারণে 'হদর ভাতা' বলা হয়ে থাকে। সদরভাতা খাওয়ার সময় বর-কনের দুজনের হাতে যে সুন্দর রাখি বাঁধা থাকে তাকে কিশোরগঞ্জে 'কাঙ্গনী পড়া' বলে। সরিষা, শুকনো নালিতাপাতা, ছোট্ট এক টুকরো হলুদ আর সোনা-রূপার ছোটা দুটি কনা একটি ছোট্ট সাদা কাপড়ে মুড়ে বরের ডান হাতে এবং কনের বামহাতে বেঁধে দেওয়া হয়। কাঙ্গনী হলো বর বধূকে অশুভ ও দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার বিশ্বাস দ্রব্য।

১২. মঙ্গলাচরণ

হিন্দু শাস্ত্র মতে কন্যার বিবাহের আগে শ্বশুর বাড়ি থেকে কনের জন্য পাঠানো অলংকার, কাপড়, মিষ্টি, মাছ, পান-সুপারি ইত্যাদি উপহার স্বরূপ দিয়ে কন্যাকে আর্শীবাদ করা হয়। কন্যার এই আর্শীবাদ স্বরূপ নতুন কাপড় পরে অলংকারাদি পড়ে সাজ-সজ্জার অনুষ্ঠানকে মঙ্গলাচরণ বলে। কিশোরগঞ্জের সর্বত্র হিন্দু ধর্ম মতে এই অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. বউবরণ

হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে বধূবরণ সাড়ম্বরে পালিত হয়। এটি একটি আনন্দঘন স্ত্রীআচারের অনুষ্ঠান। 'বর যখন নববধূকে নিয়ে নিজ গৃহে আগমন করে তখন এক পিঁড়িতে দুইজনকে দাঁড় করিয়ে প্রথমে পুত্রের ও পরে বধূর মাথায় তিনমুষ্টি ধান দিয়ে মাতা এবং পরে চাচি, নানি, দাদি ও অন্যান্যরাও বরণ করে। হিন্দু সমাজে শাঁখ বাজে, উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়। বরণকুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্যের দ্বারা বর ও বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার পথে ঘরের মেঝে হতে দরজা পর্যন্ত কাপড় বিছানো থাকে, বর ও বধূ তা মাড়িয়ে যায়। বধূ আগে থাকে, বর পেছনে, হাতের জাঁতি দিয়া সে বধূর মাথা হতে দুই চারটি করে ধান সেই কাপড়ে ফেলে দেয়। কিশোরগঞ্জের কোথাও কোথাও নববধূ ও বরকে পালকি থেকে নামিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করে বধূকে কোলে করে চাদর-বিছানা পথ দিয়ে ঘরে তোলা হয়। তাদেরকে ঘরে এনে পশ্চিমমুখী করে বসানো হয়। এরপর নববধূর মুখদর্শনের পালা শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা নববধূর মুখদর্শন করে টাকাপয়সা উপহার দেন। বধূবরণের গীত :

রাই রাই চলো সখী আমরা বরণে যাই,
এতদিন ছিলারে দুব্বা আলানে পালানে
আজ কেন আইছাওরে দুব্বা এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে ঢাকুন কুমারেরও দুকানে
আজ কেন আইছাওরে ঢাকুন এই বিয়ার বরণে।
এতদিন ছিলারে সিন্দুর বানিয়ারও দুকানে
আজ কেন আইছাওরে সিন্দুর এই বিয়ার বরণে।

www.pathagar.com

পালকি ছাড়াও কিশোরগঞ্জে এককালে 'মাপা বা মাফা-মাহা' নামক বাহনের প্রচলন ছিল। এ যুগে স্থানভেদে রিক্সা, কোথাও নৌকা, টমটম, ভটভটি ইত্যাদি যান-বাহনের প্রচলন রয়েছে।

১৪. বৌভাত

বিবাহের তৃতীয় দিবসে বরের বাড়িতে বউভাতের আয়োজন করা হয়। বরের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। কন্যাপক্ষের আত্মীয়স্বজনও নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। নববধূকে 'পাক' স্পর্শ করানোর রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। বধূকে অন্দরমহলে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি চেয়ারে বসানো হয়। তার সামনে পানভর্তি পানদানি থাকে। বধূদর্শন করে তার হাতে টাকা পয়সা, গয়না ও উপহার সামগ্রী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ এবং সম্প্রদায়ে এই বৌভাত প্রথার রীতিনীতি প্রচলিত আছে। বৌভাত একটি উৎসবমুখর অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে বর-কনের উভয়পক্ষ এসে যোগদান করেন।

হিন্দু সমাজে প্রথা আছে নববধূকে প্রথম শ্বশুর বাড়িতে রান্না ঘরে নেওয়া হয় তার হাতে তৈরি রান্না খাবার সবাইকে খাইয়ে বউকে সমাজভুক্ত করা হয়। বৌভাত সমাপ্তির পর নববধূকে কন্যার বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। একে 'ফিরানী বা মেলানী' বলে। হিন্দু পরিবারে বর এসে আটদিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থান করে। এই অবস্থানকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। মুসলমান সমাজে চার থেকে পাঁচদিন কন্যার বাড়িতে অবস্থানের লৌকিক আচার লক্ষ করা যায়। এই অবস্থানের পর বর যখন নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন শ্বশুরালয় কর্তৃক বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রাপ্ত হন। কিশোরগঞ্জে এই ফিরানী বা মেলানীকে ফিরানাইয়র, ফিরাযাত্রা, মাডি ফিরানি অথবা মাডি পাড়ানি বলে। কিশোরগঞ্জে এই ফিরা নাইয়র এ একটি প্রথা চালু রয়েছে। প্রথাটি হলো নতুন জামাই যতক্ষণ নিজ থেকে শ্বশুরবাড়িতে মাছ কিনে না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জামাই শ্বশুরবাড়িতে মাছ খেতে পারবে না।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

যে চালে ভাত হয়, সে চালেই পিঠাও হয়। পিঠা তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে সুপরিচিত। পিঠার প্রধান উপকরণ চালের গুড়োর সংগে নারিকেল, গুড়, দুধ, তালের রস, কলার রস মিশিয়ে কখনো পানিতে সিদ্ধ কের কখনো পুড়িয়ে, কখনও ভাপে দিয়ে বা তেলে ভেজে নানা রকম রসে বা সিরায় ভিজিয়ে তৈরি হয় উপাদেয় খাদ্যবস্তু যাকে লোকখাদ্য বলে। এমনকি ঝাল জাতীয় পিঠাও তৈরি হয়। বিভিন্ন পিঠার নামও আলাদা। যেমন- নকশি পিঠা, পোয়া পিঠা, চিটা পিঠ, ডুবা পিঠা, পাটি পিঠা, পাক্কন পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ পিঠা, পুলি পিঠা, কলার পিঠা, তালের পিঠা, তিলের পিঠা, পাপর পিঠা, বড়া পিঠা, মেরা পিঠা, ভাপা পিঠা, পোয়া পিঠা, ক্ষীরগুলি, চন্দ্র পুলি, পাতা পিঠা, মালপোয়া পিঠা, পাটিসাপ্টা পিঠা ফুল পিঠা ইত্যাদি। তবে লোকশিল্পের নিরিখে ও শিল্পকর্মের দিক থেকে নক্‌শি পিঠাই সবার সেরা।

এ পিঠা শুধু কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু অঞ্চলে তৈরি হয়ে থাকে। নক্‌শি পিঠার নক্‌শার মটিফ সাধারণত লতাপাতা, ফুল, ব্যবহারিক তৈজসপত্র, মাছ, পাখি ইত্যাদি। নক্‌শা তৈরির উপকরণ অতি নগণ্য খেজুর কাটা, সুঁই, মন কাটা, বাঁশের ছিলকা। এগুলোর সাহায্যে অভিজ্ঞ হাতের নিপুণতায় অতি সূক্ষ্ম দাগ কেটে বিভিন্ন নক্‌শা করে থাকে। এ সব পিঠার সুন্দর নামকরণও রয়েছে। যেমন- কাজল লতা, শঙ্খ লতা, হিজল লতা, সজনে পাতা, ভেট-ফুল, উড়িফুল (সিমের ফুল), কন্যা মুখ, জামাই মুচরা, সতিন মুচরা, সাগর দিঘি ইত্যাদি। কিশোরগঞ্জের রসমঞ্জুরী, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, সন্দেশ, পেরাসন্দেশ, দুধের ক্ষির, দুধের নাড়ু, মিষ্টান্ন ইত্যাদির খ্যাতি রয়েছে লোকখাদ্য হিসেবে। মিঠাই হিসেবে কদমা, বাতাসা, লালচিনি, গুড়, বুইন্দা, জিলাপি, গজা, খাজা, উখড়া, চিরা, মুড়ি, বিন্নিখৈ ইত্যাদি লোকখাদ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। পাক্কন পিঠার সুনামও সুপরিচিতি রয়েছে সারা কিশোরগঞ্জ জুড়ে। কেউ কেউ এ পিঠাকে নক্‌শি পিঠাও বলে থাকে।

তবে এ জেলায় পাক্কন পিঠা নামেই বেশি পরিচিত। চাউলের মধ্যে এক ধরনের ছোট ছোট কনা জাতীয় চাউলকে কিশোরগঞ্জে 'খুদ' বলে। এই খুদ চাউল দিয়ে এক ধরনের ভাত রান্নাকে 'বউ খুদ ভাত' বলে। কেউ কেউ 'খুদ ভাত' বলে। এ ধরনের ভাতের সঙ্গে কালজিরা বেটে ভর্তা করে খেলে খুবই সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। কেউ কেউ আলু ভর্তা দিয়েও খেয়ে থাকেন। কিশোরগঞ্জ জেলায় আরেক ধরনের লোকখাদ্য রয়েছে তাকে 'কাঞ্জি' বলে। প্রতিদিন রান্নার সময় এক মুটো চাউল করে একটি হাঁড়িতে ভিজিয়ে রেখে মাসের শেষে এই ভিজানো পঁচা বাসি চাউল রেঁধে কাঞ্জি ভাত তৈরি করে অনেকে খায়। আবার কেউ কেউ এই চাউল দিয়ে পিঠা তৈরি করে খায়। শুকনা মাছকে শুটকি বলা হয়। শুকনা মাছকে একটি মটকায় মাছের তৈল দিয়ে ভিজিয়ে রেখে যে ধরনের শুটকি তৈরি করা হয় তাকে কিশোরগঞ্জে 'চ্যাপা শুটকি' বলে। কিশোরগঞ্জের

www.pathagar.com

কোথাও কোথাও চ্যাপা শুটকিকে 'সিদল বা হিদল' বলা হয়। কিশোরগঞ্জে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, চ্যাপা-সিদল বা হিদল শুটকির ভর্তা দিয়ে ভাত খেলে জ্বর সর্দি জাতীয় রোগ থেকে নিরাময় পাওয়া যায়। ছই বা চই পিঠা চ্যাপা-সিদল বা হিদল শুটকির ভর্তা দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন কিশোরগঞ্জে অধিক পরিমাণে রয়েছে। এ ছাড়াও চটা পিঠা, চিতই পিঠা কিশোরগঞ্জে শুটনকির ভর্তা বা তরকারি দিয়ে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। মসলা পিঠা বলতে হলুদ বেটে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকে মসলা পিঠা বলে। তবে হলুদ ছাড়াও বিভিন্ন মসলা এবং শাক সব্জি দিয়ে বড়া পিঠা তৈরি করা হয়। এই বড়া নামের এ সব পিঠা কিশোরগঞ্জে প্রচলিত রয়েছে। কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে আজও প্রায় প্রতিদিন 'পান্তা ভাত' খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। এ অঞ্চলের লোককথায় উল্লেখ আছে-

চৈতে চাইলতা, বৈশাখে নাইলতা
জৈষ্ঠে আম খাই, আষাঢ়ে কাঁঠাল দৈ।
শ্রাবণে বাসি পান্তা, ভাদ্রে তালের পিঠা
আশ্বিনে শশা মিঠা।
কার্তিকে কচুউল, অগ্রহায়ণে খইলসা মাছের ঝোল।
পৌষে কাঞ্জি- মাঘে তেল, ফাল্গুনে গুড় আর আদা বেল।

এই ছড়াটি যেমন কিশোরগঞ্জে জনপ্রিয়, তেমনি খাদ্যাভ্যাসগুলোও এ জেলায় বেশ প্রচলিত। তাই এ জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে এই ছড়া বচনটি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে যেমন- বৈশাখ মাসে কাডল মিডা, জইষ্ঠে মিডা আম/আষাঢ় মাসে ফুরায়া যাইবে লেচু আর জাম/ শাওন মাসে শশা মিডা, ভাদ্দর মাসে তালের পিডা/আশ্বিন মাসে জলপাই আর কার্তিক মাসে উল মিডা/ আইলানা আইলানা পতি বেনী বান্ধিব মাথার চুল/ কারলাগি রান্ধি আমি অঘ্রানে খইলসা মাছের ঝুল/ পোষ মাসে কাঞ্জি পিডা মাঘে মিডাতেল/ ফাল্গুনে গুড় আদা মিডা, চৈতে মিডা বেল।

মাছে ভাতে বাঙালি কথাটি বহুল প্রচলিত থাকলেও নিরামিষ পঞ্চব্যঞ্জন বিচিত্র ধরনের ভাজি-ভর্তায় রন্ধন কুশলতায় খাদ্যরুচির পরিচয় মিলে কিশোরগঞ্জে। এই খাদ্যাভাস সংস্কৃতিরই একটি অংশ। সাধারণ মানুষের মধ্যে সকল প্রকার খাদ্য খাওয়ার পর পান-তামাক খাওয়ার অভ্যাস বা প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি সেবন করেন। বৈষ্ণবেরা নিরামিষভোজী। শাক্তরা আমিষভোজী। যোগীসিদ্ধারা আতব চাউল আর সুক্তোভোজী। কেউ কেউ হরিতকী খেয়ে মুখ প্রক্ষালন করে। এই এত খাবারের মধ্যে আমরা বাঙালির অতীত জীবনে জানি "হাঁড়িত ভাত নাই নিতি আবেসী।' আবার এই বাঙালি ঈশ্বরী পাটনী তাই দেবী অন্নদার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিল- 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। তাই বাঙালির ভাত, শাক-সবজি জাতীয় বিভিন্ন তরি-তরকারি, নানাবিধ মাছের ব্যঞ্জন, দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, চিড়া-মুড়ি-খই এবং চাউলের গুঁড়া দিয়ে তৈরি নানা ধরনের পিঠা বাংলা ও বাঙালির খাদ্যভাসের লোকায়ত রন্ধনশালার ক্রমবিকাশ। এক্ষেত্রে কিশোরগঞ্জের কৃতী সন্তান খ্যাতিমান লোকশিল্প সংগ্রাহক মোহাম্মদ সাইদুর কর্তৃক সংগৃহীত বাংলা একাডেমির সংগ্রহশালায়

www.pathagar.com

রক্ষিত পূর্ব ময়মনসিংহ তথা কিশোরগঞ্জের নকশি কাঁথা ও লোকখাদ্য তালিকার পিঠাগুলোই তার যথার্থ প্রমাণ। কিশোরগঞ্জের কন্যা কবি চন্দ্রাবতীর রচনায় মলুয়ার পিত্রালয়ে বিনোদ যে সমস্ত পিঠা খেয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে এভাবে–

শুকত খাইল বেনুন খাইল থোর ভাজা বরা
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিতই চন্দ্র পুলি
পোয়া চই খাইল কত রসে ঢলাঢলি।

সকালের কুয়াশা কিংবা সন্ধ্যায় হিমেল হাওয়ায় ভাঁপা পিঠার গরম সুস্বাদু ধুয়ায় জিভের পানি বেরিয়ে আসে। সাথে গুড়ের গুড়া মিষ্টি খাবার মনে করে দেয় পিঠার ঐতিহ্য।

কিশোরগঞ্জের জনসাধারণ পূর্বকাল থেকেই অতিথিপরায়ণ এবং আদর আপ্যায়নে অভ্যস্ত। অতিথিকে প্রাচীনকাল থেকে পান, তামাক, চা, চিড়া, মুড়ি, গুড়, নাড়ু, পিঠা, দুধ, কলা, ডাবের পানি, শরবত প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়ন করে। যুগের পরিবর্তনে অবশ্য এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সুদূর অতীতে গ্রাম বাংলার আদিবাসীদের ধান কাটার মৌসুমে নবান্ন উৎসবে মাছ-ভাতের পাশাপাশি উপাদেয় লোকখাদ্য রূপে পিঠার প্রচলন শুরু হয়। চালের গুড়ি, নারকেল কুঁচি, দুধ, আখের গুড়, খেজুর রস, তালের রস ইত্যাদি নানা রকম খাদ্য তৈরির মূল উপকরণ ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন অতিথি আপ্যায়ন এবং জামাই তোষণে ধনী-দরিদ্র সবার ঘরে ঘরে পিঠা-পায়েস এর আয়োজন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। একবাড়িতে বৌ-ঝিরা চালের গুড়ি কুটা শুরু করলেই পাঁচ বাড়িতে খবর হয়ে যেত। তাতে দশ ঘরের দশ বাড়ির পাড়া-প্রতিবেশীদের ডেকে এনে দাওয়াত দিয়ে একসাথে বসে চিতই পিতা, ভাঁপা পিঠা, পাটি সাপটা, দউল্যা পিঠা খাওয়ার আনন্দ-উৎসব যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। সেকালে পিঠা-পুলির বাণিজ্যিক ব্যবহার ছিল না। এখন যান্ত্রিক কর্মজীবনে শহর কিংবা গ্রামে অতীতের মতো ঘরে ঘরে পিঠাগুলো তৈরি হয় না। তবুও খাদ্য রসিক বাংলার মানুষের কাছে পিঠার চাহিদা আগের মতোই আছে। এককালে খামা ও বাজাল ধান পিটা ধান নামে পরিচিত ছিল। চাউলের মধ্যে আতপ চাউল ৩০/৪০ বছর আগেও খামা ও বাজাল ধানের প্রচুর চাষ হতো। ইরি ধানের পর বর্তমানে ২৮/২৯ নামের কত চালের পিঠা মুখে রুচে। তাতে পিঠার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কমে গেছে। অথচ এমন এক যুগ ছিল সে যুগে পিঠা নামই ছিল 'জামাই ভুলাইন্যা পিঠা'। যুগ থেকে যে এই বিবিয়ানা জামাই ভুলাইন্যা পিঠা বানানো আর খাবারের প্রচলন শুরু। শীতের আমেজে পিঠার চাহিদা বেশি। সরষে বাটা কিংবা শুটকির ভর্তা মাখিয়ে পথের ধারে চিতই পিঠা বানানো আর মজার ঝালে পিঠা মুখে দিলে কান গরম হয়ে শীত যেন পালিয়ে যায়।

দুধের তৈরি তক্তি, দুধের ক্ষীর দিয়ে ছাঁচের মধ্যে নানা রকম আকৃতির নকশা করা নাড়ু আজও কিশোরগঞ্জে খুবই প্রচলিত। এছাড়া নারিকেল দ্বারা তৈরি নাড়ু ও তক্তি, কাঁচা বা পাকা আম, জলপাই, চালিতা, তেঁতুল, আমড়া, মরিচ ইত্যাদির আচার, আমসত্ত্ব ও চালকুমড়ার তৈরি মোরব্বা লোকখাদ্য হিসেবে ঘরে ঘরে জনপ্রিয়। চাউলের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি রুটি বিশেষ করে কোরবানীর ঈদের সময় এবং সবেবরাত এর

www.pathagar.com

উৎসবের মাধ্যমে মুসলমানগণ প্রস্তুত করে গরীব দুখীদের মাঝে বিতরণ করে থাকে। হাজার বছর ধরে লোকখাদ্য বাঙালির অধিক প্রিয় খাবার।

পিঠা বরাবরই বাঙালির বাংলাদেশের মানুষের মনের আনন্দ, উৎসবের উপকরণ, চিরায়ত বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পরিচয় এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অনন্য উপাদান। পিঠা শুধুমাত্র লোকখাদ্য সামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে গ্রামীণ নারীর রুচি, শিল্প জ্ঞান এবং রন্ধন শিল্পের এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। কিশোরগঞ্জে হিন্দু রমনীদের তুলনায় পিঠা তৈরিতে মুসলমান রমনীদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। অঞ্চলভেদে কিশোরগঞ্জের পিঠা তৈরি ও খাবারে স্বাদই আলাদা। ভাপাপিঠা, ডুবাপিঠা, পুলি পিঠা, দুধপিঠা, মেরাপিঠা, ভাজাপিঠা, বড়াপিঠা, মসলাপিঠা, তেলের পিঠা, তালের পিঠা, কলার পিঠা, পোড়াপিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, চিড়ার পিঠা, নক্‌শি পিঠা, ঝিলিমিলি পিঠা, চিটারুটি পিঠা, তিলের পিঠা, চিতই পিঠা, দুধচিতই পিঠা, পাক্কন পিঠা, ভাতপিঠা, কড়িপিঠা, ঝিকমিক পিঠা, পয়সা পিঠা, নারকেল পিঠা, সেমাই পিঠা, সিঙ্গারা পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, মালপোয়া পিঠা, ক্ষীর পিঠা, লাউপায়েস পিঠা, লরিপিঠা, চাছি পিঠা, সাগুদানা, জামাইপিঠা, ঝুরিপিঠা, ফুলপিঠা, ফুলঝুরি পিঠা, তালবড়া পিঠা, খান্দেশা পিঠা, গুলগুলা পিঠা, গুড়িপিঠা, সমসা পিঠা, খেজুরের পায়েস, হাজারী গুড়ের পায়েস, ফির্নি, জর্দা, পুডিং, হালুয়া, দুধসিন্নি, দুধবরফি, কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, দধি, সন্দেশ, রসমলাই, ছানার সন্দেশ, কালোজাম, ছানার জিলাপি, মোহনভোগ, রসমঞ্জুরী, লালমোহন, ছানামুখী, ক্ষীরের চমচম, খাজা, গজা, জিলপি, নিমকি, আমেত্তি, বুন্দা, চমচম, লবঙ্গ প্রভৃতি নামে মজাদার পিঠা-পায়েস ও মিষ্টিদ্রব্য তৈরি করা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র : উষা রানী ভৌমিক ও তার পরিবার। ঠিকানা : বৌলাই, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকনাট্য

জনজীবনের কাহিনির উপর ভিত্তি করে রচিত ও অভিনীত শিল্পই লোকনাট্য। লোকনাট্যের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের অভিব্যক্তি ফুটে উঠে। সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে লোকনাট্য পরিবেশন করা হয়। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত তিনটি লোকনাট্য দেওয়া হলো :

১. চন্দ্রাবতী

দৃশ্য : এক

বয়াতি : উপস্থিত জ্ঞানী-গুণী সভাসদ জন,
সবাইর চরণে ভক্তি করি নিবেদন।

গাঁও গেরামের মানুষ আমি বুদ্ধি শুদ্ধ নাই,
অধমের ভুল-ত্রুটির ক্ষমা যেন পাই ॥

কিশোরগঞ্জের মাইনষেরা কয় আমি কবিয়াল
ঈশা খাঁর জঙ্গল বাড়িতে আছি বহুকাল

আমার কথা রাইখ্যা দিলাম আসল কথায় ফিরি,
চন্দ্রাবতীর দুঃখের পালা অহন শুরু করি।

কিশোরগঞ্জের পাতুয়াইর গ্রামের আসল ঘটনা,
ঐতিহাসিক সত্য-পালা আছে সবার জানা।

দ্বিজবংশী ঠাহুর গাইও মনুসার ভাসান,
ইতিহাসের পাতায় বংশীর আছেন অবদান ॥
বংশীদাসের প্রাণের কইন্যা কবি চন্দ্রাবতী,
কিশোরগঞ্জের মাটির গন্ধে পাই তার গীতি।

পরমা সুন্দরী চন্দ্র বয়সে যৈবনা,
রূপেরই করবাম তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা ॥

www.pathagar.com

পার্বতী রূপিনী চন্দ্রা রূপে ঝলমল,
বাক্সখিলার জলে হাসে স্বর্ণ কমল।

শিশুকালের সঙ্গের সাথী জয়ানন্দ নাম,
ফুলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ে বাড়ি সুইন্ধ্যাগ্রাম ॥

[ছোট চন্দ্রবতী গাছের ডালে ঝুলানো দোলনায় দোল খাবে।
ছোট জয়ানন্দের আগমন।
চন্দ্রার চোখ বেঁধে উভয়ের কানামাছি খেলা
ঘুরতে ঘুরতে উভয়ের প্রস্থান।]

বয়াতি : পাতুয়ারী সুইন্ধ্যা নামের দুই গাঁও দিয়া,
আইক্যা-বাইক্যা ফুলেশ্বরী বইত উজান ধাইয়া।

মনোহরা ফুলের বাগান আছিল নদীর পাড়ে,
প্রভাতে আইত চন্দ্র ফুল তুলিবারে।

ফুল বাগানে জয়ানন্দ করব ইতি-উতি
হেইহানেতেই দোঁহার মনে প্রেমের উৎপত্তি ॥

দৃশ্য : দুই

[ভোর রাত্রিতে মুরগির বাক। আযানের ধ্বনি। পাখির কলকাকলি।
গ্রামীণ প্রভাত বেলা। ফুলেশ্বরীর তীরে ঘেঁষে সূর্যোদয়।
ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ফুলের সাজি হাতে চন্দ্রাবতী বাগানে ফুল তুলতে যাবে।
সেখানে খানিক পর জয়নন্দে আগমন ঘটবে।]

চন্দ্রবতী: চাইর কোণা সারি-বান্ধা চম্পা-নাগেশ্বর
ডাইল নোয়াও পুষ্প তুলবাম রসিক নাগর-
গো রসিক নাগর ॥

জয়ানন্দ: আমি ধরি ডাইল কইন্যা তুমি তুল ফুল
রক্ত জবা যুঁই-চামেলি ধুতরা বকুল-
গো ধুতরা বকুল ॥

চন্দ্রবতী : প্রভাতে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে
বাপেতে কবির পূজা শিবের মন্দিরে
গো শিবের মন্দিরে ॥

জয়ানন্দ : বাইছ্যা বাইছ্যা গেন্দা তুল মালতার হার
ফুলের মধু খায় ভোমরা রঙিন বাহার
গো রঙিন বাহার ॥

www.pathagar.com

কোকিলা-গায় কুহু কুহ বসন্তেরই গান
কানে কানে কইতে কথা কাঁন্দে যে পরান
গো কান্দে যে পরান ॥

চন্দ্রবতী : দশ দণ্ড বেলা হৈলা মাথার উপরে
অহন আমি যাইগো শ্যাম তোমারই দোহাই
গো তোমারই দোহাই গো ॥

জয়ানন্দ : বিয়ানে নয় সৈন্ধ্যা বেলা আইয়ো ফলবন
সজনী গো তুমায় ছাইড়্যা বাঁচে না জীবন
গো বাঁচে না জীবন ॥

যুগল : দুই জনেতে গাঁথবাম মালা বইয়া নিরালে
সেই মালা পরাইয়াম আমি তুমারই গেল
গো তুমারই গলে ॥

দৃশ্য : তিন

[বংশীদাসের বাড়ি। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।
বারান্দায় বসে বংশীদাস পালা রচনা করবে এবং সুর করে গাইবে।]

বংশীদাস : পূবেতে বন্দিয়া গাই দেব দিবাকর
পশ্চিমে বন্দিয়া গাই দেব শশধর।

হিমালয় পর্বত মাগে বন্দিলাম উত্তরে,
যবদ্বীপ বেইড়্যা আছে বঙ্গোপসাগরে।

চাইর দিগ বন্দিলাম মাগো কি বন্দির আর
অধমে দেইখ্যা দয়া-কর একবার ॥

সুলোচনা : দিনে-রাইতে লেহা-লেহি ভাসান গানের পালা,
সংসারের চিন্তা নাই, আমার অইছে জ্বালা।

মাইয়া আমার ডাংগর অইছে সহায় সম্বল নাই,
পুড়া-কপাল জুড়া লায়না আমি কই যাই ॥

www.pathagar.com

বংশীদাস : মাতা যে পরম গুরু বেদ শাস্ত্রে কয়-
মায়ের সমান সংসারে নাই জানিও নিশ্চয়।
আরে জগত ঈশ্বরী কালী সেই মহামায়া-
শুলপাণির কৃপায় অইব আমার চন্দ্রার বিয়া ॥

শরৎ : মঠখলার মঙ্গল ঠাউকরে মানুষ পাডাইছে
পালাগাম হুননের লাইগ্যা বইয়া রইছে।

[যন্ত্রপাতি সমেত বংশীদাস ও শরতের মঠখলা যাত্রা।
বাতি ধরে চন্দ্রাবতী উভয়কেই আঙিনা থেকে বিদায় জানাবে।]

দৃশ্য : চার

[চন্দ্রাবতীর বাড়িতে কলসি কাঁখে সখিদের আগমন]
সখিগণ : গায়ে থৈ থৈ বান ডাইকাছে মন রয়না ঘরে।
কলসি লইয় চল সখি ফুলেশ্বরী পাড়ে ॥

চন্দ্রাবতী: কি যে করি কি কইরা যাই অথৈ গাঙ্গের পাড়ে,
ডাংগর অইছি মা ও বাপে আমায় নিষেধ করে
রে আমায় নিষেধ করে।

সখিগণ: কিরম কইরা কয়গো সখি ছল-চাতুরি জানি
শীতল জলে প্রাণ জুড়াইয়া করবাম কানাকানি ॥

চন্দ্রবতী: চুপিসারে যাইও সখি শুনলে অপর কানে,
লোকনিন্দ অইব পাছে, আড়ি তরার মনে
রে আড়ি তরার সনে।

সখিগণ : বিদায় নিলাম নদীর ঘাটে ছিনান করিতে
পিরিতের রঙ্গের কথা বইল আচাম্বীতে ॥

চন্দ্রবতী : লজ্জা শরম নাই দেহি কেউর যাও নদীর ঘাটে
মাও রইছে মন্দিরেতে বাপে গঞ্জের হাটে
রে বাপে গঞ্জের হাটে।

সখিগণ : ফুলেশ্বরীত নাইবা গেলা আমরা চইল্যা যাই,
গুমরামুহী বইয়া থাহ কুন ক্ষতি নাহি
সখী আমরা চইল্যা যাই

www.pathagar.com

দৃশ্য : পাঁচ

[ফুলেশ্বরী নদীর ঘাট।
জয়ানন্দ আপন মনে বাঁশি বাজাচ্ছে।
চুপিসারে চন্দ্রাবতীর-সখিদের আগমন। জয়ানন্দের বাঁশি হরণ।
সখিদের হাসা-হাসি এবং সবাই মিলে জয়ানন্দকে ঘিরে গাইবে।]

সখিগণ: তুমি আসল ডাহাইত মন হরাইছ পাঁতুয়ারী গাঁয়
ছাড়তাম না ছাড়তাম না নাগর ধরিলেও পায়।

জয়ানন্দ: আমি চোরও নই, ডাহাইতও নই, ফুলেশ্বরী ঘাটে
খেয়া বাইরে-
কেউ পয়সা দিলে পাড় কইরা দেই, যতজন ঘাটে
আয়ে যায়রে ॥

সখিগণ : মিছামিছি মিছা কতা কইও নাগো আর
হাছা কতা কইলে তুমি পাইবারে নিস্তার।

আমরা সত্য-ন্যায়ের পথ ধরি-
সত্য শিবের পূজারিনী,

আমরা ভালোবাসি গুণবতী-
প্রাণের রাধা চন্দ্রবতী ॥

জয়ানন্দ : সখি আমার ছোট্ট বেলার প্রাণের পাখি,
সে যে কৃষ্ণ প্রেমের মোহন বাঁশি
দিবা নিশি সদাই ডাকি।
সখি গো সখি আমার-
আমি কইতে নারি, সইতে নারি,
চন্দ্রার প্রেমের বিষে মরি
আমি লাজ শরমে ভুল কইরাছি
ক্ষমা চাই গো চন্দ্রার সখি
ছোট্ট বেলার প্রাণের পাখি

সখিগণ: নাগর, খালি মুহে আর কতা নাই,
মান বাঁচাইলে আনো গো খাই
ফুল বাতেসা মণ্ডা মিঠাই।

www.pathagar.com

জয়ানন্দ : তোমায় আমি ভালোবাসি ওগো চন্দ্রবতী
সাক্ষী রইলা গ্রহ-তারা ফুলেশ্বরী নদী
ওগো চন্দ্রাবতী ॥

চন্দ্রাবতী : বাড়ির আগে ফুইট্টা রইছে রক্ত জবার সারি
তুমারে করিবাম পূজা প্রাণে আশা করি।

জয়ানন্দ : তুমি পূরবী ইমনে বেহাগে ভৈরবে
ভূপালী শ্রীযাগে বাঁধারে,
আমি কেদারা পটমঞ্জুরী
ললিত বিভাসে সাধারে।

চন্দ্রাবতী: ফুলে যেমন ভ্রমণ গুন্‌জে আমি যে তোমারই
জন্মে জন্মে পাই যেন গো তোমার মতন পতি।

জয়ানন্দ : তুমি জলেও পদ্ম, স্থলেও পদ্ম,
শরতের শেফালিকা,

আমি বিনা সূতায় গাঁইথ্যা মালা
পরাইয়াম তুমায় বালিকা।

চন্দ্রাবতী: তুমি আমার জীবন-মরণ শেষ দিনের সাথী,
সইপ্যা দিলাম মান-কুলমান অইবা আমার পতি ॥

যুগল : তুমি আমার আমি তুমার চির জনমের সাথী-
চির জনমের সাথী- চির জনমের সাথী-

দৃশ্য : ছয়

[গ্রামের রাস্তা। জয়ানন্দ ও ঘটক মহাশয়ের কথোপকথন]

জয়ানন্দ : এই যে তিলক-রতন ঘটক মশায়
আফনেরে জিজ্ঞাসা করি
বিশ্‌শুদবারে না কথা দিছলাইন
যাবাইন আমার বাড়ি?

ঘটক : আরে বুঝতে আমার হয় না ভুল
ঘটকালীই আমার কাজ,
কি সমস্যা কইন আমারে
ভাইঙ্গা মনের লাজ?

www.pathagar.com

জয়ানন্দ : হুনইন ওরে মনের কথা হাছা কথাই বলি,
বিয়ার-বাতায় যাইবাইন কিন্তু পাতুয়ারি চলি।

হেইহানে বংশীদাসের কইন্যা কবি চন্দ্রবতী,
আন্দাইর ঘরে চাঁন্দের আলো আমার চৌক্ষের জ্যোতি।

চাইনা আমি টাকা-কড়ি গজমতির হার
থাক সুহে চন্দ্রাবতী সংসারে আমার।

ঘটক: কম কথার ছাওয়াল আমি বুদ্ধি বেইচ্যা খাই,
দুই এক মাসের মধ্যেই বাজবো নহবত সানাই।

দায়-দায়িত্ব নিয়া কইলাম চিন্তার কারণ নাই,
দক্ষিণা-টক্ষিণা যেন বেশি কইরা পাই।

আহন-নগদ কিছু দিতেই অইব যাইয়া মেলা দূরে-
বাদ্বাহি দেইন যে কর্তা শুভ কামের পরে ॥

দৃশ্য : সাত

[নিজগৃহে বংশীদাসের প্রার্থনা। সহযোগী-চন্দ্রাবতী।]
বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী :
গোসাঁই কর্তা, গোসাঁই কর্তা
আইছি আফনের বাড়ি,
মঙ্গল কয় অনাদি শংকর
অসীমের গতি তুমি মহেশ্বর
ধ্রুবজ্যোতি তুমি-অন্ধকারে
অধমে কর দয়া-পূজিব মনোহর ॥

[দূর থেকে ডাকতে ডাকতে ঘটক আসবে।
তাঁকে দেকে চন্দ্রবতীর প্রস্থান।]

ঘটক : গোসাঁই কর্তা, গোসাঁই কর্তা, আইছি আফনের বাড়ি,
শুভ সংবাদ, খুশির সংবাদ, হুনহাইন শীঘ্র করি।

শিয়ান অইছে কইন্যা আফনের রূপে বিদ্যাধরী,
কুলীন বংশে দেইন গো বিয়া ঘটকালী করি।

www.pathagar.com

বংশীদাস : কেউ বা বর কুন গাঁওয়ে ঘর শুইন্যা বিবরণ,
পছন্দ অইলে দিবাম বিয়া মনের মতন।

ঘটক : ফুলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ে সুইন্ধ্যা গাঁওয়ের চর,
ধনী বংশে আছে পাত্র কুলীনের ঘর।

জয়ানন্দ নাম তার কার্তিক কুমার।
চন্দ্রাবতীর যোগ্য বর অতি চমৎকার।

দেহিতে রাজার কুমার বিষয়ে মণ্ডিত
গুণে ভরা নানান শাস্ত্রে মহা সে পণ্ডিত।

বংশীদাস : আমার কাছে সাধ অনে সাধ্য কিছুই নাই
গুরুর কৃপায় কইন্যা দায়ে উদ্ধার যেন পাই

উচ্চ-বংশ, শাস্ত্র-জ্ঞানী যহন এই বর,
কথা দিলাম- দিবাম বিয়া এই ধনীর ঘর।

ঘটক : মন জুড়াইছে গোসাঁই আফনের
সুহের বাণী পাইয়া
তা অইলো-ফালগুন মাসের পঞ্চমীতে-
জয়া-চন্দ্রার বিয়া।

পাক্কা কথা অইছে সহসা নগদ কিছু দেইন
খুইল্যা যাবই চন্দ্রার ভাইগ্য কথা আমার নেইন।

দৃশ্য : আট

[জয়ানন্দের মামার বাড়ি।
জয়ানন্দ চন্দ্রবতীর সাথে বিয়ের জন্য মামিকে ফোসলাচ্ছে।]

জয়ানন্দ : তুমি জান মনের খবর কি কইয়াম আর
মামারে বুঝাইয়া তুমি দেহ আরেক বার।

হাতে ধরি পায়ে পড়ি মনের দিহে চাও-
তুমি আমার মায়ের মত আমারে বাঁচাও ॥

[মামার আগমনে জয়ানন্দের পলায়ন।]

মামি : ভাইব্যা না হয় দেহুইন একটু কি করণ যায়
ভাইগ্নার লাইগ্যা মায়া লাগে পড়ছি ভীষণ দায়।

www.pathagar.com

মামা : সমাজে কি বংশীদাসের আছে মান মর্যাদা
আসমানের চাঁদ ধরতে চায় ঐ হারামজাদা ?

গাঁও গেরামে ঘুইরা ফিরে গানের বুলি লইয়া
আমি থাকতে অইব না জয়া-চন্দার বিয়া ॥

দৃশ্য : নয়

নেপথ্য কণ্ঠ : মামার নির্দেশ শুইন্যা জয়া ঘর বাড়ি ছাড়িয়া-
প্রেমগুণে জ্বইলা মরে দিশাহারা হইয়া ॥

[নদীর ঘাট। অচৈতন্য জয়ানন্দ।
জয়ানন্দ : একটু জ... ল, একটু জল,... আঃ- আহ্... একটু জল।
কমলা কলসী থেকে জয়ানন্দকে জল ঢেলে দেবে।
জল পান শেষে উভয়ে উভয়ে দিকে অপলক চয়ে থাকবে।]

কমলা : কে তুমি ভিন গাঁওয়ের নাগর শরম বরম নাই
ফ্যাল ফ্যালাইয়া চাইয়া থাকলে কেমনে ঘরে যাই ?

কয়দিন ধইরা রসের নাগর উঁকি ঝুঁকি বাও
কথা থাকলে কও আমারে ফুলের মধু খাও

কমলাঃ কোন গেরামের নাগর তুমি কি নাম তুমার?
প্রাণ কাড়িল এই কমলার তুমি যে আমার-
নাগর তুমি যে আমার ॥

জয়ানন্দ : নাম আমার জয়ানন্দ সুইন্ধ্যা গাঁওয়ে বাড়ি
এই বয়সে আর দেহি নাই এমন রূপের নারী-
কইন্যা এমন রূপের নারী ॥

কমলা : আমি যে ভিন জাতের নারী কি করি উপায়
গলায় দড়ি ছাড়া আমার বাইচ্যা থাক দায়-
নাগর বাইচ্যা থাকায় দায় ॥

জয়ানন্দ : জাতের বালাই নাই যে আমার তুমিও মানুষ
ঘর বান্ধিলে কও আমারে মন দিলে নাই দোষ-
কইন্যা মন দিলে নাই দোষ ॥

www.pathagar.com

কমলা : কথা দিলাম সুনার চাঁন গো তুমায় করবাম বিয়া
মরণ অইলেও তুমায় নাগর যাইতাম না ছাড়িয়া-
নাগর যাইতাম না ছাড়িয়া ॥

জয়ানন্দ : কইন্যা-যাইও না ভুলিয়া

কমলা : নাগর- যাইতাম না ছাড়িয়া ॥

দৃশ্য : দশ

[চন্দ্রবতীর বিয়ের আসর ।]

বিয়ের গীত : শ্বশুর বাড়ি গিয়া কইন্যা থাকুক সোহাগে
সেকারণে কইন্যার মা ভাল সোহাগ মাগে ।

মাথায়- লক্ষ্মীর কুলা আইঞ্চলে ঘুরিয়া,
সোহাগ মাগে কইন্যার মা বাড়ি বাড়ি গিয়া ॥

চন্দ্রাবতীর বিয়া অইব আনন্দিত মন
চন্দ্রারে করায় বেশ যত নারীগণ ।

কাইরবনা পানি চন্দ্রা যতই করে বেশ
ধূপের ধুয়া দিয়ারে বসিত করে কেশ ।

গলাইতে হার দিল চন্দ্রা সুবর্ণের পাড়ি,
মইধ্যে মইধ্যে লাগাইছে সুবর্ণের ওখি ।

শরৎ : বন্ধ কর, বন্ধ কর, বিয়ার এই গীত
সর্বনাশ অইয়া গেছে কর্তা আইছুন ত্বরিত ।
জয়ানন্দ করছে বিয়া নিকাহ, অইছে মুসলমান
ভজন কীর্তন ছাইড়্যা দেয়- পাঁচ ওয়াক্ত আযান ।

ঘটক : স্বপ্নেও ভাবছিনা কর্তা করবো এমন কাম
পাপ কইরা ডুবাইছে শালা চৌদ্দ গুষ্ঠির নাম ।

নেপথ্য কণ্ঠ : আহারে দারুণ বিধি-কি কইব তোরে
এত দুঃখ দিয়ারে বিধি সৃজিলা আমারে ।

www.pathagar.com

দৃশ্য : এগার

[নির্জনে বসে শোকাহত নির্বাক চন্দ্রাবতী।
সখি মালতীর আগমন ও চন্দ্রবতীকে প্রবোধ।]

সখি : কি অইবো গো দুঃখ কইরা নিরালে বসিয়া,
পূর্ণিমার চান গ্রাস কইরাছে গ্রহণে আসিয়া।

তুমার দুঃখে আমার দুঃখী কি করি যে হায়
ভাইগ্যের লেহা চৌক্ষের জরে মুইছ্যা নাহি যায়রে
মুইছ্যা নাহি যায়।

ফুল বাগানের ফুল তুমি, তুমি গঙ্গাজল
ভক্তি ভইরা ডাহ শিবে পাবারে তার ফল।

দৃশ্য : বার

বয়াতী : আরে দিন যায় মাসও যায় বছর ঘুইরা আসে,
ফুলেশ্বরীর স্রোতের ঢল ঢলছে নিরুদ্দেশে।

চৌক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া পড়ছে ভীষণ ফান্দ
কর্ম্মদুষে জয়ানন্দের অইছে কাপাল মন্দ।
ভিন জাতেরে বিয়া কইরা না আইলরে সুখ,
মনের জ্বালায় জয়ানন্দর অঙ্গার অল বুক।

জয়ানন্দের পাগল মনে করে হাহাকার-
পত্র লেইখ্যা চন্দ্রারে দেখত চায় একবার ॥

দৃশ্য : তের

[চন্দ্রবতীর একাকী জয়ানন্দের পত্র পাঠ করবে।]

জয়ানন্দের কণ্ঠ : শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তুমারে জানাই
মনের আগুনে দেহ পুইড়্যা অইছে ছাই রে-
পুইড়্যা অইছে ছাই ॥

জানিয়া ফুলের মালা কালা সাপ গলে
মরণেরে ডাইক্যা আমি আইনাছি সকালে।

শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবন কালের মালা,
তুমারে দেখতে কইন্যা-মন অইল উতালা ॥

www.pathagar.com

বংশীদাসের প্রবেশ

চন্দ্রাবতী : শুন শুন বাপ ওগো শুন মোর কতা
তুমি সে বুঝিবে, আমি- দুঃখিনীর ব্যাথা-
শুন মোর কতা ॥

জয়ানন্দ লেখছে পত্র আমার গোচরে-
তিলেকের গাইগ্যা চায় দেহিতে আমারে ॥

বংশীদাস : শুন গো প্রাণের চন্দ্রা আমার কতা ধর
একমনে পূজ তুমি দেয় বিশ্বেশ্বর।

জায়ানন্দ করছে বিয়া তুমায় না করিয়া
সর্বনাইশ্যা ঝড়ে আমার সব নিছে কাড়িয়া।

আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র অইল
প্রেম-পূজার প্রাণ-প্রতিমা জলে বিসর্জিল ॥

জান্তে মরণ অইল তুমার যার কারণে,
হেরা কতা স্থান কইন্যা নাহি দিও মনে।

তুমারে যা কাইছি মাগো সেই কাজ কর
রামায়ণ লেহ আর পূজা নাগেশ্বর ॥

দৃশ্য : চৌদ্দ

[চন্দ্রাবতী লিখে চলেছেন। একাগ্র চিত্তে।]

নেপথ্যে পাঠ: বেদনা আর বিরহের অতল সমূদ্র থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠে- পিতার নির্দেশ আর সস্নেহ অনুপ্রেরণায় সমস্ত জীবন-যৌবন দেবতা শিবের পায়ে সঁপে দিয়ে চন্দ্রাবতী হৃদয় উজার করে দেন সারস্বত সাধনায়। ঠিক তখনই আমরা পাই-বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি- চন্দ্রবতীকে। পাই মহুয়া, দস্যু কেনারামের পালা এবং তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি 'বাংলা রামায়ণ'।

লিখে চলছেন চন্দ্রাতী। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। এমন সময় ভেসে আসবে জয়ানন্দের আকুল আর্ত।

www.pathagar.com

জয়ানন্দ : চন্দ্রাবতী... চন্দ্রাবতী... চন্দ্রাবতী...

চন্দ্রাবতী ঘরের দ্বারা বন্ধ করে দেবেনা। মঞ্চে প্রবেশ করবে উদভ্রান্ত জয়ানন্দ।

জয়ানন্দ : দ্বার খোল দ্বার খোল চন্দ্রা তুমার শুধাই,
জীবনের শেষ তুমায় একবার দেইখ্যা যাই-
গো একবার দেইখ্যা যাই।

না ছুঁইবাম না ধরবাম তুমায় দূরে থাইক্যা খাড়া,
পুণ্য মুখ দেইখ্যা তুমার জুড়াইবাম অন্তরা।

আর না দেখবাম তুমায় নয়ানে চাইয়া
দোষ ক্ষমা কর চন্দ্রা শেষ বিদায় দিয়া।

পাপীষ্ঠ জাইন্যা আমায় না অইলা সম্মত
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী-জনমের মত ॥

জয়ানন্দ : আঙিনার গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ফুলের রস দিয়ে মন্দির গাত্রে তার নাম লিখে ধীরে ধীরে চলে যাবে এবং নদীতে ঝাপ দেবে ...

দৃশ্য : পনের

পরের দিন সকাল। চন্দ্রবতী মন্দিরের দরজা খুলে বাইরে এসে মন্দির গাত্রে লেখা জয়ানন্দের নাম পড়ে চমকে উঠবে। সেই সাথী মালতীর আর্ত চিৎকারে দৌঁড়ে ছুটে যাবে নদীর ঘাটে। মৃত জয়ানন্দের লাশের উপর আচড়ে পড়বে।

চন্দ্রাবতী : বুকফাটা আর্তনাদে।

দৃশ্য : ষোল

বয়াতী : কাঁদে আজও ফুলেশ্বরী চন্দ্রাবতী নামে
আরও কাঁন্দে আকাশ বাতাস, জয়ানন্দ ধামে।

প্রেমাগুণে হইলা চন্দ্রা স্বর্ণের চেয়ে খাঁটি
জয়া-চন্দ্রার প্রেমে ধন্য পাতুয়ারীর মাটি-
ওগো-কিশোরগঞ্জে মাটি ॥

[উল্লেখ্য, মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নয়নচাঁদ ঘোষ এর পালা 'চন্দ্রাবতী'। এই প্রচলিত পালাটির আঞ্চলিক পরিবেশনায় ভূমিকা রেখেছেন লোকগীতিকার বিজয়কান্তি দাশ। তিনি পালাটি লোকনাট্যের আদলে নতুন করে রচনা ও সুরারোপ করেছেন।]

www.pathagar.com

২. বীরাঙ্গনা সখিনা'র পালা

চরিত্রলিপি

বয়াতি
ফিরোজ
উমর
বেগম আম্মা
সখিনা
দরিয়া
তসবীর
ওয়ালী
উজিরদ্বয়
সহকারী
বাঁদি
সৈনিক
রাজ নর্তকী ও
প্রজাবৃন্দ

সূচনা

কণ্ঠ : হাজার বছর ধরে বাঙালিরা শৌর্যে, বীর্যে, বীরত্বে, সংগ্রামী মহা সংগ্রামী। ইতিহাসে এই সত্য যুগে যুগে, কালে কালে, চির সবুজ উর্বরতায় সতেজ রেখেছে। বীর বাঙালির এই কিংবদন্তির জন্য আমরা গর্বিত ও চিরধন্য।

প্রায় চারশ বছর পূর্বে এদেশের সুলতানি শাসনের যখন পতন হয়, ঠিক তখনই দুর্দশাগ্রস্থ পরাধীন বাঙালির জীবনে স্বাধীকার আর স্বাধীনতার পথিকৃৎ হয়ে আবির্ভূত হলেন, মুক্তি পাগল, বীরযোদ্ধা, বাংলার, বার ভূঞাগণ।

তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বর্ণ মুকুটধারী ঈশা খাঁ অন্যতম। অসাধারণ বুদ্ধি, আর বাহুবলে তিনি ২২টি পরগনার আধিপত্য আর রণকৌশলে ছিলেন চিন্তিত। ঈশা খাঁর সংগ্রামী অগ্রযাত্রা স্তব্ধ করে দিতে পাঠালেন মোগল বাহিনী। কিন্তু বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, এই মন্ত্র ধারণ করে বীর ঈশা খাঁ ছিলেন অটল-অবিচল। তার ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তায় বজ্র কঠিন অস্ত্রে শেষ পর্যন্ত মোগল সেনাপতি মানসিংহ মৈত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তখন দেশবাসী, এই মৈত্র চুক্তির সুফল ভোগ করতে পেরেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-কিছুদিন যেতে না যেতেই বীর ঈশা খাঁ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তারই পুত্র মুসা খাঁ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। মুসা খাঁ-এর দুর্বলতার সুযোগ মুঘলরা মৈত্রচুক্তি অবজ্ঞা করে। ফলে মুঘলদের শাসন আর শোষণ বাঙালিরা নিয়তি বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সেই দুঃসময়ে দেওয়ান মুসা খাঁ হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন।

এই সংকট মুহূর্তে পরগনাগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব আর স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য বীর বিক্রমের এগিয়ে এলেন তারই পুত্র দেওয়ান ফিরোজ খাঁ।

***

www.pathagar.com

১ম দৃশ্য

বয়াতির প্রবেশ

বয়াতি : সভা করে আছেন যত
ভদ্র সুধীজন
সবারে চরণে ভক্তি
করিলাম অর্পণ।

আল্লা নবীর নাম নিয়া
পালা করলাম শুরু
ভুলক্রুটি ক্ষমা করবেন,
ময়মুরুব্বি গুরু।

এই আসরে জাগলো প্রাণে
দুঃখ সুখের কথারে
গাই সকলে আমরা
সখিনার পালারে। ২

সেই মুসা খাঁ এর পুত্র
বীর ফিরোজ খান
পরগনার দায়িত্ব পাইয়া
হইলোরে দেওয়ান।

সারাক্ষণভাবে ফিরোজ
স্বাধীন সুখী দেশ
মোগলের শোষণ জ্বালা,
কখন হইব শেষ। ঐ

ফিরোজ খাঁ দেওয়ানি লইয়া,
থাকে ব্যস্ত হইয়া
বয়স হইয়াছে তার
না কইরাছে বিয়া

দেশ বিদেশ হইতে আসে
পয়গাম বিয়ার
পছন্দের মত হয় না
যোগ্য পরিবার। ঐ

আছেন যত সুধীজন,
শোনেন দিয়া মন

www.pathagar.com

সেই সখিনার কথা,
করিব বর্ণন

সখিনার পালারে শোনাই
আমরা এই আসরে। ২
কেল্লাতাজ পুরের জানি
ওমর খাঁ দেওয়ান
তাহার সুন্দরী কন্যা
সখিনা তার নাম।

সে সখিনা জানি
অস্ত্র বিদ্যা শিখে
তার কোন জুড়ি নাই
এই মুল্লুকে ॥ ঐ

তসবির ওয়ালি আসে একদিন
জংগল বাড়িতে
সখিনার তসবির দিল
বেগম আম্মার হতে

পাইল বেগম আম্মা,
সখিনার সন্ধান
ভাবতে মজিল মন,
ভাবেতে মজিল মন,
ফিরোজ দেওয়ান ॥ ঐ

আলো নিভে যাবে
***

২য় দৃশ্য
জংগল বাড়ির মহল
তসবিরওয়ালি : তসবিরওয়ালি- আরে ও তসবিরওয়ালি (৩)

তসবিরওয়ালি তসবির বেচি,
এই তো আমার পেশা
হরেক রকম তসবির আছে,
মিটাই মনের আশা ॥
তসবির ওয়ালি-তসবির বেচি ॥ (২)

আছে আছে আমার কাছে
কত সুন্দরীর তসবির

www.pathagar.com

নয়ন জুড়াইবো গো জানি,
মন হইবো অস্থির

আরে আছে রাজা বাদশার,
রাজকুমার ফকির
মনে চাইলে দেখেন আইসা
আমার তসবির

তসবিরওয়ালি-তসবির বেচি...॥ (৩)

দরিয়ার প্রবেশ

দরিয়া : তসবিরওয়ালি- তসবিরওয়ালি,
ডাকি যে আমি তোমার কাছে রূপবতীর
তসবির আছেনি ॥

তসবিরওয়ালি : আছে কত রূপবতী
পায়ে পড়ে চুল
মুখের হাসিতে গো ঝড়ে
কনক চম্পা ফুল
যৌবন ভরা ঢলমল
কাজল কালো আঁখি
কত ভ্রমর উইড়া গো আসে
কন্যার রূপ দেখি
তসবিরওয়ালি- তসবির বেচি। (৩)

দরিয়া : শোন শোন তসবিরওয়ালি
বলি যে তোমারে
তোমার সকল তসবির দেখাও
বেগম আম্মারে ॥

আলো নিভে যাবে
***

৩য় দৃশ্য
জংগল বাড়ির মহল

দরিয়া : এই সেই তসবিরওয়ালি
বেগম আম্মাজান
তার কাছে আছে তসবির
সুন্দরীর সন্ধান।

www.pathagar.com

আম্মা : দেখাও তোমার সকল তসবির
ওগো তসবিরওয়ালি
পছন্দ হইলে আমার
ইনাম পাবে তুমি

তসবির দেখা ও পছন্দ

আম্মা : শোন শোন তসবিরওয়ালি
বলি যে তোমারে
এই কন্যা পয়দা হইছে
কোন বাপের ঘরে।

তসবিরওয়ালি : এই কন্যা পয়দা হইছে
উমর খাঁর ঘরে
দেওয়ানগিরি করে জানি
কেল্লাতাজ পুরে ॥

রূপবতী কন্যা জানি
গায়ে পদ্মের বাস
দু চক্ষে দেখিয়া তারে
না মিটে তিয়াস

চলিতে ফিরিতে কন্যার
যৈবন ঢলিয়া পড়েরে
যৌবন ঢলে পড়ে ॥ ঐ

আম্মা : এই দিলাম ইনাম তোমার
ওগো তসবিরওয়ালি
আইস তুমি আমার কাছে
এখন যাও চলি ॥

তসবিরওয়ালির প্রস্থান

আম্মা : চলরে দরিয়া চল
ফিরুজের দরবারে
পছন্দ করিবে জানি
এই কন্যারে ॥

আলো নিভে যাবে
***

www.pathagar.com

চতুর্থ দৃশ্য

ফিরোজ দেওয়ানের দরবার

কণ্ঠ : হু-শি-য়া-র, হু-শি-য়া-র মসনদে আলা, দেওয়ান ফিরুজ খাঁ হুজুর, দরবারে তাসরিফ রাখছেন- হু-শি-য়া-র, হু-শি-য়া-র ॥

সভাসদ : খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ।

ফিরুজ : প্রিয় সভাসদগণ
শোনেন দিয়া মন
জরুরি কার্যের কথা
করিবো বর্ণন

সভাসদ : দেওয়ান হুজুর জিন্দাবাদ (২)
ফিরোজ : পরাগনার যতো খাজনা পাই

ফিরোজ : পরগনার যতো খাজনা পাই
তার আধাআধি
দিল্লীর দরবারে দিয়া
পরগনার প্রজাবৃন্দ
কষ্টে কাটায় দিন
নতশীর হইয়া চলে
সুখ শান্তিহীন ॥

উজির : এই অবস্থা আমাদের
বড় অসম্মান
শাসন শোষণের ফলে
যায় যেন প্রাণ।

ফিরোজঃ আর নয় মৈত্র
নয় গলায় ফাঁস
নতশীর আর নয়
নয় দীর্ঘশ্বাস।

উজির : হঠাৎ কিছু করলে
বিপদ আনা হবে
মোগল দেওয়ান কি
চুপচাপ করে।

www.pathagar.com

ফিরোজ : যা আছে কপালে
শোনেন মিয়াগণ
প্রজার সুখের লাগি
যাক এ প্রাণ।

সবার সুখ শান্তির জন্য
সবাই দেবেন মন
এ আমার অনুরোধে
এ আমার আদেশ
শোনো সভাসদগণ ॥

সভাসদ : দেওয়ন হুজুর জিন্দাবাদ (২)

ফিরোজ : আজকের মত দরবার মুলতবি ঘোষণা করছি।
সভাসদের প্রস্থান
আসবে দরিয়া

দরিয়া : হুজুর আলা, বেগম আম্মা...জান ॥
ফিরোজ : কোথায় আম্মাজান...আম্মাজান।

বেগম আম্মার প্রবেশ
দরিয়া প্রস্থান

আম্মা : শোন প্রাণের পুত্র
বলি যে তোমারে
সাদি এখন করো বাবা
বৌ আন ঘরে।

ফিরোজ : দেওয়ানিতে ব্যস্ত থাকি
সময় কোথায় পাই।
এইতো আম্মা সুখে আছি
কোন দুঃখ নাই

আম্মা : আমার হুকুম পালন কর
তোমারে জানাই
জীবন থাকিতে আমি
বৌ দেখতে চাই।

www.pathagar.com

ফিরোজ : আপনার হুকুম করব পালন
অতি শীঘ্র করে।
আর ক'টা দিন সময় যে চাই
জানাবো আপনারে।

আম্মা : এই দেখো তসবিরখানা
তোমার মত চাই
পছন্দ হইলে জানাও
পয়গাম পাঠাই।

ফিরোজ : কি যে তার পরিচয়
কি তার ঠিকানা
বলেন সবই আম্মাজান
হউক আমার জানা।

আম্মা : কেল্লাতাজপুরের উমর খাঁ
বড় সে দেওয়ান
তাহার সুন্দরি কন্যা
সখিনা তার নাম।

বেগম আম্মার প্রস্থান

ফিরোজ : এমন সুন্দরী কন্যা
নিল মন কাড়ি
যাবো আমি তার তালাশে
লইয়া বেশ ফকিরি।

চমকিয়া উঠিল মন
তসবিতে দেখিয়া
এতদিন কই আছিল গো
কোথায় লোকাইয়া

পাগল করিল আমায়
তসবীর সুন্দরী ॥
আলো নিবে যাবে
ঘোড়ার শব্দ
***

www.pathagar.com

৫ম দৃশ্য

কেল্লাতাজ পুরের বাগান বাড়ি

সখিনা ও সহচরী : মন বগানে ফুইটাছে ফুল
রাখলো না খবর
কোথায় জানি আছে
রঙ্গীলা ভ্রমর ॥ (২)

ডালে ডালে ফুল হাসে
ছড়াই গো মধুর সুবাসে
আইলো নাতো হেসে হেসে
করিতাম আদর ॥

ফুলের মধু থৈ থৈ
রসিক ভ্রমর গেল কই
পন্থের পানে চাইয়া রই
কান্দে যে অন্তর ॥

বাঁশির প্রবেশ

বাঁদি : শোনেন শোনেন রাজকুমারী
শোনেন কই আপনারে
ফুল বাগানে ভিনদেশী এক
লোকাচুরি করে।

সখিনা : ফুলবাগানে লোকচুরি
এত সাহস কার।
ধরে নিয়ে আয় তোরা
করিবাম বিচার।
বাঁদির ও ফিরোজসহ প্রবেশ

সখিনা : কে তুমি ভিনদেশী
আমি জিজ্ঞাস করি
কেনে আমার ফুলবাগানে
করছ লোকচুরি।

ফিরোজ : নাই আমার ঘর ঠিকানা
পথে পথে ঘুরি
তাহার সন্ধানে
লাইয়াছি ফকিরি।

www.pathagar.com

সখিনা : এই বয়সে ফকিরি
না হয় মানানসই
সত্য কথা বলো ফকির
আমি অবাক হই।

ফিরোজ : কঠিন রোগের দাওয়াই দিয়া
তারে সুস্থ করি।
কবিরাজী আমার কাজ
ওগো রাজকুমারী।

সখিনা : পিতা আমার কঠিন রোগে
বড়ই যে কাতর
সুস্থ যদি করতে পার
পাইব তার আদর।

ফিরোজ : চলে আপনার পিতার কাছে
দেখি চেষ্টা করে
ইনশাল্লাহ হবেন সুস্থ
বলি যে আপনারে।

সখিনা : নিয়ে যা ভিনদেশীরে
মেহমানখানায় তারে
সব কিছু বলবে গিয়া
পিতার গোচারে ॥

বাঁদি, সহচারী, ফিরোজের প্রস্থান

সখিনা : এই সয়সে ফকিরি
বুঝি না কি করণ
তারে দেখিযা আমার
কেমন কেমন করে মন

দেখব আমি তার চালাকি
চুপিচুপিসারে
মিথ্যে যদি হয়গো কথা
রাখব বন্দি করে ॥

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ দৃশ্য

বয়াতি

বয়াতি : সখিনার পালারে, শোনাই
আমরা এই আসরে ॥ (২)

ফুল বাগানে পাই দেখা
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান
উরম খাঁ এর করতে সেবা
হইল মেহমান

লক্ষ্য রাখে চুপিচুপি
সখিনা শাহজাদী
বুঝতে কারণ এই বয়সে
কেন ফকিরির॥

যায় যায় দিন যায়
ফিরোজ ধরা পরে
সত্য কথা বলে ফিরোজ
সুন্দরী সখিনারে

শুনিয়া সখিনার তখন
যায় গলে মন
ভালোবাসায় পড়লো ধরা
দুটি জীবন

আলো নিভে যাবে

৭ম দৃশ্য

কেল্লাতাজপুরের বাগান বাড়ি

ফিরোজ : কি দেখিলাম দু নয়নে
আমি গো, সুন্দরী
এতদিন কই আছিলা লুকাইয়া

মন উদাসী, দিবানিশি
তোমার কাছে পাই গো ॥

সখিনা : কি জাদু করিলা বন্ধু
আইসা গো, ও ভিনদেশী

www.pathagar.com

পরান কান্দে তোমার লাগিয়া
মন উদাসী, দিবানিশি
তোমারে দেখিয়ারে ॥

সখিনা : তোমার মুখের মধুর বাণী
মন নিল কাড়িয়া
তুমি আমার আমি তোমার
জনমের লাগিয়ারে ॥

ফিরোজ : আমি যে তোমারি পাগল
সব দিলাম সপিয়া
অবুঝ মনে দিলে দুঃখ
যাইবো গো মরিয়ারে ॥

সখিনা : এই কথা রাইখো মনে
যাইওনা ভুলিয়া
আকাশ বাতাস চন্দ্র
তারা রইলো সাক্ষি হইয়ারে ॥

ফিরোজ : এতদিন কই...
সখিনা : পরাণ কান্দে ...

আলো নিভে যাবে
***

৮ম দৃশ্য
উমর খাঁর দরবার কক্ষ

উমর : প্রিয় সভাসদবৃন্দ,
আমি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ
এই ফকিরের সেবায়
আমি রাগ থেকে মুক্তি পেয়েছি মুক্তি
মহান আল্লাহর কাছে হাজার শোকরিয়া
দিয়েছেন শক্তি।

দরবারি : দেওয়ান হুজুর, জিন্দাবাদ ॥ (২)

উমর : শোন শোন ওরে ফকির
শোন কই তোমারে

www.pathagar.com

তোমার দাওয়াইয়ে ভালো
কইরাছো আমারে।

ফিরোজ : আমি তো উছিল হুজুর
উপরওয়ালা যিনি
তাহার দয়ায় সুস্থ
হইয়াছেন আপনি।

ওমর : চমৎকার তোমার কথা
চলো তুমি কি চাও
আমার ইচ্ছা এখান থেকে
খুশি হয়ে যাও।

ফিরোজ : আজ চাইবো না
আর একদিন আসিয়া
তখন যেন খালি হাতে
না দেন ফিরাইয়া।

উমর : যখন তোমার ইচ্ছা হবে
আসবে নির্দ্বিধায়
থাকবে তুমি সমাদরে
আমার মেহমানখানায়।

ফিরোজ : আমি তবে আসি হুজুর

ফিরোজের প্রস্থান

উমর : এসো ফিকির।

উজির : একটি সু সংবাদ আছে
উমর : বলুন কি সুসংবাদ-উজির সাহেব।
উজির : শাহ্জাদী মা সখিনা
অস্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী

তার সামনে অস্ত্রধারণ
এই মুল্লুকে কেউ নেই হুজুর।

উমর : মারহাবা, মারহাবা

উৎসব করুন সবে
আজ দিবা রাত্রি

www.pathagar.com

মুখরিত হয় যেন
এই রাজ বাড়ি।

রাজ নর্তকীর প্রবেশ
আলো নিভে যাবে
***

নবম দৃশ্য
সখিনা ও ফিরোজের কল্পনা

সখিনা: সময় কাটে না আমার
ভালো লাগে না।
প্রাণ বন্দুয়ার খবর আসে না-২

ফিরোজ : মনতো বসে না কাজে
মনতো বসেনা
দিবানিশি দুই নয়নে
ভাসে সখিনা-২

সখিনা: গেলা বন্ধু চলিয়া
পাগল করিয়া
আইবা তুমি আমার কাছে
থাকি পন্থ চাইয়া।

তুমি আমার দীলের মজনু
হইছি লাইলি দিওয়ানা।

ফিরোজ : কি যাদু করিলা
মন যে নিলা
কোনদিন তুমি হইবা আমার
মন যে উতালা

ভাবি শুধু তোমার কথা
আরতো কিছু বুঝি না।

আলো নিভে যাবে
***

www.pathagar.com

১০ম দৃশ্য

ওমর খাঁর দরবার কক্ষ

উমর : উজির সাহেব-

উজির: হুজুর

উমর : কালিদাস গজদানীর বংশধর, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ভাটির মুলুক নিয়া স্বাধীন হইতে চান।

উজির : কীট পতঙ্গের হুজুর
পাক উঠছে দেখি।
সোজা পথ ছাইড়া
করে উঁকি ঝুঁকি।

উমর : এস্তেলা পাঠান তারে
সঠিক ফিরোজ চাই
আর আনুগত্য ছাড়া তার
কোন পথ নাই।

উজির: হুজুর, জংগল বাড়ির
উজিরে আজম
আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী তাই
তার আগমন।

উমর: দরবারে হাজির করা হউক।

জংগল বাড়ির উজিরের প্রবেশ

উজির: হুজুরে আলা আমি জংগলবাড়ির
উজিরে আজম
বেগম আম্মা পাঠিয়েছেন
পত্র আর উপঢৌকন

পত্র হস্তান্তর ও পাঠ

আম্মাজান : ছালাম নিবেন দেওয়ান সাহেব
জানাই আপনারে
পুত্র বধূ করিতে চাই
আপনার কন্যারে।

www.pathagar.com

উমর : যত বড় দেওয়ান না সে
তার চেয়ে বড় কথা
যদি একবার সামনে পাইতাম
কাটাতাম তার মাথা

এই বেটা নাফরমানকে
তাড়ান দরবার থেকে।
আকাশ চুম্বির স্পর্ধা তাদের
কোথাকার সে কে

জংগল বাড়ির উজিরের প্রস্থান

উজির : মান্যগণ্য আদব কায়দা
লেশ মাত্র নাই
ইচ্ছে করে শাস্তি দিতে
জংগল বাড়ি যাই।

উমর: উমর খাঁর কন্যা চায়
কাফেরের ঘরে
সর্ব অংগ জ্বলে আমার
পত্রখানা পড়ে

আসুন আপনারা।
আলো নিভে যাবে

১১তম দৃশ্য

কেল্লাতাজ পুরের বাগান বাড়ি

সখিনা : ভালবাসলাম তোমায়
বন্ধু মন দিয়া
তোমায় আমি কেমন করে
যাইব ভুলিয়ারে বন্ধু
যাইবো ভুলিয়া।

আগে যাদি জানতাম পিতার
এমন কঠিন হিয়া
না জড়াইতাম ভালবাসায়
তোমারে দেখিয়া
অন্তর আমার পুড়িয়া গেল জ্বলিয়া ॥

www.pathagar.com

বুক ফাটেতো মুখ ফোটে না
মরি ধরফরাইয়া
কি করিব কোথায় যাবো
শুধু যাই ভাবিয়া
তুষের অনল নিভাই
বন্ধু কি দিয়া।

আলো নিভে যাবে

১২তম দৃশ্য
বয়াতি

বয়াতি: সখিনারে পালারে ...

বিয়ার পয়গাম শুনে
উমর খাঁ দেওয়ান
উজিরকে তাড়াইয়া দিল
কইরা অপমান

শুনিয়া ফিরোজ দেওয়ান
হইলরে আস্থির
লড়াই করে সখিনারে
আনতে মনস্থির।

লড়াইয়ের শব্দ

কেল্লাতাজপুরের মাঠ
রক্তে ভইরা গেল
উমর খাঁ দেওয়ান শেষে
পরাস্ত হইলো

আনলো ফিরোজ সখিনারে
জংগল বাড়ীতে
উৎসব করিল বিয়ার
সারা পরগণাতে।

আলো নিভে যাবে
***

www.pathagar.com

১৩তম দৃশ্য

জংগল বাড়ির মহল

প্রজাবৃন্দ : জংগল বাড়ির চৌদিকেগো
দেশ খুশির রোল
কেউবা বাটে হলুট মেন্দি
কেউবা আঁকে ফুল

আকাশে ঐ তারা ফোটে
মিটি মিটি হাসে
সারাদেশ ভইরা গেল
মধুর সুভাসে

দেওয়ান হুজুরের শাদী

সখিনা ও ফিরোজের প্রবেশ

দলে দলে প্রজাবৃন্দ
আইলো নাচিয়া
সারা অংগে দিল রে রং
ছিটাইয়া ছিটাইয়া

খুশির জোয়ারে মেরা
হইলামরে মশগুল

আলো নিভে যাবে

***

১৪তম দৃশ্য

উমর খাঁর মহল

উমর : হঠাৎ আক্রমণ করে
কাফেরের সন্তান
প্রতিশোধ নিব আমি
এই অপমান

যাবে আমি মোগল সম্রাট
দিল্লীর দরবারে
আনবো আমি মোগল সৈন্য
দেখব আমি তারে

www.pathagar.com

রণের জন্য প্রস্তুত হও
শোন দিয়া মন
প্রতিশোধ নিতে হবে
থাকিতে জীবন।

আলো নিভে যাবে
***

১৫তম দৃশ্য
জংগল বাড়ির মহল
ফিরোজ: শোনেন ওগো আম্মাজান
শোনেন কই আপনারে
রণ করিতে যাইবাম আমি
কেল্লাতাজপুরে।

আম্মা: যাও পুত্র বীর বিক্রমে
কেল্লাতাজপুরে
উপযুক্ত শিক্ষা দিও
উমর খাঁ দেওয়ানরে।

ফিরোজ: মোগল সৈন্য নিয়া আম্মা
উমর খাঁ দেওয়ান
হাজির হইছে শুনি
লড়াইয়ের ময়দান।

আম্মা : বীর ঈশা খাঁর নাতি তুমি
ভাব তার কথা
তার কণ্ঠে ধ্বনি ছিল
চাই স্বাধীনতা॥

ফিরোজ : তারই স্মৃতি বুকে নিয়ে
হবো আগুয়ান
মানবো না কোন বাঁধা
এই পণ আম্মাজান।

আম্মা: দেখাও তোমার বীরত্ব
ঐ না রণে মাঠে

www.pathagar.com

ফিরে এসো জয়ী হইয়া
সম্মানের সাথে

সখিনার অস্ত্র হাতে প্রবেশ
ফিরোজকে অস্ত্র দেবে।
আলো নিভে যাবে
***

১৬তম দৃশ্য
লড়াইয়ের মাঠে
সমস্বরে : আগে বাড়ো। আক্রমণ
ফিরোজ ও উমর খাঁর লড়াই
ফিরোজ বন্দী
আলো নিভে যাবে।
***

১৭তম দৃশ্য
সখিনাঃ তুইলা আন চম্পা বকুল
মালা গাথিবো।
রণে জয়ী আইলে স্বামী
গলায় পড়াইবো।

ভাণ্ডে আছে আতর গোলাপ
আনোগা রাখিয়া
সোনার বাটায় সাজাবো পান
স্বামীর লাগিয়া

আবির পাংখা আইনা রাখো
বাতাস করিব।

দরিয়ার প্রবেশ
দিরয়া : শোনেন শোনেন ওগো বিবি
কই যে আপনরে
দেওয়ান হুজুর হইলেন বন্দি
কেল্লাতাজপুরে
সখিনা : না, না, না
অন্তর ফাইটা যায়
কি করিব কোথায় যাবো
হবে কি উপায় রে বন্ধুরে

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর পিতার অবিচারে
স্বামী কারাগারে
কি দিয়া নিবাইবাম অনলে
সব অঙ্গ জ্বলেরে।

দরিয়ার প্রস্থান
বেগম আম্মার প্রবেশ

শোন শোন প্রাণের বধু
শোন কই তোমারে
পুত্র আমার হইল বন্দি
কেল্লাতাজপুরে

ফিরোজ ছাড়া কেমন কাটাই
দিবানিশি আমার
তুমিই পার প্রাণ পুত্ররে
মুক্ত করিবার ॥

সখিনা: বিদায় দেন আম্মাজান গো
বিদায় দেন আমারে
রণ করিতে যাইবাম আমি
কেল্লাতাজপুরে।

দোয়া করেন আম্মাজান গো
লড়াইও করিয়া।
আপনার পুত্রের আমি
আনবো ছিনাইয়াগো।

দরিয়ার অস্ত্র হাতে প্রবেশ
আলো নিভে যাবে
***

১৮তম দৃশ্য
বয়াতি
বয়াতি: সখিনার পালারে
সাজিল সখিনা বিবি
বীরাঙ্গনা সাজে

www.pathagar.com

কিছুতেই অংগরূপ
ঢাকা পরে না যে

খোপা কইরা বান্দে বিবি
কালো দীঘল কেশ
অংগেতে পরিয়া নিল
পুরুষের বেশ

যায়রে সখিনা বিবি
লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে
কোশবদ্ধ অসি লয়ে
সেনাপতির বেশে
সাথে লয়ে বহু সৈন্য
রণের ত্যাজি ঘোড়া
পিতার বিরুদ্ধে কন্যা
রণের মাঠে খাড়া।

আলো নিভে যাবে
***

১৯তম দৃশ্য

উমর খাঁর কারাগারে

উমর: সখিনাকে তালাক দাও
যত শীঘ্র করে
নৈলে আগুন জ্বলবে ঐ
জংগলবাড়ির ঘরে।

ফিরোজ: জীবন যদি চলে যায়
কোন দুঃখ নাই
শোনবোনা কোন কথা
আপনাকে জানাই।

উমর: মারো চাবুক সর্ব অঙ্গে
বুঝুক হাড়ে হাড়ে
তালাক দিলে পাবে মুক্তি
কন্যা সখিনারে।

চাবুক মারা উজিরের প্রবেশ

উজির: সর্বনাশ হলো হুজুর
জানাই আপনারে

www.pathagar.com

জংগলবাড়ির সৈন্যদল
আক্রমণ করে।

উমর: খামোশ
এত বড় সাহস তারা
বল কোথায় পায়
এমন শিক্ষা দিতে হবে পালিয়ে না যায়।

উজির: তরুণ সেনাপতি
অপূর্ব কৌশল
অসীম প্রেরণা নিয়ে
এগুচ্ছে সেনাদল।

উমর: রোগে দাড়ান শক্তি নিয়ে
যান তাড়াতাড়ি
ধ্বংস করে দিতে হবে
ঐ জংগলবাড়ী।

উজির : কোণঠাসা করে দিল
তাদের সেনা দল
আমাদের মোগল সৈন্য
হতবাক প্রায়।

উমর: সন্ধির প্রস্তাব পাঠান
অতি তাড়াতাড়ি
তার আগে আসুন কাছে
পরামর্শ করি।

হাঃ হাঃ হাঃ

তালাক নেওয়ার দৃশ্য
আলো নিভে যাবে
***

২০ তম দৃশ্য

কেল্লাতাজপুরের মাঠ

সৈনিক : সেলাম সেনাপতি।

সখিনা: কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক : উমর খাঁ স্বন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

সখিনাঃ যান, সকল সৈন্যদলকে
নিয়ে বিশ্রাম করেন
আর, দেওয়ান ফিরোজ খাঁর

সৈনিক: দেওয়ান ফিরোজ খাঁ হুজুর, মুক্তি পেয়ে জংগলবাড়ির উদ্দেশ্যে
রওনা দিয়েছেন-কিন্তু

সখিনাঃ কিন্তু কি সৈনিক?

সৈনিক: তিনি তার বিবিকে তালাক দিয়েছেন।

সখিনা : না... না... না...

সৈনিক : এই তার তালাকনামা

হস্তান্তর ও প্রস্তান

সখিনা : না... না... না...
এতো নিষ্ঠুর হইলারে বন্ধু
এতো নিষ্ঠুর হইলা।

বিনা দোষে দোষী কইরা
বিনা দোষে দোষী কইরা
আমায় দুঃখ দিলারে বন্ধু

সখিনার মৃত্যু

নেপথ্য কণ্ঠ : তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত লড়াই করে যে সখিনা বিন্দু মাত্র বিচলিত হয়নি-ক্লান্ত হয়নি- সেই মহিয়সী- রণরঙ্গীনী দেওয়ান ফিরোজের দেওয়া তালাক নামার কয়েকটি অক্ষরে পড়ে তার বুকের পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সখিনার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উমর খাঁর প্রবেশ

উমর : এই কি করলাম আমি
এই কি করলাম আমি,

www.pathagar.com

মনের জিদে নিজের হাতে
মারিলাম কন্যারে

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মা,
নিষ্ঠুর পিতারে।

পিরোজের প্রবেশ

ফিরোজ : বিনা দোষে দোষী হইয়া
দিলরে জীবন
এইতো আছিল আমার
ভাগ্যের লিখন

পইড়া থাকুক দেওয়ানগীরি
পইড়া থাকুক ঘর
আজি হইতে তোমার
লাগি হইলাম দেশান্তর

প্রজাবৃন্দের প্রবেশ

বয়াতি: হাতের মেন্দি না শুকাইতে
তথাপি সখিনা
স্বামীর জন্য জীবন দিয়া
হইলো বীরাঙ্গণা।

আকাশ কান্দে, বাতাস কান্দে
কান্দে বৃক্ষ লতা
অমর হইয়া রইলো আজও
সখিনার কতা।

যবনিক
* * *

[উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত 'বীরাঙ্গনা সখিনা'র পালাটির অঞ্চলিক পরিবেশনায় ভূমিকা রেখেছেন লোকগীতিকার মুক্তি চৌধুরী। তিনি পালাটি লোকনাট্যের আদলে নতুন করে রচনা ও সুরারোপ করেছেন।]

www.pathagar.com

৩. মহুয়া পালা

চরিত্রলিপি

বায়াতি	:	গায়েন (কাহিনি বর্ণনাকারী)
হোমরা	:	বেদের সর্দার।
মানিক	:	বেদের সহচর
নদের চাঁদ	:	কাঞ্চনপুরের জমিদার।
ঐ বন্ধু	:	নদের চাঁদের বন্ধু।
মহুয়া	:	হোমরার পালিত কন্যা
পালং সখি	:	মহুয়া প্রধান সখি
বেদেনীর দল	:	বেদের দলের মহিলা কর্মী
বাইদ্যার দল	:	বেদের দলের পুরুষ কর্মী
সওদাগর	:	ব্যাপারি
মাঝির দল	:	নৌকা চালক
মহুয়া (২জন)	:	১ম মহুয়া (৬ বছর) এবং ২য় মহুয়া (১২ বছর)

১ম দৃশ্য

ঝড়-বাতাস। অন্ধকার রাত। মানুষের চিৎকার সাসপেন্স মিউজিক।

কণ্ঠ : ডাকাইত আইছে, ডাকাইত আইছে-সাবধান, সাবধান
আবছা অন্ধকারে হোমরা শিশু কন্যা নিয়ে পালাবে

২য় দৃশ্য

বায়াতি: পুবেতে বন্দনা করিলাম, পুবের ভানুশ্বর
একদিনে উদয় গো ভানু, চৌদিকে পশর।

দক্ষিণে বন্দনা করি, নদী ও সাগর
সেইখানে বাণিজ্য করে চান্দ সওদাগর।

উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস পর্বত
সেইখানে পড়িয়া আছে আলী মালাবের পাথর।

পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা হেন স্থান
উদ্দেশ্যে বাড়ায় গো সেলাম মুমিন মুসলমান।

ধুয়া : ও বিধি, বিধিরে
আমার এত দুঃখ ছেলরে কপালে।
খেমটা তালে ধীরে ধীরে বাজাইয়া যাও বাই
মহুয়া সুন্দরীর পালা সবারে শুনাই।

www.pathagar.com

বয়াতি তাহলে গান ধরবে

কোরস: সাধের নীল ভ্রমরা রে
গুন গুনাইয়া গান গাইও না।
গানের সুরে পাগল করে
মনতো ঘরে বসে না।
বয়াতি: উত্তরে না গাড়ো পাহাড় তার পরে বন
দিনে রাইতে শুনা যায় বাঘের গর্জন

সেই বনেতে বাস করিত হোমরা বাইদ্যা নাম
তাহার কথা শুন কইরে, হিন্দু মুসলমান।

ডাকাতি করিত বেডা ডাকাইতের সর্দার
দলবল লইয়া আইল ধনু নদীর পাড়।

কাঞ্চনপুরের গ্রামে তারা রাত্রে নিশা কালে
ধন দৌলত না পাইয়া শিশু আনলো ঘরে ॥

কোরাস: সাধের নীল ভ্রমরা রে
গুন গুনাইয়া গান গাইও না।
গানের সুরে পাগল করে
মনতো ঘরে বসে না।

বয়াতির প্রস্থান

সমবেত গান : আরে ও ও ও আয়রে সোনা মানিক ভাই
গাও গেরামের ঘুইরা চর তামাশা দেখাই,
সোনা মানিক ভাই ॥

তোতা আছে, ময়না আছে, আরও আছে টিয়া
সোনামুখী দোয়েল রাখছি ॥
পিঞ্জিরায় ভরিয়া
আরে ও ও ও আয়রে সোনা মানিক ভাই
গাও গেরামে ঘুইরা চল তামাশা দেখাই ॥

শিশু কন্যাকে নাচ গান শিখাবে ধীরে ধীরে মহুয়া বড় হবে মঞ্চ অন্ধকার

www.pathagar.com

৩য় দৃশ্য

বায়াতি: এক দুই তিন কইরা ষোল বছর যায়।
খেলা আর তামাশা তারে যতনে শিখায়।

সাপের মাথায় যেমুন ভাই থাইক্যা জ্বলে মনি
তারে দেইখা পাগল সবে বাইদ্যার নন্দিনী।

আন্দার ঘরে শুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা
হাঁটিয়া না যাইতে কন্যার পাও যে পরে না।

কোরাস: সাধের নীল ভ্রমরা রে
গুন গুনাইয়া গান গাইও না।
গানের সুরে পাগলা করে
মন তো ঘরে বসে না।

৪র্থ দৃশ্য

হোমরা বেদের নাচ ও গীত- সময় সকাল, হোমরা ডুগডুগি বাজাবে

কণ্ঠ : এই সাপের খেইল, শংখিনি, পদ্দিনী, ছিলাবাহার
দুধরাজ, মাউচ্ছুয়া, গাওচ্ছুয়া সাপের খেইল...
সমবেত গান : আমরা যে শিকারি বাইদ্যা ॥
তীরের আগায় বিষের বড়ি হায়রে
পংখি শিকার করিয়া ॥
আমরা যে শিকারি বাইদ্যা ॥

হোমরা: রহ রহ রে (২)
আডাডারে আডাডা (২)
টিয়াডারে টিয়াডা (২)
তীরের আগায় বিশেষর বড়ি হায়রে,
পংখি শিকার করিরে
আমরা শিকারী বাইদ্যা ॥

রহ রহ রহরে (২)
ডুপিডারে ডুপিডা (২)
কইতর ডারে, কইতর ডা (২)
তীরের আগার বিষের বড়ি হায়রে,
পংখি শিকার করিরে
আমরা যে শিকারি বাইদ্যা ॥

www.pathagar.com

হোমরা: শুন হে মানিক ভাই, শুনরে সুজন
এই জীবনে গুরলাম কত জঙ্গল আর বন
এমন সুন্দর জায়গা আমি দেখি নাই আর
সারা জীবন থাকতে হেথা, মনে লয় আমার।

সুজন: ঠিকই কইছ সর্দার তুমি
যদি পাইতাম ঘর বানাইবার একটু জাগা জমি।
মানিক : থাইক্যা যাইতারাম নদ্যাপুরের চিরদিনের তরে বনজঙ্গলে ঘুরতে মনে ইচ্ছা নাহি করে।

আসবে নদের চাঁদের বন্ধু

বন্ধু : শোন শোন শোন ওগো বাইদ্যার সর্দার
এই গ্রামের নইদ্যার ঠাকুর মস্ত জমিদার
কি কি খেলা জান তোমরা ঠাকুরের দেখাও
নইদ্যার ঠাকুর হইলে খুশি, পাইবা যা চাও।

হোমরা: সাপের খেলা, নাচ গান নানান তামাশা।
সবই পারি মিঠাইতে সবার মনের আশা।
বন্ধু : তোমার কথা ঠাকুরের কাছে খবর কই গিয়া
খেইল তামাশা দেখাইলে, ফিরবা বকশিস নিয় ॥

বন্ধুর প্রস্থান

হোমরা: মাইকা ভাই ওরে সুজর, আমার মনে কয়
মনের খায়েশ এইবার বুঝি, ফলিবে নিশ্চয়।
এমন খেলা দেখাইবাস, কইরা বাহাদুরি
ইনাম বকশিস লইবাম যেন আশা পূর্ণ করি।

মঞ্চ অন্ধকার

৫ম দৃশ্য
নদের চাঁদের উঠোন, বাইদ্যার দলের নাচ ও গীত
হোমরার ডুগডুগি, তাল কাহারবা মিউজিক
নদের চাঁদ বসে দেখবে
মহুয়া ও দল: এই খাঁ ॥
সাপ ধরা মোর জাতির গো ব্যবসা
সাপ নাচাইয়া খাইওরে

www.pathagar.com

বড় বড় সাপের গো খেলা
নগরে দেখাই ওরে ॥
এই খাঁ ॥

সাত ভাইয়ের বইন গো আমি
নয়লা মামার ভাগিনী
রিয়ার রাইতে কালের নাগে
দংশিল মোর সোয়ামীরে
এই খাঁ ॥

তালছাড়া : ও ও দারুণ বিধির কি হইল
কাল রাইতে হইলাম বাড়ি গো
ওরো স্বামীরে খাইলো কাল রে নাগে
ও ও দারুণ বিধির কি হইল ॥

তালে : ও ও ও হায়রে বেউলা সতী
ও ও ও হায়রে হইলোর কলংকিনী ॥

কাইল যেন হইছিল বিয়া ডুমের কুলা দিয়া
আইজ কেমুনে যাইবাম আমি ডুমরা পাড়া দিয়া
ও ও ও হায়রে বেউলা সতী ॥
ও ও ও হায়রে হইলোরে কলংকিনী ॥

কাইল যেন হইছিল বিয়া সোনার বালা দিয়া
আইজ কেমুনে যাইবাম আমি সাদা কাপড় লইয়া
ও ও ও ও হায়রে বেউলা সতী ॥
ও ও ও হায়রে হইলোরে কলংকিনী ॥

কাইল যে হইছিল বিয়া মাথায় সিঁন্দুর দিয়া
আইজ কেমুনে যাইবাম আমি পুড়া কপাল লইয়া
ও ও ও হায়রে বেউলা সতী ॥
ও ও ও হায়রে হইলোর কলংকিনী ॥
এই খা খা খা, বক্ষিলারে খা ॥

নদের চাঁদের ও মহুয়ার চোখাচোখী। নদের চাঁদ গলা থেকে মুক্তার মালা দিতে গেলে হোমরা দু'হাত পেতে নিয়ে সেলাম জানাবে।

www.pathagar.com

নদের চাঁদ : বড় খুশি হইলাম আমি সাপের খেলা দেখিয়া
তোমারে করিলাম খুশি গলার মালা দিয়া

হোমরা: আপনা হুজুর দয়ার শরীর, দয়ার অন্ত নাই।
একটু জমি দান করিলে এই খানেই থাইক্যা যাই।
নদের চাঁদ : বসত বাড়ি বানাও তোমার বামন কান্দা গিয়া
জমি বাড়ি এক সঙ্গে দিতাছি লিখিয়া।

সেই জায়গায় থাক গিয়া বাইন্দা তোমরা ঘর
আমি গিয়া মাঝে মধ্যে লইবাম যে খবর।

বাইদ্যার দল খুশিতে সেলাম জানাইয়া প্রস্থান মঞ্চ অন্ধকার

৬ষ্ঠ দৃশ্য

বয়াতি : নদ্যাপুররে ইদ্যা ঠাকুর খেলা দেখতে গিয়া
মহুয়া সুন্দরীর কাছে হারাইল তার হিয়া।

হাজার টাকার মাল দিল আর টাকা কড়ি
বসত করার জায়গা দিল করতে ঘর-বাড়ী।

তামাশা 'দেখাইয়া একদিন মহুয়া সুন্দরী'
ফিরছিল সন্ধ্যাবেলা সেই না নতুন বাড়ী।

একলা পন্থে পাইয়া তারে নইদ্যা ঠাকুর কয়
কাইল সন্ধ্যা জলের ঘাটে আসিও নিশ্চয়।

কলসী কাংখেতে লইয়া মহুয়া যায় জলে
নইদ্যার চাঁদ ঘাটে, সেইনা সন্ধ্যা কালে।

মঞ্চ অন্ধকার

৭ম দৃশ্য

নদীর ঘাটে, মহুয়া আসবে-নেপথ্যে গান

নেপথ্যে গান : বাইদ্যার ছেড়ি কাপড়গো পিন্দে
আগায় পাছায় ডোরা
তারে দেইখ্যা পাগল হইছে
ওরে আশি বয়সের বুইড়া
প্রাণ আমার যায় যায়রে।

www.pathagar.com

নদের চাঁদের প্রবেশ

নদের চাঁদ : জল ভর সুন্দরী কন্যা
জলে দিছ মন
কাইলকা কি কইছিলাম কথা
আছে কি স্মরণ
মহুয়া : হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা
সাঝের বেলায় আইসা ঘাটে গো,
পায়ে নুপুর খইসা যায়
হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

তুমি তো ভীন দেশি পুরুষ
আমি ভিন্ন নারী
তোমার সনে কইতে কথা,
আমি লাজে মরি

হে নাগর ছাইড়া দেও
কলসি আমার যায় বেলা।

নদের চাঁদ : জল ভর সুন্দরী কন্যা
জলে দিছ ঢেউ
হাসি মুখে কওনা কথা,
সঙ্গে নাই মোর কেউ

মহুয়াঃ হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

সুন্দর নারী লইয়া তুমি
থাক মনের সুখে
তুমিতো জান না আগুন
জ্বলে আমার বুকে

হে নাগর ছাড়ি দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

www.pathagar.com

নদের চাঁদ : কঠিন তোমার মন কইন্যা
সানে বান্ধা হিয়া
মিছা কথা কইছো তুমি
না কইরাছি বিয়া
মহুয়া: হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।
কেমন তোমার মাতা পিতা
কেমন তাদের হিয়া
এত ডাঙ্গর হইছো তুমি না করাইছে বিয়া

হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

নদের চাঁদ : ভালই আমার মাতা পিতা
ভালই তাদের হিয়া
তোমার মতন সুন্দরী পাইলে
করাইতো আমার বিয়া।

মহুয়া : হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

চুপ থাক নির্লজ্জ পুরুষ
লজ্জা নইগো তর
গলাতে কলসি বাইন্দা
জলে ডুইবা মর

হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

নদের চাঁদ : কোথায় পাব কলসি কইন্যা,
কোথায় বাইবাম দরি
তুমি হও গহীন গাঙ্গ
আমি ডুইব্যা মরি

মহুয়া : হে নাগর ছাইড়া দেও কলসি
আমার যায় বেলা।

www.pathagar.com

নদের চাঁদ : না না না- ছাড়তাম না কলসি
তোমার যাক বেলা।

গান চলতে থাকবে মঞ্চ অন্ধকার

৮ম দৃশ্য
মহুয়া জলের ঘাটে যেতে থাকবে। পালং সই তাকে ডেকে বলবে। সময় সন্ধ্যা বিকাল এর মাঝামাঝি।

পালং : শোন শোন সহই মহুয়া
আমার মাথা খাও
একলা কেনে সইন্দা বেলা
জলের ঘাটে যাওরে

মহুয়া : ঐ না জলের ঘাটে সইলো
আসে আমার হিয়া
নইদ্যার ঠাকুর নিল যে মন
মুখে হাসি দিয়া রে

পালং : সারা নিশি কাইন্দা পোহাও
ঝড়াও চোখের পানি
একবার না মনের কথা,
কওনা কেন শুনি রে

মহুয়া : পানি দিলে সেই না আগুন
জ্বলে ধিকিধিকি
মনের আগুন নিবাই কেমনে
কওনা পরান সখিরে

পালং: না যাইও আর জলের ঘাটে
কইয়া দেই তোমারে
ধৈরজ্য ধর মেওয়া সইগো
বান্দ পাষান হিয়ারে

মহুয়া : সাক্ষী রইলো চন্দ্র, সূর্য্য,
সাক্ষী রইলা তুমি
আজি হইতে নইদ্যা ঠাকুর

www.pathagar.com

হইল আমার স্বামীর
প্রাণ আমার যায় যায়রে।

দু'জনের প্রস্থান মঞ্চ অন্ধকার

৯ম দৃশ্য

জলের ঘাটে নদের চাঁদ বাঁশি বাজাবে। কলসি কাঁখে মহুয়া আসবে।

মহুয়া : তুমি আমার প্রাণের বন্ধুরে,
চোখে তোমার হাসি
কেমুন কইরা বাজাও তুমি
ঐ না মোহন বাঁশিরে
তুমি আমার প্রাণের বন্ধুরে ॥

নদের চাঁদ : আমি ঠাকুর হইলাম পাগল
তুমি গলার মালা
বুকের মাঝে লইয়া বেড়াই,
প্রেমের অনল জ্বালার
আমি তোমার তুমি আমাররে ॥

মহুয়া : ফুল যদি হইতারে বন্ধু
তুইলা ঘরে আনি
কেশতে মিশাইয়া রাখতাম
কইরা সুন্দর বেনীরে
তুমি আমার প্রাণের বন্ধুরে ॥

নদের চাঁদ : তিলেক মাত্র না দেখিলে
পরান আনচান করে
পিঞ্জিরায় ভরিয়া রাখতাম
ভালবাসা দিয়ারে
আমি তোমায় তুমি আমাররে ॥
দু'জনের আলিঙ্গন। সুজন দেখে ফেলে।
মঞ্চ অন্ধকার

১০ম দৃশ্য

হোমরা বেদের দল বসে কথা বলবে

হোমরা : শোন শোন মাইনক্যা ভাই
বলি তোমার ঠাঁই
এই না দেশ ছাড়িয়া চল
অন্য দেশে যাই।

www.pathagar.com

মানিক : হোমরা ভাই গো অমন কথা,
না কইও আর তুমি
ছাইড়া যাইতে মন না চায়,
সোনার বাড়ি জমি।

হোমরা : কি করবাম ভাই ঘর,
খাইবাম ভিক্ষা মাইগ্যা
আমরা কন্যা পাগল হইছে
নইদ্যা ঠাকুরের লাইগ্যা।

মানিক: শানে বান্দা পুষ্কুরিনী
গলায় গলায় জল
পাইক্যা রইছে সাইলের ধান,
সোনার ফসল।

হোমরা: ফাইল্যা রাখ ফসল ভাইরে
ফাইল্যা রাখ বাড়ি
আইজ নিমা কালে ভাইরে
যাইবাম গাঁও ছাড়ী।

মানিকের আর্তনাদ। সকলের মন খারাপ কান্নার রোল।
মঞ্চ অন্ধকার।

১১তম দৃশ্য

সময় রাত-নদের চাঁদের পায়চারী আসবে মহুয়া

নদের চাঁদ : বিদায় দাওগো নইদ্যার ঠাকুর

মহুয়া : বিদায় দাওগো নইদ্যার ঠাকুর
বিদায় দেও আমারে
আজি নিশিকালে আমরা যাইবাম
তোমায় ছাড়িরে
প্রাণ আমার রায় যায়রে ॥

নদের চাঁদ: না-না-না

মহুয়া: আর না দেখবাম বন্ধু তোমার
চোখের মিঠা হাসি
না শুনবাম আর পাগল করা

www.pathagar.com

তোমার মোহন বাঁশিরে
প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

নদের চাঁদ : না-না-মহুয়া
মনে যদি লয়রে বন্ধু,
খাওরে আমার মাথা
দেখা করতে যাইও বন্ধু
শুনতে আমার কথারে
প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

নদের চাঁদ : মনে যদি লয়রে বন্ধু,
খাওরে আমার মাথা
দেখা করতে যাইও বন্ধু
শুনতে আমার কথা রে
প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

নদের চাঁদ : না-না-না-
মহুয়া : আমার বাড়ি যাইও বন্ধু
এমনি বরাবর
তাল্লা বাঁশের বেড়া আছে,
দক্ষিণ দেওরা ঘররে
প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

বিরহ সুর বাজবে। মহুয়া ধীরে ধীরে চলে যাবে।
হোমরা দল একে একে সবাই চলে যেতে থাকবে।
নদের চাঁদ চুপিচুপি দেখবে। মহুয়াও তাকে দেখবে।
মঞ্চ অন্ধকার।

১২তম দৃশ্য

বয়াতি: ভাঙ্গা ঘর পইরা রইল
চালে নাইরে ছানি
পিঞ্জিরা করিয়া খালি
উইড়াছে পঙ্কিনী।

কইন্যারে না পাইয়া ঠাকুর
কি কাম করিল
মহুয়ার লাইগ্যা ঠাকুর
বৈদেশি হইল।

www.pathagar.com

কিসের গয়া কিসের কাশি
কিসের বৃন্দাবন
বাইদ্যার কন্যা খুঁজে ঠাকুর
ভরমে ত্রিভুবন।
ও ও দারুণ এত দুঃখ দিলে ॥
প্রস্থান

এলো মেলা চুলে নদের চাঁদ প্রবেশ করবে

নদের চাঁদ : নাই-নাই-এইখানেও মহুয়া নাই

উইড়া যাওরে বনের পাঙ্খী
নজর বহুদুরে
এই পন্থে প্রাণ প্রিয়া মোর
গেছে বহু দূররে
হায়গো আমার দুঃখের কপাল।

মেঘের সমান কেশ তাহার
তারার মতন আঁখি
এই দেশেনি আইছে উইড়া
আমার তোতা পাখিরে
হায়গো আমার দুঃখের কপাল।

কোথায় গেলে পাবো আমি
দিলাম যারে মন
তারে না পাইলে আমার
হইবো যে মরণ রে
হায় রে আমার দুঃখের কপার ॥

নদের চাঁদ শুয়ে থাকবে। সুজনের চোখ পড়বে।
খুন করতে যাবে, কিন্তু দৌড়ে চলে যাবে।

মঞ্চ অন্ধকার

১৩তম দৃশ্য
হোমরার পায়চারী, মহুয়া খুশিতে উঠোনে ঢুকে ঘরে যাবে।

হোমরা: নিদ্রা নাই যার কইন্যার,
না ছোঁয়া ভাত পানি

www.pathagar.com

মাথার বিষেতে কইন্যা
হইল পাগলিনী
আজি কেন অকস্মৎ
হইল এমন ধারা
ছয় মাসের মরা যেন
উইঠ্যা হইল খাড়া।

সুজনের প্রবেশ

সুজন : সর্দার ও সর্দার
শোন দিয়া মন

হোমরা: কিরে কি হইছেরে
কছ নারে সুজন

সুজন কানে কানে হোমরাকে নদের চাঁদের কথা বলবে।
হোমরা রাগে আগুন হয়ে যাবে।

হোমরা: আচ্ছা-এই দেশেতেও নইদ্যার
ঠাকুর আইয়া পড়ছে
ব্যবস্থা করতাছি আমি,
মহুয়ারে ডাক দেরে।

সুজন: মহুয়া ও মহুয়া
ডাকতাছে সর্দার

মহুয়া: আমারে ডাকতাছুইন বাজান,
কি হইছে আবার।

হোমরা: বাইদ্যার কন্যা মহুয়া তোমার
জন্ম বাইদ্যার ঘরে
বাইদ্যার বেটা বিয়া করবো,
জানত না ঠাকুরে।

আমার পালন পুত্র
সুজন খেলোয়ার
বিয়া করবা তুমি এই
হুকুম আমার।

www.pathagar.com

এই ধর আমার হাতের
বিষলংখার ছুরি
নইদ্যার ঠাকুরের মাইরা
আইস তাড়াতাড়ি
শুইয়া আছে নইদ্যা ঠাকুর
ঐ না নদীর পাড়ে
ছলে বলে কৌশলে
মারবা তুমি তারে

যা-যা-যা-কইতাছি
মহুয়ার প্রস্থান, হোমরার পায়চারী
মঞ্চ অন্ধকার

১৪তম দৃশ্য
নদীর পাড়ে নদের চাঁদ ঘুমিয়ে থাকবে।
মহুয়া ছুরি নিয়া প্রবেশ করবে। সময় সন্ধ্যা।

মহুয়া: শোন শোন নইদ্যার ঠাকুর
কত নিদ্যা যাও
অভাগী মহুয়া কান্দে
আঁশি মেইলা চাওরে
প্রাণ আমার যায় বন্ধুরে ॥

নদের চাঁদ: কান্দ কেনে সোনার কইন্যা
মহুয়া সুন্দরী
হাতে কেনে দেখি তোমার
বিষলংখ্যার ছুরিরে
প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

মহুয়া : সানে বান্দা হিয়া আমার
পাষাণ বান্দা প্রাণ
তোমারে মারিতে বাজান
দিল যে সন্ধান রে
প্রাণ আমার যায় বন্ধুরে ॥

নদের চাঁদ : তোমার যদি না পাই কইন্যা
আর না যাইবার বাড়ি
এই না বুকে মার কইন্যা
তোমার হাতের ছুরিরে

www.pathagar.com

প্রাণ আমার যায় যায়রে ॥

মহুয়া : পাইড়া থাকুক বাপ মা,
পইরা থাকুক ঘর
তোমারে লইয়া বন্ধু হইবাম
দেশান্তর রে
প্রাণ আমার যায় বন্ধুরে ॥

নদের চাঁদ ও মহুয়া হাতে হাত ধরে ঘোড়ার চড়ে প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার।

১৫তম দৃশ্য

সাধুর ডিংগা নদীতে বয়ে চলবে এবং নেপথ্যে সংগীত

নেপথ্যে গান : হেইয়া হো, হেইয়া হো ॥
জোড়ছে চালাও হেইয়া হো ॥

বদর বদর বইলা মাঝি
ধর নায়ের হাল
নিলুয়া বাতাসে উড়াও
তোমার রঙিন পাল
মাঝি ধর নায়ের হাল।

হেইয়া হো, হেইয়া হো ॥
জোড়ছে চালাও হেইয়া হো ॥

ঢেউয়ের তালে দোলে দেখি
মহাজনি নাও
আকাশ ভরা তারার ঝিলিক
দেইখ্যা চোখ জুড়াও।

আস্তে ধীরে চালাও বৈঠা
না হইও বেসামাল
মাঝি ধর নায়ের হাল।

নদের চাঁদ : ও মাঝি ভাই নৌকা ভিড়াও
আমাদের পাড় করে দাও।

মাঝির দল নৌকা ভিড়াবে, মহুয়া নদের চাঁদ উঠবে। মহাজনের লোলুপ দৃষ্টি, নদের চাঁদকে নদীতে ফেলে দিবে। মহুয়া তার অজ্ঞান করা পান সকলকে খাওয়ায়ে বেহুশ করে দিবে। মহুয়া নিজেই নৌকা বেয়ে তীরে উঠবে এবং নদের চাঁদকে কাছে পাবে।

www.pathagar.com

১৬তম দৃশ্য

ভাব জাগানো সুরে মহুয়া আর নদের চাঁদ সুখের সংসার শুরু করবে। হোমরার দল তাদের ঘিরে ফেলবে।

হোমরা : হাঃ হাঃ হাঃ

প্রাণে যদি বাঁচা কাইন্যা
আমার কথা ধর
বিষলংখার ছুরি দিয়া
দুশমনরে মারো।

মহুয়া : কেমুনে মারিবাম আমি
পতির বুকে ছুরি
খাড়া থাক বাপ আমার
আমি আগে মরি।

হোমরা : পতি? হাঃ হাঃ হাঃ
শুন কইন্যা পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার
বিয়া তারেই করতে হইবো, এই কথা আমার।

মহুয়া : না-না বাজান
কেমুন কইরা যাইবাম আমি
বন্ধুরে মারিয়া
তোমা রসুজনরে আমি
না করিবাম বিয়া।

হোমরাঃ ধর-যা-মার
মহুয়া : না-না

হোমরা : মার-যা-মার, এই ধর বিষ লংকার ছুরি

মহুয়ার হাতে ছুরি দিবে

মহুয়া : শোন শোন প্রাণের পতি
বলি যে তোমারে
জন্মের মত বিদায় দেয় গো
তোমার মহুয়ারে
তোমার মহুয়ারে
হায় গো আমার দুঃখের কপাল।

জন্মিয়া না দেখলাম আমি
বাপ আর মায়

www.pathagar.com

কর্মদোষে এতে দিনে
জীবন বুঝি যায় রে
হায় গো আমার দুঃখের কপাল।

হোমরা : মার-দুশমনরে মার ...

মহুয়া নিজের বুকে নিজেই ছুরি বসাবে এবং সেই ছুরি নদের চাঁদ টেনে নিয়ে তার বুকে আঘাত করবে এবং দু'জনেই মৃতুর কোলে ঢলে পড়বে।

হোমরা : না-না-না-বটি আমি
এই কি করিলাম
কইতরের জোড়াডারে
মাইরা ফালাইলাম।
ছয়মাসের শিশু পাইল্যা
করলাম বড় তারে।
কি লইয়া ফিরবাম আমি
ঐ না বাড়ি ঘরে।

শুনরে মহুয়া বেটি
আঁখি মেইলা চাও
একবার এই বাজানের
রানডা জুড়াও।
তোমার সব চইলা যাও
নাই আমার ঘর
আইজ হইতে কইন্যার লাগি
হইলাম দেশান্তর।

বায়াতি : ও বিধি, বিধিরে
আমার এত দুঃখ ছেলরে কপালে

কাঁদতে থাকবে
সবার চোখে মুখে কান্নার রোল।
করুণ মিউজিক।
হোমরা মহুয়াকে কোলে তুলে আর্তনাদ শুধু করবে।

যবনিক

[উল্লেখ্য, মৈমনসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কবি দ্বিজ কানাই-এর মহুয়া পালা। এই প্রচলিত পালাটির অঞ্চলিক পরিবেশনায় ভূমিকা রেখেছেন লোকগীতিকার মুক্তির চৌধুরী। তিনি পালাটি লোকনাট্যের আদলে নতুন করে রচনা ও সুরারোপ করেছেন।]

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

কিশোরগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য লোকক্রীড়াগুলোর মধ্যে রয়েছে হাডুডু খেলা, বলাই, তইতই, রস-কস খেলা, লাঠিখেলা, গুটি খেলা ইত্যাদি। নিম্নে এ খেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. হাডুডু খেলা

হাডুডু বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত খেলা। জনপ্রিয়তার জন্য এটি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। হাডুডু শক্তির খেলা। সেজন্য তরুণ ও যুবকেরা এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। অল্প বয়সের বালকেরাও হাডুডু খেলতে পারে।

হাডুডু দুটি নিয়মে খেলা হয়, মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা বেঁধে এবং সীমানা ছাড়া। প্রথমটি 'কোটবন্দী' ও দ্বিতীয়টি 'ছাড়াকপাটি'।

খেলা শুরু হলে পর এক পক্ষের যে কোনো একজন মাঝ রেখা থেকে নিশ্বাস বন্ধ করে অপর পক্ষের দলের কাছে গিয়ে কাউকে স্পর্শ করে মেরে আসতে হয়। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানানোর জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য স্বরে 'হাডুডু বা হা টিকটিক বা কপাটি কপাটি' প্রভৃতি অর্থহীন ধ্বনি অথবা দু'চার চরণের ছড়া আবৃত্তি করতে হয়। সম্পূর্ণ নিশ্বাস রেখে ডুগ দেওয়ার সময় বিপরীত পক্ষের যে কোন একজনকে ছুঁয়ে গাং পার হলে পর যাকে ছুঁয়েছে, সে মারা যাবে অর্থাৎ সে খেলার অধিকার হারাবে। আর যদি নিজেই আটকা পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সেই মারা পড়বে। দ্বিতীয়বার ডুগ দিতে আসবে অপর পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড়। একে পাল্টা ডুগ বলা হয়। ছোঁয়াছুঁয়ি বা ধরা পড়ার ফলাফল একই রকম। না ছুঁয়ে বা ধরা না পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলে ফল অমীমাংসিত ও অপরিবর্তিত থাকে। হাডুডু খেলার লক্ষণীয় একটা দিক হলো : বিপক্ষের খেলোয়াড়কে মেরে স্বপক্ষের মরা খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে 'জীবিত' করতে পারে। কোনো এক পক্ষের সকল খেলোয়াড় মারা পড়লে একটা 'গেম' হয়। সকল ও সমান সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেলাটি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং পূর্বৎ চলতে থাকে।

২. বউছি খেলা

বউছি খেলার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য হাডুডু খেলায় আছে। নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ও স্পর্শ করে ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয়ে মিল আছে। দৌড়ের এবং শ্রমের খেলা হলেও বউছি হাডুডুর মত পুরুষকারে খেলা নয়। এতে আক্রমণটা একপক্ষীয়। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা প্রতিরোধ করে না, পালিয়ে স্পর্শ বাঁচায়। গায়ের জোরের চেয়ে পায়ের দৌড়ের উপর খেলাটি অধিক নির্ভরশীল। বয়স্ক পুরুষেও বউছি খেলতে পারে। দল নির্বাচনে ও সংগঠনে সমান বয়স্ক খেলোয়াড় না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে না।

www.pathagar.com

বউছি খেলা

৩. নৌকা বাইচ

নৌকাবাইচ বাংলাদেশের জনপ্রিয় খেলা। কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান ছাড়াও নিছক আমোদ-প্রমোদের উৎসবে নৌকাবাইচ হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে মনসা ভাসানের অনুষ্ঠানে (১লা ভাদ্র) নৌকাবাইচ হয়, কিন্তু মনসাপূজার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। কারণ নৌকাবাইচ না হলেও মনসা পূজার অঙ্গহানি হয় না। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন খালবিল, নদীনালা ভরাট ও শান্ত থাকে তখন কোন লোকোৎসব অথবা জাতীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে নৌকাবাইচের খেলা আয়োজন হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় এখনও 'আড়ং' মেলা হয় তার মূল অঙ্গই হলো নৌকাবাইচ। এ খেলায় নৌকার দু'পাশে জোড়ে জোড়ে বসে বাইচালদাররা বৈঠা টানে, পাটাতনে দাঁড়িয়ে সারিদাররা গান করে। চল্লিশ-পঞ্চাশ থেকে একশত জন বাইচালদার ও সারিদার থাকতে পারে। প্রতিযোগিতার নৌকার কোন পাল-মাস্তুল থাকে না। বাইচের দিন নৌকাকে সুসজ্জিত করা হয়– চালের গুঁড়া ও সিঁন্দুর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় নৌকায় গায়ে ও গুলুই-এ।

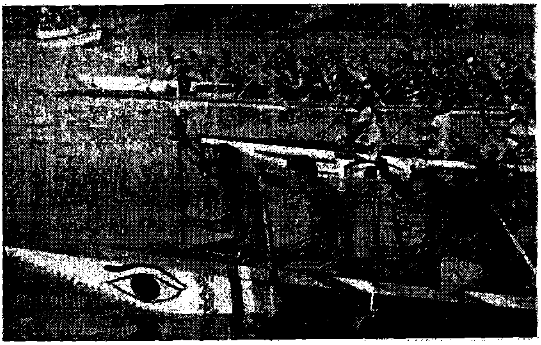

নৌকা বাইচ

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগিরা নাচ-গানসহ ফূর্তি করে। বৈঠার টানে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলে আর বৈঠার তালে তালে সমানে গান চলে। যেমন -

ওই চলে চলে চলে নাও হেঁউও
চল্ চল্ চল্ উড়াল দিয়া চলও ৷৷
বদর বদর রবে চল্ হেঁইও হেঁইও
হো হো দ্যাখ দেখি কেবা যায় আগেও ৷৷
বদর বদর বলে তারে ধরিও
আরে চল্ চল্ চল্ ওরে চলিও ৷৷

৪. লাঠিখেলা

এককালে যখন এদেশে জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল তখন 'পুণ্যাহ'র দিনে জমিদারদের পোষ্য লাঠিয়ালরা লাঠিখেলার নানান কসরৎ দেখিয়ে পেত প্রচুর বখশিস। কখনো কখনো চরদখল, জমি দখল, জমিদার-জমিদারদের ঝগড়া বিবাদ আক্রমনে লাঠিয়ালরা অংশগ্রহণ করত। লাঠিখেলা প্রাচীন বাঙালির ঐতিহ্যময় খেলা। বাঙালির শৌর্য-বীর্যের পরিচায়ক লাঠিখেলা। যে কোনো ধনী শ্রেণির বিয়ে শাদী অনুষ্ঠানে লাঠি খেলার বায়না ছিল। এ খেলা না থাকিলে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যেন আনন্দ ফূর্তি জমে উঠত না। কিশোরগঞ্জের বিয়ে বাড়ি থেকে শুরু করে মহরমের আয়োজন অনুষ্ঠানে লাঠিখেলা ছিল গ্রাম বাংলার অন্যতম আনন্দ আর আকর্ষণীয় বিষয়। এখনো পহেলা বৈশাখ ছাড়াও কোন কোন বিয়ে বাড়ি কিংবা নির্বাচন উপলক্ষ্যে কিংবা কোন বিশেষ আনন্দ উৎসবে লাঠিখেলার আয়োজন হয়ে থাকে।

লাঠিখেলা

৫. ষাঁড়ের লড়াই

গ্রামাঞ্চলে ষাড়ের লড়াই অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে কৃষক পরিবারের সদস্যরা এ খেলায় অংশগ্রহণ করে বেশি। কোন কোন কৃষক তার গৃহ পালিত ষাঁড়কে অনেক যত্ন করে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করানোর জন্য। তাতে টাকা পয়সাও খরচ করা হয় অনেক। প্রাচীনকাল থেকে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের

www.pathagar.com

ষাড়ের লড়াই ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়ে থাকে। লড়াইয়ের ষাঁড় রাখা ও পোষার জন্য অনেক গ্রামবাসী গর্ববোধ করেন। বিজয়ী ষাঁড় তার শক্তি দিয়ে মালিকের নাম প্রচারিত করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এটাকে অনেকে তাদের প্রিয় সখ বলেও মনে করেন।

৬. দাড়িয়াবান্ধা খেলা

হাডুডুর মত দাড়িয়া বান্ধা বাংলার সর্বাঞ্চলীয় জনপ্রিয় গ্রাম্যখেলা। খোলা জায়গায় নির্দিষ্ট ঘর কেটে দাড়িয়া বান্ধা খেলা হয়। বালক-বালিকা এমনকি বয়স্করাও এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ খেলায় ঘরের সীমানার বাধ্যবাধকতা আছে। ফলে দ্রুত দৌড়ের চেয়ে কৌশল প্যাঁচের উপযোগিতা অধিক। সংযত দৌড়ের এ খেলাটিও শরীরচর্চার প্রকৃষ্ট উপায়।

সাধারণত ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এ খেলায় ছক বাঁধা ঘর থাকে এবং মাটির উপর দাগ কেটে ঘরের সীমানা নির্দেশ করা হয়।

৭. গোল্লাছুট খেলা

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় কিশোরগঞ্জেও এ খেলার চল আছে। পরিমিত সীমানার দৌড়ের দ্রুততার উপরেই খেলাটি সাফল্য নির্ভর করে। হাডুডু বা বউছির মত দৌড়ানোর সময় নিশ্বাস রুদ্ধ করতে হয় না। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে। সমান সংখ্যক দুই দলের মধ্যে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৪/৬ থেকে ৮/১০ জন পর্যন্ত হতে পারে। খোলা মাঠ বা বাগান খেলার প্রশস্ত স্থান।

একটা ছোট গর্ত খেলার কেন্দ্রীয় সীমানা; ৪০/৫০ হাত দূরে ইট-পাথর অথবা কোন গাছ বহিঃসীমানা হিসেবে নির্ধারিত হয়। গর্তে একটা কাঠি থাকে, তাকে 'গোল্লা' বলে। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছটিকে ছোঁয়াই হলো এ খেলার মূল লক্ষ্য। আর এ থেকেই এর নাম গোল্লাছুট হয়েছে।

দলের একজন প্রধান থাকে। অন্যান্যরা 'গোদা' নামে পরিচিত। যে পক্ষ প্রথম দান পায় তারা গর্তের গোল্লা ছুঁয়ে দাঁড়ায়, গোদারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান ব্যক্তিকে ঘরে ঘুরতে থাকে বিপক্ষের খেলোয়াররা সুবিধামত যে যার স্থান নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের বেষ্টন থেকে যার বা যাদের হাত ছুটে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে যাবে দূরের সীমা স্পর্শ করতে। বিপক্ষ দলের লক্ষ্য এদের ছুঁয়ে বাধা দেওয়া। দৌড়ের কোন নির্দিষ্ট দিক নেই, এলোমেলোভাবে ছুটে লক্ষস্থলে এসে পৌঁছতে পারলেই হলো। বিপক্ষেরা ছুঁলেই খেলুয়ার মারা পড়ে। যতক্ষণ গর্ত ছুঁয়ে আছে ততক্ষণ নিরাপদ। গর্ত ছেড়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকেও ছুটতে হয়। যারা সফলকাম হয় তারা গোল্লা থেকে জোড় পায়ে একটা করে লাফ দেয় বহিঃসীমার দিকে। সব লাফ মিলিয়ে উক্ত সীমানায় পৌঁছতে পারলে এক 'পাটি' হয়। না পারলে অথবা সবাই স্পর্শ দোষে মারা পড়লে বিপক্ষরা দান পাবে, এ পক্ষের কোন পাটি গণ্য হবে না। পর্যায়ক্রমে গোল্লা পাওয়া এবং প্রতিরোধ করার ভেতর দিয়ে খেলাটি চলতে থাকে। পাটির সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

www.pathagar.com

৮. বলাই

কোন কোন অঞ্চলে বলাই খেলাকে মলাই খেলা বলে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এটি বলাই খেলা নামে পরিচিত। বলাই খেলা পানির খেলা। পানিতে নেমে এ খেলা খেলতে হয়। বিশেষ করে এ খেলায় ডুব সাঁতার জানা থাকতে হবে। নইলে এ খেলা করা যাবে না। বলাই ছড়া যুক্ত খেলা। এ খেলায় ছেলেরা নদী বা পুকুরে ডুব সাঁতার কেটে মুখে মুখে ছড়া বলে খেলাটি শুরু করে।

প্রথমে একজন বলে– তোমরা কে কোথায়? দশ বারোজন খেলোয়াড় সবাই এক সাথে বলে ওঠে- আমি এখানে। তুমি কে? সর্ব প্রথম যে উত্তরে বলবে আমি বলাই। সাথে সাথে সে তার মুখেই বলে ওঠে- আমি পলাই। অর্থাৎ এ খেলায় যে বলাই হবে সে তাৎক্ষণিক পানিতে ডুব সাঁতার কেটে কেটে পলানোর চেষ্টা করে। আর অন্যেরা তাকে ছুঁয়ে মারতে পাড়লে সে হয়ে যাবে বলাই। আবার সে বলবে- আমি বলাই, ডুব সাঁতার দিয়ে পলাই।

আবার অন্যেরা তাকে ধরে ছুঁতে যাবে এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই বলাই হবে আর চক্রাকারে বা পালাক্রমে সবাই বলাই সেজে খেলাটি দীর্ঘক্ষণ পানিতে হৈ-চৈ করে সময় কাটিয়ে দেয়। কখনো কখনো গভীর পানিতে কিংবা অল্প পানিতেও ডুব দিতে গিয়ে অন্য দশ বারো জন ছেলে একত্রে এসে কাউকে ছুঁতে গিয়ে এমনভাবে সজুড়ে জাপটে ধরে যে, কোন কোন ছেলের নিশ্বাস বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে এতে কখনো কখনো আনন্দের সাথে মৃত্যুজনিত দুর্ঘটনার আশংকা দেখা দেয়। যে জন্য এ খেলাটি খুবই সাবধানতা বা সতর্কতার সহিত খেলতে হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো দুর্বল খেলোয়ার ডুব সাঁতারে এ খেলা খেলতে গিয়ে পেট ভর্তি পানি খেয়ে ভেসে উঠতে দেখা যায়। কিশোরগঞ্জের ভাটি বা হাওর জনপদের নদী, নালা, খাল,বিল পুকুর, দিঘিতে এ খেলার প্রচলন রয়েছে।

৯. তইতই

কিশোরগঞ্জের গ্রামের বালক-বালিকারা তই তই খেলা খেলে থাকে। তাই তই খেলায় ডুব অথবা সাঁতার অত্যাবশ্যক নয়। সাধারণত কোমর পানিতে নেমে সকলে গোল হয়ে দাঁড়ায়। খেলার নিয়ম অনুযায়ী এক জনের হাতে থাকে একটা ভাসন্ত ফল, আজ কালকার যুগে থাকে বল।

উপর থেকে ঐ ফল বা বলটিকে একজন লিডার ছুঁড়ে দিলে সঙ্গীয় অন্যান্য জন এটিকে ধরার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করে। কে কার আগে ঐ ফল বা বলটিকে ধরে নিয়ে তার দখলে নেবে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। লাফালাফি আর পানিতে হৈ-হুলোড় করে ফল অথবা বলটা কারও হস্তগত করতে পারলেই তাদের দলীয় খেলার আনন্দ। কখনো কখনো দলবেঁধে ছেলেরা কোমর পানি দুই হাতে টেনে ঘোলাটে করে মাতামাতি আর মুখে মুখে উচ্চস্বরে ছড়া বলে।

তই তই তই
বগা মাইরা ডুলাত থই
তই তই তই।
বগা অইল কুঁইয়্যা
ভূইয়্যা খায় চুঁইয়্যা।

www.pathagar.com

তই তই তই
খুলাত ভাঁজে মুড়ি খই
তই তই তই।

১০. রস-কস খেলা

১০-১২ জন পর্যন্ত এ খেলা খেলতে পারে কিন্তু পাঁচজনে খেলাই উত্তম। সবাই গোল হয়ে বসে প্রথমে মাটিতে বাঁ হাতের তালু উপুড় করে মুখামুখি রাখে। আঙুলগুলো সব ছড়ানো থাকে কিন্তু কোনো ফাঁক থাকে না।

রস, কষ, শিঙ্গাড়া, বুলবুলি, মস্তক- এই পাঁচটি নামের যেকোনো একটি নাম একে একে পছন্দ করে নেয়। যে রস বেছে নেয় সে বলে 'আমি রস'।

একজন চোর সেজে অন্য হাতের তর্জনি দিয়ে অন্যদের ছড়ানো আঙুলগুলোর উপর টিপ দিয়ে দিয়ে বলতে থাকে 'রস কষ শিঙ্গাড়া বুলবুলি মস্তক'। যার নাম যা, তার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে গণনার সময় তার যে আঙুলে চোরের আঙুল পড়ে তখনি সে সেই আঙুলটি করতলের ভেতরের দিকে ভাঁজ করে লুকিয়ে ফেলে। চোর তার গণনা চালিয়ে যেতে থাকে।

এভাবে রস বললে রসের আঙুল, কষ বললে কষের আঙুল, শিঙ্গাড়া বললে শিঙ্গাড়ার আঙ্গুল ভাঁজ হয়ে লুকিয়ে পড়ে। অন্যদিকে গণনা চলতে থাকে ঘুরে ঘুরে। গণনা করতে করতে যার হাতের পাঁচটি আঙুলই বাঁজ হয়ে যায় সে ওঠে যায়। শেষে যে উঠতে পারে না, সে হয় চোর। চোর ডান হাতের তালু প্রশস্ত করে খাড়া ও উপুড় করে মাটির উপর ধরে, বাকিরা ঝুলন্ত তালুতে জোড়ে চড়-থাপ্পড় মারার চেষ্টা করে। এ সময় চোর চড়-থাপ্পড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘন ঘন হাতের তালু ওপরে ওঠানোর চেষ্টা করে। কেউ চড়-থাপ্পড় মারতে গিয়ে যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে চোর তার হাত থেকে বেঁচে যায়। এভাবে একে একে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চোর যদি নিজের হাত বাঁচাতে পারে, তাহলে সে মুক্ত। আর তা না হলে যাদের হাত থেকে সে নিজের হাত বাঁচাতে পারল না, তারা তার পিঠে কিল দেয়। এভাবে খেলা শেষ হয়।

১১. হুমগুটি/গুটি খেলা

গুটি বা ঘুঁটিখেলা পল্লির মেয়ে মহলে অবসর-বিনোদনের খেলা। পাঁচটি গোলাকার পাথর ঘুঁটি খেলার উপকরণ। বিচিত্র ও জটিল পদ্ধতিতে এটি খেলা হয়। হাতের দক্ষতায় ও ক্ষিপ্রতায় খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। পাঁচটি ঘুঁটির একটি হয় 'ডাগ'। কখন এক হাতে, কখন দু'হাতে দাগের সাহায্যে অন্য ঘুঁটি লোফালুফির ভেতর দিয়ে খেলা চলতে থাকে।

লোফালুফির সময় কোন ঘুঁটি মাটিতে পড়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। কড়ি খেলার মত চক্রাবর্তনে ঘুঁটি খেলা চলে। নানা প্রক্রিয়া শেষ করে যে আগে 'পাকে' তার একটি পয়েন্ট হয়। এ রূপে সাত কি দশ পয়েন্ট পেলে সে জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত যে হারে তাকে জোড়-বিজোড় ধরে কিল মারার সুযোগ পায়। কিশোরগঞ্জ জেলায় এ খেলার প্রচলন রয়েছে ।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

মানুষ যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাই বৃত্তি বা পেশা। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে জীবিকার উদ্ভব হয়েছে। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলার উল্লেখযোগ্য লোকপেশাজীবী গ্রুপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

১. মিস্ত্রি/ছুতার

মিস্ত্রি বা ছুতার কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি বা হাওর এলাকায় এদের বসবাস বেশি। হিন্দু সম্প্রদায় ও সমাজে তাদের নাম বা পদবি হলো সূত্রধর। সূত্রধর পদবি সম্প্রদায় এর লোকেরা একসময় অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী ছিল। এককালে এদের সম্প্রদায় প্রধানকে 'প্রামাণিক' বলত। সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রাচীন থেকে আধুনিক কালের সকল কারুকাজ করা বা অলঙ্করণের কাজ করে থাকে। প্রাচীন কাল থেকে সূত্রধর সমাজের লোকজন কৃষিজীবী। কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় জড়িত রয়েছেন। কিশোরগঞ্জ জেলায় সূত্রধর বংশজাত লোকেরা সংখ্যা বেশি। বর্তমান কালে মুসলমান মিস্ত্রি বা ছুতার শ্রেণির লোকজন কাঠের কাজে গ্রাম-গঞ্জে-কিংবা শহরেও দেখা যায়।

হিন্দু সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকজন গলায় চন্দন কাঠের মালা দেয়। এদের ব্রাহ্মণ হলো 'আচার্য'। কিশোরগঞ্জ জেলার উজান অঞ্চলের চেয়ে ভাটি বা হাওর অঞ্চলে সূত্রধরদের বসবাস অধিক হওয়ায় প্রায় প্রতি গ্রামেই 'আচার্য' পদবি ধারী ব্রাহ্মণদের বসবাস রয়েছে। ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণে সূত্রধর পদবির কাঠ মিস্ত্রি বা ছুতাররাই শ্রেষ্ঠ বা প্রধান। তাদের বসবাস এ জেলার সর্বত্র রয়েছে।

২. কুলু বা তেলি

কিশোরগঞ্জ জেলায় কুলুহাটি, কুলুপাড়া, তেলিহাটি, তেলিপাড়া, তেলিখাই ইত্যাদি নামের জনপদ রয়েছে। কিশোরগঞ্জে এদের অনেকেই নতুন পদবি গ্রহণ করে মূল পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ কাপড়ের ব্যবসায় জড়িত হয়ে পড়েছেন।

৩. তাঁতি

কিশোরগঞ্জ জেলায় এককালে তাঁতি বা তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস ছিল। বঙ্গবীর ঈশা খাঁর আমলে কিশোরগঞ্জ জেলায় তাঁতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এককালে কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর, বত্রিশ, হয়বতনগর, কুলিয়ারচর প্রভৃতি জনপদে মসলিন কাপড় তৈরি করা হতো। সেই যুগ থেকে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ জেলায় তাঁতের শাড়ি বা কাপড় তৈরি করা হতো। তাঁতিরা সবাই পদবি গ্রহণ করত বসাক। বসাক পদবি ধারীর হিন্দু সম্প্রদায় কিশোরগঞ্জ সদর বত্রিশ এলাকায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। আর যারা ঘুরে ঘুরে কাপড় তৈরি এবং ক্রয়-বিক্রয় করত তাদের পরিদর্শক, দালাল, সরকার, সিকদার বলত। হিন্দু তাঁতিদের মধ্যে আরেক

www.pathagar.com

শ্রেণির তাঁতি রয়েছে তাদের নাম 'যোগী'। এককালে কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার যোগীহাটি, যুগীপাড়া-পাড়ার তাঁতিরা তাদের নিজেদের তৈরি দেশীয় কাপড়, চাঁদর, গামছা খুবই জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে এসব গ্রামে যোগী/যুগী সম্প্রদায়ের লোকজন আছে কিন্তু তাঁদের ব্যবসা নেই, পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় জড়িত হয়ে পড়েছেন।

৪. জেলে

জেলেরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে মাছ ধরে থাকে। প্রাচীন প্রবাদ ছিল জাল যার জলা তার। আজকের যুগে একথার পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মাছ ধরা মাছ ব্যবসার সাথে জড়িত হয়ে কিশোরগঞ্জে পারিবারিকভাবে পরিচিত জেলে সম্প্রদায়রা পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় জড়িত হয়ে পড়ছে।

৫. কামার

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার একটি প্রাচীন জনপদের নাম রয়েছে 'লোহাজুরী'। এ জেলার কামারেরা দা, কোদাল, খন্তা, কাঁচি, ছাড়াও লোহা লক্কর, তারকাটা, পেরেক, নৌকার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বানায়। এককালে কাঁসার বাসনপত্র তারা তৈরি করত। অধুনা কিশোরগঞ্জে কামার-কুমার-জেলে-তাঁতি-মিস্ত্রি-ছুতার-সূত্রধর সবাই মিলেমিশে বসবাস করেন।

কামার

৬. গাছি

যারা গাছে চড়ে গাছের ডাল পালা কেটে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে এবং ফল মূল পাড়ে তাদেরকে 'গাছি' বলে। মানুষের বসতির আঙিনায় সুপারি, নারিকেল, আম, জাম, লিচু প্রভৃতি গাছ কেটে গাছের পরিচর্যা করা এবং সুপারি, নারিকেল, আম, জাম, লিচু গাছ থেকে পাড়ার কাজটুকু এ সম্প্রদায়ের লোকেরা পেশা হিসেবে করে থাকে। গাছিরা দরিদ্র জীবনযাপন করে।

৭. গাইন ও বৈদ

নিকলী বৈদ্যার কান্দা একটি অন্যতম প্রাচীন জনপদ ছিল। বর্তমানে বিলুপ্ত নিকলীতে যে বৈদ এর সন্ধান পাওয়া যায় তারা ছিল বেঁদে সম্প্রদায় ভুক্ত। বর্তমান যুগে এ অঞ্চলে বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত বৈদ এর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কুঠিগির্দি থেকে হয়বতনগর ও হারুয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পাড়াটি দু'টি ভাগে বিভক্ত। এককালে

www.pathagar.com

'গাইন' বা 'বৈদ্যপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। মূলত এ পাড়াটি ছিল বসতি বেদে সম্প্রদায়ের নিবাস। সম্প্রদায়গত ভাবে বেদেরা বেশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত-এ কয়েকটি শাখার মধ্যেও দু'টি শাখাই প্রাধান্য একটি বসতি বেদে অপরটি "ভ্রাম্যমান বেদে"। বসতি বেদেরা যে কোন একটি জনপদে বসতি স্থাপন করে পেশাগত কারণে বাইরে গেলেও বছরে যে কোন এক সময়ে তারা বসতিতে ফিরে আসে। আবার এ সম্প্রদায়ের অপর একটি শাখা ভ্রাম্যমান বা ভাসমান বেদেরা স্থায়ী কোন বসতি স্থাপন করে না- এরা সারা বছরই নৌকার উপর জীবনযাপন করে। কিন্তু দু'টি শাখারই একটি বিষয়ে মিল রয়েছে যে- এরা একত্র বা দল বেঁধে বসবাস করতে অভ্যস্ত।

কিশোরগঞ্জে স্থায়ী বেঁদে সম্প্রদায় ভক্ত বৈদরা গাইনদের বসতি রয়েছে। বর্তমানে তারা অন্য পেশায় জড়িত। এ সম্প্রদায়ের নারীপুরুষ উভয়ই কর্মঠ ও উপার্জনশীল। এদের শাখা ও গোত্রানুযায়ী বিভিন্ন পেশা রয়েছে-এসব পেশার মধ্যে সাপধরা, সাপখেলা, বানর খেলা, টোটকা চিকিৎসা, তালা বিক্রয়, তালা মেরামত, ছাতা সারাই, ঝিনুকের মুক্তা আহরণ, নকল মুক্তা ও অন্যান্য ধাতব অলঙ্কার তৈরি, প্রসাধন সামগ্রী ফেরি, মসলা বিক্রয়, গান বাজনা করা, পট দেখানো বা পট অঙ্কন উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জে বসতি বৈদ বা গাইন শহরস্থ্ বৈদ ও গাইন নামে উল্লিখিত পেশানুযায়ী এ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্র রয়েছে যেমন-পট অঙ্কন, পট দেখানো ও গান বাজনায় সম্পৃক্তরা 'গাইন মাঙতা'। যে গোত্রের মেয়েরা গ্রামে গ্রামে মেয়েদের অলঙ্কার ও প্রসাধন ফেরি করে তারা "চাপিলা মাঙতা"।

আবার নকল অলঙ্কার তৈরি এবং বিক্রেতারা "বানিয়া মাঙতা" মসলা বিক্রেতা ও টোটকা ঔষধ বিক্রেতারা "বৈদ মাঙতা" নামে পরিচিত। এদের নিজেদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ভাষাও ছিল বর্তমানে বিলুপ্ত। তবে কিছু কিছু লোকের মুখে মুখে তাদের নিজস্ব ভাষাটি বেঁচে আছে। নিজেদের গোত্রের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কৃতির বির্বতনে উল্লিখিত সম্প্রদায়দের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায় প্রাচীন গোত্র ও বর্ণবাদ বা বর্ণপ্রথা আর নেই। এসব সম্প্রদায়ের অনেকেই আজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক কুলীনদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং অনেকেই তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশাও পদবি গ্রহণ করেছেন। যার ফলে এরা গোত্র পদবি 'গাইন' বা 'বইদ' ব্যবহার করে না।

৮. হাউইকর শিল্পী

কিশোরগঞ্জ শহরে এবং জেলার গ্রামে গঞ্জে ও এককালে হাউইকর কারিগরদের বসতি ছিল। তার মধ্যে কটিয়াদী, বাজিতপুর, নিকলী, কুলিয়ারচর, ভৈরব, হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, করিমগঞ্জ, তাড়াইল ও অষ্টগ্রামে এ শিল্পের বেশ কদর ছিল। আতশবাজী বা নানান জাতের পটকা বা পটাশ বানানো বিক্রি ও শোলার মটুক, টুপি বানানো ব্যবহার ও বিক্রির প্রচলন ছিল। কিশোরগঞ্জ শহরে এখনও অনেক হাউইকর শিল্পের ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায় নিয়োজিত। তবে তাদের বসতি ছিল হাউইকর শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাউইকর এখনও কিশোরগঞ্জ শহরে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেসের পাশাপাশি জরির জিনিসপত্র বিক্রির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছেন।

www.pathagar.com

৯. লিপিকর শিল্পী

এককালে কিশোরগঞ্জ শহরে এবং আশেপাশের বিভিন্ন থানা বা উপজেলার গ্রামাঞ্চলেও লিপিকরদের ব্যবসা বা বসতি ছিল। বিশেষ করে লিপিকর বা খোদাইকর যারা সাইকেল, ঘড়ি, ঘটি, বাটি, থালা, বাসন, কলস, কলম ইত্যাদি জিনিসপত্রে সুন্দর হাতে নাম ঠিকানা লিখে রাখার শখ ছিল তারা এ পেশায় জড়িয়ে যেতেন। এ যুগেও তাড়াইল উপজেলার বেশ কিছু লোক এ পেশায় এ জেলা ছাড়াও ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে ঘুরে বেড়ান।

১০. শিলপাটা ধার

এককালে গরম মসলার যাবতীয় দ্রব্য বিশেষ করে মরিচ, হলুদ, জিরা পাটা-পুতা ছাড়া বাটা কিংবা পিষার কাজ কোনো ভাবেই সম্পন্ন করা যেত না। আজকের যুগে বাজারে যেমন তেমন একটা নেই, তেমনি বাসা বাড়িতেও পাটা-পুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। সব কিছুই আজকাল প্যাকেটে পাওয়া যায়। তবুও কিছু কিছু বাসা বাড়ি বা গ্রামাঞ্চলে শিল পাটা খোদানোর কাজে তাদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

১১. ঝালাইকর

লৌহা, তামা, কাঁসা, সিলভার ইত্যাদি দ্বারা তৈরি জিনিসপত্রে ঝালা দেওয়ার কাজে যারা জীবিকা নির্বাহ করত তাদের ঝালাইকর বলা হতো। এখনও কিশোরগঞ্জ শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

১২. মালাকার

জরীর দোকান গুলোতে যেসব রঙিন কাগজে তৈরি লাল, সাদা, হলুদ ছাড়াও বিভিন্ন রঙের মালা পাওয়া যায় এগুলো এসব পেশাধারী মালাকারগণ তৈরি করে থাকেন। এ শহরে এখনও অনেক মালাকারদের বসতি রয়েছে। তবে দিন বদলের পালায় আবার অনেকেই অন্য পেশায় মনোযোগী হয়েছেন।

১৩. শালকর

কিশোরগঞ্জ শহরে আজ থেকে প্রায় ৩০/৪০ বছর আগেও বড় বাজার এলাকায় একটি বিখ্যাত নদিয়া শালকর বা রিফুকার নামে লন্ড্রি ছিল। এ ব্যবসায় হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। তবে পাকিস্তান আমলে মুসলিম শালকরদেরও এ শহরে দেখা যেত। এরা কেউ কেউ পৈতৃক পেশা ধরে রেখেছেন আবার অনেকেই অন্য পেশায় জড়িত হয়েছেন।

১৪. কারিগর

যারা রঙ এর কাজ করতেন তাদের বলা হয় এবং হতো রঙের কারিগর। যারা ঘর নির্মাণ করত বিশেষ করে টিন বা কাঠের তাদের বলা হতো সূত্রধর কারিগর। টিনের কারিগর, কাঠের কারিগর, শন বা ছনের ঘর যারা নির্মাণ করতেন তাদের বলা হতো কারিগর তবে, স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'ছাপরবন'। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রবাদ আছে– "ছাপরবনের দুই উদাম"।

www.pathagar.com

১৫. আড়াইবাড়িয়ার কাঁচি ও কামারপাড়া

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার আড়াইবেড়িয়া স্থানীয় ভাষায় এটি আড়াইবাইড়া নামে পরিচিত। এখানকার কামারপাড়া গ্রামটিতে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর কামারেরা বসবাস করেন। মূলত কাঁচি তৈরি করে নিজেদের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেগুলো পাইকারি দরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন এখানকার মানুষেরা। পরম্পরাক্রমে তারা এই কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের কৃষকদের অতি প্রয়োজনীয় এই হাতিয়ারটি বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট উপাদন: ন্যায্য কারণেই এর চাহিদা ব্যাপক।

কাঁচি নির্মাণের প্রক্রিয়াটি কোনো একক শিল্পীর কর্ম নয়। এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু-তিনজন মিলে এই নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত থাকতে হয়। একজন কর্মী প্রথমে লোহাকে আগুনে গলিয়ে-পিটিয়ে কাঁচির শেপ দেন। তারপর, সেটিকে জালগাথায় (স্থানীয় নাম) ডুবিয়ে রাখা হয়। অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর রেল, ছেনা আর হাতুড়ির সাহার্যে কাঁচির ধারালো দাঁত তৈরি করা হয়। এ কাজে কামারদের অনেক কয়লা লাগে যা তারা কিনে নেন। কয়লা কেনার খরচই মূলত কামারদের বেশি। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই কাঁচির বিক্রি ভাল চলে। আবার, অগ্রহায়ণ মাসেও ধান কাটার মওসুমে লোকসংস্কৃতির এই বস্তুগত শিল্পটির চাহিদা আর ব্যবসা বেশ জমজমাটভাবেই চলে।

একসময়ে, হিন্দু কামাররা এই ধরনের কাজগুলো করত। কিন্তু এই গ্রামের পুরোটাতেই বাস করেন মুসলমান কামারেরা। সারা দিন প্রচণ্ড পরিশ্রম আর বিপদজনক ঝুঁকিকে প্রতিহত করে এখানকার কামারেরা কাঁচিশিল্পে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার কাঁচির সুনাম সারা দেশ জুড়ে। নিজের এলাকায় কাঁচির যোগান দিয়েও তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার কাঁচির সাপ্লাই দিয়ে থাকেন। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কামারপাড়াটি কাঁচি শিল্প তৈরির কাজে মুখরিত থাকে।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

গ্রামবাংলার জন-জীবনধারায় তন্ত্রমন্ত্র এবং লোকচিকিৎসার মূলে রয়েছে নানান ধরনের কুসংস্কার ও লৌকিক অলৌকিক বিশ্বাস। দেশীয় গাছ-গাছড়া-লতা-পাতার গুণাগুণ এবং ঝাড়ফুঁক দিয়ে এমন চিকিৎসা জন-মনে সমন্বিত হয়ে আছে। আবার আয়ুর্বেদিক বা কবিরাজী প্রক্রিয়ার সঞ্চায়নও এমন ধরনের চিকিৎসা-প্রক্রিয়া বর্তমান। কিশোরগঞ্জেও এমন তন্ত্রমন্ত্র এবং চিকিৎসাপ্রকরণের অপ্রতুলতা নেই।

ক. লোকচিকিৎসা

চিকিৎসার প্রথম দিকে যখন কোনো ঔষধ আবিষ্কার হয়নি, তখন প্রাচীন গ্রামীণ কবিরাজী চিকিৎসাই ছিল একমাত্র প্রধান চিকিৎসা। এ চিকিৎসায় কোনো তেমন খাওয়ার ঔষুধ ব্যবহার হতো না। শুধু ব্যবহার হতো লতাগুল্ম আর হতো তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তাবিজ কবজ আর ঝাড়-ফুঁক। এ ধরনের চিকিৎসায় যিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, তার নাম ছিল কবিরাজ। কবিরাজেরা শারিরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে– আমাশয়, আমবাত, অর্শ, বেরিবেরি, হাঁপানী, মাথাবিষ, পেটবিষ, গায়ের জ্বালা যন্ত্রণা বিষ, জ্বর, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, চোখ ওঠা, চোখে ছানি পড়া, চোখে কিছু পড়া, কলেরা, বসন্ত, জন্ডিস, হাড়ভাঙ্গা, হাড় মটকা, অর্ধাঙ্গ বা পক্ষাঘাত, মৃত সন্তান প্রসব করানো, মৃত সন্তান প্রসব বন্ধ করা, শীঘ্র সন্তান প্রসব করা, গর্ভপাত ঘটানো ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে এমনি ধরনের কত শত শত প্রকার রোগের লক্ষণ আছে, তার করিরাজেরা সব রোগের চিকিৎসা করতেন। এসব রোগের চিকিৎসার সময় তারা যে সব মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করতেন, সে মন্ত্র ছড়া বা গান ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির নাম লোকচিকিৎসা। এ চিকিৎসার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জাতির ঐতিহ্যের ধারক বাহক হিসেবে লোকচিকিৎসা তার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। কিশোরগঞ্জের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে লোক চিকিৎসার একটি বিশেষ ভাণ্ডার রয়েছে। এ ভাণ্ডারে যে সব লোকছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় সে গুলো কোথাও কোথাও মন্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন–তন্ত্র-মন্ত্র, যাদু-টোনা, শিঙ্গা লাগানো, হাঁড়ভাঙ্গা, ঝাঁর ফুঁক, তেলপড়া, পানিপড়া, গুড়পড়া, কড়িপড়া ইত্যাদি কাজে মন্ত্রপাঠের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লোকচিকিৎসার সাথে সমাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায় যুক্ত। এরা হলেন- পির-দরবেশ, সন্ন্যাসী-পুরোহিত, ফকির-ওঝা, গুনীন, বৈদ্য, বেঁদে, দাই, বইদ, হাকিম, কবিরাজ উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ, মন্দির, দরগা, ভিটা, পিরবাড়ি, মুন্সীবাড়ি, বৈদ্যবাড়ি, কবিরাজ বাড়ি নামে লোকচিকিৎসার উল্লেখযোগ্য স্থান বা এলাকা রয়েছে। যেমন- কিশোরগঞ্জ উপজেলা সদর 'যশোদলপুর' নামক গ্রাম, কটিয়াদী উপজেলার 'ভাণ্ডা' নামক গ্রামে আজও 'হাড় ভাঙ্গার' লোকচিকিৎসার বিখ্যাত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

www.pathagar.com

তারা সাধারণত যে সকল রোগে লোকচিকিৎসার কাজ করেন সেগুলো হলো- দাঁতের রোগ, বিশেষ করে দাঁত তোলা এবং দাঁতের পোঁকা বের করা, চোখের রোগ, চোখ ওঠা, চোখে কিছু পড়া, গলায় মাছের কাটা আটকানো, কলেরা, বসন্ত, শিয়াল-কুকুর-বিড়ালের কামড়, সাপেকাটা, শিশু রোগ, স্ত্রীরোগ, মাথাধরা, জন্ডিস, হাঁড়ভাঙ্গা বা মচকানো, শিশু বিছানায় প্রসাব করা, স্বপ্নদোষ, ভূত-পেত্নীর আচড়, কু-নজর, নারীপুরুষ বশীকরণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি। নিম্নে লোকচিকিৎসার কিছু লোকছড়ামূলক তন্ত্র-মন্ত্র তুলে ধরা হলো :

(১)

অচ্‌কা ঝাড়া মচ্‌কা ঝাড়া
বিলাই আগে ছড়া ছড়া
কুত্তা আগে দৈ
এমুন ঝাড়া ঝাইড়্যা দিয়াম
চৌদ্দ গুষ্টি সই।

এই লোকছড়াটি কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে হাড়ভাঙ্গা বা মচকানো হাড়কে মন্ত্রের মাধ্যমে সারিয়ে তোলার একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করেন। ছড়াটি উজান-ভাটির-হাওর জনপদে প্রচলিত।

(২)

আইদ্যা ঝাড়া বাইদ্যা ঝাড়া
আরো দিলাম তেনা ঝাড়া
তেনার ভিতর কালো ভইস
ভূত-পেরত যা-ই অইস
ঐ দূরের গাছ অ যা
আমার রোগীরে ছাইরা যা।

জ্বীন-পরী, ভূত-পেরত কত না রোগে বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। আর এসব এ জেলার গ্রামাঞ্চলে ভূত-পত্নীর আচড়ে রোগীর দেহে মন্ত্র পাঠ করা হয়।

(৩)

উতিনারে দুতিনা
তিনদিন ধইর্‍যা মুতিনা
তিনদিনের জ্বরে
মাথা বিষ করে।

চিকিৎসক এসে রোগীর খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে রোগী তার রোগ বর্ণনার বিষয়টি চমৎকারভাবে লোকছড়ার মাধ্যমে বলে দিলেন- তিন দিন ধরে তার প্রস্রাব হচ্ছে না, গায়ে ভীষণ জ্বর, আর মাথা ধরা তাই কবিরাজ ভাই এর একটা ব্যবস্থা চাই।

(৫)

করাত করাত মহা করাত
ভাল মন্দ আমার বরাত

www.pathagar.com

মাথা বিষ, পেট বিষ
যত আছে নাগের বিষ
ডাইনে কাড়ে বায়ে কাড়ে
মন্ত্র পড়ার দামে কাড়ে
দেবীর দোহাই চলে ব্যথা
দিব্যি রইল আমার মাথা।

মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, কোমর ব্যথা, পা ব্যথা, গা ব্যথা অর্থ্যাৎ সারা অঙ্গের ব্যথা-বেদনা-বিষ জ্বালা যন্ত্রণার উপর কবিরাজের এ লোকছড়াটি মন্ত্র হিসেবে কাজ করে।

(৬)

ভূত-প্যারতে লাগুক গায়
হাড়-মাংস খোয়াইয়া খায়
দৃষ্টি নজর বাউছুল্লির বান
কাইট্রা করি খান খান।

এ ছড়াটিও জ্বীন-ভূত-পেরতের আছর ছাড়ানোর মন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রোগী ভাল হয়ে উঠে।

গবাদিপশুর চিকিৎসা

কিশোরগঞ্জে লোকছড়ায় গবাদিপশুর তান্ত্রিক চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসক গোয়ালদের কথাও ফুটে উঠেছে। মানুষের পাশাপাশি পশুদেরও গ্রামীণ গোয়ালদের দ্বারা তন্ত্র-মন্ত্র যোগে চিকিৎসা করা হতো।

চতুর গোয়ালেরা গ্রামীণ মুর্খ কৃষকদের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে গবাদি পশুর চিকিৎসা করত। রোগ-বালাই ও কল্পিত 'শনি'র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য গোয়ালেরা গ্রামের রাস্তা-ঘাটে উচ্চস্বরে 'হো-ও-ও সুর-স্বর-ধ্বনি তুলে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করতেন। সুর-স্বর-শব্দ শুনে কৃষকেরা তাদের ডেকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসক গরুকে ধরে প্রথমেই 'বশ'করার জন্য এক ধরনের 'রশি বা দড়ি' ব্যবহার করতেন। গরুর শরীরে কিংবা পায়ে বেঁধে অদ্ভুত তন্ত্র-মন্ত্র যোগে লোকছড়া পাঠ করতেন। সবচেয়ে ভয়ানক হলো আগুনে পোড়ানো লোহার তৈরি একধরনের অস্ত্র তাকে বলা হয় 'আকড়া'। এই আকড়া গরম করে গরুর গায়ে ঠেসে ধরে চ্যাকা দিত। গরুর শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গিয়ে গনগনে লাল ক্ষতের সৃষ্টি হতো। এ ক্ষত শুকিয়ে গেলেও পরবর্তীতে সাদা দাগের চিহ্ন দেখা যেত। আকড়া হচ্ছে লোহার 'শিক' দ্বারা তৈরি এক ধরনের আংটা। যা দ্বারা কবিরাজ চিকিৎসা করতেন। পকেটে থাকত কিছু লতা পাতার তৈরি ভেষজ ঔষুধ। বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে টাকা-পয়সা-চাল-ডাল ইত্যাদি গ্রহণ করত। সুদূর যশোর-ফরিদপুরের গোয়াল সম্প্রদায়ের এ অঞ্চলে আগমনে তাদের কদর ছিল বেশি। স্থানীয় গোয়ালদের ও উপস্থিতি ছিল।

এ পেশাধারী গোয়ালদের এখনও কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে পূর্বের তুলনায় কম হলেও দেখা যায়। কিশোরগঞ্জ জেলা সদর গাইটাল নামক এলাকায় এখনও কয়েকঘর স্থানীয় গোয়ালদের বসতি রয়েছে।

www.pathagar.com

খ. তন্ত্রমন্ত্র

ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও ওঝার ঝাড়ার তন্ত্রমন্ত্র প্রচলিত আছে। গ্রাম্য ওঝা-বৈদ্য-গুণীনদের তন্ত্রমন্ত্র সাধনার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরু আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই এর উদ্ভাবক হিসেবে পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। আয়ুর্বেদে মাত্র একশত বনৌষধির কথা উল্লেখ আছে। আর সুশ্রুত সংহিতায় প্রায় সাতশত গাছের ভেষজ ওষুধের গুণের কথা বলা হয়েছে। এভাবে লোকচিকিৎসা ক্ষেত্রে কবিরাজ, ফকির, পির-দরবেশ, সাপুরে বা ওঝা যেসব মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে মুমূর্ষু রোগীকে নিরাময় করে, কিশোরগঞ্জের প্রচলিত এমন কিছু তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ওঝার ঝাড়-ফুঁক বা সাপের তন্ত্রমন্ত্র

সাপ বিশেষ করে বিষধর সাপ নিয়ে মানুষের কৌতূহল আদিকাল থেকেই। সাপ মানুষের চিরশত্রু। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই বিষয়ধর সর্পের দংশনে কত প্রাণীর যে ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ সর্প থেকে- সর্পের বিষয় থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। সর্প বিষ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়েই বঙ্গদেশে সাপের মন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দু পুরাণে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন পদ্মাবতী।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে মনসা দেবী হলেন পদ্মাবতীর শত্রু। একদিন পদ্মাবতী বিষ রেখে স্নান করতে গেলে মনসা দেবী তেত্রিশ কোটি বিষ নিয়ে পালায়। সে মর্ত্যে এসে চাঁদ সওদাগরকে পূজা দিতে বলে। দেবী ছিলেন কানা অর্থাৎ একচোখা। দম্ভভরে চাঁদ সওদাগর 'কানি মাগীকে পূজা দেব না' বলে জানিয়ে দেয়। এতে মনসা দেবীর রোষানলে পতিত হয় চাঁদ সওদাগর। একে একে অনেক পুত্র সন্তান হয় চাঁদ সওদাগরের কিন্তু যৌবনে সাপের দংশনে সবাই মারা যায়। রাজরানি সনকা পুত্র শোকে অধীরা।

অবশেষে রানীমাতার কোল জুড়ে এলেন লখিন্দর। যৌবনে অপরূপ সুন্দরী বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিয়ে হলো। লোহার বাস ঘর বানানো হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিশ্ছিদ্র লৌহ বাসরে কালনাগিনী লখিন্দরকে দংশন করে। সতী বেহুলা স্বামীর মরদেহ নিয়ে অবশেষে বহুদিন পর দেবী পদ্মাবতীর কৃপাদৃষ্টিতে স্বামীর আত্মা ফেরত পান। সাপের মন্ত্রাদিতে এই বেহুলা লখিন্দরের কাহিনিও উল্লেখ করে ঝাড়-ফুঁক করা হয়। গ্রাম্য ওঝাদের বিশ্বাস এই পদ্মাদেবীর দোহাই দিলে সাপের বিষ রোগীর দেহ থেকে নেমে যায়।

আধুনিক শিক্ষার বদৌলতে মানুষ সাপের মন্ত্রের এইসব ঝাড়-ফুঁকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সাপের বিষতো বাঙালির বিষ নয় যে 'কষিয়া গালি গালাজ করিলেই' আপনা থেকে নেমে যাবে।

যারা সাপের বিষ ঝাড়ে তাদেরকে 'ওঝা' বলা হয়।

www.pathagar.com

ওঝারা ব্যক্তিগত জীবনে বহু নিয়ম-কানুন রক্ষা করে চলে। অনেকে ছাতা মাথায় দেয় না, জুতা পরে না, সাপ মারে না কিংবা রোগীর বাড়িতে জলস্পর্শও করে না।

ওঝা ঝাড়তে গিয়ে যে মন্ত্র ব্যবহার করে তা হলো :

ধর্ম চালম কর্ম চালম
সাপের মই টক চালম,
আসা আসি কমন চালম
ধর্ম চালম কর্ম চালম॥

ওঝার হাতে ঘটিতে রাখা পানি। সাধারণত পানি তোলার সময় দম বন্ধ করে সাত ঘাটের পানি আনা হয়। পানি পড়ার মন্ত্র নিম্নরূপ :

সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও,
কোনখানে দংশিলেরে বুড়া যইবত নারীর গাও?
সাধের চিলারে বাঁকা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে চিলা যইবত নারীর গাও॥
সাধের মাছোয়া রে মাছোয়া বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে মাছোয়া যইবত নারীর গাও॥
সাধের কাইল্যা রে কাইল্যা বলি তোরে
কোনখানে দংশিলে রে কাইল্যা যইবত নারীর গাও॥

এরপর শুরু হয় ঝাড়ার মূল অংশ:

আছিলে মাধব নাগরে হৈয়া গেলে ডুরা
রাখ ওয়ালে পাইলে তরে ভাঙ্গবো তোর মুড়া॥
তোর দেবী কালী দেবী
ন্যাংড়া থাকে নিরবধি
ন্যাংড়া মাগী কানী মাগী সেও তোর মা
যা বিষ ছাইড়্যা যা নইলে আস্ত রাখব না॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব॥
কিংবা
এ পাড়ে ধোবা ধুবনী সে পাড়ে তার পাও,
মাঝখানে দিয়া বইয়া যায় সওদাগরের নাও॥
সওদাগরের নাওখানি ঝুমুর ঝুমুর করে,
হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া বিষ ভূমে আইসা পরে॥
ভূমেতে আসিয়া বিষ চায় চতুরদিকে,
ঝাড়িতে লাগিল নেতা পদ্মার সাক্ষাতে॥
নেতা বলে পদ্মাবতি কিবা ঝাড়া ঝাড়ো,
'জলসাফা' 'কুলি ভাঙ্গা বীর' সকল জ্ঞানের বড়॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব,
রহিতে না পারো বিষ মা পদ্মার তলব॥

www.pathagar.com

কিংবা

গাঁইট বানলাম গাটরে বানলাম
দইর‍্যা বানলাম ছাইর‍্যা;
বাপে না লইছিল কোলে, মায় না দিছিল তন।
আরক্ষ্যা জারক্ষ্যা বিষ মন্ত্র নাহি মানে,
কালিয়া সাপের বিষ ঢলিয়া পড়ে।
উজানী উজানী দাফন যদি করিবে
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পার বিষ মা পদ্মার তলব॥

কোনো কোনো ওঝা সাপে কাটা রোগীকে দশ পনের হাত দূরে গাইলের উপর বসিয়ে ঝাড়া শুরু করেন। প্রথমে ওঝা ঘটির পড়া পানি দিয়ে মাটির উপর হাত ঘোরাতে ঘোরাতে পানি ঢালে। পানি মাটিতে কাদা হয় লেপার মত হয়। হাত কাদা মাটির উপর প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। 'দোয়াই আল্লার' 'দোয়াই পয়গম্বরের', 'দোয়াই আলীর', 'দোয়াই কালীর', 'দোয়াই পদ্মার', 'দোয়াই ওস্তাদের' বলে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে মন্ত্র আওড়ায় এভাবে–

কর্ম ছালি ধর্ম গো ছালি
ছালি আর গো যত দেব ধরম গো।
পঞ্চম পাণ্ডব ছালি অষ্ট মাতা তবে গো
চৌষট্টি নগরে ছালি ধর্মপুরের মধ্যে গো॥
চল চল হাতরে চল
চল আরগো যেখানে সাপের বিষ গো॥

এ অবস্থায় ওঝা হাত ঘোরাতে ঘোরাতে রোগীর পিঠে এবং মাথায় থাবা দেয়। তারপর আবার শুরু করে মন্ত্র এভাবে–

থাবায় ধরলাম বিষ
চিপায় করলাম পানি
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পারে বিষ মা পদ্মার তলব॥

এরপর শুরু হয় মূলমন্ত্র। মূলমন্ত্র এ রকম
সাধের বুড়ারে চিকনী করে রাও
কোনখানে দংশিলে বুড়া যইবত নারীর গাও।
যইবত নারী জলে যায় গোলখাড়ুয়া তার পায়
পথে পথে নারী জাতে যৈবন বিলায়।
ময়ূরা ময়ূরী নাচে উলু খেতে থাইক্যা
গুইয়াডায় লড়ালড়ি যায় সেই পারে থাইক্যা;
সেই পার সাধু সদাগর ডিঙ্গা বাইয়া যায়
এই পাড়ে ধোবা ছেড়ি এ কাপড় ধুলাই করে॥

www.pathagar.com

এর পরবর্তী অংশ ভারী অশ্লীল। তাই এখানে উল্লেখ করা হলো না। এগিয়ে চলে ঝাড় ফুঁক। আর মন্ত্র পড়েন। দু'একটি উদাহরণ :

ওরে কেউট তুই মনসার বাহন
মনসা দেবী আমার মা
ওলট পালট পাতার ফোঁড়-
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
দুধরাজ মণিরাজ।
কার আজ্ঞা- বিষহরির আজ্ঞা॥

কিংবা

বিষ থুইয়া পদ্মাবতী ছান করিতে গেল।
তেত্রিশ কোটি বিষগো লইয়া মনসা পালাইল॥
ওরে বিষ ওরে বিষ রহি মন কলব।
রহিতে না পারো বিষ মা পদ্মার তলব॥

www.pathagar.com

ধাঁধা

কিশোরগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে এককালে সকল শ্রেণির মানুষের মুখে মুখে শিলুক বা ধাঁধা বলার প্রচলন ছিল। বিশেষ করে মহিলারা শিলুক বলায় পারদর্শী ছিলেন। তারা কথায় কথায় এককালে শিলুক বলতে পারতেন। এ যুগে এখন আর খুব একটা শিলুক উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। সে এক সময় গেছে যখন গ্রামের বাড়ির দাদা-দাদী, নানা-নানী, মা-চাচীরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্লোকের ঝাঁপি খুলে বসতেন।

হাজারো ঢঙের বৈচিত্রপূর্ণ শ্লোক সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি ঝালাইয়ের জন্য অর্থাৎ মগজ ধৌলাইয়ের জন্য খুবই সহায়ক হতো। কে কতো বুদ্ধিমান অথবা কার মাথায় কত বুদ্ধি আছে তার তাৎক্ষণিক প্রমাণ পাওয়া যেত এ সকল শ্লোকের প্রশ্ন উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে। যেমন– শুভংকরের ফাঁকি– ছয়ত্রিশ থেকে তিন'শ চলে গেলে, কত থাকে বাকি? এর উত্তর দিতে হয়- ৩৩ (তিন'শ অর্থাৎ শ,ষ ও স)। একটি শিলুকে এক মহিলাকে প্রশ্ন করে তার স্বামীর নাম কী জানতে চাইলে উত্তরে স্ত্রী'র মুখে স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না, তাই কথা বলে শিলুকে–

১. তিন তের দিয়া বার
নয় দিয়া পূরণ কর
গাজী-বলে ডাহে হগলে
হুন মিয়া ভাই বলে
আমার স্বামীর এই নাম।
পার কইয়া দেও, নাইত্তর যাম।

উত্তর : ১৩ × ৩ = ৩৯ + ১২ = ৫১ + ৯ = ৬০ অর্থাৎ নাম তার ষাইডাগাজী।

ধাঁধার ভিতরে কখনো কখনো কোনো প্রচ্ছন্ন গল্প-কাহিনি-কিংবদন্তিও থাকে। তাকে বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। কোনো কোনো শিলুক হাস্য রসিকতায় থাকে ভরপুর। তবে কোন কোন ধাঁধার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন কাজ। যেমন-

২. তিন অক্ষরে নাম তার
জলে বাস করে
মধ্যের অক্ষর ছেড়ে দিলে আকাশে উড়ে। উত্তর- চিল।
এ ধরনের আরও একটি শিলুক। যেমন–

৩. দুই হাতে টিপা টিপি
এক হাতে ঢালা
ভিতরে গেলে
তোমারও ভালা
আমারও ভালা।
উত্তর- হাতে চুড়ি পরানো।

www.pathagar.com

৪. অষ্টচরণ, ষোল হাঁটু
খাবার ধরতে চলে গোলাটু
শুকনা ডাঙ্গায় পাতে জাল
তাতে খাবার খায়, চিরকাল।
উত্তর- মাকড়সা।

৫. বিয়া হইল না বাপের
আড়াই হাত মোছ হলো ছেলের
কও দেখি ভাই, কেবা পারো
ঘুরে যায় মাথা পণ্ডিতেরও।
উত্তর- রসুন।

৬. জঙ্গলবাড়ি হতে বাহির হইল টিয়া
সোনার পুটুলি মাথায় দিয়া।
উত্তর- কলাগাছ।

৭. হাতে লইয়া হাতে থাপা দিলে
বাদ্য বাজে টেম্ টেম
অ-মিয়া, দাম কত দেম।
উত্তর- মাটির পাতিল।

৮. একটুখানি পুষ্কুনি খান
কইয়ে ভূর ভূর করে
রাজা আইলে প্রজা আইলে
সবাই তুইল্যা সালাম করে।
উত্তর- হুক্কা।

৯. দুই ঠ্যাং ফাগাইয়া
মাইজখানঅ লাগাইয়া
ফরিংয়ের রাজায় কয়
যাঁতা দিলে সিদ্ধি অয়।
উত্তর- সুপারি কাটার চরতা বা যন্ত্র।

১০. যাঁতার উপরে যাতা
আড়ুর উপরে ভর
কমরে কমরে লাগাইয়্যা
গলার মধ্যে ধর।
উত্তর- জল ভরা কলস।

১১. আত্তির দাঁত ময়ুরের পাখ
এই শিলুক না ভাঙ্গাইতে পারলে
গাধার জাত।
উত্তর- মূলা।

www.pathagar.com

অতীতে কিশোরগঞ্জের নারীদের বিয়ের কালে শিলুক জানে কিনা তা প্রশ্ন করা হতো। বলতে পারলে বিয়ে হতে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ তাতে বর পক্ষের বিশ্বাস ছিল যে, যে পল্লিবালা এত সুন্দর 'শিলুক' বলতে বা বানাতে পারে সে বুদ্ধিমতি না হয়ে পারে না, তাকে বৌ করে নিতেই হবে। এককালে কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এই বিশ্বাস বা ধারণা প্রচলিত ছিল, এখনও তা অব্যাহত আছে। এদিক থেকে বিচার করলে পল্লির নর-নারীর মুখের ভাষাগুলো এক একটি ভাব জগৎ, চিন্তা-চেতনার সম্পদের পরিচয় বহন করে।

কিশোরগঞ্জ জেলার নামকরণ নিয়েও একটি স্থানীয় ধাঁধা রয়েছে।

১২. বলুন তো- কিশোর নামটি তার
রয়েছে গঞ্জের পাশে
এ নামে কোন স্থান আছে ?
উত্তর- কিশোরগঞ্জ, বৃহত্তর ময়মনসিংহে।

কিশোরগঞ্জের সংগৃহীত ধাঁধা নিম্নে দেওয়া হলো

১. ছোটকালে জটা ধারী
জোয়ান কালে উলঙ্গ
বুড়াকালেও জটাধারী
মধ্যে মধ্যে সুড়ঙ্গ।
উত্তর- বাঁশগাছ।

২. এক অঙ্গ, দুই অঙ্গ, তিন অঙ্গ জোড়া
দৈবে তার মাথা গেল পোড়া।
ভাবে বোঝা যায় তার পেটে করে রাও
মুখে এত স্বাদ তারে চুষে চুষে খাও।
উত্তর- হুক্কায় তামাক খাওয়া।

৩. এককানি ক্ষেতের দুইকানি মাথা
ভঁইষ মারে লাতালুথা
মরা ভঁইষে যুদ্ধ করে
এই শিলুক কে ভাঙ্গাইতে পারে।
উত্তর- মই।

৪. রাস্তা দিয়া দুটি মেয়ে যায় হাঁটিয়া
একই দামের একই শাড়ি দুইজনে পরিয়া
কত দামের শাড়ি এবং তাদের সম্বন্ধ কি হয়
এক কথায় বল দেখি, দাম ও পরিচয় ?
উত্তর- ২০৩ (অর্থাৎ ওরা দুই সতিন)।

www.pathagar.com

৫. ক' দিয়ে নাম তার
আঁঠাল যুক্ত আঁশ
শরীর জুড়ে কাঁটা তার
তবু করি চাষ।
উত্তর- কাঁঠাল।

৬. ইন্দ্র নয়, তবু তার সহস্র নয়ন
লোহানয়, তামানয়, তামাটে বরন
মোরগ নয়, ময়ুরী নয়, শিরে মোহন চূড়া
তারে খেলে খুশি হয় ছেলে পুলে বুড়া।
উত্তর- আনারস।

৭. চামড়ার তলে তলে পড়তে পড়তে ছানি
কোন দেশে দেখিয়াছ গাছের আগায় পানি।
উত্তর- ডাব।

৮. মাটির তলে থাকে বেটি
কাপড় পিন্ধে আঁটি আঁটি
কেউনা ছোঁয়, কেউ না ধোয়
তবু কত পরিষ্কার রয়।
উত্তর- রসুন

৯. উড়িতে ঝিকিমিকি পড়িতে ধান্ধা
আদার করিতে তার লেঙ্গুরে বান্দা।
উত্তর- কনুই জাল।

১০. এমুন একটা অখাদ্য সর্ব লোকে খায়
ছুডু মানুষ খাইলে পরে কান্দিয়া বেড়ায়
বড় লোকে খাইলে পরে বুহে ব্যথা পায়
জোয়ান মানুষ খাইলে পরে এম্ম এম্মে চায়।
উত্তর- আছাড়।

১১. আঁতুর বাডাল বাইশটা
চুরে নিল তিনডা
বাকি রইল তার কয়ডা?
উত্তর- একটিওনা।
[কারণ এগুলো ছিল তিনটি যন্ত্রের নাম যা কাঠ মিস্ত্রি ব্যবহার করে।]

১২. তুমি থাক জলে, আমি থাকি ডালে
তোমার আমার দেখা হবে
দু'জন-দুজনে মরণের কালে।
উত্তর- মাছ ও লেবু।

www.pathagar.com

১৩. আসমান জুইড়া বাঘের পাড়া
ষাইট গরু দিয়া জুড়ছে মারা
যদি গরু গইর লয়
আঁশ ফালাইয়া বাহল লয়।

উত্তর- পাটশোলা।

১৪. উন্দা রইছে ধুন্দা অইয়া
বৈরাগী রইছে চাইয়া।

উত্তর- কলার থোর।

১৫. কালিদাস পণ্ডিতে কয়
বহুদিন আগের কথা
নয় হাজার তেতই গাছে
কত হাজার পাতা?

উত্তর- আঠারহাজার।

১৬. মামুর বাড়িতে গেলাম
মামু আমারে দেইখ্যা
দুয়ারটা বন্ধ কইর‍্যা
দিল একটা সালাম।

উত্তর- শামুক।

১৭. টনটন গডন, কোন কুমারে
বানাইছে ঘড়ি
নাগরের পুতে ধরছে চাত্তি
আনা তেলে জ্বলতে বাত্তি।

উত্তর- সুপারি গাছ।

১৮. মামুর বাড়ির মেনা গাই
মেন মেনাইতে চায়
হাজার টাকা মরিচ খাইয়া
আরো খাইতে চায়।

উত্তর- পাটা।

১৯. এড়াইয়া দিলে বেড়াইয়া ধরে
টেবাইয়া পড়ে রস
কাজের বেলা কাজ করে
আর বেলা থাহে খস।

উত্তর– ঘানি টানা।

২০. তিন অক্ষরে নাম তার, সর্বঘরে আছে
শেষের অক্ষর বাদ দিরে, কেউ যায় না কাছে

www.pathagar.com

প্রথম অক্ষর দিলে বাদ, সর্ব লোক খায়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে, বাজনা বাজায়।
উত্তর- বিছানা।

২১. আজব এক জিনিস, দেইখ্যা আইলাম ভাই
আট পাও তার, দুই হাঁটু, লেজ আছে পিঠে।
লড়ে চড়ে, উপরে নিচে পড়ে, চোখ তার নাই।
উত্তর- দাড়িপাল্লা।

২২. দেইখ্যা আইলাম মিয়া সাহেবের হাটে।
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।
উত্তর- দরজার খিল।

২৩. চামড়া সুন্দর কুমড়ার বাখল
না খায় সাধু গেরানে (ঘ্রাণে) পাগল।
উত্তর- তাল।

২৪. উচু উচু বুক টান
এক বেটার চার কান।
উত্তর- চৌচালা ঘর।

২৫. ছোট্ট-খাট্ট ছেলেডা, রাঙা কোর্তা গায়
হাটু দিয়া বন্দুক মারে, দালান চিড়া খায়।
উত্তর- বজ্রপাত।

২৬. রহিমুদ্দি কলিমুদ্দি সবাই মিল্লা ডাহে,
তবু বেটা ফিরা নাহি চাহে।
উত্তর- সময়।

২৭. দুই অক্ষরে নাম মোর, বাঁশের কাঠের তালি
বেঁধে রাখলে আটজন চোর, দোঁড়াই একা মুই
ছেড়ে দিলে লুজ, মুই কিছুই নাহি জানি।
উত্তর- মই।

২৮. আছে ফল দেশে নাই
খাই ফল তার যে গা (ছাল) নাই।
উত্তর- শিলাবৃষ্টি।

২৯. হাত আছে পা নাই
মাথা তার কাডা
আস্ত মানুষ গিলে খায়
বুক তার কাডা।
উত্তর- জামা।

www.pathagar.com

৩০. আমি থাকি খালে
তুমি থাক ডালে
আখেরের দিনে
মইত একখানে।

উত্তর- মাছ ও মরিচ।

৩১. এস্তুন মাইল্লাম ছুরি
ছুরি গেল পাতালপুরী।

উত্তর- কেঁচো।

৩২. গুল গুল লোহার পাও
কান্দ লইয়া দিমু দউড়
পাও কিনা পাও।

উত্তর- মটরগাড়ি।

৩৩. আল্লার কি কুদরত
লাঠির ভিতর শরবত।

উত্তর- ইক্ষু।

৩৪. পাঁচ বেডা তুইল্যা দিল, বত্রিশ বেডার ঘাড়ে
দুয়ারে আছে কুটনাবুড়ি টাইন্যা নেয় ঘরে।

উত্তর- আঙ্গুল, দাঁত ও জিহ্বা।

৩৫. তিন কুনা মধ্যে গাতা
ফালদু ফালদা মারে যাতা।

উত্তর- পেলুন (এক প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র)।

৩৬. নাকে বসে কানে ধরে।

উত্তর- চশমা।

৩৭. হাত নাই পাও নাই দেশে দেশে ঘুরে
তার অভাব হলে লোকে অনাহারে মরে।

উত্তর- মুদ্রা।

৩৮. গাতার ভিতর পাতা নড়ে,
না করলে আরও নড়ে।

অথবা

বত্রিশটি ডালে একটি পাতা।

উত্তর- জিহ্বা।

৩৯. তুমি আমি একজন দেখিতে একরূপ
আমি কথা কই, তুমি কিন্তু চুপ।

উত্তর- ছবি।

www.pathagar.com

৪০. নহি আমি গাছ তবু শাখা আছে মোর
সব সময় থাকি আমি মাথার উপর।
উত্তর- হরিণের শিং।

৪১. দিনগুনি, সপ্তাহগুনি, আর গুনি
এমনি করি কাটাই আমিবারটি মাস।
উত্তর- ক্যালেন্ডার।

৪২. তিন অক্ষরে নাম যার আছে এশিয়াতে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে বড্ড ঝাল খেতে।
উত্তর- শ্রীলংকা।

৪৩. গলা আছে তলা নাই
পেট আছে উজুরী নাই।
উত্তর- পলো (মাছধরার যন্ত্র)

৪৪. আইল দিয়া যা-
উইক্কা উইক্কা (উঁকি) চা।
উত্তর- সুঁই।

৪৫. আমার একটি পাখি আছে
যা দিই তা খায়
জল দিলে মারা যায়।

অথবা
যা কিছু পায়- গিলে খায়।
উত্তর- আগুন।

৪৬. একশ ঘরের দু'শ দুয়ার
এক মারুলে ঘর তৈয়ার।
উত্তর- তছবিহ ছড়া।

৪৭. এক হাত গাছটা
ফুল ধরে পাচটা।
উত্তর- হাতের আঙ্গুল।

৪৮. মা রইল নানীর পেটে
আমি গেলাম বাবুর হাটে।
উত্তর- কলা।

৪৯. পানির নীচে হিজল গাছ
কাটতে লাগে বার মাস।
উত্তর- ছায়া।

www.pathagar.com

৫০. বিনা সুতার মোহনমালা- কেউ দেখে না তারে
ইহার এমন নিঠুর ধারা- সারা করে ছাড়ে।
উত্তর- প্রেম।

৫১. ছোট ছোট পোলাপান দুধ ভাত খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে চায়।
উত্তর- কুঁড়াল।

৫২. তিন টক্কর লোহা লক্কর
আমার কাছে নাইকো ফক্কর।
উত্তর-ঘড়ি।

৫৩. ঘষা দিলে মিটে আশা
নইলে পরে সব নিরাশা।
উত্তর- দিয়াশলাই।

৫৪. দুই পা ধরিয়া
আপন কাজ করিয়া
পরে দেয় ছাড়িয়া।
উত্তর- ছরতা (সুপারি কাটার যন্ত্র)।

৫৫. মাসে মাসে আসে যায়
দিনে খায় না, রাতে খায়।
উত্তর- রোজা।

৫৬. এক ফকিরের এক দাঁত
রাত পোহালে গোল-ভাত।
উত্তর- পাঁচন।

৫৭. কোঠার কোঠা নব্বই কোঠা
বেত লাগে আশি মোঠা
সোনার কামলা ভাই
কোঠাতে কেন বান নাই।
উত্তর- মৌমাছির বাসা।

৫৮. টিপ দিলে কথা কয়–
না দিলে না কয়।
উত্তর : রেডিও।

৫৯. কালো গাছের তলে
কালো হরিণ চলে।
উত্তর : উকুন।

www.pathagar.com

৬০. লাল লাল জামা গায়
মেমসাহেবরা হাটে যায়।
উত্তর : টমেটো।

৬১. জমি সাদা বীজ কালো যায় বহুদূর
তার বচনে মনটি হয় যেন মধুর চেয়ে মধুর।
উত্তর : চিঠি।

৬২. বাগানে এক শব্দ হইল, শুনল দুইজনে,
সেইজনে গেল না, গেল অন্য দুইজনে।
সেইজনে দেখল না, দেখল অন্য দুইজনে
সেইজনে আনল না, আনল অন্য দুইজনে
সেইজনে খাইল না, খাইল অন্য একজনে।
উত্তর : কান, পা, চোখ, হাত ও মুখ।

৬৩. হাত নাই পা নাই পেটটা কেবল সার
সারা জনমে একবার করেছে আহার।
উত্তর : বালিশ।

৬৪. অর্থের লোভ তার যত পারে নেয়
আবার চাইলে সব অর্থ ফেরত দেয়।
উত্তর : ব্যাংক।

৬৫. সমুদ্রে জন্ম আমার থাকি সবার ঘরে
একটু পানির পরশ পেলে তখন যাই মরে।
উত্তর : লবণ।

৬৬. দেখিতে গোল গা
পেটের ভিতর হাত পা
চলে কিন্তু নড়ে না
এটা কি তা বল না।
উত্তর : ঘড়ি।

৬৭. লতা নয়, পাতা নয়, তবু লতিয়ে লতিয়ে যায়
সর্ব অঙ্গ ছেড়ে শুধু চক্ষু দুইটি খায়।
উত্তর : ধুয়া।

৬৮. ডাল নেই, পালা নেই, আছে শুধু পাতা
নাক নেই, মুখ নেই, কয় তবু কথা।
উত্তর : বই।

৬৯. অকুল সমুদ্রে মেরু, জল তাতে নাই
রাশি রাশি স্থলভাগ, ঘর-বাড়ি নাই।
উত্তর : মানচিত্র।

www.pathagar.com

৭০. এপাড়ে শোয়া শিয়াল
ঐ পাড়ে শোয়া শিয়াল
ক'টি শিয়াল?

উত্তর : ২টি।

৭১. সাগরে জন্ম নয়, জন্ম হইলে খালে
এমন আশ্চর্য বস্তু পরিয়ে সকলে
রাশির মিনতি হলে টপকে উঠে গালে।

উত্তর : জুতা।

৭২. পা, পিষ্ঠ, মাথাটা, কুড়ি আঙ্গুল তার নাকটা
চক্ষু কর্ণ নাই তার
এ কোন জীব?

উত্তর : মানুষ।

৭৩. কালা কালা বকরি কালা ঘাস খায়
আলে ঠোঁট মুছে গর্তে ঢুকে যায়।

উত্তর : ক্ষুর।

নিম্নের ধাঁধাগুলো কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

১. তুমি ডাক যারে
সে নাই ঘরে
তোমার শ্বশুর বিয়ে করেছে
আমার শাশুড়ি মারে।

উত্তর : জামাই ও শ্যালকের বউ।

২. শাখাহাতি ছোলাদাতি
পোলা দোয়াছ কার নাতি?
পোলার বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর

উত্তর : ভাই ও বোন

৩. একটি গাছে যদি এক ঝাঁক পাখি জোড় জোড় করে বসতে চায়– তখন একটি ডাল খালি থাকে, আর যদি পাখিগুলি একা একা বসতে চায় তখন একটি পাখি উড়ালে থাকে, কয়টি পাখি ও কয়টি ডাল?

উত্তর : ৪টি পাখি ও ৩টি ডাল।

৪. চিড়ার সের পয়সা পয়সা, গুড়ের সের তিন পয়সা, আগে গেলে আগে পাবেন, চিনির সের ছ'আনা, আড়াই সের কিন ভাই, চার আনায় কতটুকু পাবেন।

উত্তর : ১ সের চিড়া, ১ সের গুড় ও আধা সের চিনি।

৫. কোন ধানে চাল নেই ? উত্তর : অভিধানে।

www.pathagar.com

৬. কোন ইস্টেশনে গাড়ি থাকে না? উত্তর : রেডিও স্টেশনে।

৭. কোন ড্রাইভার গাড়ী চালায় না? উত্তর : স্ক্রু ড্রাইভার।

৮. কার ছাতা সবচেয়ে ছোট? উত্তর : ব্যাঙের ছাতা।

৯. কোন শহর খুলতে মানা? উত্তর : খুলনা।

১০. ধর্ম ধলা কর্ম কালা/মাথাত লেজুড়/পুটকিত মালা।
উত্তর : খাইস্যা জাল।

১১. ঘর আছে দুয়ার নাই/মানুষ আছে রাউ [কথা] নাই।
উত্তর : কবর।

১২. লাইলের তলে মরা গাই/ সাতবার তাতে দুয়াতে যাই।
উত্তর : মাছ ধরার চাঁই।

১৩. মাথার উপর মাথা/তার উপর তিন মাথা।
উত্তর : মানুষ।

১৪. দুই বুক দিয়া পারা/মাঝখানে তারা।
উত্তর : চোখ।

১৫. দুটো ঠ্যাং টাইনা মাঝানে লাগাইয়া/আমার কাজ কিরয়া/ তুমারে দিলাম ছাড়িয়া।
উত্তর : সুপারি কাটার সরতা।

১৬. থইল্যা দিলে মেইল্যা যায়। বিত্তে গেলে আরাম পায়।
উত্তর : ছাতা।

১৭. উঁহু উঁহু দুক্কু পাই/ তো আমি খয়ালাই। দিতে লইছ আরেকটু দাও/ তুমারো ভালা আমারো ভালা।
উত্তর : চুড়ি।

১৮. হাতে ধইরা টিপাটিপি/ মুখখান করে কালা/ দিয়া সারলে তুমারো ভালা আমারো ভালা।
উত্তর : চুড়ি।

১৯. গলায় গলা কুমরে কুমরে লাগাইয়া/গলায় ধরে আড়াইয়া।
উত্তর : কলসি।

২০. অতবড় উঠানডা ফুরায়া নাই/অত ফুল ফুইট্যা রইছে? তুলয়া নাই।
উত্তর : আকাশের তারা।

২১. জিলহি ঠাডা/ জিলহি ঠাডা/ধান মাড়াইলাম আঠার কাডা। দিন অইলে ধান পাকে/রাত অইলে ধান থাকে না।

২২. এই দেকলাম এই নাম বেতগরুর গাই নাই।
উত্তর : বিজলী।

২৩. মামুরা বাড়িতে গেছলাম/চুলার পাড়েত শুইয়া রইলাম।
উত্তর : বিড়াল।

www.pathagar.com

২৪. মামুর বাড়ির পাশে/ঘাড় ভাঙ্গা শেয়ালে নাচে।
উত্তর : কলার ছড়ি।

২৫. নানীর বাড়িত গেলাম/ঘাটের তলে শুইয়া রইলাম।
উত্তর : রাস্তা।

২৬. নানীর বাড়িত গেলাম/ঘাটের তলে শুইয়া রইলাম।
উত্তর : পিঁপড়া।

২৭. চারটা কলস জিনিস ভরতি/ নিজ দিকে পইরা রইছে পরে না।
উত্তর : গাইয়ের ওলান।

২৮. পেডে খায় পিডে চলে।
উত্তর : স্টিমার।

২৯. পিড কুঁজ বুক টান/ কুনাত তীর চারখান।
উত্তর : ঘর।

৩০. একটা জীবের পাঁচচল্লিশটা নাম।
উত্তর : পাঁচকমড়ি পোকা।

৩১. আমার একডা খাসি আছে/বট পাতা খায়/নিঙ্গুর ধরইরা টিপ মারলে /উইক্যা উইক্যা যায়।
উত্তর : ঢেঁকি।

৩২. লেড়বেড় /ছ্যাপ দেয় খাড়া হয়/ টিপ দেওয়া হামায়া দেই।
উত্তর : সুঁই-সুতা।

৩৩. রাত হইলে আগ্‌গুয়া/ দিন হইলে বাইট্যা।
উত্তর : দরজা।

৩৪. পথে ঘাটে দেখছি যারে/বুঝি না তার কথা/কাটলে মাথায়/বুঝায় বুলি/কেমন ধারার প্রথা।
উত্তর : কাবুলিওয়ালা।

৩৫. পেট কাটলে হয় কালী বরণ/ লেজ কাটলে হয় কাবু/ এ জীবের চিনতে পারলে/শাবাশ বলি বাবু।
উত্তর : কাবুলিওয়ালা।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত ১০নং থেকে ৩৫নং সংখ্যক ধাঁধা কথক -

১. উষা রাণী ভৌমিক, বয়সঃ ৮৬, পেশাঃ গৃহিনী, ঠিকানাঃ বৌলাই, কিশোরগঞ্জ
২. দুলাল চন্দ্র দাস, বয়সঃ ৪৫, পেশাঃ গায়ক, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৩. মজিবুর রহমান, বয়সঃ ৪৭, পেশাঃ ব্যবসা, ঠিকানাঃ নাজিরহাজির বাড়ি, বৌলাই, কিশোরগঞ্জ
৪. বয়াতি চান মিয়া, বয়সঃ ৫০, পেশাঃ বয়াতি, ঠিকানাঃ বৌলাই, কিশোরগঞ্জ
৫. সলিমুদ্দিন, বয়সঃ ৪৫, পেশাঃ সেল্যুন ব্যবসা, ঠিকানাঃ বৌলাই, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

গ্রামঞ্চলের বয়স্ক ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কিছু অর্থপূর্ণ বাক্য তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন। এগুলোই প্রবাদ-প্রবচন। নিম্নে কিশোরগঞ্জের কিছু প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখ করা হলো :

'যেয়ছা তেয়ছা মিলে'।

এ প্রবাদটি প্রাচীন চর্যাপদেও রয়েছে। কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন অঞ্চলে এ প্রবাদ কথিত হয়। যেমন–

যেয়ছা তেয়ছা মিলে
যায় সানকা তায়সান
কিংবা
বাইগুনে হুটকী মিলে ॥
হুঁটকিকা বায়গান।

অর্থাৎ যার সাথে যার মিল তার সাথেই ঘটে প্রেম প্রীতি বা প্রণয়। এ কথাই এ প্রবাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্থানীয় প্রবাদ আছে–

মনে মনে মিল
ঘরে দেয় খিল।

এই প্রবাদেও পূর্বের ভাষা ব্যাখ্যার ন্যায় একই কথা উচ্চারিত হয়েছে।

ভাটি কা ঘর কা।

অর্থাৎ ভাটি দেশে আমার বাড়ি-ঘর। ভাটি দেশ আমাদের ঠিকানা, আমাদের পরিচয়, আমাদের জীবন-জীবিকা সব। এ অর্থে এ প্রবাদ বলা হয়ে থাকে।

বাঙ্গালা বরায়ে বাঙ্গালী
চেরা ভগিরদ এ তাঁতারী।

অর্থাৎ বাংলাদেশ বাঙালির জন্য এ দেশে ভিনদেশী শোষক শাসক তাঁতারিদের স্থান নেই। ঐতিহাসিক এ প্রবাদে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রবাদটি কিশোরগঞ্জে বহুল প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রবাদগুলির মধ্যে অন্যতম একটি প্রাচীন প্রবাদ।

ইল্লাত যাতানি ধোনেসে
খাসালাত যাতানি মরনেসে।

বাংলায় আমরা কথায় কথায় বলি ইজ্জত যায় না ধইলে আর স্বভাব যায় না মইলে। একই ভাব ব্যক্ত করে শুধু অন্য ভাষায় এটি বা এগুলো অনূদিত হয়ে পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

নাচ না জানে, আঙ্গান টেরা।

www.pathagar.com

এ প্রবাদটিও বাংলায় প্রচলিত নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। অর্থাৎ অলস অকর্মণ্য যারা তাদের নিজের দোষকে ঢেকে অন্যের দোষ ত্রুটি দেখতে বা ধরতে চেষ্টা করে। তাই একথা এখানে ফুটে উঠেছে।

কানাকানি কইরাসার
পরামানিকের পুরী ছারখার।
অথবা
কানাকানি ফানাফানি
পরামানিকের পুষ্কুনি।

কিশোরগঞ্জ নামকরণের ইতিহাসের সঙ্গে স্থানীয় বত্রিশ এলাকার একদা হিন্দু জমিদার নন্দ কিশোর প্রামাণিকের নাম মুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। তাদের একুশ রত্ন পুরীসহ সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তি আজ কালের করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জনসাধারণের ধারণা তাদের কূট নির্বুদ্ধিতার কারণে বা মানুষের সাথে মানুষের হানাহানি কানাকানি নানান শলা-পরামর্শ বা ষড়যন্ত্রের কারণে তাদের এই ধ্বংস দশা হয়েছে। তাই কিশোরগঞ্জ সদর শহরাঞ্চলে এই প্রবাদ-প্রবচনটি কথায় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বেদেং বৈদ তেতেং তাঁতি
কুমারের চাক, কামারের ভাতি।

এ প্রবাদটিও কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল। এর কারণ হলো এই শহরেরই একটি প্রসিদ্ধ জনপদের নাম বৈদপাড়া। পাশে রয়েছে গাইনপাড়া। বত্রিশে ছিল তাঁতি বসাক সম্প্রদায়ের বসবাস। কাতিয়ারচরের পাশে কামার পাড়া। আশে পাশে কুমারপাড়া। বৈদ পাড়ার পূর্ব পুরুষ বেঁদে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সম্প্রদায় গত কোন ধর্ম গোত্র বর্ণের বিভক্তি করণের কথা উঠলেই জন্ম হোক যথা তথা তার কর্মফল নিয়ে নজির দিতে এ ধরনের প্রবাদ আলোচিত সমালোচিত হয়ে উঠে।

জ্ঞাতী গুতি নাতী
ফুজুঙ্গারা ধরে ছাতি।

এ প্রবাদটি সম্ভবত কিশোরগঞ্জে জমিদারি শাসন আমলের প্রবাদ। কারণ এ প্রবাদে যে সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। তারা এককালে কিশোরগঞ্জ সদর শহরস্থ মনিপুরী ঘাট সংলগ্ন পশ্চিম তারাপাশা এলাকায় বসবাস করত। নরসুন্দা নদী তীরবর্তী একটি স্থানের নাম রয়েছে ফুজুঙ্গাপাড়া। তাদের পূর্ব পুরুষদের বংশগত পেশা হলো ছাতি মেরামত ও তৈরি করা। হয়ত তারা এককালে জমিদারদের মাথায় ছাতা বা ছাতি ধরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে পেশাগত বৃত্তির কারণে এই স্থানীয় 'ফুজুঙ্গা' দের কথা নিয়ে পরবর্তীতে মুখে মুখে রচিত হয়েছে এই প্রবাদ প্রবচন।

কিশোরগঞ্জ সদরে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন

১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত বৃহত্তর জেলার সবকটি অঞ্চলেই প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু লোক প্রবাদ-প্রবচন তুলে ধরা হলো।

আত ধইয়া দিলাম পানি
ক্ষেত বলে, যেঁইলাম আমি।

www.pathagar.com

বগা অইছ বগী অইচ
দেড় আত লাম্বা ইজা অইচ
ক্ষেত দেইখ্যা যদি কেউ এইড়্যায়
মাগী পোলা লইয়া হাইদালে মইড়্যায়।
আত ধইয়া দিলাম বর
ধান অইচ ভইরা ঘর।

কৃষ্টি হচ্ছে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বনভূমি কর্ষণ থেকে শুরু করে মানুষের মনভূমি কর্ষণেরও আচরণের নাম কালচার থেকে সংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতিকে সভ্যতার নির্যাস বলা যায়। যেমন- গৃহ হচ্ছে সভ্যতার প্রতীক। কিন্তু গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি কাজ অর্থাৎ গৃহটি উত্তরমুখী হবে নাকি দক্ষিণমুখী হবে সে কাজটি হচ্ছে সংস্কৃতি।

কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন

ভাটি কিশোরগঞ্জের একটি প্রাচীন জনপদের নাম বাঙ্গালপাড়া। ভাটি কিশোরগঞ্জে বাঙ্গালপাড়া, ভাটিপাড়া, ভাটিবরাটিয়া, ভাটিয়া, ভাটিনগর, ভাটিঘাগড়া প্রভৃতি জনপদ রয়েছে। ভাটি, ভাইট্টা, বাঙ্গাল নামের মানুষ মূলত ভাটি কিশোরগঞ্জের নিকলী, মিঠামইন, ইটনা ও অষ্টগ্রাম উপজেলার অধিবাসীকে চিহ্নিত করে কিশোরগঞ্জ শহরস্থ উজান অঞ্চলে এ কাথা বলা হয়ে থাকে। ভাটি, ভাইট্টা, বাঙ্গাল নামে রয়েছে প্রবাদ-প্রবচন। নিচে এ অঞ্চলে প্রচলিত ভাটি-ভাইট্টা-বাঙাল নামে প্রবাদ-প্রবচনগুলি দেওয়া হলো :

* বাঙালি কুত্তার ইশকারী রাও
  রাইত পোহালেই করে খাও খাও।
* উজান থাইক্যা ভাটি ভালা
  ভুইল্যা থাকি মনের জ্বালা।
* জাতে কান্দে জাতের লাইগ্যা
  বাঙালে কান্দে ভাতের লাইগ্যা।
* ঠারে ঠারে বুঝতে নারে
  বাঙাল আর বলব কারে।
* ভাইট্যা বাঙাল মনুষ্য নহে
  জলের ওই এক জন্তু
  জলে-ডাঙ্গায় চলে
  লম্প দিয়া গাছে উঠে
  লেজ নাই কিন্তু।
* বাঙাল হয় যদি মানুষা
  হরি হরি বলি হরি
  প্রেত্মাতার হবে কি দশা।
* হাওর বাওর প্লাবন ভূমি
  মৎস্য চাষের সোনার খনি।
* খুলে দাও হাওরের বুক
  দেখিবে বাংলাদেশের মুখ
* ভাটি দ্যাশের বাড়ি
  উজান দ্যাশের নারী
  হাওরে চড়া গাই
  এই তিনে বিশ্বাস নাই।
* ভাটি বাংলার রাজা ঈশা খান বীর
  দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।
* ভাটির রাজা মসনদে আলী
  পশ্চিমের রাজা বল্লালী।
* জঙ্গল বাড়ির ঈশা খান
  কিশোরগঞ্জের সম্মান।
* ভাটি থেকে আইল বাঙাল
  লম্বা মাথার চুল।

www.pathagar.com

* বাঙাল মরে মাছে আর ভাতে
জোলা মরে শীতে আর তাঁতে।
* রণ মুখো সিপাই
ঘর মুখো বাঙালি।
* বাঙালির মাইর
* বাঙালির মাইর
দুনিয়ার বাইর।
* উজান দেশে থাকরে বন্ধু
ভাটি দেশে ঘর
আইতে যাইতে আপন অইছে
চোখে দেখার পর।
* ভাইট্যা গাবুর
তেলের ডাবুর
খায় কচুর মোরা
হাগে চৌদ্দপুরা।
* ম্যাচা মিয়া ভাডি গিয়্যা
খায় বোরো ধানের চাউল
কাজে নাহিকো আউল
ডাহে বাউল-বাউল।
* কাঙ্গাল হইল সবে
বাঙ্গালা দেশে এসে।
* বাংলা বাজার পুইড়্যা খাইছি
চাইলতা রইছে বাহি।
* বাঙালা দেশে বাড়ি আমার
আমি জংলী কেমনে হই
এ-দেশে মানুষ পাই না।
মানুষকে মানুষ ছাড়া
অন্য কিছু কেমনে কই।
* কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালি উৎপন
না বুঝে বাঙালি সবে আরবি বচন।
* কাঁদেরে বাঙাল ভাই
বাফোই-বাফোই
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ
বিদেশে হারাই।
* ভাইট্যা বাঙাল ভাটিতে বাঁধে আইল
খায় মাছ শৈইল আর বোয়াইল।
* বোরো খায় ভাইট্যা গাবরে
ভাত রান্ধে গরুর গোবরে।
ভাটির মানুষ বৈরাগি আর বাউল
খায় বোরো ধানের চাউল
কাজে নাহিকো আউল।
* ভাইট্যা ভাটি চিনে
বাঙ্গাল চিনে ভাত
কাঙ্গালে জাঙ্গাল চিনে
জিরাতি চিনে ধানের জাত।
* ভাটি বরাইয়ে বাঙ্গাল
চেরা ভগিরত এ তাঁতার
* ভাইট্যা নামে ভাই
ভাটি গেলে পাই।
* হোক্কার মধ্যে ডাব্বার জল
নৈছার মধ্যে পানি
ভাইট্যা বাঙাল তামুক খাইয়্যা
হাপুর-হুপুর টানি।
* বাঙ্গালের পুত ঘোড়ায় চড়ে
ধাপ্পুর-ধুপ্পুর পইর‍্যা মরে।
* বাঙালের পুত আরবী কয়
আব-আব কইর‍্যা মরণ অয়।
* বাড়ি মুখো বাঙাল
কাইন্দ্যা বেড়ায় কাঙ্গাল।
* বাঙালেরে হাইকোর্ট দেখান?
* বাঙালের পেটে
ঘি-ভাত হজম হয় না।

www.pathagar.com

* নদী দেখলাম নারী দেখলাম
ভাডি দেশ অ আদা
উজান দেশ অ পীরিত কইরা
বাপ-ভাই হইল গাধা।
* জল নাই নদীর কালিদর সাগর
লোক নাই গেরাম, হাওর নগর।
* জল যার জলা তার।
লাঙ্গল যার জমি তার।
লাডি যার মাডি তার।
মাডি যার মাগী তার।
জোর যার মল্লুক তার।
* রসিকে রসিক চিনে
ভোমরায় চিনে মধু
আজ্যাতা বাঙালে চিনে
থুরা ভরা কচু।
* বাঙাল পুঁটি মাছের কাঙ্গাল।
* দূর বেটা ভাইট্যা-বাঙাল।
* বাঙালি জঞ্জালি এড়াইয়্যা দিশা
হিরারে কয় শিশা
বাঙালেতে জাতি-ধর্ম
কর্ম দোষে করে নিশা।
* রঙ্গের নাও, রঙ্গের বৈঠা
রঙ্গে রঙ্গে বাইও
উজান দেশে রঙ্গ না থাকিলে
ভাডি দেশে আইও।
* ভাডি দেশের ভাইট্যা গাবর
দেখতি অতিশয় সুন্দর।
* আশীর্বাদংন গৃহিয়াৎ পূর্ববঙ্গ নির্বাসিন
শতায়ুবিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ।

* বাঙালের ভালবাসে ভাডি দ্যাশের ঘরে
পান পানি খানাপিনা আদর যত্ন করে।
* ভাডি গিয়্যা ভাইট্যা মিয়্যার কাডে ক্যামন দিন
হাঙ্গা কইরা রাঙ্গা বউ সেও বাসে ভিন।
* বাঙালি মাগনা পাইলে
আলকাতরাও খায়।
* হাঁইট্যা আয়ে ভাইট্যা বেডা
খাম্বিয়া খায় কাকা জেডা।
* ভাটি মেশে এসে দেখে যাও
গাঁও গেরামে আছে নদী নাও।
* পট্ট ধান্যে মৎস্যে ভরা
ভাটিদ্যাশ এক বিচিত্র বসুন্ধরা।
* বাঙ্গালি কুত্তার, ইসকারী রাও।

কিশোরগঞ্জে নাথ ধর্মীয় প্রবাদ-প্রবচন

* তিন দিনের যুগী
ভাতেরে কয় অন্ন।

www.pathagar.com

* যুগীরে মাটি দেয় বুয়াইয়্যা
* ঠাডা পইর্য়া বগা মরে
  যুগী কয় তার কেরামতি বাড়ে।
* ভিক্ষায় তুষ্ট যুগী আর ছাগী।
  পাতায় তুষ্ট ছাগল আর ছাগী।
* যুগীর গামছা যুগীর ধুতি
  তারে দেইখ্যা বুনে তাঁতি।
* যোগী চিনি যোগে
  ভোগী চিনি ভোগে
  পিরিত মরা চিনি যারে
  ধরছে পিরিত রোগে।
* যোগী চিনি ধিয়্যানে
  ছাগী চিনি দুধ পিয়ানে
  ঘোড়া চিনি বিয়্যানে
  ঘোড়া চিনি কানে
  নাপ্তের পুত যে বাদশা অইছে
  তারে চিনি দানে।
* যেমন যুগী
  তেমন গুফী
  যুগে যুগে তাড়াই যোগী।
* বগীর ধ্যানও ধ্যান
  যোগীর ধ্যানও ধ্যান।
* যোগী পাল ভোগী পাল
  মহীপালের গীত
  শুনিবারে চায় লোকে
  হয়ে অচম্বিত।
* যোগীরা পেশা করে সাধনা করিয়া
  মন্ত্র দিয়া গাও বান্ধে
  শিখে মন্ত্রের গান
  হিরালী মন্ত্রের রাগিনী শিখে
  শিখে নানা গুনক জ্ঞান।
* বধির অঙ্গে রণ তরঙ্গে
  নাচিছে শিবে যোগিনী সঙ্গে

www.pathagar.com

চঞ্চল চরণে চলে অচল নন্দিনী
তরুণ যেন চরণ দু'খানি।

* গাঁয়ের যুগী ভিক্ষা পায় না
বড় যুগীর বড় বায়না।

* এক করার মুরাদ নাই
যুগী মারবার গোঁসাই।

* নমঃ শুদ্র যুগীনাথ গুরুমন্ত্র লইয়া
হিরালীর পেশা করে সাধনা করিয়া।

* যুগী ভোগী কলার বুগী
যুগী জাতের কাইত
হগল যুগী মইর‍্যা রইছে
শনিবাইর‍্যা রাইত।

* যুগী মরে যুগী লড়ে
কলাগাছের বুগী পড়ে।

* দেখ দেখিরে ভাই
রামগতি আর রামুমালি
কবি গানে করে লড়াই
রামগতি নাপিত
রামু-মালী
যুগী জাতের জাত মাইর‍্যা
করে কবি গানের বড়াই।

* জাতে যোগী ভাতে কম
এর লাইগ্যা নাই ভরম।

* যুগী জাতের মরণ বড় নটখটি
এই যুগীজাত মরলে পরে
তেছ্‌রা করে দেয় মাটি
যুগী কখনও হিন্দু নয়
তার সন্দেহ কি আছে?
মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমলে
মিলে সব যুগীর দলে
দরখাস্ত লিখে কোম্পানির কাছে
পাঁচশত ট্যাহা নজর দিয়্যা
যুগী পোড়ার সনদ লয়
কিন্তু হইল না যুগী পোড়া

www.pathagar.com

দেশ জুড়িয়া আছে পরিচয়।
সুতার পাড়ার রাম জয়
কাইট্যা দিল চিতাশাল
যুগীরে আগুন দিতে কয়
গইর দিয়া যুগী পইর্যা গেল
আর কি যোগী পোড়া অয়
দেশ জুড়িয়া আছে পরিচয়।

* যত যোগী ঋষি যোগ তপস্বী
আর যত তীর্থ বাসী
করে বসে ব্রত একাদশী
তারা শান্তি পেল না
কারণ গুরু ছাড়া তারা
পেল না তার আদি অন্ত
তাই মনে ভ্রান্তি গেল না।

* একি বিধির লীলা খেলা
যুগীর গলায় তুলসীর মালা।

* বিধাতা নির্মাণ ঘর নাহিক দুয়ার
যুগী পুরুষ তাহে আছে নিরাকার
যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাইঙ্গ্যা করে খান খান।

* যৌগীর নামকর, নামভজ, নাম সর্বময়
নাম জপ করলে অয় সর্বপাপ ক্ষয়।

* যোগী নারীর গতর উদাম
ভিক্ষা করে খায় হাওর গেরাম

* যোগী ঠাকুর পূজা করে
আইট্রা কলা দিয়া
গুণমনি বইয়া রইছে
প্রসাদের লাগিয়া।

* কপালে দিয়া পেক
যোগী বৈষ্ণবে লইছে ভেক

* যুগী বৈরাগী টং টং
কাউট্রা খাইতে বর রং।

* থলির ভেতরে মালা থুইয়া
যুগী নাচে উপত অইয়া।

www.pathagar.com

* যুগী বৈষ্ণবের জাতিভেদ
    করিলে প্রমাদে
    বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক
    সংসারে।

অল্পসল্প-গল্পে প্রবচন

কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কতা না
কইবাম বান কী ?
বিলাইয়ে খাইছিন আমরার
একশ্ আড়াই মন ঘি।
হুনছি বেডার গফ্
এক করার মুরাদ নাই
বউ মারার গোসাই।
কইলে কইবাইন গফ্ করি
কইবার কতা না
কইবাম বান কী ?
ভাত দেইখ্যা খাইবাইন ঘি
জামাই দেইখ্যা দিবাইন ঝি।
হুনছি বেডার গফ্
ভাত নাই কপাল পাতে
সোনার আংগুট আতে
তবু হালা গফ্ করে
বাইর কর ঘার ধরে।

স্বামী কিশোরগঞ্জের বাজারের ব্যবসায়ী। সংসারে কোনো কিছু কম বেশি হলেই স্ত্রীর কাছে দোকানের কর্মচারীর মত হিসেব-নিকেশ করে। গ্রাম-বাংলায় এসব ঘটনা নিয়েও প্রবাদ-প্রবচন মুখে মুখে রচিত হয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনার ওপর রচিত একটি দীর্ঘ প্রবচন নিম্নে প্রদত্ত হলো। একদিন স্বামী বাজার থেকে ষোলটা কই মাছ কিনে এনেছে। কিন্তু স্ত্রী খাবার সময় কেবল একটি মাছ পাতে দিতে দেখে স্বামী ব্যবসায়ী স্ত্রীকে বলছে অর্থাৎ হিসাব নিচ্ছে।

স্বামী : ষোল কৈ গেল কৈ ?
স্ত্রী : চার কৈ গেল পাগারে ঐ।
স্বামী : থাকে বারোটা ?
স্ত্রী : শ্বশুর-শাশুড়িকে দিলাম দুইটা।
স্বামী : ঠেকলো গিয়ে দশে ?

www.pathagar.com

স্ত্রী : ধুতে বাছতে গেল দুইটা খসে।

স্বামী : থাকলো আট ?

স্ত্রী : দুটো মরা গেল নদী ঘাট।

স্বামী : থাকে ছয়।

স্ত্রী : তোমার বোন ভাগ্নে দুটা খায়।

স্বামী : আরো থাকে চার ?

স্ত্রী : দুইটা দিয়ে শুধেছি ধার।

স্বামী : থাকে দুই ?

স্ত্রী : ঝুরির জন্য একটা থুই।

স্বামী : থাকলো এক ?

স্ত্রী : এবারে একটু রেগে গিয়েই উত্তর দেয় স্ত্রী। স্বামী আড় চোখে তাকায়। "চোখ থাকলে পাতে চেয়ে দেখ"। এভাবে অনেক সংসারে স্ত্রীর ভাগ্যে কৈ মাছ কেন এরূপ অনেক খাবারই হিসেবে একটিও জুটে না। কিন্তু তারপরও স্ত্রীকে হিসাব দিতে হয়। না হয় প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। ব্যবসায়ী হলে কি হবে হিসাব চাই। প্রবাদ সব বিষয়েই রচিত এবং প্রচলিত।

তাড়াইল উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার মানুষ এককালে খুবই সহজ সরল ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ এলাকার কিছু প্রবাদ-প্রবচনে। এককালে তাড়াইল উপজেলার "বাল্লা" নামক গ্রামের কোনো এক লোক কিছু কাপড় কিনে পার্শ্ববর্তী "পুবাইল" নামক গ্রামের এক দর্জির নিকট জামা একটি বানাতে দিয়ে বলেছিল কাপড় বাড়তি থাকলে যেন ঐ জামাতেই লাগিয়ে দেয়। যেমন কথা তেমন কাজ। অর্থাৎ জীবন যেখানে যেমন। সেই দর্জি বাড়তি কিছু কাপড় অন্যত্র না লাগিয়ে তা দিয়ে জামার দু'টি হাত থেকে হাতা ছাড়াও অতিরিক্ত আরেকটি হাতা লাগিয়ে দেয়। অন্যরা তা দেখে অবাক হলো মানুষের দেখি দুই হাত এখন দেখছি তিন হাত। তাহলে লোকটি কোন গ্রামের কে সে। 'রাজী ও কানলা' দু'টি গ্রামের নাম। ঐ গ্রামের লোকেরা খুব সহজ সরল ছিল। এক সময় তাদের বৈষয়িক বুদ্ধি শুদ্ধি কম থাকায় অন্যান্য গ্রামের লোকেরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। বাল্লা গ্রামের লোকেরা পুবাইল গ্রামের ঐ দর্জির বোকামীর কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে লোক জ্ঞানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা দিয়েই মানুষের মুখে মুখে প্রবাদ রচিত হয়ে গেছে। প্রবাদটি নিম্নরূপ–

রাজী গ্রামের আহ্মক
কানলা গ্রামের বেকক্ল
বাল্লা গ্রামের কি দোষ ?
এক পিরানের তিন ডেনা
পুবাইলবাসী হুইন্যা অয় বেঁহুশ।

www.pathagar.com

একবার আচারগাঁও এর মানুষের সাথে পার্শ্ববর্তী আবাদীগাঁও এর মানুষদের মধ্যে বিরাট ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হয়। এতে অন্য গ্রামের মানুষ এ দু'টি গ্রামের মাতব্বর মুরব্বি শ্রেণির মানুষদেরকে বলে কয়েও কোন প্রকারে তাদের দু'গ্রামের মানুষদের আপুষ করতে পারেনি। ফলে অন্য সব গ্রামের মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে উল্লিখিত এই দুই গ্রামের মানুষের সাথে তারা কোন সম্পর্ক গড়ে তুলবে না। এই সিদ্ধান্তে মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে যায় প্রবাদ-প্রবচন। প্রবচনটি নিচে তুলে ধরা হলো।

এক ঘরে তিন গীত
হুনতে লাগে অচম্বিত
আচার গাঁও বিচার নাই
আবাদী গাঁও হম্বন্ধ নাই।
(অচম্বিত- আশ্চর্য, হম্বন্ধ- সম্পর্ক)

মাগ্‌রী নামে তাড়াইল উপজেলার একটি গ্রাম রয়েছে। গ্রামটি হাওরের কুল ঘেঁষে অবস্থিত। পাশের গ্রাম চৌগংগা আর কাজলা। এসব অঞ্চলের মানুষদের আচার আচরণ স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি নিয়েও প্রবাদ রয়েছে। এ রূপ একটি প্রবাদ নিচে তুলে ধরা হলো।

শ্বশুর বাড়ি মাগ্‌রী
জামাই মাথাত্‌ দিছে পাগরী
জামাই চেংগা বেংগা
বাড়ি চৌগংগা।
অনুরূপ-
বউ সাজলো গো সাজলা
তোরে লইয়্যা যাইব কাজলা
খাওরী আর নেউরী
না দিলেই গাল ফুলাওরী।

তাড়াইলের ধলা গ্রামে রয়েছে কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। এ গ্রামের গৃহস্তদের পালিত দুধের গাভীকে 'গাই' বলে। গাই গিরস্থী যাদের আছে তাদের ঘরে ভাতের অভাব থাকলেও আবার হয়তবা ফসল ভাল হলে সুখের সংসার রচনা করা যাবে। এ আশায় এখানকার স্বামীদের প্রতি নারীদের একটি বিশ্বাস স্থাপন রয়েছে। এ নিয়ে একটি প্রবাদে উল্লেখ আছে–

রাউতি লাউতি
ধলার গাই
ভাত নাই কাপড় নাই
তবু আমার হাঁই।

তাড়াইল অঞ্চলের প্রকৃতি বিষয়ক একটি প্রবাদ-প্রবচনে আছে-

আস্‌মান কুদাইল্লে
পুবাল বাও
বান হাইনগে আইল।

www.pathagar.com

হিরালীর ভাও
মেঘ আইতো পাড়ে
আইজ বা কাইল।

শিক্ষিত সমাজে যেমন গণতন্ত্র চর্চার কথা ওঠে। নির্বাচনের হাওয়ায় মেতে ওঠে দেশ। দেশের মানুষ পাগল হয়ে ছুটে। তেমনি নিরক্ষর অশিক্ষিত সমাজের মানুষও এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। প্রবাদ-প্রবচন তৈরি করে। তাড়াইলে প্রচলিত এরূপ একটি প্রবাদ-প্রবচন এখানে তুলে ধরা হলো।

ভোডের ভাইল আইল দেশে
গরীব মরে কেশে কেশে।

সংগৃহীত প্রবাদ

১. নাই দ্যাশে ফুটকালাই সন্দেশ।
২. আর রে [হায় রে] কলির কাল/ছাগলে চাটে বাঘের গাল।
৩. নয়াটাটে করতে হয় /হয়টাকে করতে হয় নয়/ তারেই বাউল কয়।
৪. বাপদাদার নাম নাই/ চানমল্লের বিয়াই।
৫. লাইগ্যা থাকলে মাইগ্যা খায় না।
৬. পুটকিত নাই চমি/রাধাকৃষ্ণের নাম।
৭. বামনে মন্ত্র কয়/ পাড়ার [পাঁঠা] চ্যাটে শুনে [শোনে]
৮. সাপেরও দুদ দ্যায়/ বাগেররেও দুদ দেয়।
৯. এমন জাগাত বইও না/কেউ কয় উট/ এমন কতা কইও না/ কেউ কয় ঝুট।
১০. হাত্তি মরলেও ঘোড়ার গলার সমান।
১১. নদী মইরা গ্যাছে/রেকটাতো [রেখা, চিহ্ন] আছে।
১২. নয় মন ঘিও আইতো না/ রাধার নাইচও অইতো না।
১৩. ছাল নাই কুত্তার বাগাই নাম।
১৪. মিনমিনা শয়তান কেলাই [কালাই] খাওনের যম।
১৫. রাঙ্গা ঝালো [জেলে], কালা বাউন, নিদাড়িয়া মুসলমান/ তিন শালা একসমান।
১৬. যার যির [যার] দাড়ি ফ্যালাইয়া রাহে মুছ [মোছ]
১৭. খাড়া মুছওয়ালা/বাজল দাড়িঅলা।
১৮. কাউচার বাসায় কুলির ছাও/ জাতি বিদাত্ করে রাও।
১৯. আত্তির মুড়ে আয়ে যায়/ মেকর দেইখ্যা বয় [ভয়] পায়।
২০. উলির মারগ পাকা অইলে/মুণ্ডাবাড়িত যায়।
২১. উলে পাঁড়া/চুলে ফইর [ফকির]
২২. ব্যাডার রাগে বাদশা/ব্যাড়ির রাগে বাশ্যা [বেশ্যা]
২৩. জামাইয়ের বাপ বাদশা/বেড়ির বাপ বাশ্যা [বেশ্যা]

www.pathagar.com

২৪. আগিলা গো আগিলা/আগে কত বাল আছিল।

২৫. মাংসে মাংস বৃদ্ধি/দুদে বৃদ্ধি বল শাগে বাড়ায় মল।

২৬. সুখ কর গো পুতের বউ আল্লায় তুমরারে দিছে/আমরারেও দিছে সুক/ আল্লায় তুইলায় নিছে।

২৭. প্যাড ভরা বিরানির বাত/গান্দা গান্দা লাগে/ সাইদ দিয়া বিয়া দিলে/বান্দিও সমান লাগে।

২৮. বান্দির ব্যাটাগুলামের জন্ম/তার নাই জাত ধর্ম।

২৯. খাইয়া কাম নাই/হাইকলো লইয়্যা গুরে [ঘোরে]

৩০. কুলে ছেলে হইছে/ পাদনেরও ভর অইছে।

৩১. নাপিত দেকলেই কুনি নক বাড়ে।

৩২. কত পাইলাম কামার/দাও ধারাইলাম আমার।

৩৩. বেশি ফকির দুর্গা নষ্ট।

৩৪. বড় নষ্ট ঘাটে/ ছেলে নষ্ট হাটে।

৩৫. বেডাইন [পুরুষ] দেখে হাডে/বেইট্যাইন [নারী] দেখে ঘাডে।

৩৬. ব্যাডার বালা সামনা/বেডির বালা সামনা/বেডির বালা পাছা।

৩৭. নাপতের বাইল/ফুতারের [মিস্ত্রী] কাইল।

৩৮. জাতের মেয়ে কালাও ভালা/নদীর পানি গুলাও বালা [ভাল]

৩৯. মা মরলে বাপ তালই/ বাই অয় বোনের পালই [এক ধরনের শাক]

৪০. গাই গুণে ঘি/ মা গুণে অয় ঝি।

৪১. গাছ গুণে গোটা/ কপাল গুণে অয় ফুটো।

৪২. হাজির পুত পাজি।

৪৩. হুঁটকির নাউ/ বিলাই হয়ে চৌকিদার।

৪৪. শিয়ালের কাছে মুরগি রাখানি।

৪৫. চ্যাড নাই ব্যাটার শনিবারে মিয়া।

৪৬. চুরের [চুরা] মার বড় গলা।

৪৭. রুম্বা [লোমা] বাছলে কম্বল মিছা।

৪৮. শ'কুরে লাঙ্গল/এক কুবে চেলিলাকড়ি]।

৪৯. দশ হাত কাপড়ে পা!ঠায় লেংটি হয় না।

৫০. সব রসুনের পুটকি এক।

৫১. নিজের পুত পরের বউ /সবার বালা লাগে।

৫২. গরিবের বউ বেহেরেই [সকলের] ভাবী।

৫৩. বড় বাই জেড়া/তার উপরে ক্যাডা।

৫৪. পরের বাড়ির পিডা /দাঁতে লাগে মিডা।

www.pathagar.com

৫৫. বাউনের গরু গণ্‌তিত আছে/ গুয়ায় নাই।

৫৬. পুরান চাউল ভাতে বাড়ে।

৫৭. নিজের বুদ্ধিতে ভাতকাপড়/পরের বুদ্ধিতে চড়থাপড়।

৫৮. আমার প্যাড কত গীত/ আমার বিয়ায় নাই গীত।

৫৯. নিজে সওনের জায়গা নাই/ বেয়াই লইয়া টানাটানি।

৬০. বাত খাওনের লবণ নাই/টুনায় টুনায় বড়ই।

৬১. উচিতেই মিলে না আবার পিষ্ট।

৬২. মুটের জা রান্দে না ততা আর পান্তা।

৬৩. বান্দির পুতের নাম সুলতান খাঁ।

৬৪. পুটকি থওনের জায়গা নাই/ আবার হুতনের চিন্তা।

৬৫. হাইগ্যা হচে না/মুইত্যা গলাপানি।

৬৬. কামের কতা কইলে বুগি/ গায়ে আনে জ্বর/ হাঙ্গার কতা কইলে বুড়ি/ উইট্যা মারে দড় [দৌড়]

৬৭. বাবু যাই হাইট্যা/ উল যায় পালকি দিয়া।

৬৮. হাই মইরা টাই হইছে/ দুই হতীনের মিল হইছে।

৬৯. থাকতে দেয় না ক্যাকড়া চাড্ডি/ মরলে পরে দেয় শীতল পাডি।

৭০. ছাল নাই ত্তার বাগ রাজা নাম।

৭১. বাইরে বাড়িত শুনা যায়/ সোমবারের হাট/ বাইত আইস্যা দেখি/ মূলা বটি বাত।

৭২. আইজ বুজবি না/বুজবি কাইল/পুটকি থাবরাইবি মরবি কাইল।

৭৩. ন্যাডার বিবি খাটে যায়/ফিইরা ন্যাডার দিকে চায়।

৭৪. বাড়িঅলার বাড়ি না দাওয়াইল্যার চাপাদাড়ি।

৭৫. ট্যারা টুতের নাম পদ্মলোচন।

৭৬. কানারে বাকড়ায় কেডা/নানা আর নানি।

৭৭. চুল নাই বেডির চুলের লাইগ্যা কান্দে/কচু পাতার ডিবা দিয়া বড় খুঁপা বান্দে।

৭৮. কই যাও গুপাল/ লগে লগে যায় কপাল।

৭৯. যারে না দেকছি/সে বড় সুন্দরী/যার হাতে না খাইছি/ সে বড় রান্দুনি।

৮০. তহিমলের বাড়িতে মরছে মলের মা/ লগে লগে না কাঁদলে জায়গা দিত না।

৮১. রাজ্য জুইড়া হাঙ্গামা/চোঙ্গা পাইত্যা দই।

৮২. হাতে না ঘুঁতে /চুঙ্গা ভাইরা মুতে।

৮৩. আগে হুইত্যা বইয়া/ নাশ করছে বদ লাগাইয়া।

৮৪. অলি ললি রে/ কালবাদুরের ছাও/ পাইল্যা লাইল্যা ডাঙ্গর করলাম/ হরিণ ধইরা খাও।

৮৫. আদরে ঠকায় বদাই/বদারে ঠকায় কুদায়।

৮৬. মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি।

৮৭. অছ অছ অছ/গব্যস্রাবীরে গব্যস্রাবে গছ।

৮৮. যেমন যার পাছাড়া তেমন তার মাচ্ছাড়া।

৮৯. যে সে গাই তে সেই গাই মিলে/ শুঁটকি আর বাইগনে দিলে

৯০. তিন দিনের যুগী ভাতের কয় অন্ন।

৯১. টেহা থাকলে তালই বাপের শ্রাদ্য।

৯২. টেহা হইল সর্বজয়া/ দেবতা থুইয়া মাইনষে করে দয়া।

৯৩. আপন হউর সালাম পায় না/ মাঐই হউরি উকিনুকি বায়।

৯৪. আমার বাপ আরে খায় আমার শ্যালাসমুন্ধী উপাস যায়।

৯৫. ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই।

৯৬. লাউঘুড়ির নিচে খড়ি টুকাইওনা।

৯৭. বাড়িঅলার বাড়ি না/দাড়িঅলার মার জমিদারি

৯৮. মায়ের কাছে মামারবাড়ির গল্প।

৯৯. প্যাটের চামড়া পিঠে লাগে না।

১০০. চিড়া বল পিঠা বল ভাতের সমান না মাসী বল পিসী বল মায়ের সমান না।

তথ্যসূত্র :
১. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বয়সঃ ৬৩, পেশাঃ কাঠমিস্ত্রি, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
২. টিটো, বয়সঃ ৪৬, পেশাঃ ব্যবসা, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৩. সেলিম পারভেজ, বয়সঃ ৪৬ পেশাঃ ব্যবসা, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৪. উৎপল, বয়সঃ ৩৯, পেশাঃ ব্যবসা, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৫. শ্রী বিমান, বয়সঃ ৪০ পেশাঃ চাকুরি, ঠিকানাঃ নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৬. বিভাষ রঞ্জন ভৌমিক, বয়সঃ ৪৪ পেশাঃ স্কুল-শিক্ষক, নগুয়া, কিশোরগঞ্জ
৭. উমা রানী দেব, বয়সঃ ৫০, পেশাঃ গৃহিনী, ঠিকানাঃ বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ
৮. শাতিল আহমেদ, বয়সঃ ২৭ পেশাঃ সাংবাদিকতা, ঠিকানাঃ আখড়াবাজার, কিশোরগঞ্জ
৯. সবিতা ভট্টাচার্য, বয়সঃ ৫৭, ঠিকানা বিন্নগাঁও, কিশোরগঞ্জ
১০. চিনু রানী সরকার, বয়সঃ ৫৮, ঠিকানাঃ বিন্নগাঁও, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

অধুনা জনগণের সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে বিজ্ঞান নানা সুবিধা মেলে ধরেছে, পূর্বে এ রকম ছিল না। অথচ সার্থক ও সুখী জীবন ছিল সকলেরই কাম্য। তদানীন্তন সমাজে নানা রকম লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার প্রচলিত ছিল। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলার কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার তুলে ধরা হলো :

শুভাশুভ লক্ষণ সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস

১. কলা খেলে অথবা দেখলে যাত্রা অশুভ হবে। ডিম খেলেও এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

২. ধান গাছে খৈ হলে আবাদ খুব ভাল হয়। কু'নজর থেকে রক্ষার জন্য ধান ক্ষেতে জুতা-ঝাড়ু পুতে রাখলে ভাল হয়।

৩. ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খারাপ হয়। দাঁড়িয়ে পানি খাওয়া অমঙ্গল হয়।

৪. ঠিক দুপুর সময় যাত্রা অশুভ হয়। দুপুর সময় বটগাছ, শেওড়াগাছ, তেতুল গাছে ভূত থাকে।

৫. যাত্রাকালে কাউকে কাঁদতে দেখলে যাত্রা শুভ হয়। হাঁচি উঠলে অথবা উষ্টা খেলে যাত্রা অশুভ হয়।

৬. যাত্রাকালে মরা মানুষ ডানে দেখলে যাত্রা শুভ হয়। যাত্রাকালে খালী কলস দেখলে অশুভ হয়।

৭. যাত্রাকালে মাথায় হোঁচট খেলে যাত্রা অশুভ হয়। সোম-শনিবার ছাড়া অন্যদিনে পূর্বদিকে যাত্রা শুভ হয়।

৮. যাত্রাকালে ছাগলের কান খাড়া দেখলে যাত্রা অশুভ হয়। ঘরের চৌকাঠে বসলে গৃহস্তের অমঙ্গল হয়।

৯. যাত্রাকালে মা পিছন থেকে ডাকলে যাত্রা শুভ হয়। ভাগ্নেকে মারলে মামার হাত কাঁপে এ বিশ্বাস রয়েছে।

১০. শুকনো ডালে কাক পড়ে থাকতে দেখলে যাত্রা অশুভ হয়। কাকে খাওয়া আম খেলে বগলে ফোঁড়া হয়।

১১. কুকুর বাড়ির উঠানে মাটি খুঁড়লে রোগের উৎপত্তি হয়। কুকুর রাত্রি কালে উচ্চস্বরে কাঁদলে অথবা ডাকলে রোগের সৃষ্টি হয়।

১২. আগুন, লোহা সঙ্গে থাকলে রাত্রে ভূতে ধরে না। খালি ঘরে রাত্রে জ্বীন আসে।

১৩. ভাগ্নে অথবা ছোট ছেলের লিঙ্গ চোখে ছোঁয়ালে চোখ উঠা রোগ ভাল হয়।

১৪. ট্যাওয়া মাটি গুলে গালে প্রলেপ দিলে গাল ফোলা রোগ ভাল হয়।

১৫. কুকুর বিড়াল কামড় অথবা নাকে আঁছড় দিলে কলাপড়া এবং দা-বটির উপর লবণ মিশ্রিত বেগুন ফুল খেলে ভাল হয়। এ ধরনের শত সহস্র লোক বিশ্বাস-সংস্কার-কুসংস্কার রয়েছে যা আমাদের সমাজে রক্ষা কবচ হিসেবে আজও মানুষের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করে আছে।

www.pathagar.com

১৬. ভাত-তরকারি রান্না করা মাত্রই পাত্রটি সরাসরি মাটিতে নামাতে নেই, এতে অমঙ্গল সাধিত হয়। ভাঙ্গা পাত্রে পানি খেতে নেই।
১৭. হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেলে বা কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে আত্মীয়-কুটুমের আগমন হয়। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলেই, তাতে আয়ু কমে।
১৮. থালা থেকে এক লোকমা ভাত খেলে পানিতে ডোবার সম্ভাবনা। তাই দুবার খেতে হয়।
১৯. খেতে বসে বিষম ঢেকুর খেলে দুরের আত্মীয়-স্বজন কেউ তাকে স্মরণ করেছে বলে বিশ্বাস রয়েছে।
২০. গামছা, গেঞ্জি সেলাই করে পরিধান করা অমঙ্গল হয়। মেয়েরা মাথায় টুপি পড়লে অমঙ্গল হয়।
২১. জুতা-সেন্ডেল, ঝাড়ু পেতে বসতে নেই, এতে অমঙ্গল হয়।
২২. আম-কাঁঠাল গাছে ফল না ধরলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে যে 'গাশশি' অনুষ্ঠান হয় সেই রাত্রে দা দিয়ে গাছ কোপালে গাছে ফল ধরে বিশ্বাস রয়েছে।

কিশোরগঞ্জে প্রচলিত আরও কয়েকটি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উদাহরণ দেওয়া হলো।

পাগলা মসজিদে 'হান উল্ডানি'

'হান' শব্দটি এসেছে 'ইট'-এর প্রতিশব্দ 'শান' থেকে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় সময়ই 'শ' 'ষ' এবং 'স'-এর উচ্চারণ 'হ' দিয়ে করা হয়। যেমন- সাপ>হাপ, সমৃদ্ধি> হমৃদ্ধি, ষাঁড়>হাঁড়, শালিক>হালিক, শোলমাছ>হোলমাছ ইত্যাদি। একই রকমভাবে 'শান'কে বলা হয় 'হান'। একশ্রেণির মানুষের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, কিশোরগঞ্জ শহরের পাগলা মসজিদে কোনো বিশেষ নিয়তে কেউ যদি ইট উল্টে রাখে তবে তার সে নিয়ত অলৌকিকভাবে পূরণ হয়ে যায়। যদিও ইট উল্টে রেখে কেউ সুফল পেয়েছে এ রকম কোনো ঘটনার প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবুও দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্মীয় অনুভূতি উৎসারিত এই লোকবিশ্বাসটি কিশোরগঞ্জে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পাগলা মসজিদে ইট উল্টিয়ে রাখার এই ঘটনাটিকে স্থানীয় ভাষারীতিতে 'হান উল্ডানি' বলা হয়। একইভাবে তাড়াইল থানার সেকান্দর শাহ'র মাজারেও 'হান উল্ডানি'র লোকবিশ্বাসটি প্রচলিত আছে। পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দুর 'পাঁচ পিরের মাজার' বিশেষ নিয়তে রঙিন সুতা দিয়ে ইট ঝুলিয়ে রাখার লোকবিশ্বাস প্রসূত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভুত-পেত্নি, দেও-দানোর আছর থেকে মুক্তি

তাড়াইল থানার হাওর এলাকায় 'দশজনের মেলা' নামক অন্ধবিশ্বাস প্রসূত একটি মেলা বহুদিন প্রচলিত ছিল। ভূত-পেত্নি, দেও-দানোসহ যাবতীয় বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এলাকার অজ্ঞ লোকজন তেল ছাড়া হাঁসের ডিম ভাজা এবং পোড়া গজার মাছ স্থানীয় জঙ্গলে, বেতগড়ে, হাওর বা বিলের মাঝখানে অবস্থিত শ্যাওড়া, তেঁতুল অথবা বটগাছের নিচে ভোগ দিয়ে আসতো। মহামারি দেখা দিলে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে মাগন মেগে দুধ-চিনি ও চাল সহযোগে ক্ষীর তৈরি করে হাওরে উক্ত 'দশজনের মেলা'র আয়োজন করা হতো। রান্না করা ক্ষীর আয়োজিত মেলায় সবাই একত্রে বসে ভক্ষণ করার নিয়ম ছিল। এতে করে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, ভূত-পেত্নি, দেও-দানোর আক্রমণ এবং বালা-মুসিবত দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

পাথরের দুগ্ধস্নান

কিশোরগঞ্জ শহরতলীর কাটাবাড়িয়া দিঘিরপাড় গ্রামের হিন্দু অধ্যুষিত শ্মশানীপাড়ার শহিদ বিনোদ বিহারী রায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ বিশাল পুকুরের উত্তরপাড়ে এবং বৃহদাকারের পাথর আছে। এক শ্রেণির মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পাথরটি কোনো সাধারণ পাথর নয়। এর ভেতরে প্রাণ আছে এবং প্রাণ সঞ্জীবনীর জোরে এক সময়ের ক্ষুদ্র পাথরটি সময়ের পরিক্রমায় বড় হতে হতে বিশাল আকৃতি ধারণ করেছে। শুধু তাই নয়, এ পাথরটি প্রতি রাতে পাশের পুকুরে স্নান করে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে বলেও জনশ্রুতি ছিল। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রায় প্রতিদিনই পাথরটিকে দুধ দিয়ে ধুয়ে দিত এবং এতে করে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুগ্ধস্নাত পাথরটি তুষ্ট হলে তাদের রোগ-বালাই দূর হয়ে যাবে, এমনকি মনের বাঞ্ছাও পূর্ণ হবে। বর্তমানে পাথরটির আর সেই সুদিন নেই। অত্যন্ত অযত্ন-অবহেলায় জৌলুস হারিয়ে সেই পুকুরের উত্তর পাশে এক সময়ের পূজনীয় পাথরটি 'নিষ্প্রাণ' পড়ে আছে। এ রকম কথিত 'জ্যান্ত' পাথরের আরও অস্তিত্ব কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে জানা যায়।

বৃষ্টির জন্য ব্যাঙের বিয়ে

উপর্যুপরি খরায় গ্রামের মাঠ-ঘাট যখন চৌচির হয়ে যেত তখন এক পশলা বৃষ্টির আশায় গ্রামে গ্রামে 'ইসতিশক্বার নামায' পড়ার বিধান প্রচলিত ছিল, যা এখনো মাঝে মাঝে দেখা যায়। অন্যদিকে বৃষ্টির প্রার্থনায় গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ঘটা করে 'ব্যাঙের বিয়ে' দেবার আয়োজন করত এবং এখনো তা প্রায়ই করে থাকে। এ সংস্কারটি লোকবিশ্বাস প্রসূত অন্ধ ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ব্যাঙের বিয়ে' নামক লোকাচারে ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে একটি ছড়া উচ্চারণ করে থাকে, যা নিম্নরূপ–

ব্যাঙের ঝিয়ের বিয়া/ষোল্ল মোরগ ধিয়া/ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা/আম পাতা দিয়া দিলাম ছানি/তেও না পড়ে ম্যাঘের পানি/জাম পাতা দিয়া দিলাম ছানি/ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা/ব্যাঙাজির বিয়া/পাথলা মাতাত্ দিয়া/আলের ফলা চাঙ্গঅ থইয়া/গিরস্ কান্দে বন্দে বইয়া/ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা।

মশা-মাছির মুখপোড়া

প্রতি বছর কার্তিক মাসের শেষ সন্ধ্যায় মশা-মাছি বিতারণের একটি সংস্কার কিশোরগঞ্জে প্রচলিত আছে। এই সংস্কার অনুযায়ী ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রথমে পাটশোলার একটি আঁটি বাঁধে। অতঃপর কিছু মশা-মাছি মেরে সেই আঁটির মাথায় মশা-মাছিগুলোকে স্থাপন করা হয়। তারপর তৈরিকৃত পাটশোলার আঁটির মাথায় আগুন ধরিয়ে ছেলে-মেয়েরা মশাল আকৃতির জ্বলন্ত আঁটি নিয়ে প্রথমে নিজ বাড়ির চতুর্দিকে চক্কর দেয় এবং পরে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি দৌড়ে দৌড়ে যেতে থাকে। এ লোকাচার দ্বারা তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল যে, মশা-মাছির মুখ পড়ে দেওয়া হলে এ মওসুমে মশা-মাছির উপদ্রব কমে যাবে এবং রোগ-বালাই হ্রাস পাবে। জ্বলন্ত মশাল হাতে দৌড়ানোর সময় ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে নিচের ছড়াটি উচ্চারণ করে থাকে :

ভালা আইয়ে বুড়া যায়/মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়/কাতি মায়া পেরেত যা/অলক্ষ্মী বাইর হ'/লক্ষ্মী আইয়া ঘর ল'/ধনে-জনে ঘর ভইরা যা/টেকা-পয়সায় ঘর ভইরা যা/ভালা আইয়ে বুড়া যায়/মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়।

www.pathagar.com

কলেরা-বসন্ত রোগ প্রতিরোধ

কিশোরগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এক সময় কলেরা ও বসন্ত রোগকে দেও-দানো'র আক্রমণ বলে বিবেচনা করা হতো। কলেরাকে বলা হতো 'উবা' এবং বসন্তকে বলা হতো 'শীত্‌লা।' এই জীবনঘাতি কল্পিত দেও-দানোকে প্রতিরোধের জন্য গ্রামের চতুর্দিকে খড়-বিচালির কুণ্ডলি তৈরি করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। শুধু তাই নয়, গ্রামের শক্ত-সামর্থ্য ও সাহসী যুবকেরা কথিত দেও-দানো প্রতিরোধের জন্য সারারাত্র সজাগ থেকে গ্রাম জুড়ে পাহারা দিতো। পাহারা দেয়ার সময় তারা সমস্বরে একটি ছন্দোবদ্ধ তন্ত্র উচ্চারণ করত; যা ছড়ার চরিত্র বহন করে। এ দ্বারা গ্রামীণ মানুষের লোকবিশ্বাস প্রসূত ভাবাবেগ প্রতিফলিত হতো। পাহারা দেবার সময় উচ্চারিত তন্ত্রটি নিম্নরূপ :

দমছে আল্লা দমছে মাওলা দমছে এলাহী/হরদমেতে ডাকিগো আল্লা দিদারের লাগি/লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু/আলীর আতে জুলফিকার, ফাতেমার আতে তীর/যেই দিগ হইতে আইছোরে বাল্লা হেইদিগেতে ফির/লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

গৃহপালিত গরুর 'শনির দশা' প্রতিরোধ

গবাদিপশুর তান্ত্রিক চিকিৎসার জন্য এক সময় সুদূর যশোর ও ফরিদপুর অঞ্চল থেকে একশ্রেণির বৈদ্য কিশোরগঞ্জ এলাকায় আগমন করতো। যাদেরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'গোয়াল'। এই গোয়ালেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কৃষকের পালিত গরুর উপর থেকে কথিত 'শনি'র দশা কাটানোর জন্য এক ধরনের তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রয়োগ করত। এ তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রয়োগের সময় তারা ছন্দোবদ্ধ কিছু তন্ত্র উচ্চারণ করত; যা ছড়ার আমেজ বহন করে। গ্রামীণ মানুষের এ অন্ধ লোকবিশ্বাসের সুযোগে কথিত 'গোয়াল' নামক বৈদ্যরা তাদের সারা বছরের খোরাকী কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিত। গোয়ালদের উচ্চারিত মন্ত্রের নমুনা নিচে দেওয়া হ'ল :

বড়বাড়ির বড় গাই/বেশি কইরা দুধ চাই/বছর বছর বিয়ান দিবি/দুনা ভইরা দুধ দিবি/ভাল কইরা ঘাস খাবি।

ফসল রক্ষার জন্য হিরালীর মন্ত্র

কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অধ্যুষিত উপজেলাগুলোতে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রায় বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগে, বিশেষ করে শিলাবৃষ্টিতে এ সকল বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। কৃষকদের ফসলী জমিকে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভাটি এলাকায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। স্থানীয় ভাষায় এ সম্প্রদায়ভুক্তদের বলা হয় 'হিরালী'। 'শিলারী' শব্দের অপভ্রংশ হিসেবে 'হিরালী' শব্দের উদ্ভব। এ জেলা শিলাবৃষ্টিকে স্থানীয় ভাষারীতিতে 'হিলাবিষ্টি' বা 'হিল' বলা হয়। এ 'শিলাবৃষ্টি' বা 'হিল' থেকে জমির ফসল রক্ষার জন্য যারা তান্ত্রিক মন্ত্র প্রয়োগ করে থাকে, তারাই 'হিরালী' নামে পরিচিত। হিরালী সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় কৃষকদের ফসলী জমিকে শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য নগদ অর্থ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিময়ে বিশাল এলাকার বোরো জমি কন্ট্রাক্ট নিত। তারপর সেই জমিতে যাত শিলাবৃষ্টির আঘাত না আসে সেজন্য তারা জমির পাশে খোলা আকাশের নিচে পুজো আয়োজন করতো। এ ধরনের পূজায় কালো

www.pathagar.com

রঙের পাঁঠা বলী দেয়ার রেওয়াজ ছিল। হিরালীগণ কন্ট্রাক্টকৃত জমির বোরো ফসল রক্ষার নামে পূজার সময় শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য ছড়াধর্মী নানা ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করত। হিরালীদের উচ্চারিত ছড়াধর্মী একটি মন্ত্র নিচে তুলে ধরা হ'ল :

ভুবনেশ্বর ভজহরি অংশুমান ভোন্দরি/ত্রিকূল নশ্বরী মা কালী ভোজ মহান্দরী/ঈশানে ইন্দ্রকুমার নাগের মণি জয়হরি/বিরিক্ষি বিশাখী জমিন বিচালি বিখারী/পবন দেবতা স্মরি, রক্ষা কর মা জয়হরি/মা কালী ভুবনেশ্বরী, রক্ষা কর মা জয়হরি/রক্ষা মা জয়হরি, রক্ষা কর মা জয়হরি।

খালি কলসি দেখে যাত্রা

যাত্রা করার সময় খালী কলসী দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা, ডিম এবং কলা খেয়ে কোনো শুভ কাজে গেলে সুফল না পাওয়ার আশংকা, শনি-মঙ্গলবারে কোনো কাজে যাত্রা করলে অশুভ ঘটার সম্ভাবনা, 'আটকুঁড়ে'র মুখ ও 'কলু' সম্প্রদায়ের মানুষের মুখ দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি লোকবিশ্বাস এখনো কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত আছে। এ সকল লোকবিশ্বাস কু-সংস্কারের আওতাভুক্ত এবং এগুলোও আমাদের লোকসংস্কৃতির অংশ। এ ধরনের লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কার নিয়ে দু'টি উপদেশমূলক লোকছড়া কিশোরগঞ্জ জেলার কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত আছে। যা নিম্নরূপ :

বুধে ভদ্রা, চতুর্দিকে যাত্রা/না যাইও পুত উত্‌রা/যদি যাও বলে/নাক কাডা যাইব কোনো ছলে।

(শব্দার্থ-ভদ্রা-ভালো, উত্‌রা=উত্তরে)

সোম-শুক্কুর বাইচ্ছা/পূবে যাইও নাইচ্যা।

জ্বীন, ভূতের আছর

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষ বিকারগ্রস্ত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করলে মনে করা হয় তাকে জ্বীনে অথবা ভূতে ধরেছে। এই অপশক্তিকে তাড়ানোর জন্য কবিরাজ ডাকা হয়। কবিরাজ রোগীর উপর নানা রকম উৎপীড়ন, নিপীড়ন চালিয়ে থাকে। মানুষ মনে করে এই উৎপীড়ন, নিপীড়নে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না, বরং ঐ জ্বীন অথবা ভূত সাজা পেয়ে রোগীকে ছেড়ে চলে যায়।

কলেরা বসন্ত রোগের দোহাই

কোনো গ্রামে কলেরা অথবা বসন্ত রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে ফকির পদবির মানুষ খুঁজে আনা হয়। মানুষের বিশ্বাস, এই রোগটি মহিষ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুর আকৃতি ধারণ করে গ্রামে ঢুকে পড়ে। তাদের নিশ্বাস যার গায়ে লাগে সেই মহামারীতে আক্রান্ত হয়। এই রোগটি যাতে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য ফকির সারারাত গ্রাম পাহারা দেয়। মাঝে মাঝে সে জীব জন্তুর আকৃতিতে রোগটিকে দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দোয়া দরুদ পড়ে একটি লোহার শিক দিয়ে পিটিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। মানুষের বিশ্বাস, ফকির সর্তকতার সাথে পাহারা দিলে এই রোগ গ্রাম বা মহল্লায় প্রবেশ করতে পারে না।

www.pathagar.com

দিশা দেখা

মূল্যবান কোন বস্তু অথবা গরু-বাছুর হারিয়ে গেলে গণক ডেকে দিশা দেখা হয়। গণক মাটিতে আঁক-জোক করে অথবা অন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে হারানো বস্তু সম্পর্কে তথ্য দিয়ে থাকে।

চোর ডাকাত ঠেকাতে বাড়ি বন্ধনা

চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য অনেকেই বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারা নিজ নিজ বাড়ি বন্ধনা করে থাকে। বাড়ির চার কোনায় এবং ঘরের চৌকাঠে তাবিজ-কবজ বেঁধে রাখলে বাড়িতে চোর-ডাকাত প্রবেশ করতে পারেনা বলে তাদের বিশ্বাস।

সোনা-রূপার পানি ছিটানো

কার্তিক মাসের শেষদিন সন্ধ্যায় খড়ের তৈরি ভোলা পুড়িয়ে মশা-মাছি তাড়ানো হয়। তারপর ঐ ভোলা লাউয়ের মাচাঁয় পুতে রাখা হয়। বাড়ির বৌ-ঝিরা তাদের সোনা, রুপার অলংকারগুলি পানিতে চুবিয়ে সেই পানি সারা বাড়ি ছিটিয়ে দেয়। এতে ঘর বাড়ি পাক-পবিত্র হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

আতুর ঘরে শিশুকে বাঁচানোর উপায়

চডিঘরে 'চউক্কা গোটা' (এক শ্রেণির গুল্ম জাতীয় গাছের ফল) 'কাইতম' (চিকন, মসৃণ কালো সূতা বিশেষ) গলায় দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কোমরে, বাজুতে হয়তো থাকে কোনো পির-ফকির বা পাঁচ পিরের কোন মাজারের খাদেমের অথবা বড় হুজুরের দেওয়া তাবিজ বা মাদুলি। সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে বেঁধে রাখা হয় 'তাগা' বা 'বাইট্টা' (মোটা কালো সূতা) দিয়ে। বিশ্বাস রয়েছে এতে শিশুর মঙ্গল হয়।

বালা-মুছিবত থেকে মুক্ত থাকার জন্য অপদেবতাকে ভোগ দেওয়া

অনেকে বিশ্বাস করে তাদের দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদের জন্য কিছু অপদেবতা দায়ী। এদের খুশি রাখতে পারলে বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। 'ভোগে দেবতা তুষ্ট" এই বিশ্বাসে তারা অপদেবতাদের কল্পিত অধিষ্ঠান, খাল, বিল, গাছতলা ইত্যাদি স্থানে লাল মোরগ, ডিম, কলা, গজারমাছ ইত্যাদি উপাদেয় খাবার উৎসর্গ করে থাকে। এর মধ্যে বোয়াল মাছ ও পাঠাখাসী অন্যতম।

নজর লাগা বা চোখ লাগা

কোন গাভীর যদি ওলানপাকা রোগ হয়, অথবা ফলবান বৃক্ষে যদি ফল অকালে ঝরে যায়, তবেমনে করা হয় যে এতে কারও বা কোন ব্যক্তি লোকের খারাপ চোখ লেগেছে। মানুষের বিশ্বাস যে, সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদের চোখের দৃষ্টি খুবই বিপদজনক। এর প্রতিরোধ করতে মানুষ তাবিজ, কবজ ব্যবহার করে। ফলবান বৃক্ষে সবজী ক্ষেতে কালিমাখা মাটির হাঁড়ি পাতিল বাঁশের দ্বারা পুঁতে রাখে। কোথাও ছেড়া জামা-কাপড়, ঝাড়ু, জুতো ইত্যাদি টানিয়ে রাখে। এতে কুদৃষ্টি প্রতিহত হয় বলে বিশ্বাস রয়েছে।

www.pathagar.com

ইটনার ঐতিহাসিক মসজিদে গড়াগড়ি দেওয়া

এই এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ইটনার গায়েবি মসজিদে নিয়ে গড়াগড়ি দেয়ানো হয়। অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ ক্ষীর, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এখানে আসে। মানুষের বিশ্বাস, এতে অনেক পুণ্য অর্জিত হয়।

ধুলিপড়া দিয়ে ইঁদুর নিবারণ

অনেক সময় ফসলের মাঠে ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে যায়। ইঁদুর নিবারণ করার জন্য বিশেষ ব্যক্তিদের কাছ থেকে ধুলিপড়া এনে জমির চারপাশে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে ইঁদুর সদলবলে ঐ জমি ছেড়ে চলে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

১. রাতের বেলা এক ডাকে সাড়া দিতে নেই। কমপক্ষে তিনবার ডাক দিতে হয়। ধারণা করা হয়, কোনো অপদেবতা, ভূত-প্রেত অনিষ্ট করার লক্ষ্যে একডাক দিয়ে ঘরে থেকে বের করার চেষ্টা করছে। রাতে ঘর থেকে টাকা-পয়সা দিতে নেই। অমঙ্গল হয়।
২. হাত চুলকালে টাকা আসবে। বাঁ দিকের চোখ লাফালে মঙ্গল হয়।
৩. ডান চোখ ফরকিলে অসুখ আসবে। মেয়েরা রাতে চুল আঁচড়াতে নেই।
৪. বাড়িতে কুকুর বিড়াল অথবা কাক কাঁদলে অমঙ্গল হয়, মৃত্যু প্রবেশ করে।
৫. পরপর অবিরাম বৃষ্টি হলে ঘর থেকে ঘটি, বাটি, দা-কুঠার উঠোনে ফেলে দিলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়। নিজের প্রতিচ্ছবি ছায়ার দিকে তাকাতে নেই। অমঙ্গল হয়।
৬. দুজনের মাথায় ঠুকে খেলে তৎক্ষণাৎ উভয়ের মাথা একবার ঠুকতে হয়, নইলে আধমাথা ধরে বা মাথায় শিঙ গজায়। যমজকলা খেত নেই তাতে যমজ সন্তান হয়।
৭. মাথার উপর দিয়ে কা-কা করতে করতে কাক উড়ে যায়, তাহলে অমঙ্গল হয়।
৮. বাড়িতে আঁতুড় থাকলে বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আগুন হাত-পা সেঁকে ঘরে প্রবেশ করতে হয়। নইলে বাইরে থেকে ভূত-প্রেত তার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করতে পারে। আতুর ঘরে একখণ্ড লৌহ ব্যবহৃত জাল ও ঘরে জ্বলন্ত আগুন রাখতে হয়।
৯. স্নান করে এসে বা রাত্রিবেলা ভিক্ষা দিতে নেই। রাত্রি বেলা হলুদ দিতে নেই।
১০. স্নান করে মুখে কিছু না দিয়ে ফল খেতে নেই। আগে ভাত মেয়েদের খেতে নেই।
১১. রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দিতে নেই। রাত্রিকালে হুঁতোম পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল আসে।
১২. চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে গরু-বাছুর বিক্রি করতে নেই। গোয়াল ঘরের সামনে মৃত শিং
১৩. সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা মাছ কুটলে বা কানো কিছু ভাঙালে ঠোঁট কাটা বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে। শুধু শুধু ভাতের চাউল খেতে নেই, অমঙ্গল হয়।
১৪. গর্ভাবস্থায় তার ঘরে সুন্দর শিশুর ছবি রাখা হয়। বিশ্বাস এতে সুন্দর শিশুর জন্ম হয়। প্রথম সন্তান মেয়ের চেয়ে ছেলে হলে ভালো হয়।
১৫. গর্ভাবস্থায় ডাব খেলে সন্তানের চোখ খোলা হয়। নতুন কাপড় পরিধান করার পূর্বে আগুন অথবা পানি চিটিয়ে নিতে হয়। না হয় নতুন কাপড়ে ভূত প্রেতের আঁচর আসতে পারে ঘরে। তাতে অমঙ্গল হয়।
১৬. বিড়াল মেরে ফেললে সওয়াসের ওজনে লবণ নদীতে ফেলে দিতে হয় না হলে অমঙ্গল হয়।

www.pathagar.com

১৭. শিশুকে ঘরের বাইরে নিতে হলে কপালের বাম দিকে কালির দাগ দিতে হয়। আঁতুর ঘরে ভাঙ্গা দা-বটি, কাঁচি, শিয়রে লোহা ইত্যাদি ভূত প্রেতের ভয়ে রাখতে হয় না হয় অমঙ্গল হয়। কোন মেয়ের নাকে যদি তিল থাকে স্বামী তাকে ভালবাসে। কোন পুরুষের নাক ঘামলে স্ত্রী তাকে আদর করে বা ভালবাসে।

বাইদ্যার ঝাড়া

বেদে সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত যাযাবর জীবনযাপন করে থাকে। বছরের বেশির ভাগ সময় নদীর উপর নৌকাতেই তাদের জীবন কাটে। বর্ষাকাল হচ্ছে বেদে সম্প্রদায়ের আয়-রোজগারের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সময়। এ সময় তারা নদীর বুকে নৌকার বহর নিয়ে পাল উড়িয়ে জীবিকার অন্বেষণে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমায়। অতঃপর পছন্দ মতো জায়গায় এসে নদীকূলবর্তী স্থানে অস্থায়ী ছাউনি ফেলে বসবাস করতে শুরু করে। বেদে পুরুষেরা তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করা ছাড়াও বন্ধ্যা রমণীকে সন্তানসম্ভবা করার জন্য ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবচ দিয়ে বিনিময়ে টাকাকড়ি সংগ্রহ করে। অন্যদিকে বেদেনিরা শিঙ্গা লাগিয়ে বাতের ব্যথা সারানোর কাজসহ প্যারালাইজড রোগীর চিকিৎসার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। শিঙ্গা হচ্ছে বড় গরু বা মহিষের শিং দ্বারা তৈরি এক ধরনের নল। যারা বাতের রোগী তারা এই শিঙ্গা লাগানোর তন্ত্রে বিশ্বাস করে বেদেনিদের নিজ বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। রোগীর অবস্থা বুঝে বেদেনি রোগীর শরীরের যে অংশে ব্যথা রয়েছে সেখানে 'কাঁইক্কা' মাছের কর্তিত ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়ে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি করে। তারপর ক্ষতস্থানে শিঙ্গা লাগিয়ে সাময়িক উপশম হয়ে থাকে। এই শিঙ্গা লাগানোর সময় বেদেনিরা সাধারণত বড় বড় পির-মাশায়েখ ও আউলিয়া-দরবেশের নাম উচ্চারণ করে মন্ত্র পাঠ করে থাকে। এরকম একটি মন্ত্রের উদাহরণ নিম্নরূপ।

শাহজালাল, শারফিন, শাহপরান
মাইজভাণ্ডার, বার পির, বার আউলিয়া
কেল্লা বাবার দোহাই লাগে-
রসবাত, কটিবাত, জ্বালাপোড়া বাত
বাইর হ' - বাইর হ'।

শিঙ্গার মাধ্যমে বাতের বিষ বা বদরক্ত বের করার পর গাছ-গাছড়ার পাতা, শিকড় এবং লতা ছেঁচে রস তৈরি করে তেলের সাথে সেই রস মিশিয়ে আগুনে জ্বাল দিয়ে বেদেনিরা এক ধরনের মিক্চার তেল তৈরি করে। সেই মিক্চার তেল বাতের রোগীকে ব্যথার স্থানে মালিশ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। রোগীর অবস্থাভেদে কাউকে ২১ দিন, কাউকে ১৪ দিন এবং কাউকে ৩ দিন এই মিক্চার তেল মালিশ করতে হয়। এতে বাতের ব্যথা উপশম হয় বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। বেদেনিরা এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের বিনিময়ে গৃহস্থের কাছ থেকে কখনো নগদ টাকা, কখনো ধান-চাল, মুরগি, ডিম বা শাকসবজি পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। দাঁতে বিষ ব্যথা ছাড়াও দাতের পোকা বের করে বেদেনিরা গ্রামের সহজ সরল মানুষদের মাঝে চিকিৎসা করে থাকে। আর চিকিৎসায় সাধারণ মানুষদের বিশ্বাস রয়েছে। এভাবেই মানুষ যুগের পর যুগ ধরে বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করে বেঁচে আছে সমাজে।

www.pathagar.com

শিশুকে গরগরি দেয়া

উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে শিশুরা যথাসময়ে হাঁটতে না শিখলে অভিভাবকেরা টিনের চালায় পুলি পিঠা ঢেলে দেয় এবং টিনের চালা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়তে থাকলে গ্রামের অন্যান্য মানুষ তা হুড়ো হুরি করে তুলে নেয়। এতে একদিকে যেমন গ্রামের সকল মানুষ মজা পায় অন্যদিকে অভিভাবকেরাও আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। ঐ সময় অভিভাবক তার ছোট্ট শিশুকেও গরগরি (পুলি পিঠা/গুলিপিঠা) তুলে নিজ হাতে খেতে মাটিতে নামিয়ে দেয়। অভিভাবকরা বিশ্বাস করে গরগরি প্রদান করলে শিশুরা যথাসময়ে অর্থাৎ দশ/এগার মাসে হাঁটতে শিখবে। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। গরগরি দেয়ার আগের দিন গ্রামের মানুষদের একদিকে জানিয়ে দেওয়া হয় অন্য দিকে চলে গরগরি বানানোর প্রক্রিয়া। গরগরি বানানো খুবই সহজ। চালকুটে তা প্রথমে চালনি দিয়ে ছেকে নিতে হয় তারপর লবণ পানি দিয়ে গুলতে হয় শক্ত করে, যাতে করে ছোট ছোট গোল গোল করে গুলি বানানো হয় তারপর এগুলো পুলি পিঠা যেভাবে তৈরি করা হয় সেভাবে তৈরি করতে হয়। তৈরি হয়ে গেলে এগুলো একটা পাত্রে করে ঘরের ঢেউ টিনের চালায় উঠে একবারে পুরো চালা জুরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ছিটানো গরগরিগুলো গড়িয়ে মাটিতে পড়তে থাকে এবং গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলে মিলে এগুলো কুড়িয়ে নেয়, এতে সবার মনেই আনন্দ বিরাজ করতে থাকে। বিশেষ করে শিশুরা এতে বেশি মজা পায়।

মাজার জিয়ারতে বিশ্বাস

প্রতি বছরই কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ দেশের বিভিন্ন মাজার জিয়ারত করতে যায়। নৌকা ও বাসযোগে এবং হেঁটে মাজার জিয়ারত করা হয়। বিশেষ করে ভাটি কিশোরগঞ্জের নিকলী, মিঠামইন, ইটনা, অষ্টগ্রাম ও কুলিয়ারচর উপজেলায় ফরিদপুরের ফতেহ আলীর মাজার, শাহরানীর মাজার (পোড়দিয়া), পশ্চিম গোবড়িয়ার গোলাপ শাহের মাজার, বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুরের পাগলাবাবার মাজার ইত্যাদি স্থানে হেঁটে জিয়ারত করা হয়। কিন্তু আখাউড়ার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) কেল্লা বাজার মাজারে নৌকা দিয়ে জিয়ারত করা হয় এবং চট্টগ্রামর বায়েজিদ বোস্তামির মাজার, সিলেটের শাহ জালালের মাজার ইত্যাদি স্থান অত্র এলাকার মানুষ বাস রিজার্ভ করে জিয়ারত করে থাকেন। এই এলাকার মানুষের মাজার জিয়ারত প্রক্রিয়াটি খুবই চমৎকার। জিয়ারতের জন্য খাসি, মুরগি, হাঁস, লাকড়ি, বিভিন্ন প্রকার মসল্লা, তৈল, পাতিল ইত্যাদি নিয়ে কয়েক পরিবার (১০ থেকে ২০ জন) রওয়ানা হয়। মাজার জিয়ারত এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানত পালন করা। কেউ কখনো রোগে শোকে ভুগলে তখন তার জন্য মানত করা হয়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বলে "আমার এই রোগ ভাল হলে/উদ্দেশ্য সফল হলে আমি ঐ মাজারের জন্য একটি ছাগল/খাসি/মুরগি/হাস/গরু/মহিষ মানত করলাম। উদ্দেশ্য হাসিল হলে তখন মাজার জিয়ারত করা হয়। জিয়ারতে গিয়ে মানতের প্রাণীটি জবাই করে রান্নাবান্না করে খেয়ে মাজারের দরবারে দোয়া করা হয়। এতে বিশ্বাস রয়েছে দোয়া মোনাজাত কবুল বা সফল হবে।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

মানুষ আদিকাল থেকেই নিজের প্রয়োজনে জ্ঞান ও বুদ্ধি ঘটিয়ে কল্পনাশক্তির সাহায্যে এমন কিছু যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে যাকে লোকপ্রযুক্তি বলা হয়। যেমন- লাঙল, মই, ফাল, দা-বটি ইত্যাদি। নিম্নে কিশোরগঞ্জ জেলার কিছু লোকপ্রযুক্তি দেওয়া হলো :

১. মাছ ধরার উইন্যা

উজান ভাটি কিশোরগঞ্জের সাধারণ মানুষ বাঁশ বেত দিয়ে ছাই, উনিয়া, পল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। পৈতৃক পেশা হিসেবে এরা শত বছর ধরে এই পেশা চালিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র বাঁশ ও দা এ শিল্পের হাতিয়ার ও উপকরণ। এরা অতিদরিদ্র শ্রেণির মানুষ। ছোট ছেলেমেয় বউ সকলেই এই কাজে পারদর্শী। গ্রামের কৃষক জালো, মালো সাধারণ মানুষ বিল বা হাওর থেকে মাছ ধরার জন্য ছাই, পল, উনিয়া কিনে কিংবা নিজেরা তৈরি করে সারা বছরই মাছ ধরে। সারা বছরই এর চাহিদা দেখা যায়। এরা মুড়া তৈরি করতেও পারদর্শী। অনেক পরিবার মুড়া তৈরি করে দেশের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এরা কারুকাজ সম্পূর্ণ পাখির পিঞ্জিরা হাঁস মুরগির খাঁচা তৈরি করে থাকে। পল ও পাখির পিঞ্জিরা তৈরি করে সিরাজ উদ্দিন, কাশেম আলী, আ. কাদির। উনিয়া/ছাই তৈরি করে আ. ছালাম, মিছির উদ্দিন, আবু তালেব, আবুল কাশেম, খোকন, নজরুল, সিরাজ উদ্দিন, মোবারক, আব্বাছ আলী, ইউসুফ আলী, কাশেম, হাসেম, সামছুল, লিটন মুড়া তৈরি করে তোরাব আলী, উমর আলী, সমর আলী, জনাব আলী কাজল, ইয়াকুব আলী, আ. হান্নান, দেওয়ান আলী, সুজন মিয়া, মোস্তফা, হযরত আলী, মজিবুর এরা করিমগঞ্জের আশুতিয়া পাড়া পলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আ. হাকিম, নামাপাড়া, গিয়াস উদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন, ইব্রাহিম, কাজু মিয়া, রামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

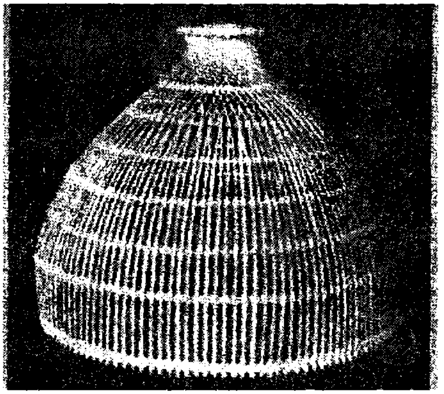

পলো

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর কাতিয়ারচর নামক এলাকায় এককালে কাতিয়া, চাটি, ধারি ইত্যাদি তৈরি করার প্রধান এলাকা ছিলা। কাতিয়ারচর নামটি প্রমাণ করে এ অঞ্চলে এককালে প্রচুর কাতিয়া, চাটি, ধারি ইত্যাদি বাঁশ বেতের জিনিস তৈরি করত সাধারণ মানুষ।

২. মাছ ধরার জাখা

কৃষকের কৃষি কাজের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস খাঁচা, কাদি বা জাহুন সারা বছরই কৃষক কাজের জন্য এই জিনিসগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে। ধান মাড়াই, ধান উঠানো, মাটি কাটা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বাজারে নিয়ে বিক্রি করার কাজ এসব জিনিস ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ও বেত একমাত্র উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন আকারে তৈরি এসব জিনিস কৃষকের নিকট সারা বছরই এর চাহিদা রয়েছে।

৩. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ

ঘানি- সরিষা, তিল, রেড়ি এবং পাকা নারকেলের শাঁস থেকে পিষে তেল বের করে আনার ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র। ঘানির উপরিভাগে রয়েছে বালতি সদৃশ ধারণপাত্রসহ কাঠের একটি কাঠামো। তেল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল অল্প পরিমাণে এই ধারণপাত্রের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। ঘানিতে ঢেলে দেওয়ার পর তা পেষানো হলে তা থেকে ধারাক্রমে একটি গ্রহণকারী অংশে তেল গড়িয়ে পড়ে। এটিকে সরিষা ভাঙার খানি গাছ বলে। ঘানি ঘোরানোর জন্য যান্ত্রিক মোটরের পরিবর্তে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক হচ্ছে ঘোড়া ও গরুর মধ্যে বলদের ব্যবহার। ঘানি ঘুরানোর জন্য একটি মাত্র পশু ব্যবহার করা হয়। পশুটির চোখের দুই পাশে বাঁশের পাতলা বাতার তৈরি চশমার মতো ঠুলি বা দুটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধক জুড়ে দেওয়া হয়। পশুটিকে বৃত্তাকার পথে শুধু সামনের দিকে চলমান রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এভাবেই গ্রামে-গঞ্জে এখনও সরিষা ভাঙার ঘানি গাছ এর ব্যবহার রয়েছে। এককালে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের পথে ঘাটে ঘানিগাছ দেখা যেত। আজকাল তার ব্যবহার অনেক কম।

এক কালে ঘানি গাছের সরিষা তেল ছাড়া মানুষের রান্নাঘরে খাওয়াই হতো না। আজ তার পরিবর্তে এসেছে সয়াবিন তেল। যা যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। যদিও সরিষার তেল এখন যন্ত্রের মাধ্যমেই বেশি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তবুও গ্রামে-গঞ্জে ঘানিগাছের চাহিদা বেশি। পাশাপাশি এর দুমূর্ল্য ও দুস্প্রাপ্যতা রয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় এককালে সরিষা কি পরিমাণে চাষাবাদ হতো তার প্রমাণ হিসেবে এ জেলায় একটি বিখ্যাত জনপদের নাম রয়েছে সরিষাপুর উপজেলা বাজিতপুর।

৪. কাপড় বোনার তাঁত

কিশোরগঞ্জে এককালে তাঁত শিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল। এই জেলার জঙ্গলবাড়ি, বত্রিশ, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর প্রাচীন আমলে এবং মধ্য যুগে মসলিন কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে মসলিন কাপড় বুনন, তৈরি ও বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে এ অঞ্চলে মসলিন কাপড়ের স্মৃতি চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমান যুগে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলা, কুলিয়ারচর উপজেলা ও ভৈরব উপজেলায় দেশীয় তাঁতের প্রচলন রয়েছে। এইসব তাঁত থেকে সুঁতি কাপড়, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি তৈরি ও

www.pathagar.com

বিক্রি করা হয়। এ সমস্ত তাঁত ব্যবসা ও পেশায় স্থানীয় লোকজন জড়িত রয়েছে। প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান যুগেও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় সব ক'টি উপজেলায় তাঁতি শ্রেণির লোকদের মধ্যে যুগী, দেবনাথ তাদের বসতি রয়েছে। এই জেলার এমন একটি গ্রাম নেই যেখানে যুগী পাড়া, যুগী হাটি, যুগী কান্দা ইত্যাদি নামে জনপদ নেই। তাতে প্রমাণ করে এই জেলায় এককালে তাঁতিদের বসতি ছিল বেশি। হিন্দু তাঁতি শ্রেণির লোকেরা অনেকেই বর্তমানে বসাক পদবি গ্রহণ করে তাঁত ব্যবসা ও পেশা থেকে বিরত হয়ে অন্য ব্যবসা ও পেশায় জড়িত হয়ে পরেছেন। মুসলিম তাঁতিরা অনেকেই জোলা পদবি ছেড়ে অন্য পদবি গ্রহণ করে অন্য পেশায় জড়িত হয়ে পরেছেন।

৫. কুলা

গ্রাম-শহর সকল পরিবারে আর একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বাঁশ দিয়ে তৈরি লোকজশিল্প কুলা। এর চাহিদা সকল পরিবারেই রয়েছে। প্রতিটি বিয়ে অনুষ্ঠানে কুলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কুলা ছাড়া বিয়ে অনুষ্ঠান আজ গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত কুলাকে বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান ভাবা যায় না। বিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম ক্রয়কৃত বস্তুটি একমাত্র কুলা। আর এ কুলাটি তৈরি করে গ্রামের এক শ্রেণির লোকজ শিল্পকর্মী। বিভিন্ন কারু কাজ সম্পূর্ণ কুলা বাজারে বিক্রয় করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

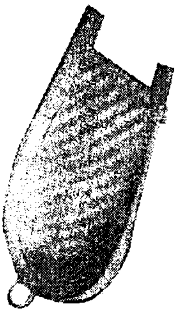

কুলা

৬. দারি/চাডি

গ্রামের মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু দারি বা চাডি। খাট বা চৌকিতে বিচানো হতদারিদ্র মানুষের মাটির উপর চাডি বিচায়ে রাত্রিযাপনসহ কৃষকের প্রয়োজনীয় বস্তু দারি চাডি। বৈশাখ মাসে বোরধান তুলার জন্য দারি অতি প্রয়োজনীয় কারণ বোর মৌসুমে বৃষ্টির সময় ধান মাড়ায়ের কাজে দারি ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ধান মাড়ায়ের সময় আসার আগেই কৃষক কম দামে ক্রয় করে রেখে দিত সময় হলে তা ব্যবহার করত। জায়নামায হিসেবে বাঁশের তৈরি ছোট চাডি কে নামাযের জন্য কৃষক বা সব শ্রেণির মানুষই প্রতিবাড়িতে ব্যবহার করার জন্য ২/৩টি কিনে রাখেন। এ পেশায় জড়িত কৃষকেরা দারি চাডি তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। পালই কান্দা গ্রামের আ. খালেক ইউসুফ আলী, নজরুল, মঞ্জিল মিয়া, ছাত্তার, আছির উদ্দিন, রোবেল, সিরু মিয়া, খুশিদ উদ্দিন, হোসেন আলী, গিয়াস উদ্দিন, বাবুল, মিলন মিয়া,

www.pathagar.com

মফিজ, নিজাম উদ্দিন, মর্তুজ আলী, হাসান আলী, আ. আলী, আবুল কাশেম, ছোট মিয়াসহ অনেকেই বাঁশ দিয়ে চাড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। গ্রামের নাম পালই প্রমাণ করে এখানে এককালে পল মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ তৈরি করা হতো।

মাছধরা বা রাখার জন্য বাশের তৈরি ডুলা এখনও গ্রামের মানুষ মাছ ধরা কাজে নিত্য প্রয়োজনীয় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

৭. পাটিশান/সিলিং

আমাদের দেশে এক শ্রেণির লোকজ শিল্পের কারিগর ছিল, বাঁশ দিয়ে কারুকাজ সম্পূর্ণ মাঝঘরের পাটিশান, ঘরের সিলিং বা কারুকাজ সম্পূর্ণ বেড়া তৈরি করত। একটি পাটিশান তৈরি করতে প্রায় ৩ মাস থেকে ৬ মাস সময় প্রয়োজন হতো। গ্রামের অনেক ধনী কৃষক শখ করে এ ধরনের কাজে পারদর্শী লোক দিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করে ঘরের পাটিশান বা সিলিং তৈরি করাত। বাঁশের চেয়ে কাজের মজুরি নিত অনেক বেশি। এইসব কারুকাজ সম্পূর্ণ পাটিশান দেখার জন্য গ্রামের লোকজন এসে ভির জমাত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের শিল্প কর্ম বা কাজের লোক নাই বললে চলে। তবুও কিশোরগঞ্জের সর্বত্র টিনের ঘরে সিলিং হিসেবে বাঁশ বেতে তৈরি বেড়ার ব্যবহার এর প্রচলন রয়েছে।

তথ্যনির্দেশ : ১। এগারসিন্দুর দুর্গ- দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা-২০০০, শাহ আজিজুল হক
২। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ১৯৯২, সম্পাদনা- নূরুল ইসলাম খান
৩। মুদ্রা ইতিহাস ও সংগ্রহ- খন্দকার মাহমুদুল হাসান
৪। আইন-ই-আকবরী- আবুল ফজল
৫। আকবর নামা- আবুল ফজল
৬। ঢাকাই মসলিন- ড. আবদুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫
৭। কোম্পানী আমলে ঢাকা- জেমস টেলর, অনুবাদ- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২
৮। ময়মনসিংহের চরিতাভিধান, ময়মনসিংহ- দরজি আবদুল ওয়াহাব, ১৯৮১
৯। কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ, ঢাকা- মোহাম্মদ আলী খান, ১৯৯০
১০। কত কথা কত স্মৃতি- রাজশাহী, শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ, ১৯৯০
১১। পাকুন্দিয়া উপজেলার কথা, কিশোরগঞ্জ, মোহাম্মদ আলী খান, ১৯৮৭
১২। প্রেমবিলাস, কলিকাতা, নিত্যানন্দ দাস, ১৩২০ বঙ্গাব্দ
১৩। বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, শামসুজ্জামান খান, ১৯৮৫
১৪। বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, খগেশকিরণ তালুকদার
১৫। ভৈরব অতীত ও বর্তমান, কিশোরগঞ্জ- মোহাম্মদ আলী খান, ১৯৮৭
১৬। ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, ময়মনসিংহ, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, ১৯৮৭ ইং
১৭। ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা, ময়মনসিংহ- জেলা পরিষদ পর্ষদ- ১৯৮৭
১৮। ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ময়মনসিংহ- জেলা পরিষদ পর্ষদ- ১৯৮৭
১৯। মৈমনসিংহ গীতিকা- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্মুদ্রণ- ১৯৭৩
২০। মোমেনশাহীর নতুন ইতিহাস, ময়মনসিংহ, খান সাহেব এম. আবদুল্লাহ, ১৯৭১
২১। বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, কলিকাতা, নীহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ
২২। উচ্ছ্বাস জঙ্গলবাড়ী, কিশোরগঞ্জ, শ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

www.pathagar.com

২৩। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, সুপ্রকাশ রায় ১৯৬৬
২৪। বরণী, সুতি, কুলেশ্বরীর দেশ তাড়াইল, ঢাকা, সাজেদুল হক ও হাসনা আরা হাই, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ
২৫। বাংলাদেশের নদী, বাংলা একাডেমী, সৈয়দ মাজহারুল হক, ১৯৮৫
২৬। মাসিক সৃষ্টি, কিশোরগঞ্জ স্থান নামের উৎস সন্ধানে, মোহাম্মদ সাইদুর, ১৯৮৫
২৭। কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, মোহাম্মদ সাইদুর ও মোহাম্মদ আলী খান, ১৯৯৩
২৮। বাজিতপুরের কথা, ঢাকা, মুহম্মদ বাকের, ১৯৯৫
২৯। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ, ঢাকা- জেমস ওয়াইজ ২০০২
৩০। কিশোরগঞ্জের লোক ঐতিহ্য, কিশোরগঞ্জ, প্রিন্স রফিক খান, ২০০৫
৩১। কিশোরগঞ্জের লেখক জীবনী, কিশোরগঞ্জ, প্রিন্স রফিক খান, ২০০৯
৩২। বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা, মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, ২০০৪
৩৩। লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির, ঢাকা, মনিরুজ্জামান, ২০০০
৩৪। কিশোরগঞ্জের গুণীজন, ঢাকা, এম. এ. মান্নান
৩৫। বাংলাদেশের লোকগীতি, বাংলা একাডেমী, ড. আবদুল ওয়াহাব
৩৬। মোহাম্মদ সাইদুর (জীবনীগ্রন্থ); এম. এ. কাইয়ুম ও মোহাম্মদ আলী খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩
৩৭। বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৩৮। কিশোরগঞ্জের বাউল ও বাউলা গান, প্রিন্স রফিক খান
৩৯। কটিয়াদীর প্রামান্য ইতিহাস, রফিকুল হক আকন্দ
৪০। মুক্তিযুদ্ধে কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, জাহাঙ্গীর আলম জাহান

এছাড়া যেসব জ্ঞানী-গুণী, নিরক্ষর, অশিক্ষিত, লোক কবি, শিল্পী, গীতিকার, বাউল সমাজের নানান পেশার সুধীজনদের সাক্ষাৎকারসহ তাদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১। সিরাজ উদ্দিন খান, নিকলী উপজেলা, বয়স-৭৫
২। হাসিনা বেগম, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৮০
৩। শামীমা খান, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৪৫
৪। রাফিনা খান, নিকলী উপজেলা, বয়স-২৫
৫। অভিনা খান, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-২০
৬। সৈয়দ রেজুয়ান উল্লাহ বাশার, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৫০
৭। আলহাজ্ব আবদুল কদ্দুছ মিয়া, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৫৫
৮। প্রদীপ চন্দ্র দাস, নিকলী উপজেলা, বয়স-২৩
৯। আনফর আলী, নিকলী উপজেলা, বয়স-৬০
১০। সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিয়া, করিমগঞ্জ উপজেলা, বয়স-৪৫
১১। অমর চন্দ্র শীল, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৭০
১২। হারিছ মোহাম্মদ, কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, বয়স-৪৫
১৩। চঞ্চল মাহমুদ, হোসেনপুর উপজেলা, বয়স-৫০
১৪। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ভৈরব উপজেলা, বয়স-৫৫
১৫। আব্দুল মান্নান স্বপন, বাজিতপুর উপজেলা, বয়স- ৪৫
১৬। তাজুল ইসলাম, পাকুন্দিয়া উপজেলা, বয়স- ৬৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি